বঙ্গদর্শন।

[নবপর্য্যায়]

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ।

১৩১১।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, গোপালকৃষ্ণ, ৺সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি।

সহঃ সম্পাদক

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক

২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

সূচী।

বঙ্গদর্শন।

বিদ্যাপতির প্রকাশিত-পদাবলী।*

১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গদর্শনে স্বর্গগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে বিদ্যাপতির প্রকৃতইতিহাস-নির্ণয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তৎপূর্ব্বে এই কবির সম্বন্ধে লোকে যাহা জানিত, তাহা লোকপ্রবাদমাত্র। প্রকৃত কথা কেহ জানিত না, জানিবার তেমন কোন প্রয়াসও হয় নাই। রাজকৃষ্ণবাবু প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অসামান্য মৌলিক গবেষণা দ্বারা কবির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করিলেন। প্রচুর প্রমাণ দ্বারা তিনি যে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত হইল। —"(১) মৈথিলভাষায় রচিত অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল গীতের ভণিতায় রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ ও লখিমাদেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (২) মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। (৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমাদেবী তাঁহার মহিষী ছিলেন, ইহা পঞ্জীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়। (৪) বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতা ও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাংলা-দেশে নাই। (৫) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বিস্ফীগ্রাম দান পাইয়াছিলেন; দানপত্র অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে; এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। (৬) বিদ্যাপতির হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাপি তদ্বংশীয়দিগের নিকটে মিথিলায় দেখিতে পাওয়া যায়। (৭) রাজা শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলায় আছেন। (৮) বিদ্যাপতিলিখিত পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও অন্যান্য অনেক সংস্কৃতপুস্তক মিথিলায় প্রচলিত

---

* বিদ্যাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অধিবেশনে পঠিত। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ অপ্রকাশিত পদাবলী, জ্যৈষ্ঠসংখ্যার বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে।

দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। (৯) এই সকল পুস্তকে তাৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় আছে, পঞ্জীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। (১০) বিদ্যাপতিরচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।" রাজকৃষ্ণবাবুর এই দশটি সিদ্ধান্ত এতাবৎকাল প্রামাণ্য রহিয়াছে, কোনটিই খণ্ডিত অথবা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় নাই। দুইটির সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার বংশধরদিগের নিকট আছে, এ কথা আরও অনেকে বলেন; তালপত্রের প্রতিলিপিও প্রকাশিত হইয়াছে। বিস্ময়ের কথা এই যে, কবির রচিত অমূল্য পদাবলী ও তাঁহার রচিত বহুতর সংস্কৃতগ্রন্থের একখানিও পাণ্ডুলিপি অথবা তালপত্র তাঁহার বংশধরদিগের অথবা অপর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না, অথচ সম্ভবত সেগুলি তাঁহার বিশেষ আদরের ও যত্নের সামগ্রী ছিল। বিস্‌ফীগ্রামের দানপত্রসম্বন্ধেও নূতন তথ্য নিরূপিত হইয়াছে। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধে উক্ত দানপত্রের একাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। প্রায় দশবৎসর পরে গ্রিয়ার্সন্ দানপত্রের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পাইয়া *Indian Antiquary* পত্রে প্রকাশ করেন। সে সময় পর্য্যন্ত তিনি মূল দানপত্র দেখিতে পান নাই। কিছুদিন পরে দানপত্রের তাম্রলিপি পাইয়া তাহার প্রতিকৃতি এসিয়াটিক্ সোসাইটির কার্য্যবিবরণীতে (Proceedings) প্রকাশ করেন। আরও কিছুদিন পরে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, তাম্রলিপি কৃত্রিম, আসল নহে। বোধ হয়, মূল দানপত্রখানি হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া যাওয়াতে বিদ্যাপতির কোন বংশধর একখানি নূতন তাম্রলিপি প্রস্তুত করাইয়া থাকিবেন, এবং সেই সময় তাহাতে তারিখের গোল থাকিয়া যায়।

পূর্ব্বে বিদ্যাপতির গীতাবলী স্বতন্ত্রপুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, পদকল্পতরুর কবিতাকুসুমও বর্ণাশুদ্ধিকণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে নিহিত ছিল। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধ প্রচারিত হইবার দুইবৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৮০ সালে, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র নিজের নাম অপ্রকাশিত রাখিয়া মহাজনপদাবলী হইতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী স্বতন্ত্রগ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিয়া প্রথমে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই উদ্যম ও অধ্যবসায়ের যথোচিত প্রশংসা হয় নাই। পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারগণ তাঁহার নিকট অশেষ ঋণী, এমন কি, তাঁহার কৃত অনেক টীকা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সে ঋণ স্বীকার করেন নাই, ইহা ক্ষোভের বিষয়। তাঁহার সংগৃহীত পাঠ ও তৎকৃত টীকা প্রমাদশূন্য হয় নাই, এবং বিদ্যাপতির জন্মস্থানসম্বন্ধে তাঁহারও ভ্রান্ত ধারণা ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বার্থশূন্য উদ্যম ও পরিশ্রমে সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 'প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ'সঙ্কলনে ব্রতী হইলেন। বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন ও টীকা প্রভৃতির ভার সারদাবাবু লইলেন, অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ অক্ষয়বাবু সম্পাদন করেন। পরে বিদ্যা-

পতির পদাবলী সারদাবাবু স্বতন্ত্রপুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অক্ষয়বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সবিশেষ পারদর্শী ছাত্র, ক্রমে সাহিত্যসমাজেও উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইলেন। সারদাবাবু মেধাবী, সহপাঠীদিগের অগ্রণী, কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ যশস্বী হইয়া এক্ষণে উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। একদিকে রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য, বহুশাস্ত্রবিশারদ, চিন্তাশীল, মনীষী লেখকের আবিষ্কার, অপরদিকে সগুপরীক্ষোত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ভূষণ ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ আগ্রহ—শিক্ষিতসমাজে বিদ্যাপতির আদর হইবার উপক্রম হইল। এতকাল এই মৈথিল কবি ভিক্ষুক বৈষ্ণবের কণ্ঠে ও কন্থায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, বটতলার জীর্ণ মলিনবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, এতদিনে তাঁহার ভদ্রবেশে ভদ্রসমাজে স্থান হইল। যাঁহারা ভারতচন্দ্র রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠকবি বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদের পুত্রগণ এই বৈষ্ণবকবির সমাদর করিতে শিখিলেন। সৌভাগ্য কবির নয়, কারণ বৈষ্ণবভিক্ষুকের ঘরে ও রাজপ্রাসাদে কবির তুল্য প্রীতি। বঙ্গভাষার অপ্রকাশিত কোন পদে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

মণি কাদব লপটায় রে।
তই কি তনিক গুণ যায় রে॥

মণি কর্দ্দমলিপ্ত হয়, তাহাতে কি তাহার গুণ যায়? 'কিমপৈতি রজোভিরৌর্ব্বরৈরবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা?' যে মণি চিনে, সেই সৌভাগ্যশালী। যে শিবসিংহ রাজা বিদ্যাপতিকে গ্রামদান করিয়াছিলেন, কবির পরিচয়েই আজ তাঁহার পরিচয়। কবির পদাবলীতে তাঁহার নাম পুনঃপুন অনুস্যূত না থাকিলে রাজা শিবসিংহকে আজ কে চিনিত? বিদ্যাপতিকে তাঁহার উপযুক্ত আসনে বরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য স্বয়ং গরিমান্বিত হইয়াছে।

সাহিত্যের ভদ্রপল্লীতে বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ হইল, কিন্তু পাঠের, টীকার, অর্থের, অসংখ্য ভ্রম রহিয়া গেল। কারণ নানা, তাহার মধ্যে দুইটি নির্দ্দেশ করিতেছি। প্রথম, ভাষা। বিদ্যাপতির ভাষা প্রাচীন বঙ্গভাষা কি না, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মিথিলার ও বঙ্গদেশের কথিত ও লিখিত ভাষায় কতদূর সাদৃশ্য ও পার্থক্য ছিল, সে কথার বিচার বা আলোচনা না করিয়াও স্বীকার করিতে হইবে যে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি, কিন্তু দুইজনের ভাষায় কোন সাদৃশ্য নাই। বীরভূম ও মিথিলায় যত ব্যবধান, কলিকাতা ও চট্টগ্রামের পরস্পর দূরত্ব তাহার অপেক্ষা অধিক, কিন্তু উভয় স্থানের লিখিত ভাষায় বড় প্রভেদ নাই। যাহাকে ব্রজভাষা ও ব্রজবুলি বলা যায়, তাহাও ঠিক কোন দেশের ভাষা নয়, পুঁথির ও গানের ভাষা, এবং বিদ্যাপতিই তাহার স্রষ্টা। বঙ্গদেশে বিস্তর বৈষ্ণবকবি সেই ভাষার লালিত্যে, শ্রুতিমাধুর্য্যে, তরলতায় ও মধুময়ী মোহিনীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুকরণে ভূরিভূরি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ ভাষা দুর্ব্বোধ। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে এদেশে বিদ্যাপতির গীতাবলীর বহুলপ্রচার ছিল না, সেইজন্য বৈষ্ণবদাস বলিয়া গিয়াছেন, 'আছিল গোপতে, যতন করি পঁহু মোর (চৈতন্য-

দেব), জগতে করল পরকাশ।' সেকালে বিদ্যাপতির ভাষা বৈষ্ণব ভাবুক ও কবিদিগের নিকট তেমন দুরূহ ছিল না। বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের পর সাম্প্রদায়িকতার কারণে পদাবলীর চর্চ্চা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। সম্প্রদায় যত বড়ই হউক, জাতির অপেক্ষা ছোট। বৈষ্ণব যাহা ভক্তিপূর্ব্বক পড়ে, শাক্ত হয় ত তাহাতে উদাসীন। ক্রমে লোকে বিদ্যাপতির ভাষা ভুলিল, পদাবলী দিনদিন দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় কারণ, লিপিকরের উৎপাত। বর্গীর দৌরাত্ম্য দেশের লোককে ছাড়িয়া দেশের পুঁথিকে আক্রমণ করিয়াছিল। কোন শাসন নাই, কোন নিয়ম নাই, যাহার যেমন ইচ্ছা, সে তেমন লিখে। জ, ন, শ, ইকার, উকার কখন্ যে কোন্ আকার ধারণ করে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। পরাধীন জাতি এই এক পুঁথি লিখিবার সময় মনের সাধ মিটাইয়া স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া লইল। এখন, পুঁথি নকল করা ও ছাপান অক্ষরে বই তৈয়ারি করায় অনেক তফাৎ। মুদ্রাযন্ত্রে যে অক্ষর সাজায়, সে পাণ্ডুলিপির অক্ষরই দেখে, শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে না, শব্দের অর্থ বুঝিবার বিদ্যারও তাহার অভাব। শব্দ সাজাইতে তাহার যে ভ্রম হয়, অপর লোকে বারবার তাহা সংশোধন করিয়া দেয়। কিন্তু যে পুঁথি লিখে, পুঁথিগত বিদ্যার তাহার একটু অভিমান থাকে। নকল করিবার সময় শব্দ পাঠ করিয়া লিখে, কেবল একএকটি অক্ষর দেখিয়া লিখে না। কোন কথা না বুঝিতে পারিলে কিংবা কোন শব্দ তাহার বিবেচনায় অসঙ্গত বোধ হইলে আর একটি শব্দ বসাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। অথচ সে যাহা লিখিবে, তাহা সংশোধন করিবার কোন উপায় নাই। ছাপা অক্ষরের প্রুফ দশবার কাটিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু হস্তলিখিত পুঁথিতে হস্তক্ষেপ করিয়া পাঠপরিবর্ত্তনরূপ মহাপাতকের ভাগী কে হইবে? বিদ্যাপতির পদাবলী একে গীত, তাহার উপর লিপিকরের গুণপনা, পরিবর্ত্তন যে অনেক ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। পাঠপরিবর্ত্তনে পদগুলি অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে, অনেকসময় ভিন্ন ভিন্ন পাঠ মিলাইয়াও সদর্থ করা যায় না। স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রথম প্রকাশিত হইবার পর বিদ্যাপতির পদাবলীর আরও অনেকগুলি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অর্থবোধের কিছু আনুকূল্য হইয়াছে, কিন্তু এখনও বহুতর ভ্রম রহিয়াছে। সে কথা পরে বলিতেছি।

রাজকৃষ্ণবাবুর প্রথম ও প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, মৈথিলভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে এবং তাহাদের ভণিতা এদেশে প্রচলিত ভণিতার অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি গীতের পাঠান্তর ও একটি নূতন গীত উদ্ধৃত করেন। পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারদিগের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ সংবাদ। নূতন পদ এরূপ আর কত আছে এবং এদেশে প্রচলিত কতগুলি পদের পাঠান্তর মিথিলায় পাওয়া যায়, এই দুইটি বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অত্যন্ত আবশুক, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর সাতটিমাত্র মৈথিল পদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, হয় মিথিলায় আর পদ

নাই, অথবা যাহা আছে তাহা প্রকাশযোগ্য নহে, কিংবা পদকল্পতরু হইতে ভণিতা-সংবলিত পদগুলি বাছিয়া সঙ্কলন করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান কৃতার্থ ও অধ্যবসায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শেষের অনুমানই সত্য মনে হয়। মহাজনপদাবলী ও প্রাচীনকাব্যসংগ্রহে যে সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, মোটের উপর তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার পরের সঙ্কলনগুলি আরও বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হইবে, এরূপ আশা করা যায়, কিন্তু তদনুরূপ হয় নাই। বরং কোন কোন সংস্করণে পদগুলি সাজাইবার প্রণালী বিকৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতি বাঙালীর কবি; তিনি মিথিলাবাসী হইলেও বঙ্গভাষার আদিকবি বলিয়া এদেশে তাঁহার সমাদর ও সম্মান। তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাবলী সঙ্কলন, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথা নিরূপণ করা বাঙালীর কর্ত্তব্য, কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু অধ্যবসায়ের যে পথ প্রদর্শন করেন, তাহা আর কেহ অনুসরণ করেন নাই। বাঙালী ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু যে জাতির অসীম অধ্যবসায়, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য সংগ্রহে যাহাদিগের আত্মপরজ্ঞান নাই, সেইজাতীয় একজন পণ্ডিত বাঙালীর অসমাপিত কর্ত্তব্য সমাপনে যত্নবান্ হইলেন। যে সময় সারদাবাবু বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলনে ও গ্রন্থের উপক্রমণিকা লিখনে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় গ্রিয়ার্সন্ মিথিলায় তৎপ্রদেশপ্রচলিত বিদ্যাপতির গীতাবলী প্রভৃত পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে সঞ্চয় করিয়া মৈথিল পণ্ডিতদিগের সহায়তায় অর্থ করিতেছিলেন। সারদাবাবুর স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রকাশ হইবার ন্যূনাধিক ছয়-বৎসর পরে, খৃষ্টাব্দ ১৮৮১-৮২ সালে গ্রিয়ার্সন্, এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে মৈথিলভাষার ব্যাকরণ, রচনাসংগ্রহ ও শব্দার্থ প্রকাশ করেন (An Introduction to the Maithili language of North Bihar, containing a Grammar, Chrestomathy, and Vocabulary)। এই সংগ্রহে বিদ্যাপতি-বিরচিত ৮২টি পদ সানুবাদ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৭৬টি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, অবশিষ্ট ৬টি অপরাপর প্রসঙ্গে। এই পদগুলির অধিক সংখ্যাই বঙ্গভাষায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। বিদ্যাপতিসম্বন্ধে গ্রিয়ার্সন্ আরও কয়েকটি তত্ত্ব নির্ণয় করেন। দানপত্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টায় ১৮৮৫ সালের *Indian Antiquary* পত্রে তিনি সারদাবাবুর লিখিত উপক্রমণিকার প্রশংসা করিয়া আদ্যন্ত অনুবাদ, শিবসিংহের সম্পূর্ণ বংশবল্লী প্রকাশ এবং অপর প্রবন্ধে বিদ্যাপতি-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁহার সঙ্কলিত পদাবলীর পূর্ব্বভাষে বলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস, ত্রিহুতে প্রচলিত সমুদায় পদ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রতি কিছু কঠোর কটাক্ষপাত করেন। নকল বিদ্যাপতি (Pseudo-Vidyapati) আখ্যা দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, উদ্ধৃত করিতেছি। "These spurious songs of Vidyapati have been more than once collected··· I have gone carefully through every poem in both these collections

(প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ এবং সারদাবাবুর সঙ্কলন), and am in a position to state that not more than five or six of them altogether show even a resemblance to songs admitted up here (ত্রিহুত) to be the work of Vidyapati. Even these are so distorted, both in language and in rhythm, that identification is by no means easy. The songs in the Bengali recension will not even scan according to Maithili rules of prosody, much less can they be brought within the bounds of any rules of Maithili Grammar The fact is that both these Bengali collections are most interesting as showing the influence of Vidyapati over the Bengali mind, but in no way can they be considered as containing more than a few lines really written by himself." খৃষ্টীয় ১৮৮২ সালে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন; ১৮৮৫ সালে তাঁহার মতের কিছু পরিবর্ত্তন হয়। সে বৎসর *Indian Antiquary* পত্রে লেখেন—"Owing to the influence of Chaitanya, Vidyapati's poems obtained an immense popularity in Bengal, and were speedily compiled into written manuals of devotion, an honour to which they did not attain in their native country of Bihar." প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ-সন্নিবিষ্ট-পদাবলী-সম্বন্ধেও তাঁহার কিঞ্চিৎ মতান্তর হয়। "While containing a number of hymns undoubtedly written by Vidypati it also contains a great number certainly not written by him and the bulk is of very doubtful origin." আটবৎসর পরে, ইংরাজি ১৮৯৩ সালে, এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রে প্রসঙ্গক্রমে আর এক মত প্রচার করেন। "Vidyapati Thakur, who lived in 1400 A. C. has only left us a few songs which have come down to us through five centuries of oral transmission, and which now cannot be in the form in which they were written." বিদ্যাপতির মৈথিল-পদাবলীর প্রথম সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া গ্রিয়ার্সন্ চিরকাল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন হইয়া থাকিবেন; বিদ্যাপতিসম্বন্ধে তাঁহার কোন মত খণ্ডন করিতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু তাঁহার এই মতগুলি সমীচীন বোধ হয় না। মিথিলায় বিদ্যাপতির সর্ব্বশুদ্ধ ৮২টি মাত্র পদ আছে এবং তাহাতেই তাঁহার এত যশ, এই অনুমানই কিছু বিস্ময়জনক। পাঠান্তর-সম্বন্ধেও তিনি কিছু অসাবধানতার সহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন, উভয়রূপে দেখিলে আরও অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মৈথিলব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া ছন্দ ও ব্যাকরণের নিয়মাদির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইবারই কথা, কিন্তু শুধু সেই কারণে এ-দেশে প্রচলিত পদগুলিকে কৃত্রিম অথবা জাল স্থির করিয়া অবহেলা করা স্বাধীনচেতা

রসগ্রাহী ব্যক্তির উচিত হয় না। তাঁহার সংগৃহীত পদগুলি ও এদেশের সংগ্রহের কাব্যাংশ তুলনা করিয়া বিচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। যদি বিদ্যাপতি দুই ব্যক্তির নাম হয়, একজন মিথিলাবাসী ও আর একজন বঙ্গবাসী, একজন আসল, দ্বিতীয় ব্যক্তি জাল, এবং যিনি আসল বিদ্যাপতি, তিনি গ্রিয়ার্সন্-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৮২টি বই পদ রচনা করেন নাই, তাহা হইলে যে বঙ্গবাসী জাল বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী আসল বিদ্যাপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না। এদেশে চলিত মোহর যদি মেকি হয়, আর গ্রিয়ার্সন্ যদি খাঁটি মোহর আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মেকিতে সোনা অনেক বেশী। তাঁহার দ্বিতীয় কথা কতক প্রামাণিক। বিদ্যাপতির পদ বলিয়া যাহা এদেশে প্রচলিত আছে, তাহার কতকগুলি যে তাঁহার রচিত নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং পাঠের যে অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু অপরগুলি কিছু রূপান্তরিত হইলেও যে বিদ্যাপতির রচনা, সে বিষয়ে কোন কথাই উঠিতে পারে না। গ্রিয়ার্সনের তৃতীয় কথা কোনমতেই মানিয়া লওয়া যায় না। বিদ্যাপতির পদাবলী যেমন গীত হইয়া আসিতেছে, তেমনি পরম্পরাক্রমে পুঁথিতেও লিখিত হইয়া আসিতেছে। এই ভারতে লিপিবিদ্যার সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে বহুতর মহাগ্রন্থ মুখে মুখে রচিত হইয়াছিল, সহস্রবৎসর ধরিয়া কেবল কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিতেছিল, সে সকল গ্রন্থ কি লুপ্ত অথবা অতিবিকৃত হইয়াছে? গ্রন্থ ছাড়িয়া যদি কেবল গীতের উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি তানসেনের, শোরী মিঞার গীত কত কালের? তাঁহাদের গান যেমন রচিত হইয়াছিল, তেমনি রহিয়াছে। গ্রিয়ার্সনের এই মত অপ্রামাণ্য, এরূপ যুক্তিতে বিদ্যাপতির কোন পদ ত্যাগ বা গ্রহণ করা যায় না।

এদেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর যে কয়খানি স্বতন্ত্র সঙ্কলন আছে, সকলগুলিই প্রধানত পদকল্পতরু হইতে নির্ব্বাচিত। প্রথম তরুণাবস্থায় সারদাবাবু যে সঙ্কলনখানি প্রকাশ করেন, তাহাতে পাঠে ও টীকায় অনেক ভ্রম আছে জানিয়া তিনি সেই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর প্রাচীনকাব্যসংগ্রহে 'বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট' বলিয়া যে পদগুলি আছে, তাহাতে নির্ব্বাচনের কোন প্রণালী নাই, কয়েকটি পদ বিদ্যাপতির, অবশিষ্ট অপর কবিদিগের। পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারগণ এ বিষয়ে অক্ষয়বাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া ভাল করিয়াছেন। কিন্তু পদনির্ব্বাচনে কোন সঙ্কলনকার কোনরূপ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দেন নাই। ভণিতা থাকিলেই বিদ্যাপতি, না থাকিলে নয়। বিদ্যাপতির নামযুক্ত পদ কবির না হইতে পারে এবং অপরভণিতাযুক্ত বা একেবারে ভণিতাশূন্য পদও তাঁহার হইতে পারে, এই সকল সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তার পরিচয় দেন নাই। ভাষা ও ভাবগত প্রমাণ, শব্দযোজনা ও ছন্দোবন্ধে কবির যে বিশেষত্ব আছে, সে সকলের প্রতি কোন সঙ্কলনকার লক্ষ্য করেন নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, একই সঙ্কলনে ভিন্ন ভিন্ন

পদের ভাষা ও ভঙ্গীতে বর্ণ ও মজ্জাগত এত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় যে, তৎসমুদায় একই কবির রচনা বলিয়া কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বিদ্যাপতি নাম অথবা উপাধিধারী অপর কোন কবি এদেশে ছিলেন কি না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বিদ্যাপতির নামসংবলিত কোন পদ পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও সঙ্কলনকারের কর্ত্তব্য সম্ভব-অসম্ভব-সম্বন্ধে প্রমাণাদি ও যুক্তি প্রয়োগে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া, এবং বিদ্যাপতির স্বাতন্ত্র্য কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। ভ্রষ্টলক্ষ্য সঙ্কলনকারগণ নানাবিধ অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন।

কবির অনুকরণের প্রাচুর্য্যে সঙ্কলনকার কিছু সংশয়ে পড়িতে পারেন। বিদ্যাপতির যেরূপ অনুকরণ হইয়াছিল, বোধ হয় কোন দেশে কোন কবির তদ্রূপ হয় নাই। বঙ্গের পশ্চিমদ্বারে বিদ্যাপতি ও অন্তঃপুরমধ্যে চণ্ডীদাস যে সঙ্কিত মধুররসার্দ্র আবেগময়ী রাগিণীতে পঞ্চমস্বরে গান গাহিয়াছিলেন, তাহার দিগন্তপ্রসারী পূর্ণবিকাশ হইল বৈষ্ণব কবিদিগের শত শত কোকিলকণ্ঠ ঝঙ্কারে। জয়দেবের আলাপমূর্চ্ছনা বিদ্যাপতির গানে স্ফুটবাক্ বেদন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগমনীসঙ্গীত বিদ্যাপতির ললিত রাগিণীতে। তাহার পর সঙ্কীর্ত্তনক্ষেত্রে যখন গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, তখন সুরসরিৎ জাহ্নবী যেমন উষরভূমিকে উর্ব্বর করিয়া, বিপুল প্রবাহপরিসরে, পুলকিত কলকলনাদে, গদগদকণ্ঠে ভগীরথের শঙ্খধ্বনি-অনুসারিণী হইয়াছিলেন, সেইরূপ চৈতন্যের হরিহরিধ্বনির অনুগামিনী অমৃতনিষ্যন্দিনী উচ্ছ্বসিত কাব্যধারা শতসহস্রমুখী হইয়া, তরল, শ্রুতিশীতল, মধুর তরঙ্গভঙ্গে তরতররবে ন্যায়ব্যাকরণদর্শনদগ্ধ বঙ্গদেশকে সরস, সিক্ত, প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল। প্রাচীন কবির মধুররসাশ্রিত পদ ছিল একবেণী-স্রোতস্বিনীতুল্য, শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতি বহুতর ভাবপ্রবাহিণীর মিলনে নানা সঙ্গমতীর্থ হইয়া উঠিল! ভাব চৈতন্যদেবের, ভাষা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের—বৈষ্ণব কবিতার ইহাই উপাদান। চণ্ডীদাসের অপেক্ষা বিদ্যাপতির অনুকরণ অনেক অধিক। তাঁহারই ভাষা ভাঙিয়া-চুরিয়া, গড়িয়া-গঠিয়া, রূপরস, ছন্দোবন্ধ, ঠামভঙ্গী, শব্দ, উৎপ্রেক্ষা, উপমা তাঁহারই পদাবলী হইতে লইয়া লোকমনোমোহন বৈষ্ণবকাব্যসমূহ সৃজিত হইল। মিথিলাবাসী বিদ্যাপতি বাঙালীর কবি নয়, এমন কথা কে বলিবে? যে বলে, সে রাধাকৃষ্ণপ্রেমরজ্জু গলায় দিয়া বৈষ্ণবকাব্যের অমৃতসাগরে ডুবিয়া মরুক!

যাঁহারা বিদ্যাপতির অনুকরণে কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গোবিন্দকবিরাজ প্রধান। গোবিন্দদাস স্বয়ং প্রতিভান্বিত ক্ষমতাশালী কবি, কিন্তু বিদ্যাপতির আশ্রয় তিনি কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির শিষ্যত্ব তিনি অপূর্ব্ব কৌশল ও কবিত্বের সহিত স্বীকার করিয়াছেন—

বিদ্যাপতিপদ যোহে উপদেশল
রাধা রসময় কন্দা।
গোবিন্দদাস কহ কৈসন হেরল
যো হেরি লাগয়ে ধন্দা॥

বন্দনায় বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি-পদযুগল-সরোরুহ-নিষ্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পিবইতে কর অনুবন্ধে॥

সেই অনুবন্ধের বশবর্ত্তী হইয়া গোবিন্দদাস কেবল বন্দনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ব্বকবির অনেক কথা, এমন কি অনেক পদের অংশ নিজরচিত গীতে গ্রথিত করিয়া লইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, স্থানে স্থানে বিদ্যাপতির ভণিতা ভাঙিয়া অথবা অসম্পূর্ণ পদ পাইয়া তাঁহার নামের সহিত আপনার নাম গাঁথিয়া দেন। যেমন—

বিদ্যাপতি ভণ মিছে নহে ভাখা।
গোবিন্দদাস কহ তুঁহু তঁহি সাখী।

গীতান্তরে—

এত করি বিষাদ ভাবি রহুঁ মাধব
রাই প্রেমসে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহ রস ওর॥

অপর পদে—

পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর॥

উদ্দেশ্য অসাধু নয়, কারণ তাহা হইলে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির নাম একেবারেই লোপ করিতে পারিতেন। সাগরসঙ্গমে স্রোতস্বিনীর যে আনন্দ, সহকার অবলম্বনে চূতলতিকার যে আনন্দ, বিদ্যাপতির গীতে আপনার নাম মিশাইলে গোবিন্দদাসেরও সেই আনন্দ, কিন্তু বিদ্যাপতির গীতসঙ্কলনকারের পথে যে কণ্টক রোপণ করিয়া যাইতেছেন, গোবিন্দদাস সে কথা ভাবেন নাই। কণ্টক দেখিয়া সঙ্কলনকারও সে পথে অগ্রসর হন নাই, এরূপ পদগুলি প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই পদগুলি যে বিদ্যাপতির,—রচনা, ভাষা ও ভাবগৌরব এবং যুক্ত ভণিতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এই সকল পদ বিদ্যাপতির সঙ্কলনেই সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। গোবিন্দদাসের দৃষ্টান্ত অন্য বৈষ্ণবকবিও অনুসরণ করিয়াছেন, যথা—

বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি শূর।
রাধামোহন দাস রসপূর॥

রাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র, ইনি পদামৃতসমুদ্রের সংগ্রহীতা ও টীকাকর্ত্তা।

গোবিন্দদাস ও অপর কবিগণ বিদ্যাপতির ভণিতায় নিজ নিজ নাম সংযুক্ত করিয়াছেন বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু এমন পদও আছে, যাহার সম্বন্ধে কিছুই নিরূপণ করিতে পারা যায় না। পদকল্পতরুতে নিম্নোক্ত পদটি আছে—

গমন অবধি তুয়া নাহিক বিশেষ।
ভিত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ॥
তাহি মেটি কোইউ ন শুনায়ে।
বদন মেচই কেই জল লেই ধায়ে॥
কি কহব মাধব কউলমুখী।
যতনে জীয়াওল সকল সখী॥
কাহুক নলিনী কাহুক চন্দনা।
কোই কহয়ে আওল নন্দনন্দনা॥
সরস মৃণাল হৃদয় ধরি কোই।
চাঁদকিরণে কেহো রাখয়ে গোই॥
কেহ মলয়ানিল বারই চীরে।
কোই করয় নব কিশলয় দূরে॥
মধুকরধুনি শুনি কোই মুদে কান।
করতলতালে কোই কোকিল খেদান॥
কান্ত-দিগন্তহি কোন কোন যায়।
কেহো কেহো হরি তুয়া গুণ পরথায়॥
নরনারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয়নারায়ণ ইহ রস গান॥

এ পদটি কাহার রচিত মনে হয়? বিদ্যা-

পতির পদ বলিয়া কোন সঙ্কলনকারের মনে হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহাদিগের অপরাধ কি? 'বিদ্যাপতির পরিশিষ্টে'ও নরনারায়ণ অথবা বিজয়নারায়ণের নামগন্ধ নাই। অথচ বিদ্যাপতির পদাবলীর মৈথিল পুঁথিতে এই পদ প্রায় অবিকল এই আকারে পাইয়াছি। প্রথম শ্লোক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, 'বিশেখ' (বিশেষ) ও 'রেখ' মিলিয়াছে। 'ষ'য়ের উচ্চারণ 'খ'য়ের মত আমাদের দেশে হয় না, মিথিলায় হয়; যখন মৈথিল উচ্চারণপ্রণালীতে মিল সাধিত হইয়াছে, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, পদের ভাষাও মৈথিল। মৈথিল পুঁথি না পাইলে ত এ পদ কখনই বিদ্যাপতির সঙ্কলনে স্থান পাইত না! এরকম কত ঘটিয়াছে, কে বলিতে পারে? কত ভিক্ষুক, কত তস্কর, বিদ্যাপতির রত্নভাণ্ডার হইতে যাজ্ঞা বা লুণ্ঠন করিয়া ধনবান্ হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? কিন্তু তাহাতে বিদ্যাপতির কি ক্ষতি হইয়াছে? লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অকাতরে দান করিলে কিংবা লুঠ করিলে ফুরাইয়া যায়, কিন্তু সরস্বতীর ভাণ্ডার কে শূন্য করিতে পারে? বিদ্যাপতির প্রসাদে অনেক কবি যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি এই বৈষ্ণবকবিকুলচূড়ামণির যশোরাশি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে?

যে বন্যার মুখে বিদ্যাপতি পড়িয়াছিলেন, ক্ষুদ্র কবি হইলে তাহাতে ভাসিয়া যাইত। শ্রেষ্ঠ কবি সেই, অনুকরণে-বিকৃতিতে যাঁহার গৌরব ম্লান হয় না, কালের তরঙ্গাঘাতে যাঁহার রাজ্যের তটভঙ্গ হয় না। একটি অপ্রকাশিত কবিতার ভণিতায় বিদ্যাপতি আপনাকে কবিরাজ বলিয়াছেন। কবির রাজ্য বাণীর রাজ্য—বাণী স্থিরা, কমলা চঞ্চলা। বাণী যাঁহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দেন, তিনি নিষ্কণ্টকে চিরকাল রাজ্যভোগ করেন। কবিতাই কবির সম্পত্তি, কবিতাই তাঁহার পরোয়ানা। বিদ্যাপতি রাজার পরোয়ানায় হয় তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর, না হয় তাঁহার পাঞ্জার ছাপ আছে, যাহাতে নাই, তাহা তাঁহার সামগ্রী নয়। শুধু ভণিতায় যদি বিদ্যাপতি হইত, তাহা হইলে ত বিদ্যাপতির পদের ভাবনা থাকিত না! কোন্ পদ বিদ্যাপতির, কোন্ পদে আংশিক বিকৃত হইয়াছে, কোন্ পদ একেবারেই তাঁহার নয়, তাহা এই দেশের পদাবলী হইতেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ তিনটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম পদে দুইএকটি শব্দের সামান্য রূপান্তর ঘটিয়াছে—

সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর রে।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর রে॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওয়ত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক,—পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কইসে গোঙায়বি
হরি বিনু দিনরাতিয়া॥

ইহাতে পাঞ্জার পুরা ছাপ রহিয়াছে, একটি অঙ্গুলিচিহ্নও অস্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয় পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই—

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥

ভণিতায় কবির, রাজা শিবসিংহ ও লছিমা-দেবীর নাম থাকিলেও, কলিকাতায় টাকায় ছয় সের হিসাবে যেমন খাঁটি দুধ পাওয়া যায়, এই পদ সে হিসাবেও বিদ্যাপতির খাঁটি পদ নয়। কোন কোন পদে চণ্ডীদাস ও অপর কবিদিগের পদাংশের সংযোজনা আছে। চণ্ডীদাসের রচনা বিদ্যাপতির প্রতি আরোপ করা শুধু গুরুতর অপরাধ নহে, অজ্ঞতার প্রমাণ, কারণ উভয় কবির ভাষায় কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই।

আর একটি পদের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
* * *
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥
বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।
গোপত পিরীতি বিষম বড়॥

এই পদটিকে মনে কোন দ্বিধা না করিয়া, বিনা আপত্তিতে যদি কেহ বিদ্যাপতির পদ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। যে কয়েকটি সঙ্কলনে এই পদ দেখিয়াছি, তাহার কোন-কোনটিতে ইহার সম্বন্ধে কোনপ্রকার অভিমত প্রকাশিত হয় নাই। বিশুদ্ধ অথবা অবিশুদ্ধ বাংলায় এখন যদি কেহ পদ রচনা করিয়া তাহাতে বিদ্যাপতির নাম জুড়িয়া দেয়, তাহা হইলেও হয় ত সঙ্কলনকার তাহাকে সংগ্রহভুক্ত করেন।

পক্ষান্তরে, ভণিতা না থাকিলেও যে বিদ্যাপতির পদ হইতে পারে, সঙ্কলনকারগণ সে সম্ভাবনার দূর কল্পনাও করিতে পারেন নাই, কিন্তু এরূপ অনেকগুলি পদ আছে, এবং ভণিতা না থাকিবার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নহে। পদকল্পতরুতে এই পদটি পাইয়াছি—

মনমথ তোহে কি কহব অনেক।
দিঠি অপরাধে পরাণ পর পীড়সি
এ তুয়া কোন বিবেক॥
ডাহিন নয়নে পিশুনগণ বারণ
পরিজন বামহি আধ।
আধ নয়নকোণে যব হরি পেখলুঁ
তাহে ভেল এত পরমাদ॥
পুরবাহির পথ করত গতাগত
কো নাহি হেরত কান।
তোহারি কুসুমশর কতিহুঁ না সঞ্চর
হামারি হৃদয়ে পাঁচ বাণ॥

পদকল্পতরু হইতে আরও একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

সজনি তেজলুঁ জীবনক আশ।
দারুণ বরিখ ভাউ ভেল অন্তর
নাহ রহল পরবাস॥
বাদর দরদর নাহি দিন অবসর
গরগর গরজে ঘনঘটা।
অনিল হিলোল ঘন মেঘ ঘেরয়ে
যামিনী ঝলকত তড়িতছটা॥

ঘনঘন নিসর   ডাহুক ডাহুকীগণ
  চাতক পিউ পিউ গানে
শিখণ্ডিমণ্ডল   নাচ নাচাকুল
  নিরবধি শবদ করে॥

ভণিতা নাই, সুতরাং সঙ্কলনকার নিরপেক্ষ-ভাবে এইরূপ পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এ দুইটি যে বিদ্যাপতির অবিকৃত বিশুদ্ধ পদ, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। রচনাকৌশলে, ভাষার গঠনে ও ভাবের সঙ্কেতে বিদ্যাপতির বৈথিল পদের সহিত এই পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভণিতা নাই বলিয়া কোন সংগ্রহকার সঙ্ক-লন করেন নাই, এবং সেই কারণে পাঠ-পরিবর্ত্তন অথবা অপবর্জ্জিত সুযোগ হয় নাই। রাজপুরুষদিগের পক্ষে দেশের অঙ্গচ্ছেদ যেমন সহজসাধ্য, পাঠকার ও টীকাকারের পক্ষে কবি ও কাব্যের মুণ্ডচ্ছেদ সেইরূপ অনায়াসসাধ্য। বিশেষ এই উভয়বিধ ছেদন কার্য্যে অসির প্রয়োজন হয় না, মসি ও শাণিতাগ্র লেখনী হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

সঙ্কলনের পর টীকা ও অর্থ। বিদ্যাপতির পদ দুর্ব্বোধ হইবার প্রথম কারণ ভাষা, দ্বিতীয় পাঠের বিকৃতি। তাঁহার রচনায় বড় বড় আভিধানিক শব্দ অধিক নাই, কিন্তু পাঁচশত বৎসরে শব্দের অর্থেও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; অনেক শব্দ এখন যে অর্থে আমরা ব্যবহার করি, বিদ্যাপতি সে অর্থে প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার শব্দশিল্প বড় সূক্ষ্ম, তিনি শব্দরত্নকার। ভাষা আমাদের পক্ষে অপরিজ্ঞাত ও অনভ্যস্ত, অর্থশৈথিল্য ও অর্থভ্রম হইবার সতত সম্ভাবনা। ক্রিয়া, অব্যয়শব্দ প্রভৃতি লইয়া অনেকসময় ভ্রম হয়। এদিকে পদকল্পতরু, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে কোনরূপ টীকা পাওয়া যায় না। পাঠপরিবর্ত্তন হইবারও প্রধান কারণ ভাষা এবং শব্দের জটিলতা, এবং তাহাতে স্থানে স্থানে অর্থনির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পদামৃতসমুদ্রের প্রধান দোষ সঙ্কলনকার রাধামোহন ঠাকুর স্বরচিত পদ অধিক সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, বৈষ্ণবকবিগুরুদিগের অল্পসংখ্যক পদ দিয়াছেন। বিদ্যাপতির কতিপয় পদ আছে। যে পদটি তাহার নিজের দুর্ব্বোধ মনে হইয়াছে, রাধামোহন ঠাকুর সহজ সংস্কৃতভাষায় তাহারই ভাবার্থ করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের যথেষ্ট সহায়তা হয় না। যাহা দুর্ব্বোধ, তাহা সুবোধ করাই যে টীকার ও অর্থের প্রধান উদ্দেশ্য, আধুনিক টীকাকারেরা তাহা বিস্মৃত হইয়া, টীকাস্তূপের উপর কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডায়মান করিয়াছেন। কাজটা নিতান্ত কঠিন নয়। কোষ, দর্পণ, দীপিকা, মঞ্জরী, ব্যাকরণসূত্র প্রভৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার পড়িয়া রহিয়াছে, কিছু উদ্ধার, কিছু আহরণ করিয়া অগাধপাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকারাশি সংগ্রহ করা যায়। তথাপি কবির প্রতি কৃপা করিয়া টীকার ভার কিছু লঘু করিলে হইত ভাল। স্ত্রীলোকের বেশবিন্যাসের ষোড়শ প্রকার ও তাহার তালিকা, বিরহের দশ দশার নাম-কথন, কন্দর্পের পঞ্চ কুসুমশরের নাম, দশাবতারের নাম ইত্যাদি ইত্যাদি কতকগুলি অত্যন্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি প্রাচীন বয়োবৃদ্ধ টীকাকারদিগের উপর বরাত দিলেও হইত। কিন্তু এই এত টীকা পড়িয়াও অর্থ-সুগমতার তেমন সুবিধা হয় না। তখন

রাজপথে মিঠাইবিক্রেতার একটা ছড়া মনে পড়ে। তাহার মিঠাইয়ে—দিল্লীর লাড্ডু কি না, বলিতে পারি না—ঘি আছে, চিনি আছে, বাদাম-কিস্‌মিস্‌-পেস্তা প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় পদার্থ আছে জল নেই! তেমনি আমাদের এই সকল টীকায় টীকা আছে, টিপ্পনী আছে, অলঙ্কার আছে, ব্যাকরণ আছে—অর্থ নাই! স্থানে স্থানে টীকাকারমহোদয়গণ অর্থ বুঝাইতে পারেন নাই, এবং শব্দার্থেও অনেকসময় গোল বাধাইয়াছেন। এমন কথা প্রমাণাভাবে বলা যায় না, অতএব কয়েকটি প্রমাণ দিতেছি।

প্রাচীন বৈষ্ণবপুঁথির মতে, মিথিলায় প্রচলিত প্রণালীতে ও গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে রাধার বয়ঃসন্ধিবর্ণনে পদাবলীর আরম্ভ, কারণ তাহাই উভয়পক্ষে পূর্ব্বরাগের সূচনা। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উপস্থিত আলোচনার বহির্ভূত, কিন্তু কে কোন্ পথের পথিক হইবে, অনুরাগ অথবা উদাসীনতার পথ অবলম্বন করিবে, তাহাও সন্ধিস্থলে স্থির করিতে হয়। বয়ঃসন্ধির প্রথম পদ "শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল, শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল" ইত্যাদি সকলের স্মরণ আছে। সেই পদের শেষের দুইটি শ্লোক এই—

মাধব পেখলু অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহু আগেয়ানী।
দুহু একযোগ ইহকো কহে সেয়ানী॥

চারপাঁচ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত কোন সঙ্কলনে এইরূপ টীকা ও অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়—"আগেয়ানী—অজ্ঞানা, অজ্ঞান। সেয়ানী—সেয়ানা বা চতুর; যুবতী। চতুর লোকে ইহাকে দুইএর একত্র যোগ কহে অর্থাৎ শৈশব-যৌবনের সম্মিলন বলে। 'কো কহে সেয়ানী' এইরূপ পাঠ ধরিলে—কে ইহাকে যুবতী বলে, ইহাতে শৈশব ও যৌবনের সম্মিলন ঘটিয়াছে—এইরূপ অর্থ হইবে।" অর্থ ত হইল, কিন্তু বুঝিতে ত পারা গেল না! শব্দ একটিও দুরূহ নাই, ভাবার্থ লইয়াই গোল। সেয়ানী অর্থে চতুর ও যুবতী, অর্থাৎ উভয়লিঙ্গ বিশেষণ; চতুর লোকে কি কহে, তাহা বুঝিলাম। আবার 'ইহকো'-শব্দের অর্থ 'ইহাকে' না হইয়া যদি 'কে ইহাকে' হয়, তাহা হইলে কি অর্থ হইবে, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু সংশয় ত ঘুচিল না। আগেয়ানী কে? টীকার অর্থে পুংলিঙ্গ বিশেষণ মনে হয়। ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি রাগ করিয়া কাহাকে অজ্ঞানী বলিতেছেন, ও কেন বলিতেছেন? যে বলিয়াছিল, মাধব পেখলু অপরূপ বালা, শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা, কবি যে তাহাকেই তিরস্কার করিতেছেন, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আর তাহার অপরাধ এই যে, সে বলিয়াছিল, শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা। চতুর লোকে বলে দুহু একযোগ, সে বলিয়াছিল দুহু এক ভেলা, তবে সে অজ্ঞানী হইল কেন? অর্থান্তরে, কে ইহাকে যুবতী বলে, ইহাতে শৈশব ও যৌবনের সম্মিলন ঘটিয়াছে, ইহাও ত সেই অজ্ঞানীর কথা, কবি তাহাকে খামখা একটা দুর্ব্বাক্য বলিলেন কেন? একটি শব্দের অর্থের গোল করিয়া টীকাকার এই শ্লোকদুইটির অর্থ করিতে পারেন নাই। যে ভাষায় বিদ্যাপতি রচনা করিয়াছিলেন, সে ভাষায় সেয়ানীশব্দ উভয়লিঙ্গ হয় না, সুতরাং এই শব্দের অর্থ চতুর হইতে পারে না। পুংলিঙ্গ,

সেয়ান অথবা সেয়ানা—স্ত্রীলিঙ্গ, সেয়ানী। আবার সেয়ানী অর্থে যুবতীও নয়। শব্দের শিথিল প্রয়োগে সেয়ানীশব্দের অর্থ যুবতী হইতে পারে, কিন্তু অদ্বিতীয় শব্দকুশলী বিদ্যাপতি সেরূপ প্রয়োগ করিবার লোক নহেন। সেয়ানী অর্থে চতুরা অথবা কিশোরী, এখানে কিশোরী। আগেয়ানী স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ, দূতীর প্রতি প্রযুক্ত। দূতী প্রৌঢ়া, রসিকা, বাগ্‌বিদগ্ধা নহে, বালা গোপকন্যা, শব্দনির্ব্বাচনে অনভিজ্ঞা। অপরূপ বালা দেখিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু কেমন করিয়া বর্ণন করিবে, স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। তরুণী বলিলে যথার্থ বর্ণনা হয় না, আবার ওদিকে বালিকাও নয়। ঠিক শব্দটি খুঁজিয়া না পাইয়া সেই গোপকুমারী বলিয়া উঠিল, শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা। তাহাকেই অতি মধুর ভৎসনা করিয়া কবি কহিতেছেন, শৈশব যৌবন দুই এক হয় না, দুইয়ের একযোগে একটি অপূর্ব্ব তৃতীয় পদার্থ সৃষ্ট হয়। *হে গোপকন্তে, হে অজ্ঞানতিমিরাবৃতনয়নে,* যাহাকে দেখিয়াছ, সে কিশোরী, শৈশব-যৌবনের সন্ধিরেখাস্থলে কমলারুণলাঞ্ছিত চরণপাতে দণ্ডায়মানা! আধার শৈশবের, কিন্তু যৌবনস্পর্শে চকিতচঞ্চল!

প্রথম মিলনের একটি পদে নায়িকার সঙ্কোচ, আশঙ্কা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ভণিতা এই—

বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি॥

টীকাকার 'তরসি'শব্দের অর্থ করিয়াছেন; তরসি—বলে, বলপূর্ব্বক। অথবা তরস্বী—বলবান্, বলিষ্ঠ।" অর্থ হইল কি? পরশিতে বলপূর্ব্বক হস্তদ্বারা হস্ত ঠেলিয়া দেয়, অথবা বলবান্ স্পর্শ করিতে হাত দিয়া হাত ঠেলিয়া দেয়, না বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিতে হাত ঠেলিয়া দেয়? যে অর্থ করা যায়, তাহাতেই কিছু বিস্মিত হইতে হয়। 'সেয়ানী'শব্দের মত 'তরসি' যে উভয়লিঙ্গ বিশেষণ প্রতিপাদিত হয় নাই, তাহাও বলা যায় না, কারণ বলপূর্ব্বক হস্ত ঠেলিয়া দেওয়া নায়িকার পক্ষেই প্রযোজ্য মনে হয়। অনেক বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিতে হয় যে, তরস্বী আর কেহ নয়, টীকাকার নিজে, কারণ তিনি গায়ের জোরে এই অর্থ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির সঙ্কলনকার ও টীকাকারগণ যদি যত্নপূর্ব্বক প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে বিদ্যাপতির রচনা বুঝিবার ও বুঝাইবার অনেক আনুকূল্য হয়, কিন্তু তাহারা কোষ, দর্পণ, ব্যাকরণ লইয়া ব্যস্ত, অন্য দিকে বড় একটা দৃক্‌পাত করেন না। বিদ্যাপতির এই পংক্তিটি পরশিতে *তরসি করহি কর ঠেলি গোবিন্দদাস* অবিকল এই আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পদে রহিয়াছে—

সুবধল মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারী॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়ান জল খলই॥

তরসি—তরাসে, ত্রাসে। স্পর্শ করিলে ত্রাসে করে কর ঠেলিয়া দেয়—এই সহজ অর্থ পড়িয়া রহিয়াছে, ইহার উপর তরস্বিতা প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই।

বিরহক্লিষ্ট নায়িকার তনিমাবর্ণনে কবি কহিতেছেন,—

সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তুক দোসর দেহা।

তত্র টীকা। "তন্তুক দোসর—দ্বিতীয়তন্তুবৎ, তাঁতের সদৃশ। এত কৃশ যে, তাঁতের দ্বিতীয় বলিলেই হয়।" ভাল কথা, কিন্তু তাঁতের সদৃশ দেহ হইলে সখীগণ সাহস করিয়া ছুঁইতে পারে না কেন? পাছে বেহালার তারের মত পিড়িংপিড়িং করিয়া উঠে, সেই ভয়ে? তাঁত যে এত স্পর্শকাতর, সে কথা ত কেহ জানিত না! ধুনুরিযন্ত্রের গুণ তাঁতের, কিন্তু তাহা কিরূপ স্পর্শসহিষ্ণু, শীতকালে বোধ করি সকলে দেখিয়া থাকিবেন। অভিধানে তন্তুর অর্থ তাঁত ছাড়া সূতাও লেখে, এবং মাকড়সার জালকে লূতাতন্তু বলে। তন্তুবায়, তাঁতি ও মাকড়সা। তন্তুক দোসর দেহা—দ্বিতীয় সূতার ন্যায় দেহ, সখীগণ সাহসে ছুঁইতে পারে না, ছুঁইলে পাছে ছিঁড়িয়া যায়, সেই ভয়ে। এরূপ অর্থ করিলে কি অসঙ্গত হইত?

এমন কত দেখাইব? সঙ্কলনকারগণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া টীকা ও অর্থ করেন, তাঁহারাই যদি অর্থ করিতে অনবরত এইরূপে ভ্রমে পতিত হন, তাহা হইলে সাধারণ পাঠকের অবস্থা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। একজন সঙ্কলনকার বৈষ্ণব কবি ও ভক্তদিগের প্রতিভানির্ব্বাচিত মধুর শব্দ, ভাবোল্লাস ও ভাবসম্মিলন পুরাতন বিবেচনায় ত্যাগ করিয়া মাথুরের পর পুনর্ম্মিলন আখ্যা দিয়াছেন, এবং অতৃপ্তি ও অনুভবের চরম-অভিব্যক্তি-স্বরূপ সেই নিত্য নূতন পদে—জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল—গ্রন্থ সমাপ্ত না করিয়া প্রেমবৈচিত্ত্যের একটি গাঢ়রসঘটিত পদে সমাপ্ত করিয়াছেন। সঙ্কলনকার কি ভাবসম্মিলনের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গীতার কালনির্ণয়।*

ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকতাসম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতই উদয় হয়; যথা, গীতার প্রণেতা কে? তাহার প্রণয়নকালই বা কি? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া কঠিন; তবে, আনুমানিক প্রমাণে সম্ভব-অসম্ভব-বিবেচনায়, যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তাহা পাঠকদের সম্মুখে ধারণ করাই আমার অভিপ্রেত। ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। ব্যাসদেব মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং

* Gita and the Gospel.—By Neil Alexander.
ছদ্মনামের পুস্তিকায় এই বিষয়ে অল্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা দৃষ্ট হইবে।

ব্যাসদেবই গীতার প্রণেতা বলিয়া সাধারণ লোকের ধারণা। ঐরূপ ধরিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই, কেন না, গীতাকারের নামধাম ভারতসাহিত্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গীতার রচনাকৌশলে প্রকাশ পায় যে, উহাতে ভগবৎ-প্রচারিত ধর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু গীতা-গ্রন্থখানিকে কি ভগবৎপ্রচারিত বলা যাইতে পারে? ইহাতে অবশ্য অনেক পরমার্থতত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে, অনেক সারবান্ ধর্ম্মোপদেশ আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহার সকল কথাই যে অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা নহে। ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থের যে সকল লক্ষণ প্রত্যাশিত, তাহা ইহাতে সর্ব্বাংশে বিদ্যমান আছে, আমি এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। দ্বিতীয়ত, যদি শ্রীকৃষ্ণ সত্যই গীতার রচনাকর্ত্তা হন, তবে গীতাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসাময়িক বলিতে হয়। কিন্তু কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ যে গীতারচনার বহুকাল পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বেদসঙ্কলনের সমকালীন ঘটনা, খৃষ্টপূর্ব্ব সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এবং গীতার জন্ম বৈদিক সময়ের অনেক পরে, বোধ করি ইহাও কেহ অস্বীকার করিবেন না। গীতা শ্রুতি নহে, স্মৃতির মধ্যে গণ্য।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আবির্ভাবকালে ঈশ্বরাবতাররূপে আর্য্য-সমাজে গৃহীত হইতেন, তাহা হইলে সে সময়ে অথবা তাঁহার তিরোভাবের পরে ধর্ম্মরাজ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, যেমন খৃষ্টের আবির্ভাবকালে হইয়াছিল; যদি তাহা হইত, তবে পরবর্ত্তী শত শত বৎসরের সাহিত্যে তাহার কোন-না-কোন নিদর্শন থাকা সম্ভব, কিন্তু তাহা কোথায়? ব্রাহ্মণ বল, আদিম উপনিষদ্ বল, কোথাও এ কথার কোন প্রসঙ্গই নাই। শতপথব্রাহ্মণ, যাহা কুরুপাঞ্চালপ্রদেশে বিরচিত, যাহাতে মহাভারতের অনেক বীরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে তিনি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য, দেবকীপুত্র বলিয়া কথিত, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচিত নহেন। এই সকল গ্রন্থের পর অনেককাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত, কিন্তু দেবতা বলিয়া অর্চ্চিত নহেন। পাণিনিতে "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" বলিয়া একটি সূত্র আছে, তাহা হইতে এইটুকু পাওয়া যায় যে, তখনকার কালে কৃষ্ণার্জ্জুনভক্ত কোন উপাসক-সম্প্রদায় ছিল, কিন্তু গীতাতে দেবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ একাধিপত্য সূচিত, তদনুযায়ী বিশ্বাস ঐ সূত্র হইতে প্রমাণিত হয় না। পাণিনির মহাভাষ্যেও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কোন নিদর্শন নাই।

এই ত একপ্রকার প্রমাণ। এখন দেখা যাউক, গীতোক্ত ঘটনাটি কতদূর সম্ভব? দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে উদ্যত, এমন সময়ে যে একপক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথস্থাপনপূর্ব্বক অষ্টাদশ অধ্যায় যোগশাস্ত্র শুনিতে বসিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এই সুযোগে কৌরবসেনাপতিগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের

প্রতি অজস্র বাণনিক্ষেপ করিতে কেনই বা ক্ষান্ত থাকিবেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অর্জ্জুনের ন্যায় প্রতিভাশালী পুরুষ এক ইসারায় সমস্তটা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। আমি ত গীতা হইতেই দেখিতে পাই যে, অনেক সময়ে কৃষ্ণোপদেশের ভাবার্থগ্রহণে অর্জ্জুন নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাক্, আবার এরূপ যুক্তিও শুনিয়াছি যে, আরম্ভে হয় ত গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় ছিল না, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তন ছিল, শেষের কয়েক অধ্যায় উত্তরকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; কিন্তু এ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি এক ভাগ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে অন্য ভাগ প্রক্ষিপ্ত হইবার বিচিত্র কি? ফলে, এ কথা স্বীকার করিলে, সমগ্র গ্রন্থখানি অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। যাঁহারা প্রচলিত বিশ্বাস সমর্থন করিবার জন্য এইরূপ ওকালতী করিতে তৎপর, আমি তাঁহাদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে প্রস্তুত নহি।

আর এক কথা। ধর, রণক্ষেত্রে সত্যসত্যই এইরূপ ধর্ম্মালোচনা চলিয়াছিল, কিন্তু ব্যাসদেব তো আর সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কেমন করিয়া সমস্তটা শুনিলেন? ইহার উত্তর এই যে, ব্যাসদেবতুল্য মহর্ষি যোগবলে দূর হইতে সকলি জানিতে পারিয়াছিলেন। এ উত্তরের কোন প্রত্যুত্তর নাই। যুক্তি-ক্ষেত্রে ঐশী শক্তির অবতারণা করিলে, অসম্ভবকে সম্ভব করা কিছুই কষ্টসাধ্য নহে। "শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়"—সকলি সম্ভবে। ঐশশক্তিপ্রয়োগের কাছে কোন যুক্তিই টিকিতে পারে না।

যাঁহারা গীতার প্রাচীনত্বরক্ষার জন্য সমুৎসুক হইয়া এইরূপ একদেশদর্শী যুক্তি অবলম্বন করেন, আমি তাঁহাদের দোষ দিতেছি না- শাস্ত্র যত প্রাচীন হয়, সেই পরিমাণে তাহা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। আমি কেবল সত্যের উপরোধে এই স্থানে ভিন্নমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। দু পক্ষেরই যুক্তি তুলনা করিয়া আমার বিচারে দাঁড়ায় এই যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা প্রণয়ন করেন নাই, অন্য কোন ব্যক্তি গীতার প্রণেতা। যুদ্ধপক্ষসমর্থন উপলক্ষ্য করিয়া লোকসমাজে বিশুদ্ধ জ্ঞানধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার উদ্দেশ্য, কিন্তু অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে কথাপ্রসঙ্গে বাহির করিতেছেন, ইহাই সম্ভব। ৺ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এ বিষয়ে আমার এক মত।

গীতার ভাষা, ভাব ও মতামত আলোচনা করিয়া দেখিলে ঐ গ্রন্থ কোন্‌সময়কার নয়, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ ধারণা হয়। কোন্‌সময়কার নয়, তাহা আগে স্থির হইলে, সাহিত্যক্ষেত্রে গীতার স্থান ও তাহার প্রণয়ন-কাল আপনা-আপনি একটা দাঁড়াইয়া যায়।

প্রথম, ঋগ্বেদসংহিতা। যে সময়ে বৈদিক ঋষিগণ প্রাকৃতিক দেবতাদের স্তব-স্তুতিপূর্ণ সূক্তাবলী রচনা করিতেছিলেন, সে কাল গীতার বহুশতাব্দপূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বৈদিক সূক্তসকল সঙ্কলিত হইয়া ঋক্, যজু, সাম, এই সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। এই সময়ে আমরা আর এক রাজ্যে প্রবেশ করি। তখন ঋগ্বেদের যে

কবিত্বের উচ্ছ্বাস, তাহা আর নাই। তখন এদেশে পৌরোহিত্যের প্রভাব দিগ্বিদিক্‌প্রসারিত হইতেছে। সাহিত্যেও পৌরোহিত্যের আভা প্রতিফলিত। সে সময়ে যে সাহিত্যভাণ্ডার প্রস্তুত হয়, তাহার ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত—পশ্চিমে শতদ্রু হইতে পূর্ব্বে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ও গীতার আবির্ভাবকাল নহে। গীতার জন্ম ইহারও অনেক পরে।

গীতার অনেকস্থলে ত্রিবেদেরই উল্লেখ দেখা যায়, চতুর্থ যে অথর্ব্ববেদ, তাহার কোন উল্লেখ নাই। ভগবান্ একস্থানে ঋক্, যজু, সাম রূপে আত্মবর্ণন করিয়াছেন $\left(\frac{৯}{১৭}\right)$; বিভূতিযোগাধ্যায়ে বেদের মধ্যে আপনাকে সামবেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; $\left(\frac{১০}{২২}\right)$; কিন্তু কোথাও অথর্ব্ববেদের কোন কথাই নাই। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদ ব্রাহ্মণ্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে গীতার প্রণয়নকাল সাব্যস্ত হয় এবং এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত গীতার প্রাচীনত্ব অনুমান করেন, কিন্তু এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত মনে করা যায় না। অথর্ব্ববেদ বহুকাল পর্য্যন্ত সাহিত্যসমাজে বেদ বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। উহাতে যাতুবিদ্যা (যাদু), ভৈষজ্য প্রভৃতি নানা বিষয় আছে, যাহা যাজ্ঞিক ক্রিয়াকর্ম্মের উপযোগী নহে। কর্ম্মকাণ্ডে ব্যবহারযোগ্য বিষয় উহাতে অতি অল্পই আছে এবং যাহা আছে, তাহা শেষভাগে প্রক্ষিপ্ত। এই হেতু শ্রৌত-গ্রন্থাবলীর মধ্যে অথর্ব্ববেদের কোন মাহাত্ম্য নাই। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণে উহার কোন উল্লেখ নাই। শতপথব্রাহ্মণও বেদকে ত্রয়ীবিদ্যা বলিয়াই জানেন—বৌদ্ধযুগেও উহা ত্রয়ী-বিদ্যারূপে পরিচিত। কৌশীতকীব্রাহ্মণে—ছান্দোগ্য উপনিষদে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত—অধিক কি, অমরকোষেও * অথর্ব্ববেদ বেদের মধ্যে ধর্ত্তব্যই নহে। যদিও পাতঞ্জলভাষ্য এবং কোন কোন উপনিষদে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে, তথাপি মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে আসিয়া না পৌছিলে উহার বৈদিক প্রতিপত্তি অনুভূত হয় না। বিষ্ণুপুরাণে অথর্ব্ববেদের একজন স্বতন্ত্র পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গোপথব্রাহ্মণে অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মবেদ বলিয়া কীর্ত্তিত। কিন্তু মহাভারত ও পুরাণের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, সূত্র প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রে উহার বেদাসন নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অতএব দেখা যায় যে, অথর্ব্ববেদ বেদের মধ্যে গণ্য হইবার পূর্ব্বে বহুকাল অতিক্রান্ত হয়! এখনো পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের অনেকানেক অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণেরা ঐ বেদকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। এই সকল কারণে, অথর্ব্ববেদের কোন উল্লেখ নাই বলিয়া গীতার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয় না।

উপনিষৎসকল বেদের শেষভাগ, এই-জন্য উপনিষৎকে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল অংশ ব্রাহ্মণনামে অভিহিত, তাহা উপনিষদ্ অপেক্ষাও প্রাচীনতর, সন্দেহ নাই।

উপনিষদ্ আবার একসময়কার রচনা নহে। উহাদের রচনা ও বিষয় ভেদে কাল-

* ঋক্‌সামযজুষী—ইতি বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী—(স্বর্গবর্গ)।

বিভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি উপনিষদ্ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতকগুলি আধুনিক, কতক বা এই দুই কালের মধ্যবর্ত্তী। উপনিষৎসমস্ত চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের শীর্ষস্থানীয় আদিম উপনিষদ্-গুলি গদ্যে প্রণীত; সে গদ্য আধুনিক সংস্কৃতগদ্যের অনুরূপ নহে, ব্রাহ্মণগদ্যের আদর্শে রচিত। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌশীতকী এইশ্রেণীভুক্ত, কেনোপনিষদ্ গদ্যপদ্যে বিরচিত। কেনোপনিষদ্ হইতে আমরা ছন্দোবদ্ধ পদ্যোপনিষদে আসিয়া পড়ি—কঠোপনিষদ্, ঈশোপনিষদ্, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, মহানারায়ণী—এই সমস্ত দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয়শ্রেণীর উপনিষদ্গুলি আবার গদ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এই গদ্য আধুনিক সংস্কৃতগদ্যের ধরণে রচিত। মৈত্রায়ণীয় ও অপর কয়েকটি উপনিষদ্ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চতুর্থশ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত উপনিষদ্ পরিগণিত, তাহা অথর্ব্ব-উপনিষদ্, গদ্যপদ্যে বিরচিত। যতগুলি পাওয়া গিয়াছে, সর্ব্বসমেত প্রায় সপ্তবিংশতি-সংখ্যক হইবে।* ইহাদের অনেকগুলি আধুনিক, এমন কি, আল্লোপনিষদ্নামক গ্রন্থবিশেষ ইহার মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য এই উপনিষৎত্রয় অথর্ব্বোপনিষদের অন্তর্ভূত। ইহাদের দার্শনিক ভিত্তি বেদান্ত।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত তত্ত্বের উপদেশ সন্নিবেশিত, তাহা চারপ্রকার—

১। আত্মতত্ত্ব।

২। যোগসাধন।

৩। সন্ন্যাস।

৪। অবতারবাদ ও কৃষ্ণ-বিষ্ণু-শিবের দেবত্বপ্রতিষ্ঠা।

গীতার কালনিরূপণ করিতে হইলে ইহাকে কঠাদি দ্বিতীয়শ্রেণীর পরবর্ত্তী বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই শ্রেণীর উপনিষদের উপদেশ ও ভাবার্থ গীতার অনুকরণীয়; এমন কি, ইহাদের কতিপয় শ্লোক গীতার মধ্যে সশরীরে সমানীত দেখা যায়।

অথর্ব্বোপনিষদের সহিত গীতোক্ত উপদেশের সমধিক সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। অপরাপর তত্ত্ব ছাড়িয়া অবতারবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কিয়ৎপরিমাণে গীতার কালনির্ণয়ের সন্ধান পাইতে পারি। গীতায় যে অবতারবাদের কথা আছে, তাহা বেদে নাই, ব্রাহ্মণে নাই, আদ্যোপনিষদ্গুলিতেও নাই। ঈশ্বরের অবতারকল্পনা—কৃষ্ণ বিষ্ণু-শিবের ঈশ্বরত্বস্থাপন—সাম্প্রদায়িক ভাবে আর্য্য-ধর্ম্মের এইরূপ পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পরিচায়ক। এই হিসাবে গীতাকে অথর্ব্বোপনিষদের সমকালবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বোধ হয় না।

গীতার পূর্ব্বে যে আমাদের দর্শনশাস্ত্র-সকল প্রণীত হইয়াছিল—সাংখ্যদর্শন, যোগ ও বেদান্তদর্শন—শুধু মুখে মুখে অসম্বদ্ধ, অসম্পূর্ণ কথায় নয়, কিন্তু শাস্ত্র বা সূত্রাকারে গীতার সময় সে সমস্ত প্রচলিত ছিল,গীতার মধ্য হইতেই তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। গীতায় সাংখ্যতত্ত্বসকল বিস্তারিতরূপে উপদিষ্ট—

* Macdonell's Sanskrit Literature.

সাংখ্যদর্শনকে গীতার দার্শনিক ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গীতার সময় সাংখ্যশাস্ত্র সূত্রাকারে গঠিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবারও কারণ আছে। তাহার সাক্ষী অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৩শ, ১৮শ শ্লোক দেখ। ১৩শ শ্লোকের "সাংখ্য কৃতান্ত" অর্থাৎ সাংখ্য-সিদ্ধান্ত এবং ১৯শশ্লোকোক্ত 'গুণসংখ্যান' অর্থাৎ গুণের সংখ্যাকরণ, -ভাষ্যকারেরা এই বাক্যগুলি সাংখ্যশাস্ত্র অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহা হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, তখনকার কালে সাংখ্যদর্শন বাঁধাবাঁধি শাস্ত্রাকারে পরিণত হইয়াছে।

যোগদর্শনও গীতার আদরের বস্তু। ইহার এক নামই যোগশাস্ত্র। জ্ঞানযোগে সাংখ্য, কর্ম্মযোগে যোগশাস্ত্র—গীতার অবলম্বন। আমরা দেখিতে পাই যে, পাতঞ্জলদর্শনের যোগসাধনপ্রণালী গীতোপদেশের অন্তর্ভূত; ভগবানে চিত্তসংযোগ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তি-সূচক কতকগুলি কথা, যাহা কিছু নূতন, তাহাই গীতার নিজস্ব সম্পত্তি। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে যোগশাস্ত্রসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "পুরাতন যোগশাস্ত্র কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়াছে—হে পরন্তপ! তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ—উত্তম রহস্য—আমি অদ্য তোমাকে বলিলাম।"

বেদান্তদর্শনের সহিত গীতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই—সে সম্বন্ধ পদে পদে প্রতীয়মান হয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ের একস্থানে ভগবান্ 'বেদান্তকৃৎ' বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। শ্রীধরস্বামী তাহার এই অর্থ করেন—"আমি তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক জ্ঞানদাতা গুরু।" যদি শ্রীকৃষ্ণকে বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে গীতার সময় বেদান্তদর্শনের অস্তিত্ব ও লোকসমাজে প্রচার সহজেই প্রতিপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, ১৩শ অধ্যায়ের ৫মশ্লোকোক্ত 'ব্রহ্মসূত্রপদৈর্গীতং' কথাগুলি এই প্রসঙ্গে বিচারযোগ্য, উহা পরে আলোচিত হইবে।

উল্লিখিত দর্শনত্রয়ের মধ্যে সাংখ্যই প্রাচীনতম। কপিলমুনি সাংখ্যশাস্ত্রের আদি-গুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি বৌদ্ধযুগেরও পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ধারণা হয়, কেন না, বৌদ্ধধর্ম্মে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রভাব বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, আর বৌদ্ধদের মধ্যে প্রবাদ এই যে, বুদ্ধদেবের জন্মভূমি যে কপিল-বাস্তু, কপিলের নাম হইতেই তাহার নামকরণ হয়। সে যাহা হউক, কপিলের স্বরচিত কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সাংখ্যসূত্র পাইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। গীতার সময় দর্শনশাস্ত্র-সকল কি আকারে প্রচলিত ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। যদি এমন মনে করা যায় যে, সে সময় পাতঞ্জলদর্শন বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে গীতার প্রণয়নকাল খৃঃ পূঃ দুই শতাব্দীরও উত্তরকাল হইয়া পড়ে।

কিন্তু যদিও এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, তথাপি সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে গীতার প্রাচীনত্ব-বাদে বিশেষ সন্দেহ জন্মে। যখন দেখা যায় যে, গীতোক্ত দর্শনতত্ত্ব তাঁহার পূর্ব্বগামী দর্শন হইতে সংগৃহীত—সেই সমস্ত দর্শনের সমন্বয়-সাধনেই গীতার বিশেষত্ব, তখন গীতার কাল

নিদানপক্ষে দর্শনসূত্রসঙ্কলনের পরবর্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষণের প্রতি গীতার বিশেষ লক্ষ্য। বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইতে সমাজ-বিপ্লবের আশঙ্কা উহাতে পদে পদে সূচিত হইতেছে। পরধর্ম্মের তুলনায় স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, পরধর্ম্মাবলম্বন বিনাশের মূল—এইরূপ উপদেশ আর্য্যসমাজের আদিম অবস্থার কথা নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ঐ সমাজে যে ঘোরতর জাতিবিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই বিপ্লব নিবারণ করা ঐ সমস্ত উপদেশের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গীতাকে বুদ্ধের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন ভূতোপাসনা, সাকারবাদ ও ভক্তিযোগের কথাসকল আধুনিক কালের অনুকূল সাক্ষ্য প্রদান করে।

সূত্রসাহিত্যের পর মহাভারত ও মনু-সংহিতার উল্লেখ করিতে হয়। ইহাদের প্রভাবও গীতার স্থানে স্থানে উপলব্ধি করা যায়। সৃষ্টিপ্রকরণ, বর্ণাশ্রমের কর্ম্মবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে মনুর সহিত গীতার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, গদাচক্র-ধারী বিষ্ণু, সেনাপতি স্কন্দ, সমুদ্রমন্থনপ্রসূত উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, মকরাদির কথা হইতে মহাভারত ও পৌরাণিক আখ্যানসকল স্মরণপথে উদিত হয়। মহাভারতে আছে, ভীষ্মদেব দেহত্যাগের পূর্ব্বে সদ্গতিলাভার্থ শরশয্যায় উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। গীতাও উপদেশ দিতেছেন যে, যোগীর উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ হইলে সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয়। মোক্ষ অর্থে নির্ব্বাণশব্দের প্রয়োগ মহাভারতেও দৃষ্ট হয়। মহাভারতের সাদৃশ্য হইতে গীতার কাল-নির্ণয়ের বিশেষ কোন সাহায্য হয় কি না, দেখা যাউক।

মহাভারত যদি একসময়কার রচনা হইত ও তাহার রচনাকাল অকাট্য প্রমাণদ্বারা নিরূপণ করা সুসাধ্য হইত, তাহা হইলে গীতা মহাভারতের অন্তর্গত ব'লয়া তাহার কালনির্ণয়ে আমরা অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম, কিন্তু সে পথ বন্ধ। বঙ্কিমবাবু তাহার কৃষ্ণচরিত্রে মহাভারতের মধ্য হইতেই দেখাইয়াছেন যে, মহাভারতের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথমটি আদিম কঙ্কাল, তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনু-ষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা চতুর্ব্বিংশতিশ্লোকাত্মিকা ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। প্রথম-শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেই অংশই প্রাথমিক বা আদিম; এবং দ্বিতীয়-শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রথম স্তরে ও দ্বিতীয় স্তরে এক গুরুতর প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন ঐশী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তিনি স্পষ্টত বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চ্চিত; নিজেও নিজের

ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করেন; কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষপ্রকারে যত্নশীল। ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরো এক স্তর আছে, তাহা তৃতীয় স্তর। এই তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। এই কারণে ভালমন্দ অনেক কথা ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও মহাভারতকে স্তরে স্তরে বিভক্ত করেন—

১। আদিম কঙ্কাল (কাব্য)।

২। চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রী সংহিতা (মহাকাব্য)।

৩। স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের আকার।

৪। পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্তাংশ।

তাঁহাদের মতে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে তৃতীয় বা চতুর্থ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাভারতের ব্যাপ্তিকাল। প্রায় সহস্র বৎসরে সহস্র শ্লোক লক্ষাধিক শ্লোকে পুষ্টিলাভ করিয়াছে — বীররসাত্মক কাব্য তাহার এই বর্ত্তমান ধর্ম্মশাস্ত্রের আকারে পরিণত হইয়াছে। এইকালমধ্যে কৃষ্ণ সামান্য নর, নরোত্তম, নারায়ণ—মনুষ্য হইতে ক্রমে দেবতার পদে সমারূঢ় হইয়াছেন।

এই সংযোজনার মধ্যে গীতা কোন্ স্তরে স্থাপিত হইতে পারে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবদ্গীতা ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত, কিন্তু গীতা মহাভারতের প্রক্ষিপ্তাংশ কি না এবং কোন্ সময়েই বা প্রক্ষিপ্ত, এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিস্তর বাদানুবাদ চলিতেছে। অতএব ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত বলিলেও গীতার কালনির্ণয় অধিকদূর অগ্রসর হয় না। মহাভারতের একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইতে পারে—তাহা এই—

> যদাহশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
> রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
> কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
> তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥
>
> ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ। আদি, ১ম, ১৭৯

"যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দুঃখাভিভূত হইয়া রথোপস্থে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ তাঁহাকে স্বীয় শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন, হে সঞ্জয়, আমি বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিলাম।" কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে? ইহাতে ত গীতার নামোল্লেখ নাই। এমন হইতে পারে যে, এইশ্লোকোক্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কোনকালে গীতা রচিত হইয়াছিল, যেমন মহাভারতের শকুন্তলাখ্যান অবলম্বন করিয়া কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল বিরচিত। তাহা ছাড়া, উক্ত শ্লোক কোন্ স্তরের অন্তর্গত, তাহা নিরূপণ করাও সহজ নহে। মহাত্মা কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ বাহ্যাভ্যন্তর নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গীতানুবাদের উপক্রমণিকায় গীতার জন্মকাল অন্তত খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী অনুমান করেন। গীতার ভাষা, ছন্দ, রচনাপ্রণালী, দর্শন, বেদ-যজ্ঞ-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে উহার মতামত ইত্যাদি বিষয় লইয়া আভ্যন্তরিক প্রমাণ। গীতার কালনির্ণয়ের উপযোগী বাহ্যপ্রমাণ যাহা পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে তাঁহার যুক্তির সারাংশ এই:—

তিনি বলেন, শঙ্করাচার্য্য গীতার ভাষ্যকার—শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর লোক, অতএব গীতাগ্রন্থখানি অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে ছিল, ইহা নিশ্চিত।

'কাদম্বরী' প্রণেতা বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাদম্বরীতে ভগবদ্গীতার উল্লেখ আছে। তাহার একস্থানে রাজবাটী-বর্ণনায় মহাভারতের সহিত রাজার প্রাসাদের উপমা দেওয়া হইয়াছে এবং "অনন্তগীতাকর্ণনানন্দিতনর" এই শব্দগুলি সেই প্রাসাদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। এই বিশেষণ প্রাসাদের প্রতি প্রয়োগ এবং মহাভারতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং তদনুসারে তার দুই ভিন্নার্থ হয়। প্রাসাদে প্রযুক্ত হইলে এই অর্থ হয় যে, সেখানকার লোকেরা অনন্ত গীতশ্রবণে আমোদিত। মহাভারতের সম্বন্ধে এই যে, লোকেরা সেখানে অনন্তগীতা অর্থাৎ ভগবদ্গীতা শ্রবণে আনন্দিত। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কাদম্বরীরচনার সময় মহাভারত ও গীতা পাঠ জনসাধারণে প্রচলিত ছিল।

বাণভট্টের হর্ষচরিতে কবি কালিদাসের নামোল্লেখ আছে, সুতরাং বাণভট্টের পূর্ব্বে কালিদাসের জন্মকাল বলা যাইতে পারে। কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত, ইহা একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত। কালিদাসের কাব্যে গীতার বচন হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দৃষ্ট হয়। দুইএকটি উদাহরণ দিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মহাত্মা তেলঙ্গ রঘুবংশ হইতে একটি দিয়াছেন, তাহা দশম সর্গে দেবতাদের বিষ্ণুস্তবের ৩১তম শ্লোক—

অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্ম্মণোঃ॥
কি আছে অলব্ধ কিম্বা অপ্রাপ্য তোমার,
নিত্য পরিপূর্ণ, প্রভু, বিশ্বের আধার?
জনম করম তবু করিছ গ্রহণ।
কেবল লোকের হিত করিতে সাধন॥

নবীনচন্দ্র দাস।

ইহা হইতে গীতার অনেক স্থানের শ্লোক ও ভাবার্থ স্মরণ হয়। ভগবানের যে কোন কর্ত্তব্য নাই, লোকানুগ্রহের জন্যই তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত, তাহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে ২০শ হইতে ২৪শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের "দিব্য জন্ম কর্ম্ম" এই বাক্যগুলি শব্দশ অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। $\frac{8}{৯}$

বিষ্ণুস্তবের আর একটি শ্লোক আমার মনে হইতেছে

(২৭) ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকর্ম্মণাম্।
গতিস্ত্বং বীতরাগাণাম্ অভূয়ঃসন্নিবৃত্তয়ে॥
বিষয়বিরাগমতি যেই যতিগণ
যোগবলে নিজ চিত্ত নিবেশি তোমায়।
সর্ব্বকর্ম্ম তোমা'পরে করে সমর্পণ
মোক্ষগতি পায় তারা তোমারই কৃপায়।

নবীনচন্দ্র দাস।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

এ দুয়ের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, তাহা বিনা ঋণগ্রহণে উৎপন্ন হইতে পারে না।

আবার, কুমারসম্ভবের ষষ্ঠ সর্গে ৬৭তম শ্লোকে সপ্তর্ষিদের মুখে হিমালয় স্থাবর বলিয়া বর্ণিত। গীতার বিভূতিযোগাধ্যায়েও ভগবান্ "স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ" বলিয়া আত্মবর্ণন করিতেছেন। মল্লিনাথ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যথার্থই লিখিয়াছেন—"'স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ' ইতি গীতাবচনাৎ।"

এই কয়েকটি উদাহরণ হইতে কালিদাসের কাব্যে গীতার আভাস সহজেই উপলব্ধ হয়, সুতরাং গীতা পঞ্চমশতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত গীতানুবাদকের সহিত আমাদের এক মত। অতঃপর তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, গীতা বেদান্তসূত্র অপেক্ষাও প্রাচীন। এই মত সমর্থনে তিনি যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুসরণ করিতে পারিলাম না। বাদরায়ণের বেদান্তসূত্র প্রাচীনশাস্ত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে গীতার কোন নামোল্লেখ নাই। কোন কোন সূত্রে প্রমাণস্বরূপ স্মৃতির কথা আছে বটে, কিন্তু সে কোন্ স্মৃতি, তাহার নির্দ্দেশ নাই। ভাষ্যকারেরা বলেন, সে স্মৃতি গীতা, কিন্তু সে তাঁহাদের নিজের মত, তাহার পৃষ্ঠপোষকপ্রমাণাভাব। অন্যান্য পণ্ডিতেরা ইহাতে মতভেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বেদান্তসূত্রের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র —গীতা স্বয়ং একস্থানে সেই নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

> ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
> ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ১৩/৫

"ঋষিগণকর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দে এবং হেতুবিশিষ্ট সুনিশ্চিত 'ব্রহ্মসূত্র'পদ দ্বারা উহা (ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব) পৃথক্‌রূপে বহুধা গীত হইয়াছে।"

ভট্ট মোক্ষমূলর তাঁহার প্রণীত ষড়্দর্শনে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই শ্লোকে 'ব্রহ্মসূত্র' পদে 'বেদান্তসূত্র' বুঝিতে হইবে। "হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" এই দুই বিশেষণ সূত্রশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব। বেদান্তসূত্রে যে স্মৃতির প্রমাণ কথিত আছে, তাহা গীতা ভিন্ন অন্য কোন স্মৃতি হইতে পারে—স্মৃতির মূল যে শ্রুতি, তাহার বচনও হইতে পারে; এ বিষয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যেও মতভেদ; কিন্তু, তাঁহারা যাহাই বলুন, গীতোক্ত ব্রহ্মসূত্র বেদান্তসূত্র অর্থে গৃহীত হওয়া যতদূর সঙ্গত, তাহার বিপরীতপক্ষে তাঁহাদের ব্যাখ্যা তেমন প্রতীতিজনক নহে।

অতএব গীতার কালনির্ণয়সম্বন্ধে তেলঙ্গমহোদয় যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে দোষ ধরিবার নাই, এমন নহে। সে যাহা হউক, তিনি গীতার যে জন্মকাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাও উহাকে দূরে ফেলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না—বরং আরো উত্তরকালীন বলিলেও বলা যাইতে পারে। অনেকানেক সমীচীন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পক্ষপাতী। গীতার সময় প্রাচীন যোগশাস্ত্র লুপ্তপ্রায়, ইহাতে তাহার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইতেছে। কাপিল সাংখ্যও এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে যে, কপিলমুনি সিদ্ধযোগীর পদে সমারূঢ় হইয়াছেন। ১০/২৬ ব্যাসদেবও অসিত-দেবলের সঙ্গে দেবর্ষিমধ্যে পরিগণিত। ১০/১৩ তাহা ছাড়া, গীতার ভাষাও বৈদিক নহে, সামান্য ব্যতিক্রম বাদে আধুনিক সংস্কৃত, ইত্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে গীতার প্রণয়নকাল বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা যায় না। উপনিষদের অথর্ব্বভাগ, মহাভারতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের গঠনকাল যাহা, গীতার রচনাকাল মোটের উপর তাহাই ধরা যাইতে

পারে—বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মধ্যবর্ত্তী—খৃষ্টাব্দপ্রবর্ত্তনের কিছুকাল অগ্রপশ্চাৎ উহার জন্ম বলাই সঙ্গত। যাহা হউক, এ সকলই অনুমানের উপর নির্ভর, আমি এ বিষয়ে কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই-য়াছি, এ কথা বলিতে সাহস করি না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজি।

আজি পূর্ণ হ'ত যদি আজিকারি মাঝে।
তপনখচিত এই নভ চন্দ্রাতপ,
সুগভীর নীল ছটা মাথায় বিরাজে,
বান্ধববিটপী যত পল্লব-সৌষ্ঠব
বিকাশে কবির মত সুন্দর প্রচুর,—
সহকারে বাড়ে ফল নিটোল কঠিন
সরস কৈশোরসম! তপ্ত সুমধুর
সোমরসসম আলো! জরালসহীন
সারাদিন চলে যায়—ক্ষণে কর্ম্মপর,
ক্ষণে নেত্রবারিমোছা, ব্যথিত অন্তর,
কভু তীব্র রৌদ্রালোকে বহ্নিময় পথে
চলে যাওয়া বহুদূর বাধাহীন পদে,
কভু স্থির বসে থাকা ক্ষান্ত দিয়া কাজে!
আজি পূর্ণ হয়ে যাক্ আজিকার মাঝে।

৺সতীশচন্দ্র রায়।

স্মৃতিমন্দির।

পৃথিবীপতি বাদশাহ তাঁহার মর্ম্মবেদনার ছবি শ্বেতমর্ম্মরে রচনা করিয়া রাজধানী আগ্রার উপান্তভাগে যমুনাতীরে রাখিয়া গিয়াছেন। আগ্রার তাজমহল শাজাহান বাদশাহের তুষারধবল পাষাণময় শোকাশ্রু। আজ সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সে বাদশাহ নাই এবং যাঁহার অবশেষের উপর এই শোকমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহার জন্য শোক করিবার ইহ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। কিন্তু এই বিয়োগবিধুর প্রেমিকের হৃদয়োচ্ছ্বাসের ছবি দেখিয়া আজ পর্য্যন্ত কতশত মৃত্যুপীড়িত নরনারীর হৃদয়তল হইতে রুদ্ধশোকবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কে তাহার অনুসন্ধান করে। আসমুদ্র-হিমাচলবিস্তৃত সাম্রাজ্যের একাধীশ্বর, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ময়ূরতক্ত যাঁহার সিংহাসন, কেশববক্ষোবিলম্বিত-কৌস্তভনিন্দিত কোহিনুর যাঁহার শিরোভূষণ, ত্রিংশৎকোটি মানব যাঁহার আজ্ঞাপালনে সর্ব্বদা জোড়হস্ত, সেই সাহান-সাহা বাদশাহ শতচেষ্টাতেও একটিমাত্র নারীকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না। হায়। মানব, তোমার ক্ষমতা এতই তুচ্ছ, তুমি এতই দুর্ব্বল।

শোকের সান্ত্বনা, সুখের সহচরী, রোগের সেবা, অবসরের চিত্তবিনোদন, সংসারমরুভূমির সুশীতলচ্ছায়ারূপিণী মহিষীকে বাহুবেষ্টনের মধ্যে রাখিতে শাজাহান কি না করিতে পারিতেন। কিন্তু কৈ, তাঁহার হৃদয়পিঞ্জরের পক্ষিণী আরযুমন্দ বানু কৈ রহিল? সুখ-দুঃখে, সম্পদে বিপদে, বহুবর্ষ ধরিয়া যে পার্শ্বচরী ছিল, হঠাৎ তাহাকে হারাইয়া এক নিমিষে বিশাল বিশ্বে নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ, আশ্রয়হীন, একাকী হওয়া কি কঠিন, তাহা যাহার সে দুঃখ ঘটিয়াছে, সেই জানে। সূর্য্যচন্দ্রের যেখানে গতিরোধ, বায়ু যেখানে ধীরে প্রবাহিত হয়, সেই মোগলরাজান্তঃপুরে সবলে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বহর কাল যখন বাদশাহের প্রেমবেষ্টন হইতে রাজমহিষীকে হরণ করিল, শাজাহানের তাৎকালিক মনোভাব অনুভবযোগ্য মাত্র, বর্ণনাতীত। শোকের প্রথমোচ্ছ্বাস অতিবাহিত হইলে, মৃত্যুকে যথাসম্ভব সুন্দর, রমণীয় ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে বাদশাহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—এ ইচ্ছা স্বাভাবিক। জীবিত থাকিতে যাহার ভাবনা আমরা ভাবি, যাহার জন্য আমরা কাজ করি, যাহার প্রয়োজন সাধন করিয়া দিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি, মৃত্যুর পরেও তাহারি ভাবনা ভাবিতে, তাহারি উদ্দেশে কাজ করিতে আমাদের মন চাহে—ইহা প্রেমের ধর্ম্ম। আমাদের প্রেমের পাত্র মৃত্যুর অধীন বটে, কিন্তু প্রেম চিরজীবী। ইহসংসারে আমাদের প্রেম ব্যর্থ, মর্ম্মাহত হইতে পারে; যম আমাদের প্রেমের পাত্রকে সময়ে-অসময়ে আমাদের

নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু সেই ব্যর্থ, মর্ম্মাহত, বিয়োগপীড়িত প্রেম সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে প্রেমভাজনকে অনুসরণ করে তাহাতেই তাহার চরম সার্থকতা। অবরোধসৌন্দর্য্যের শিরোমণি মমতাজকে বাদশাহ যে ভালবাসিতেন, সেই অনির্ভিন্ন গভীর ভালবাসাই এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মৃত্যু-মন্দিরের সৃষ্টিকর্ত্তা। নচেৎ অর্থ, অহঙ্কার ও ক্ষমতার সাধ্য কি যে, পাষাণমন্দির এমন সুন্দর করিয়া রচিতে পারে, পাষাণে এত কোমলতাসন্নিবেশ করিতে পারে, প্রস্তরকে এমন শোকনম্র করিয়া তুলিতে পারে।

শশিসূর্য্যবিরাজিত, নক্ষত্রখচিত, উদার, উন্মুক্ত, নীল নভোমণ্ডলের নিম্নে, ইহপর লোকব্যাপী অসীম প্রেমের কি মহিমান্বিত ছবি! যুগযুগান্তের সাক্ষিস্বরূপিণী, স্নেহধারপ্রবাহিণী শীতসলিলা যমুনার নিকট—আজ কত-কালের কথা শুনিয়াছি একদা বিয়োগ-বিধুরা ব্রজবালা তাহার মর্ম্মবেদনা শুনাইয়া-ছিল। দুনিয়ার মালিক মোগলবাদশাহ বিশ্ববিজয়ী মৃত্যুর নিকট পরাজিত হইয়া জীবিতরূপিণী মহিষীর শবদেহ বুকে করিয়া সজলনয়নে সন্তপ্তের চিরশান্তি সেই যমুনার কাছে আসিয়াছিলেন। শাজাহান আজ নাই, কিন্তু করুণাময়ী কালিন্দী বাদশাহের দুঃখভার আজও বুকে করিয়া বহিতেছে;—সুস্নিগ্ধ প্রভাতে, উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে, পাণ্ডুর সন্ধ্যায়, নিবিড়-নিস্তব্ধ নিশীথে তুষারশীতল জলধারায় ভূপতির এই মৃত্যুজ্বালা ধুইয়া-লইয়া অনন্ত মহাসাগরে ফেলিতেছে। যুগ-যুগান্তজীবী প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্যে অনিন্দ্যসুন্দর শ্মশানচ্ছবির চতুর্দ্দিকস্থ মহা-শূন্যে রাজাধিরাজের শোকশ্বাস আজিও কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই হে প্রেমিক, তোমার শোক আজ বিশ্বব্যাপী—জলে-স্থলে অন্তরিক্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সমগ্র বিশ্বের মৃত্যুপীড়িত নর-নারী সেই শোক অন্তরে-অন্তরে বুঝিয়া তোমার শোকসাক্ষী, যমুনাসৈকতস্থিত প্রস্তরীভূত দীর্ঘশ্বাসের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইতেছে।

হে পরলোকগতা রাজরাজেশ্বরি আর্য্যমন্দ্-বানু, তুমি ঐশ্বর্য্য ও বিদ্বেষ পরিপূর্ণ সপত্নী-বহুল মোগলরাজান্তঃপুরে সুখে ছিলে কি দুঃখে ছিলে, তাহা তুমিই জান। কল্পনার বলে ঐতিহাসিকবৃন্দ, যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট্শ্রেষ্ঠ দিল্লীশ্বরের হৃদয়ে তোমার কি-পরিমাণ স্থান ছিল, তাহা বোধ হয় তুমি অথবা সম্রাট্, কেহই জানিতে না। যে ইহ-লোক হইতে চলিয়া গেলে পৃথিবীর সব সুখ, সব আনন্দ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া যায়, জীবন তুচ্ছ ও দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হয়, জীবিত থাকিতে সে যে আমাদের কত আত্মীয়, কত নিকট ছিল, তাহা তাহাকে জানাইবার আমাদের অবসর হয় না, ইহা সংসারের অতি-বড় প্রাচীন এবং অতি-বড় কঠিন দুঃখ। শাজাহানের বুঝি সেই দুঃখই ঘটিয়াছিল। অকারণ-অশনিসম্পাত-তুল্য সুস্থকায়া প্রসূতিকা মহিষীর মৃত্যুসংবাদ যখন বাদশাহ পাইলেন, রাজকার্য্যনিরত স্বল্পাবসর শাজাহান তখনও বুঝি তোমাকে জানাইতে পারেন নাই—তুমি তাঁহার কত

প্রিয় ছিলে। তাই তোমার সমাধিমন্দিরে বাদশাহের এত ব্যাকুলতা আমরা দেখিতে পাই। বিশ-বৎসর ধরিয়া 'বলি বলি' করিয়া রাজ্যেশ্বর যে কথা বলিবার অবসর পান নাই, তোমার অবসানের পর প্রায় বিশ-বৎসর ধরিয়া 'তাজ' নির্ম্মাণ কবিতে করিতে, তাহার প্রতি প্রস্তরসন্নিবেশের মধ্যে কত যত্নে বাদশাহ সে কথা কতবার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তাহা যাহার চক্ষু আছে, সে-ই দেখিতে পায়। রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট জীবিতকাল সমস্তই ঐ কার্য্যে ক্ষেপণ করিয়াছেন, তথাপি রাজরাজেশ্বরের তৃপ্তি হইয়াছিল কি না, কে জানে। জরাজীর্ণ-দেহে, অবসন্নমনে, জীবনের সায়াহ্নে বাদশাহ যখন স্বীয়পুত্রকর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন পুত্রের নিকট প্রাসাদমধ্যস্থ এমন একটি ঘর নির্জ্জনবাসের জন্য চাহিয়া-ছিলেন, যেখান হইতে দিনান্তে একবারও 'তাজ' দেখিতে পান। জীবনের শেষতম নিমেষে যখন কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত, তেজোহীন চক্ষুতারকায় মৃত্যুর করাল ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তখনো বাদশাহ ইহপরকাল ভুলিয়া প্রাণপণে সুদূর সমাধিমন্দিরের প্রতি পলকহীন দৃষ্টি রাখিয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

মোগলবাদশাহের অবরোধপ্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিয়া, প্রাসাদসংলগ্ন উপবনের গন্ধবায়ু সেবন করিয়া, সহস্রদর্পণখচিত মর্ম্মরগৃহে উৎসমুখনিঃসৃত সুগন্ধজলে স্নান করিয়া, পারসিক সুবর্ণসুরা পান করিয়া, মণিমাণিক্য-খচিত বহুমূল্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া, হিন্দুস্থানের বাদশাহের সহিত একত্রে ময়ূরসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সুখ পাইয়াছিলে কি না, জানি না। কিন্তু হে পরলোকবাসিনি, তোমার স্মৃতিটুকু লইয়া পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ জীবনের অবশিষ্টাংশ কি ভাবে কাটাইয়া-ছিলেন, যদি তোমার 'পরীলোকে' বসিয়া তাহা একবারও দেখিয়া থাক, তবে বোধ করি সুখ ও গর্ব্ব দুই-ই অনুভব করিয়াছ, এবং শাজাহানের জীবনব্যাপী তপস্যাও সার্থক হইয়াছে।

এ পৃথিবী হইতে যে একবার অবসর গ্রহণ করে, সে আর ফিরে না, আমা-দিগকে পরলোকগত প্রিয়পাত্রের স্মৃতি লইয়াই থাকিতে হয়—উহাই আমাদিগের অবশিষ্ট জীবনযাত্রার সম্বল। কিন্তু নিরা-কারব্রহ্মোপাসনার অধিকারী যেমন সকলে হইতে পারে না, তেমনি নিরবয়ব স্মৃতি সংসারের জালজঞ্জাল হইতে যাবজ্জীবন স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল রাখা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাই আমরা স্মৃতির উদ্বোধক একটা-কিছু চাই, যাহা আমরা প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে রাখিতে পারি। অপরূপলালিত্য-পরিপূর্ণা, মহামহিমান্বিতা, পাষাণসুন্দরী 'তাজ' ব্যতীত এই রাজদম্পতির প্রেম আজ পর্য্যন্ত সুমহান্ মর্ত্ত্যলোকে কে জাগাইয়া রাখিতে পারিত বলিতে পারি না।

রক্তপাষাণবেদিকার উপরে শ্বেতপ্রস্তরাসন পাতিয়া, স্পন্দহীন-মহামৌন-পাষাণযোগিনী আজ সার্দ্ধদ্বিশত বর্ষ ধরিয়া লোকান্তরিত রাজমহিষীর পার্থিবদেহাবশেষ কোলে করিয়া মহাযোগে নিমগ্ন রহিয়াছে। সুদীর্ঘ-কালের তপোমাহাত্ম্যে পাষাণরাণীর দেহ

সর্ব্বপ্রকার-অনাবশ্যকবাহুল্য-বর্জ্জিত, তপঃ-প্রভাবে তাহার [illegible]অঙ্গ দিয়া স্নিগ্ধ-কান্তি-সুনির্ম্মল লাবণ্যজ্যোতি গড়াইয়া পড়িতেছে। সমাধিশায়িতা সাম্রাজ্ঞীর প্রেমপ্রভাবে, প্রেমার্জ্জিত পুণ্যমহিমায়, নির্জ্জীব পাষাণপ্রতিমা অপূর্ব্বলাবণ্যময়ী প্রৌঢ়া সুন্দরীর সর্ব্বপ্রকার গরিমায় ও মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সুবৃহৎ তোরণদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার যে এই বাক্যহীনা সুন্দরী পাষাণীকে চক্ষু তুলিয়া দেখিয়াছে, তাহার চক্ষু সার্থক।

স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামশোভাসম্পন্ন উপবনমধ্যে অমল-ধবল পাষাণসুন্দরী 'তাজ' অনন্ত-নীল চন্দ্রাতপতুল্য গগনতলে অমল-ধবল পাষাণসুন্দরী 'তাজ'—গোপাঙ্গনার আনন্দ-বর্দ্ধন নন্দনন্দনের নর্ম্মসহচরী নীলবসনা যমুনার উপকূলে পাষাণসুন্দরী 'তাজ'—অনন্তনীলিমাময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে 'তাজের' এই অনিন্দনীয় ধবল সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাধিমন্দিরের কারুখচিত অভ্যন্তরশোভা দেখিলে মনে হয়, সম্পদ্-লালিতা রাজমহিষীর শেষনিবাস যথার্থ তাহার উপযুক্ত করিয়াই বাদশাহ রচিয়া গিয়াছেন। স্থপতির অদ্ভুত কৌশলে ভিত্তি-গাত্রে বিচিত্রবর্ণাঙ্কিত ফুল, পল্লব, পত্র, পক্ষি-গুলি যেন সজীব বলিয়া মনে হয়, অথচ সমাধিমধ্যস্থ পীতাভ ক্ষীণালোকে শোক-মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ দেখিলে মৃত্যুরাজ্যের উল্লাসবিহীন গম্ভীর ছায়া মনের উপরে আপনি আসিয়া পড়ে। আলোকপ্রবেশ-পথ প্রশস্ত হইলেও এরূপ সুকৌশলে স্থাপিত যে, প্রাণসঞ্চারক সূর্য্যরশ্মি প্রচুরপরিমাণে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুমন্দিরের সুগভীর নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া দিতে পারে না। যে ক্ষীণালোকটুকু প্রবেশ করে, তাহা নবোদিত সূর্য্যের রক্তরশ্মি নহে, তাহা সমাধিমধ্যস্থ অন্ধকারের সহিত মিশিয়া পীতবর্ণ হইয়া যায়; মনে হয়, যেন সার্দ্ধদ্বিশতবর্ষ পূর্ব্বে রাজেন্দ্রাণীর জীবমানে যে সূর্য্যালোক ছিল, তাহারই কিয়দংশ যেন তাহার শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে সমাধিমন্দিরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজরাজেশ্বরীর বিচিত্রকারুকার্য্যখচিত সমাধির সন্নিহিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম-যাজকগণ যখন ভক্তিপরিপ্লুত গদ্গদকণ্ঠে নিখিলব্রহ্মাণ্ডপতি পরাৎপর পরমেশ্বরের নামকীর্ত্তন করে, তখন কবরচূড়ার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশলে শ্রোতার মনে হয়, যেন ধীরে ধীরে বায়ুস্তরসকল ভেদ করিয়া ক্রমে অস্ফুটতর হইতে হইতে ভক্তমুখোচ্চারিত নামসঙ্কীর্ত্তন অনন্তের মহিমাময় সিংহাসন-তলে পৌঁছিতেছে। হে পরলোকগত পৃথ্বী-নাথ, অনাদিকাল হইতে যে প্রিয়বিরহ এবং অপ্রিয়সম্মিলনে বিধাতার বিশ্ব জর্জ্জরীভূত ও ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছে, যে মৃত্যু আসিয়া দণ্ডে-দণ্ডে, পলে-পলে বিশ্বসংসারের সকল সৌন্দর্য্য, সকল আনন্দ হরণ করিয়া জীবনের অস্থিকঙ্কালগুলি আনিয়া জগতের চক্ষের সম্মুখে ধরিতেছে, তাহা হইতে কাহারো অব্যাহতি নাই। যে সমস্ত উপাদান একত্র সম্মিলিত হইলে সুখ মানবের নিকট আপনি আসিয়া ধরা দেয়, তোমার তাহার একটিরো অভাব ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটি-মাত্র ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া, এক আঘাতে কে তোমাকে ভূলুণ্ঠিত করিল? কোথা হইতে

কি সূত্র অবলম্বন করিয়া, কোন্ সময়, কাহার উপরে, কি আঘাত আসিয়া পড়িবে, যিনি সর্ব্বকার্য্যকারণের নিদান, সেই সর্ব্বেশ্বর ভিন্ন এ কথার উত্তর কে দিবে?

জন্ম এবং মৃত্যু, এ দুইটি জীবজগতের অতি-বড় বৃহৎ ঘটনা। জন্মের মধ্যে আমরা ভগবানের অজস্র করুণা দেখিয়া থাকি, এবং মৃত্যু ঘটিলেই কাতরকণ্ঠে বিধাতার নির্দ্দয়তা ঘোষণা করি; কিন্তু জানি না, সেই নির্দ্দয়তার মধ্যে কি গভীর কল্যাণ জীবহিতের নিমিত্ত কল্যাণময় সঞ্চয় করিয়া রাখেন। নিদাঘসন্ধ্যার প্রবল ঝটিকা এবং প্রাণসংহারিণী বিদ্যুৎশিখাই আমরা দেখি, কিন্তু বিশ্বদেবতার স্নেহধার স্বরূপ নববারিধারায় যে সুমহৎ কল্যাণ সাধিত হয়, তৎপ্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

যে ইন্দ্রপ্রস্থে আজ তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সেই বিস্তীর্ণ জনপদের উপভোগ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গের যুদ্ধোন্মুখ বহু অক্ষৌহিণী বাহিনীর মধ্যে রথস্থাপন করিয়া, সাময়িক করুণায় কর্ত্তব্যবিরত মহাবীরের প্রতি উপদেশচ্ছলে, ভগবান্ বলিয়াছিলেন "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" যদি সর্ব্বতত্ত্বদর্শী সর্ব্বময় যোগেশ্বরের কল্যাণকর উপদেশবাক্যে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর থাকিত, তবে বোধ করি জীবনের আনন্দটুকু আমরা নিঃশেষে ভোগ করিতে পারিতাম, অপরিহার্য্য মৃত্যুভয়ে আমরা এত সন্ত্রস্ত ও কাতর হইতাম না; কিন্তু তাহা হইবার নয়! তাই হে সম্রাট্, ইন্দুমতীর বিরহে সূর্য্যবংশীয় নরপতি বিলাপ করিয়াছেন, তুমি পাষাণময়ী বিলাপগীতি রচনা করিয়া গিয়াছ। পরবর্ত্তিগণের সে সাধ থাকিলেও বোধ করি সাধ্য নাই—তাহারা কেবল নিশাথনয়নজলে প্রিয়জনের পুণ্য-স্মৃতিটুকু ধুইয়া ধুইয়া আজীবন অমলিন করিয়া রাখে।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

নিশীথিনী।

সোনার সন্ধ্যার পরে এল রাত্রি, বিকাশিল তারা,
দিগন্ত মিলায় বনে, নভস্তল চন্দ্রকলাহারা।
কালো অন্ধকার যেন কালো এক ভ্রমর বিপুল
আবরিয়া বসিয়াছে মধুময় ধরণীর ফুল।
সেই আলো-প্রস্ফুটিত লক্ষদল কুসুম সুন্দর,
তারি 'পরে বিস্তারিয়া কালো ডানা, গভীর অম্বর

বিদারি', অতল মধু বিহ্বলিয়া করিতেছে পান,
ধরণী-গগনে লাগে মধুরস-জোয়ারের টান।
রসভরা বহে বায়ু বনস্পতিশাখায় সঞ্চরি,
রসাবেশে বনস্পতি আপনারে রেখেছে আবরি।
প্রান্তরের ক্ষুদ্রতম তৃণমুখে লাগিছে শিশির,
অতল নিদ্রার রসে ডুবে গেছে জীব ধরণীর।
সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই,
মনে হয় এ আঁধার একেবারে নহে রস বই!

৺সতীশচন্দ্র রায়।

হনুমান্।

যৌথ-পরিবারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং পত্নীর যেরূপ স্থান, ভৃত্য বা সচিবেরও সেই-রূপই একটি স্থান; এই বিচিত্র প্রীতির সম্বন্ধ ত্যাগের ভাবে মহিমান্বিত হইয়া গৃহধর্ম্মকে কিরূপ অখণ্ড সৌন্দর্য্য প্রদান করিতে পারে,—রামায়ণকাব্যে তাহা উৎকৃষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

হনুমান্ প্রথমত সুগ্রীবের সচিবরূপে রামলক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হন। ইনি সচিবোচিত সদ্‌গুণাবলীতে ভূষিত; ইঁহার প্রথম আলাপ শ্রবণ করিয়াই রাম মুগ্ধচিত্তে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—'এ ব্যক্তিকে ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বোধ হয়, ইহার বহুকথার মধ্যে একটিও অপশব্দ শ্রুত হইল না',—

"বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্।"

"ঋক্, যজু ও সামবেদে পারদর্শী না হইলে এভাবে কেহ কথা কহিতে পারে না। ইহার মুখ, চক্ষু ও ভ্রূ দোষশূন্য এবং কণ্ঠো-চ্চারিত বাণী হৃদয়হর্ষিণী।" অশোকবনে সীতার সঙ্গে পরিচয়ের প্রাক্কালে ইনি তাঁহার সহিত সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিবেন কি না—মনে মনে বিতর্ক করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইনি শাস্ত্রদর্শী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যই সচিবের প্রধান গুণ নহে—অটল প্রভুভক্তিও তাঁহার অত্যাবশ্যক গুণ।

সুগ্রীব বালির ভয়ে জগৎ ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। কোথায় প্রখরসৌরকরমণ্ডিত যবদ্বীপ, কোথায় রক্তিমাভ দুরতিক্রম্য লোহিতসাগরের খর্জ্জুর ও গুবাকতরুপূর্ণ বেলাভূমি, কোথায় বা দক্ষিণসমুদ্রের সীমান্ত-স্থিত স্থির অভ্রাবলীর ন্যায় পুষ্পিতকগিরি—পৃথিবীর নানা দিগ্দেশে ভীতচিত্তে সুগ্রীব

পর্য্যটন করিতেছিলেন। তখন যে কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী ছিলেন, তন্মধ্যে হনুমান্ সর্ব্বপ্রধান। সুগ্রীবের প্রতি অটল ভক্তির তিনি নানারূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হইয়া বানরসৈন্য এক সময়ে একান্ত হতাশ হইয়া পড়িল; সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না—সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট একমাসকাল অতীত হইয়া গিয়াছে—অতঃপর সুগ্রীবের আদেশে তাহাদের শিরশ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, এই শঙ্কায় বানরবাহিনী আকুল হইয়া উঠিল,—তাহারা পরিশ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসাতুর, নিরাশাগ্রস্ত এবং মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ভীত। পিপাসার তাড়নায় ইতস্তত পর্য্যটন করিতে করিতে তাহারা একস্থলে পদ্মরেণুরক্তাঙ্গ-চক্রবাক-দর্শনে এবং জল-ভারার্দ্র-শীতলবায়ু-স্পর্শে কোন জলাশয় অদূরবর্ত্তী বিবেচনায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাণের ভয় বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা বহুক্রোশ-ব্যাপী এক গভীর অন্ধকারগুহার মধ্যে জলান্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা পৃথিবীনিম্নে এক সাধুপুষ্পিত বাপীবহুল মনোরম রাজ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারিত হইলে, তাহারা প্রাণের আশঙ্কায় পুনরায় বিকল হইয়া পড়িল। তখন যুবরাজ অঙ্গদ ও সেনাপতি তার সমস্ত বানরবৃন্দকে সুগ্রীবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া গেলে ক্রূরপ্রকৃতি সুগ্রীবের হস্তে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত, এস আমরা এই সুরক্ষিত সুন্দর অধিত্যকায় সুখে বাস করি, আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।" সমস্ত বানরসৈন্য এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিল—"সুগ্রীব উগ্রস্বভাব এবং রাম স্ত্রৈণ। নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইয়াছে, এখন রামের প্রীতির জন্য সুগ্রীব অবশ্যই আমাদিগকে হত্যা করিবে।" হনুমান্ সুগ্রীবকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করাতে অঙ্গদ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন "যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসমা তৎপত্নীকে গ্রহণ করে, সে অতি জঘন্য. বালি এই দুরাচারকে রক্ষকরূপে দ্বারে নিয়োগ করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট প্রস্তরদ্বারা গর্ত্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, সুতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধর্ম্মজ্ঞ বলিব? সুগ্রীব পাপী, কৃতঘ্ন ও চপল, সে স্বয়ং আমাকে যৌবরাজ্য প্রদান করে নাই, বীর রামই আমার যৌবরাজ্যের কারণ। রামের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছিল—লক্ষ্মণের ভয়ে জানকীর অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আবার ধর্ম্মজ্ঞান কি? সে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে—এখন জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ আর তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। সে গুণবান্ বা নির্গুণ হউক, আমাকে সে হত্যা করিবে—আমি শত্রুপুত্র।"

অঙ্গদের এই সকল কথায় বানরগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাহারা ক্রমাগত বালির প্রশংসা ও সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।

এই উত্তেজিত সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে হনুমান্ অটলসঙ্কল্পারূঢ়। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"যুবরাজ, আপনি মনে করিবেন না,

এই বানরমণ্ডলী লইয়া এই স্থানে আপনি রাজত্ব করিতে পারিবেন। বানরগণ চঞ্চল-স্বভাব, তাহারা এখানে স্ত্রীপুত্রহীন হইয়া কখনই আপনার আজ্ঞাধীন থাকিবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এই জাম্ববান্, সুহোত্র, নীল এবং আমি,—আমাদিগকে আপনি সামদানাদি রাজগুণে কিংবা উৎকট দণ্ড দ্বারাও সুগ্রীব হইতে ভেদ করিতে পারিবেন না। আপনি তারের বাক্যে এই গর্ত্তে অবস্থান নিরাপদ্ মনে করিতেছেন, কিন্তু লক্ষ্মণের বাণে ইহার বিদারণ অতি অকিঞ্চিৎকর।”

বিপৎকালে এই ধৈর্য্য ও তেজ প্রকাশ করিয়া হনুমান্ বানরমণ্ডলীকে আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

হনুমান্ সুগ্রীবের শুধু আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্য ছিলেন না, সতত তাঁহাকে সুমন্ত্রণা এবং তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিয়া দিতেন। জগদ্ভ্রমণক্লান্ত সুগ্রীবকে ইনিই, মাতঙ্গমুনির আশ্রমসন্নিকটে ঋষ্যমূকপর্ব্বতে প্রবেশ বালির নিষিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বালিবধের পরে যখন বর্ষাক্ষয়ে শরৎকালের সূচনায় গিরিনদীসমূহ মন্থরগতি হইল—তাহাদের পুলিনদেশ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল, সেই সিকতাভূমিশোভী শ্যাম সপ্তচ্ছদতরুর তরুণ পল্লব এবং অসন ও কোবিদারবৃক্ষের কুসুমিত সৌন্দর্য্য গগনালম্বিত হইয়া গিরিসানুদেশে চিত্রপটের ন্যায় অঙ্কিত হইল, সেই সুখশরৎকালে কিষ্কিন্ধাপুরী রমণীগণের সমতালপদাঙ্কর তন্ত্রীগীতে বিলাসের পর্য্যঙ্কে সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল,—সুগ্রীবের শুভ্র প্রাসাদশেখর কাঞ্চীর নিস্বন এবং স্খলিত হেমসূত্রের হিল্লোলে স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কিষ্কিন্ধার গিরিগুহার একটি স্থানে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় কর্ত্তব্যের নির্ব্বচক্ষু জাগ্রত ছিল—তাহা বিলাসের মোহে ক্ষণেকের জন্যও আচ্ছন্ন হয় নাই, তাহা সতত প্রভুর হিতপন্থার প্রতি স্থিরলক্ষ্য ছিল। লক্ষ্মণের কিষ্কিন্ধাপ্রবেশের বহুপূর্ব্বে, শরৎকাল পড়িতে না পড়িতে, হনুমান্ সুগ্রীবকে রামের সঙ্গে তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সমস্ত বানরবাহিনীকে রামকার্য্যে সমবেত করিবার জন্য আদেশ বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। সে আদেশ এই—

> ত্রিপঞ্চরাত্রাদূর্দ্ধং যঃ প্রাপ্নুয়াদিহ বানরঃ।
> তস্য প্রাণান্তিকো দণ্ডো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

‘যে বানর পঞ্চদশ দিবসের পরে কিষ্কিন্ধার উপস্থিত হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে—ইহাতে আর বিচারবিবেচনা নাই।’

ইহার পরে রোষস্ফুরিতাধরে লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলেন। বিলাসী সুগ্রীব বিপৎ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি না করিয়া ক্রূরকটাক্ষে অঙ্গদের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—

> ন মে দুর্ব্যাহৃতং কিঞ্চিন্নাপি মে দুরনুষ্ঠিতম্।
> লক্ষ্মণো রাঘবভ্রাতা ক্রুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে॥
> ন খল্বস্তি মম ত্রাসো লক্ষ্মণান্নাপি রাঘবাৎ।
> মিত্রং ত্বস্থানকুপিতং জনয়ত্যেব সম্ভ্রমম্॥
> সর্ব্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্॥”

“আমি কোনরূপ অন্যায় আচরণ বা দুর্ব্যবহার করি নাই; রামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ কেন ক্রোধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। লক্ষ্মণ হইতেই কি, রাম হইতেই কি,

আমার ত ভয় করিবার কিছু নাই; তবে বিনা কারণে মিত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এইমাত্র আশঙ্কা। মিত্রলাভ অতিসুলভ, কিন্তু মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন।'

তখন বড় বিভ্রাট দেখিয়া হনুমান্ কাম-বশীভূত সুগ্রীবকে অদূরস্থ পুষ্পিত-সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষ দেখাইয়া শরৎকালের আবির্ভাব বুঝাইয়া দিলেন—"রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আর্ত্ত, তাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, আপনি প্রতিশ্রুতিপালনে তৎপর হন নাই তাঁহারা দুঃখে পড়িয়া ক্রোধের কথা বলিলে তাহা আপনার গণ-নীয় নহে। আপনি পরিবারবর্গের ও নিজের যদি কুশল চান, লক্ষ্মণের পদে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন, নতুবা তাঁহার শরে কিষ্কিন্ধা বিনষ্ট হইবে।" হনুমানের বাক্যে আতঙ্কিত হইয়া সুগ্রীব স্বীয়-কণ্ঠ-বিলম্বিত ক্রীড়ামাল্য ছেদন করিয়া ফেলি-লেন এবং লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, হনুমান্ সুগ্রীবকে শুভমন্ত্রণাদ্বারা অন্যায়পথ হইতে সাবধানে রক্ষা করিতেন,—শুধু আদেশ শ্রবণ ও অনুমোদন করিয়া যাইতেন না। এদিকে সুগ্রীবের বিরুদ্ধে কোন ষড়্‌যন্ত্র হইলে একাকী তিনি একশতের মত দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া তাহা নিবারণ করিতেন—সুগ্রীবের বিপৎ-কালে তাঁহার সমস্ত ক্লেশের সমধিকভাগ নিজে বহন করিতেন,—কিষ্কিন্ধার বিলাসহিল্লোল তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যে বদ্ধলক্ষ্য চক্ষু ক্ষণেকের জন্যও বিলাসমোহাচ্ছন্ন হইতে দিতেন না।

সুগ্রীবের এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভৃত্য, শাস্ত্রদর্শী শুভাকাঙ্ক্ষী সচিব, রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেই তাঁহার গুণমুগ্ধ ও একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন।

রামলক্ষ্মণকে প্রথম দর্শন করিয়াই তাঁহার যে হৃদয়োচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রথম আলাপেই প্রকাশ পাইতেছে—

"বিশাল চক্ষুর দৃষ্টিতে পম্পাতীরবর্ত্তী বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন—আপনারা কে? আপনাদের বাহু আয়ত, সুবৃত্ত ও পরিঘোপম;—আপনারা দুইজনে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ। আপনা-দের সুলক্ষণ দেহ সর্ব্বভূষণধারণযোগ্য—আপনারা ভূষণহীন কেন?"

রাম-সুগ্রীবের মৈত্রী স্থাপিত হইল। সুগ্রীব যখন সমস্ত সৈন্য সীতার অন্বেষণে প্রেরণ করেন, তখন রাম হনুমান্‌কে স্বীয়-নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি অভিজ্ঞানস্বরূপ সীতার জন্য দিয়াছিলেন, তাঁহার মন তাঁহাকে বুঝা-ইয়া দিয়াছিল এ কার্য্যে হনুমান্‌ই সফলতা লাভ করিবেন।

নানাদিদেশ ঘুরিয়া সৈন্যবৃন্দ সীতার কোন খোঁজই পাইল না; বন্ধুর পর্ণপুষ্পহীন এক গিরিগুহা অতিক্রম করিয়া তাহারা সমুদ্রের তীরে উপনীত হইল। এই সময়ে তাহারা অনশনে প্রাণত্যাগ সঙ্কল্প করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল,—সহসা জটায়ুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি তাহাদিগকে সীতার সন্ধান বলিয়া দিল—সীতা দূর সমুদ্রের পারে লঙ্কাপুরীতে আছেন, বানরগণের মধ্যে কেহ সেইখানে না গেলে সীতার সংবাদ পাওয়া অসম্ভব।

সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তাহারা বিস্ময়ে, ভয়বিহ্বলচক্ষে অপার জলরাশি দেখিতে লাগিল। মেঘের সঙ্গে চূর্ণতরঙ্গ মিশিয়া গিয়াছে—সীমাহীন বিশাল সরিৎপতির তাণ্ডব-নর্ত্তন দুব-পাটল-আকাশস্পর্শী, উন্মাদনময় ফেনিল আবর্ত্তরাশি। তাহারা ভয়ব্যথিত হইয়া পড়িল,—কে এই অবধিশূন্য মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবে? শরভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ একে একে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং অস্ফুটবাক্ অনন্ত জলরাশির কলকল্লোল শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। অঙ্গদ দাঁড়াইয়া বলিলেন—"পরপারে যাইতে পারি, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিব কি না, সন্দেহ।" নৈরাশ্যবিহ্বল ভয়গ্রস্ত বানরবাহিনী সমুদ্রোপকূলে সমবেত হইয়া যে যাহার পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে লাগিল, কিন্তু সেই অনিলোদ্ধত ভ্রান্ত উর্ম্মিসঙ্কুল বিপুল জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার সাধ্য কাহারও নাই—ইহাই বিদিত হইল। বানরসৈন্যের মধ্যে হনুমান্ মৌনভাবে এক স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, বানরগণের নানা আশঙ্কা ও বিক্রমসূচক আলাপ তিনি নিঃশব্দে শুনিতেছিলেন নিজে কোন কথাই বলেন নাই; জাম্ববান্ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"বীর বানরলোকস্য সর্ব্বশাস্ত্রবিদাং বর।
তূষ্ণীমেকান্তমাশ্রিত্য হনুমন্ কিং ন জল্পসি॥

"বানরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তার বরণীয় হনুমন্, তুমি একান্ত মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছ কেন? এই বিষণ্ণ সৈন্যদিগকে আর কে উৎসাহ দিয়া কথা বলিবে—তুমি ভিন্ন এ কার্য্যের ভার আর কে লইতে পারে?"

হনুমান্ শুধু আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এ কার্য্য যে তাঁহারই,—তিনি তাহা জানিতেন। জাম্ববানের কথার উত্তর না দিয়া তিনি সচল হিমাচলের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে সমুত্থান করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অসীম সাহস ও স্বীয়শক্তিতে বিপুল আস্থা তাঁহার ললাটে একটি প্রদীপ্ত শিখা অঙ্কিত করিয়া দিল।

কি ভাবে তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কবিকল্পনায় জড়িত হইয়া আমাদের চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বহুক্রোশব্যাপী সমুদ্র তিনি বহু কৃচ্ছ্র ও বিপদ্ সহ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—তিনি পথে বিশ্রামের জন্য মৈনাকপর্ব্বতের রম্য একটি শৃঙ্গ সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুকার্য্য সম্পাদন না করিয়া বিশ্রাম করিতে তিনি ইচ্ছা করেন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন—

"যথা রাঘবনির্ম্মুক্তঃ শরঃ শ্বসনবিক্রমঃ।
গচ্ছেৎ তদ্বৎ গমিষ্যামি লঙ্কাং রাবণপালিতাম্॥"

প্রকৃতই তিনি রামকরনির্ম্মুক্ত শরের ন্যায় লঙ্কাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন। রামের ইচ্ছার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহের ন্যায় আশুগতি হনুমান্ লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

লঙ্কায় পৌছিয়া হনুমান্ সরল, খর্জ্জুর ও কর্ণিকারবৃক্ষপূর্ণ বেলাভূমির অদূরে রক্তবর্ণ প্রাচীরের উর্দ্ধে সপ্ততল হর্ম্ম্যরাজির উচ্চশীর্ষ দেখিতে পাইলেন। পর্ব্বতশীর্ষস্থিত দুর্গম লঙ্কাপুরীর অতুল বৈভব ও বিক্রম এবং দুর্গাদির সংস্থান দেখিয়া হনুমান্ ভীত হইলেন। যে উৎসাহে তিনি পুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে উৎসাহ যেন সহসা দমিয়া গেল,

সুরক্ষিত লঙ্কার প্রভাব দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার মুখে সহসা আশ-ঙ্কার কথা উচ্চারিত হইল—

"ন হি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কা শক্যা জেতুং সুরৈরপি।
ইমান্তুবিষমাং লঙ্কাং দুর্গাং রাবণপালিতাম্।
প্রাপ্যাপি সুমহাবাহুঃ কিং করিষ্যতি রাঘবঃ ॥"

'এই লঙ্কা দেবগণও যুদ্ধে জয় করিতে পারেন না। রাবণরক্ষিত এই দুর্গম, ভীষণ লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়াই বা কি করিবেন।' যাহার ধ্রুব বিশ্বাস—

"ন হি রামসমঃ কশ্চিদ্বিদ্যেত ত্রিদশেষ্বপি

—'দেবগণের মধ্যেও কেহ রামের তুল্য নহেন', তাঁহার অটল বিশ্বাসের মূলে যেন একটা আঘাত পড়িল। লঙ্কার বহির্দ্দেশে সুগন্ধি নীপ, প্রিয়ঙ্গু ও করবীতক যেখানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভিত ছিল, হনুমান্ সেই দিকে চাহিয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রাত্রিকালে রাবণের শয্যাগৃহে যখন তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় তিনি চোরের ন্যায় সন্তর্পণে দেখিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার নির্ভীক চিত্তে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। হস্তিদন্তনির্ম্মিত উজ্জ্বলস্বর্ণমণ্ডিত খট্বায় মহার্ঘ আস্তরণ বিস্তারিত, তাহার এক পার্শ্বে শুভ্র চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় একটি ছত্র—তন্নিম্নে মহাবলশালী উগ্রমূর্ত্তি রাবণ প্রসুপ্ত—তাহাকে দেখিয়া—

" * * * পরমোদ্বিগ্নঃ সোঽপাসর্পৎ সুভীতবৎ।"

উদ্বিগ্নভাবে হনুমান্ ভীতচিত্তে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। অশোকবনে সীতার সম্মুখে উপস্থিত রাবণকে দেখিয়াও তাঁহার মনে এইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল—

"স তথাপ্যুগ্রতেজাঃ সন্ নির্ধূতস্তস্য তেজসা।
পত্রে গুহ্যান্তরে সক্তো মতিমান্ সংবৃতোঽভবৎ।"

উগ্রমূর্ত্তি রাবণের তেজে তাড়িত হইয়া তিনি শিংশপাবৃক্ষের শাখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। কোন মহাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পাক্কালে, উদ্দেশ্যের বিরাট্ ভাব এবং প্রবল প্রতিপক্ষের কথা মনে করিয়া সময়ে সময়ে এইরূপ ভয় হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু হনুমানের উন্নত কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে শীঘ্রই উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। তাঁহার লঙ্কাপ্রবিশনব্যাপারে তিনি কত চিন্তা ও ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, বাল্মীকি তাহার ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন।

প্রকাশ্যভাবে, তাহার বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং বৈদেহীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইতে পারে—

"ঘাতয়ন্তীহ কার্য্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।"

পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে অনেক সময়ে দূতগণ কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে সুতরাং স্পর্দ্ধা পরিত্যাগপূর্ব্বক ছদ্মবেশে তিনি রাত্রিকালে লঙ্কা অনুসন্ধান করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শনৈঃশনৈ নিশীথিনী আসিয়া লঙ্কার প্রতি বিলাসপ্রকোষ্ঠে প্রমোদদীপাবলী জ্বালিয়া দিল; হনুমান্ রাবণের বিশাল পুরীতে রমণীবৃন্দের বিচিত্র আমোদপ্রমোদ প্রত্যক্ষ করিলেন। পানশালায় শর্করাসব, ফলাসব, পুষ্পাসব প্রভৃতি বিবিধপ্রকার সুরা বৃহৎ স্বর্ণভাজনে সজ্জিত ছিল; রাবণ এবং তাহার স্ত্রীগণ কুক্কুটের মাংস, দধিসিক্ত বরাহমাংস কতক আহার করিয়া কতক ফেলিয়া রাখিয়াছে; অম্ল ও লবণপাত্র এবং নানা-

প্রকার অদ্ধভক্ষিত ফল চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; নৃত্যগীতক্লান্তা অঙ্গনাগণের অলস-লুলিত দেহ হইতে বসন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, নানাস্থান হইতে আহৃত রমণীবৃন্দ পরস্পরের ভুজসূত্রে গ্রথিত হইয়া বিচিত্র-কুসুমখচিত মাল্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে ; একটু দূরে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা লঙ্কাপুরীশ্বরী প্রসুপ্তা মন্দোদরীর স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় কান্তি দেখিয়া মনে করিলেন, এই সীতা। তাঁহার চেষ্টা কৃতার্থ হইল ভাবিয়া তিনি আহ্লাদে সাশ্রুনেত্র হইলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, রামবিরহিতা সীতা এভাবে সুপ্তা থাকিতে পারেন না, এরূপ ভূষণ ও পরিচ্ছদ, এরূপ সৌম্য শান্তির ভাব পতিপরায়ণা সীতার পক্ষে অসম্ভব। আবার হনুমান্ বিমর্ষ হইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। কোনস্থানেই তিনি নাই। হায়, সীতা কি রাবণকর্ত্তৃক হৃতা হইবার সময় স্বর্গের একটি স্খলিত মুক্তাহারের ন্যায় সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন, অথবা পঞ্জরাবদ্ধ শারিকার ন্যায় অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ? রাবণের উৎপীড়নে হয় ত বা তিনি আত্মহত্যা করিয়া থাকিবেন। যে রামচন্দ্র তাঁহার শোকে উন্মত্ত হইয়া অশোকপুষ্পগুচ্ছকে আলিঙ্গন দিতে ধাবিত হন, রাত্রিদিন যাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই, স্বপ্নেও যাঁহার মুখ হইতে 'সীতা' এই মধুরবাক্য নিঃসৃত হয়, সেই বিরহবিধুর প্রভুর নিকট হনুমান্ কি বলিয়া উপস্থিত হইবেন ? উর্ম্মিময় ক্রীড়োন্মত্ত মহাবারিধির বেলাভূমিতে যে বিপুল বানরবাহিনী তাঁহার মুখ হইতে সীতার সংবাদ পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আকাশপানে তাকাইয়া আছে —তাহাদের নিকট তিনি যাইয়া কি বলিবেন ? অনুসন্ধানশ্রান্ত হনুমানের মনের উপর নৈরাশ্যের একটা প্রবল আবর্ত্ত আসিয়া পড়িল, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আশা আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইল ; হনুমান্ লঙ্কার বিচিত্র হর্ম্ম্যসমূহ ও বিচিত্র কাননরাজি পুনরায় পর্য্যটন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, আশার মৃতমন্ত্রে যেন তিনি পুনরায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। রক্ষঃপ্রাসাদের সমস্ত স্থান তিনি তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। রক্ষঃপুরীর বিশালতা তাঁহার নিকট শূন্যময় বলিয়া বোধ হইল। কোথায়ও সীতা নাই—সীতা জীবিত নাই,- হনুমান্ গভীর-নৈরাশ্য-মগ্ন হইয়া ক্লান্ত-পাদক্ষেপে কোথায় যাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। "রাজপুত্রদ্বয় এবং বানর-বাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে, আমি তাহাদের উন্নত আশামঞ্জরী ছিন্ন করিতে পারিব না। রামচন্দ্র নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, লক্ষ্মণ স্বীয় অগ্নিতুল্য শরদ্বারা নিজে ভস্মীভূত হইবেন—সুগ্রীবের মৈত্রী বিফল হইবে ;—আমার প্রত্যাগমনে এই সকল বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী।" এই ভাবিয়া হনুমান্ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন ; কখনও বা রাবণকে বধ করিবার জন্য ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, —কখনও বা স্থির করিলেন—

"চিতাং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি।"

'প্রজ্বলিত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিব' ; "কিংবা সাগরোপকূলে অনশনে দেহত্যাগ করিব,"—

"শরীরং ভক্ষয়িষ্যন্তি বায়সাঃ শ্বাপদানি চ।"

'আমার শরীর কাক ও শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিয়া

ফেলিবে।' কখনও বা ভাবিলেন, "আমি বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক বনে বনে জীবন কাটাইব।"

প্রভুর কার্য্য অথবা কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের যে ব্যগ্রতা হনুমানের চরিত্রে দৃষ্ট হয়, অন্য কোথায়ও তাহা দেখা যায় না। রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন--

'যোহি ভৃত্য নিযুক্তঃ সন ভর্ত্তৃকর্ম্মণি দুষ্করে।
কুর্য্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্॥'

'যিনি প্রভুকর্ত্তৃক দুষ্কর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগের সঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ করেন, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ। হনুমান্ প্রাণপণে এবং অনুরাগের সহিত রামের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রভুসেবার এই উন্নত আদর্শ ধর্ম্মভাবে পরিণত হইয়া থাকে। হনুমান্ বিপুল শারীরিক শ্রম পণ্ড হইল দেখিয়া অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধনে চেষ্টিত হইলেন।

"আমি নৈরাশ্যমগ্ন হইলে বহু ব্যক্তির আশা বিফল হইবে। বহু ব্যক্তির শান্তিসুখ আমার সফলতার উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং চিতাপ্রবেশ বা বানপ্রস্থ অবলম্বন আমার পক্ষে উচিত হয় না। আমার উপর যে সুমহান্ ন্যাস অর্পিত, তাহার সাধনে যেন আমার কোন ত্রুটি না হয়।" "সুতরাং,

"ইহৈব নিয়তাহারো বৎস্যামি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।"

'এই স্থানেই আমি ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক সংযতাহারী হইয়া প্রতীক্ষা করিব।' তখন করজোড়ে হনুমান্ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ মৃদু বিকম্পিত হইয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করিল—

"নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্রযমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নিমরুদ্গণেভ্যঃ॥"

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রুদ্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতিকে নমস্কার করিলেন এবং—"নমস্কৃত্য সুগ্রীবায় চ"—সুগ্রীবকে নমস্কার করিয়া ধ্যানিবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। তখন হনুমান্ স্বীয় হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইলেন। এবার তিনি হৃষ্টমনে সীতাকে খুঁজিতে অশোকবনে প্রবেশ করিলেন।

এস্থানে হনুমান্ সাধারণ ভৃত্য নহেন—সাধারণ সচিব নহেন, এস্থানে তিনি প্রভুভক্তির সিদ্ধতপস্বী, তপঃপ্রভাব তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল। রাবণের অন্তঃপুরে তিনি যখন দেখিতে পাইলেন, স্খলিতহারা কোন রমণী অদ্ধনগ্নদেহে অপর একটি সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, কোন সুলক্ষণা রমণীর দেহযষ্টি হইতে চেলাঞ্চল উড়িয়া গিয়াছে—নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাসবেগে কাহারও সুবৃত্ত বক্ষোজযুগল আন্দোলিত হইতেছে, আবার কোন রমণী ভুজান্তরসংলগ্ন বীণাকে গাঢ়রূপে পরিরম্ভণ করিয়া অসংবৃত কেশপাশে প্রসুপ্তা হইয়া আছে—তখন,

"জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্ম্মসাধ্বসশঙ্কিতঃ।
পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্।"

অন্তঃপুরের প্রসুপ্তপরস্ত্রী দর্শনে ধর্ম্ম লুপ্ত হইল, এই চিন্তায় হনুমান্ অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

"ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্ম্মলোপং করিষ্যতি।"

আজ নিশ্চয়ই আমার ধর্ম্ম লুপ্ত হইল—এই আশঙ্কায় হনুমান্ বিকল হইলেন; কিন্তু তিনি তন্নতন্ন করিয়া স্বহৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন—তথায় কোন কলঙ্কের রেখা পড়ে নাই।

"ন তু মে মনসা কিঞ্চিৎ বৈকৃত্যমুপপদ্যতে।"
"মনো হি হেতুঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তনে।
শুভাশুভাস্ববস্থাসু তচ্চ মে সুব্যবস্থিতম্॥"

'আমার চিত্তে বিকারের লেশ নাই, মনই ইন্দ্রিয়গণের পাপপুণ্যের প্রবর্ত্তক, কিন্তু আমার মন শুভসঙ্কল্পে দৃঢ়।'—"আর বৈদেহীকে অনুসন্ধান করিতে হইলে, রমণীবৃন্দের মধ্যেই করিতে হইবে—তাহার উপায়ান্তর নাই।"

এই তাপসচরিত্র রামকার্য্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্যসিদ্ধির ইহাই প্রাক্-সূচনা। হনুমান্ অশোকবনে সীতার ম্লান, উপবাসশীর্ণ, ক্লিন্নকাষায়বাসিনী মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন রাবণ সহস্র রূপে শক্তিসম্পন্ন হউক—তাহার রক্ষা নাই। ইনি লঙ্কার পক্ষে কালরজনীস্বরূপিণী—রামের অমোঘ বাণ যদি প্রভাবশূন্য হয়, এই সাধ্বীর তপস্তেজ তাহাতে তীক্ষ্ণতা প্রদান করিবে। সীতা আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থা

অপর সহায় উপলক্ষ্যমাত্র, সীতা—"রক্ষিতা স্বেন শীলেন।" ধর্ম্মনিষ্ঠ হনুমান্ ধর্ম্মবল কি, তাহা জানিতেন; এইজন্যই সীতাকে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত আশঙ্কা দূরীভূত হইল,—আত্মপক্ষের বলের উপর প্রবল আস্থা জন্মিল।

এই নৈতিক পবিত্রতা আমরা কিষ্কিন্ধা হইতে প্রত্যাশা করি নাই। যেখানে বালির ন্যায় মহিমান্বিত রাজা স্বীয় কনিষ্ঠের বধূকে হরণ এবং স্ত্রীঘটিত কলহে লিপ্ত হইয়া দুন্দুভিকে হত্যা করেন, যেখানে রামসখা মহাপ্রাজ্ঞ সুগ্রীব জ্যেষ্ঠের জীবিতকালেই সেই জ্যেষ্ঠের পত্নীকে স্বীয় প্রমোদশয্যায় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যেখানে পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়া অতিরিক্ত পানে মুক্তলজ্জা তারা সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই—সেই কিষ্কিন্ধাপুরীতে উগ্রতপা, তীক্ষ্ণনৈতিকবুদ্ধিসম্পন্ন, কর্ত্তব্যকার্য্যে সতত জাগ্রতচক্ষু, কলুষহীন, বিলাসলেশবর্জ্জিত ও বিপদে অকুণ্ঠিত দাস্যভক্তির অবতার হনুমানকে আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, নানাপ্রকারে সীতার অনুসন্ধান করিয়াও যখন হনুমান্ বিফল হইলেন, তখন তিনি অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন। দৈহিক শ্রম পণ্ড হইয়াছিল। তখন উন্নতকর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তিনি তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, এই বৃত্তির উন্মেষ করিবার উপযোগী সাধনা ও পবিত্র জীবন তাঁহার ছিল।

তিনি এবার প্রফুল্ল, তাঁহার শ্রম এবার সার্থক হইবে,—সাফল্যের পূর্ব্বভরসা তিনি মনে মনে পাইলেন। অশোকবনে যাইয়া তিনি শিংশপাবৃক্ষ হইতে সীতাকে প্রথম দেখিতে পাইলেন,—সীতা সুখার্হা অথচ দুঃখসন্তপ্তা, মণ্ডনার্হা অমণ্ডিতা, তিনি উপবাসকৃশা, পঙ্কদিগ্ধ পদ্মিনীর ন্যায়—"বিভাতি ন বিভাতি চ"—প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন না;—তাঁহার দুটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, পরিধান ছিন্ন কৌষেয়বাস,—তাঁহার চতুর্দ্দিকে উৎকট স্বপ্নের ন্যায় একাক্ষী, শঙ্কুকর্ণা, লম্বিতস্তনী, ধ্বস্তকেশী, বিকট রাক্ষসীমূর্ত্তি,—নারকীয় পরিবার যেন একটি স্বর্গীয় সুষমাকে পরিবেষ্টন করিয়া

রহিয়াছে—কিন্তু সেই দীনা তাপসীমূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব ধৈর্য্য সূচিত।

"নাত্যর্থং ক্ষুভ্যতে দেবী গঙ্গেব জলদাগমে।"

'জলদাগমে গঙ্গার ন্যায় ইনি ক্ষোভরহিত।' যখন রাক্ষসীরা আসিয়া কেহ শূল দ্বারা তাঁহার প্লীহা উৎপাটন করিতে চাহিল,—হরিজটা, বিকটা, বিনতা প্রভৃতি বিরূপ চেড়ীবৃন্দের মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে "মুষ্টিমুদ্যম্য তর্জ্জতি", কেহ বা "ভ্রাময়তি মহৎ শূলং"—কেহ কেহ বা মাংস-লোলুপ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইয়া তাণ্ডবলীলা প্রকট করিতে লাগিল, তখন একবার সীতার সেই সুগম্ভীর ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল,—তিনি "ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য রোদিতি,"—ধৈর্য্যত্যাগ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার যখন রাবণ নানাপ্রকার লোভপ্রদর্শনেও তাঁহাকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া মুষ্টিপ্রহার করিতে অগ্রসর হইল—ধান্যমালিনী আসিয়া রাবণকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল তখনও সীতার ধৈর্য্য অপগত হইল, রক্ষোহস্তে অপমানিতা সীতা ধূলিলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু এই উৎকট বিপদ্‌রাশির মধ্যেও তিনি পবিত্র যজ্ঞাগ্নির ন্যায় স্বীয় পুণ্যপ্রভায় দীপ্ত ছিলেন, তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখে স্বর্গের তেজ স্ফুরিত হইতেছিল। হনুমান্ এই বিপন্না সাধ্বীর প্রতি পূজকের ন্যায় ভক্তির চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

হনুমান্ শিংশপাবৃক্ষারূঢ় ছিলেন, কি উপায়ে সীতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন, প্রথমত তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। হঠাৎ উপস্থিত হইলে সীতা তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইবেন, রাক্ষসগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবে—তাঁহার সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই সমূহ গোলযোগ উৎপন্ন হইবে। চেড়ীগণ যখন ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিবার জন্য সীতাকে ছাড়িয়া একটু দূরে গিয়াছে, শেষ রজনীতে বিনিদ্র সীতা অশোকতরুর শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সুকেশীর বক্র কেশগুচ্ছ তাঁহার কর্ণান্তভাগে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন হনুমান্ শিংশপা-বৃক্ষ হইতে মৃদুস্বরে রামের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; সহসা অনির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে আশাতীতরূপে প্রিয় রামকথা শুনিয়া সীতার গণ্ড বাহিয়া অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল। তিনি স্বীয় সুন্দর মুখমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া অশ্রুপূর্ণচক্ষে শিংশপাবৃক্ষের ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন—তাঁহার কৃষ্ণ ও বক্র কেশান্ত নিবিড়ভাবে তাঁহার মুখপদ্ম ঘিরিয়া পড়িল।

হনুমান্ এই সুযোগে করজোড়ে বলিতে লাগিলেন--

"কা নু পদ্মপলাশাক্ষি ক্লিষ্টকৌশেয়বাসিনি।
দ্রুমস্য শাখামালম্ব্য তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতে॥
কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি স্রবতি শোকজম্।
পুণ্ডরীকপলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণমিবোদকম্॥"

'হে পদ্মপলাশাক্ষি, ক্লিষ্টকৌষেয়বাসিনি, অনিন্দিতে, আপনি কে, অশোকের শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন? পদ্মপলাশদলের ন্যায় আপনার দুইটি সুন্দর চক্ষু অশ্রুবর্ষণ করিতেছে কেন?'

সীতা নিজের পরিচয় দিয়া হনুমান্‌কে নিম্নে অবতরণ করিতে ইঙ্গিত করিলে, হনুমান্ তাঁহার দৌত্যের কথা সীতাকে জ্ঞাপন করিলেন।

কিন্তু হনুমান্‌কে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া রাবণভ্রমে সীতা আতঙ্কিত হইলেন; তাঁহার কুন্দশুভ্র অঙ্গুলিগুলি অশোকের শাখা ছাড়িয়া দিল; তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; সেই ভয়ের মধ্যেও তিনি একটু আনন্দ পাইয়াছিলেন, একএকবার মনে করিতেছিলেন, ইঁহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত হৃষ্ট হইতেছে কেন?

হনুমান্ তখন তাঁহার প্রতীতির জন্য রামের সমস্ত ইতিহাস তাঁহাকে শুনাইলেন - শ্যামবর্ণ রাম এবং "সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণের দেহ-সৌষ্ঠব সমস্ত বর্ণন করিলেন—তখন সীতার বিশ্বাস হইল, হনুমান্ রামের দূত। বিপৎ-সমুদ্রে পতিতা সীতা সেই শেষরাত্রে যেন কূল পাইলেন,—আশার নক্ষত্র কালরজনী ভেদ করিয়া কিরণদান করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সীতা হনুমান্‌কে শতশত প্রশ্ন করিলেন, রামের কার্য্যকলাপ, তাঁহার অভিপ্রায়—সমস্ত জানিয়া সীতা পুলকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হনুমানের নিকট রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ছিল—তাহা তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ আনিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি তাহা দেন নাই। সাধারণ দূত সেই অঙ্গুরীয়ক দ্বারাই কথোপকথনের মুখবন্ধ করিত, কিন্তু হনুমান্ সেই বাহ্যচিহ্নের উপর ততটা মূল্য আরোপ করেন নাই। তাঁহার পরিচয়ে সীতার সম্পূর্ণ প্রতীতি উৎপাদন করিয়া শেষে অঙ্গুরীয়কটি দিয়াছিলেন।

সীতাকে তিনি পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া যাইবেন, এই প্রস্তাব করিলে সীতা স্বীকৃতা হইলেন না,—কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি হনুমানের প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইল।

সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞানস্বরূপ চূড়ামণি লইয়া তিনি বিদায় হইলেন, কিন্তু রাবণের সৈন্যবল, সভা ও মন্ত্রণাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে সমস্ত তথ্য অবগত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা তিনি উচিত মনে করিলেন না। এ সম্বন্ধে সুগ্রীব কি রাম তাঁহাকে কোন উপদেশই দেন নাই—তথাপি তাঁহার দৌত্য সম্পূর্ণরূপে সফল করিবার জন্য রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক মনে করিলেন। তিনি যদি তস্করের মত ফিরিয়া যান, তবে তাঁহার জগজ্জয়ী মহাপ্রতাপশালী প্রভু রামচন্দ্রের ভৃত্যের যোগ্য কার্য্য করা হয় না, এই ভাবিয়া তিনি অশোকবনের তরুলতা উৎপাটন করিয়া লঙ্কাবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা যাইয়া রাবণকে সংবাদ দিল, "কে এক মহাশক্তিধর বীর অশোকবন ভগ্ন করিয়া রাক্ষসগণকে ভয় দেখাইতেছে—সীতার সঙ্গে সে বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াছে।" রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিল,—বহু রাক্ষসসৈন্য নষ্ট করিয়া হনুমান্ ধরা দিলেন। রাবণের সভায় আনীত হইলে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল—তিনি বিষ্ণু, ইন্দ্র, কিংবা কুবের, ইঁহাদের মধ্যে কাহার দূত?

হনুমান্ বলিলেন -

"ধনদেন ন মে সখ্যং বিষ্ণুনা নাস্মি চোদিতঃ।"
"কেনচিদ্রামকার্য্যেণ আগতোঽস্মি তবান্তিকম্।।"

'কুবেরের সঙ্গে আমার সখ্য নাই, বিষ্ণুও আমাকে পাঠান নাই, আমি রামের কোন কার্য্যের জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।'

এই সভায় রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল প্রতাপ দেখিয়া হনুমান্ বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ নির্ভীকভাবে তিনি রাবণকে ধর্ম্ম সঙ্গত উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ অবহেলা করিলে লঙ্কার ভাবী বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া রাবণপ্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের জন্য যেরূপ অবিচলিত সাহসে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাহাতে আমরা তাঁহার কর্ত্তব্য-কঠোর অটলসঙ্কল্পারূঢ় মূর্ত্তির আভাস পাইয়া চমৎকৃত হই। তিনি ত্রিলোকবিজয়ী সম্রাটের সম্মুখে ধর্ম্মের কথা ধর্ম্মযাজকের মত কহিয়াছিলেন,—পরিণামদর্শী বিজ্ঞের ন্যায় ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন এবং ফলাফল তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠার দৃঢ়-ভিত্তিতে বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, ক্রুদ্ধ রাবণ যখন তাঁহার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করিল, তখনও তাঁহার উজ্জ্বল উদগ্ররূপ অবিচলিত ছিল,—তাহার প্রশস্ত ললাট একটুও ভয়কুঞ্চিত হয় নাই। বিভীষণের উপদেশে তাহার অপরপ্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইল।

হনুমান্ যখন সাগর অতিক্রম করিয়া তাঁহার পথপ্রেক্ষী বানরমণ্ডলীর নিকট সীতার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই নিরাশাবিশীর্ণ মৃতকল্প কপিকুল এক বিশাল আনন্দকলরবে জাগিয়া উঠিল, তাহারা নাচিয়া-গাহিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল।

হনুমান্ বহুকষ্ট সহ্য করিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন। আজ একদিনের জন্য বন্ধুগণের সঙ্গে আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিলেন,—সেই আনন্দোচ্ছ্বাসে সমুদ্রের উপকূল টল্‌মল্ করিতে লাগিল। সুগ্রীবের আদেশ-রক্ষিত মধুবনে যাইয়া তাহারা একটি প্লাবন বা ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় পতিত হইল, মধুবনপ্রহরী দধিমুখ বানর তাহাদিগকে বাধা দিতে যাইয়া প্রহার-জর্জ্জরিতদেহে পলায়ন করিল।

তখন হনুমান্ একদিনের জন্য বন্ধুজনের সঙ্গে মধু খাইয়া উন্মত্ত হইলেন। সকলে মিলিয়া তাহারা উৎসবের দিন কিভাবে কাটাইয়াছিল, বাল্মীকি তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

> 'গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ
> নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।—

'কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ বা প্রণাম করিতে লাগিল।'

হনুমান্ লঙ্কায় শুধু সীতাকে দেখিয়া আইসেন নাই, তিনি রামকে লঙ্কার যে সকল অবস্থা জানাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার সূক্ষ্মদৃষ্টি সূচিত হইয়াছে। হনুমান্ জিজ্ঞাসিত হইয়া রামকে লঙ্কাসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

"লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বদ্ধ ও অর্গলযুক্ত, উহার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে। ঐ দ্বারে বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্রসকল সংগৃহীত রহিয়াছে। উপস্থিত হইবামাত্র প্রতিপক্ষসৈন্য তদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বারে যন্ত্রসজ্জিত লোহময় শত শত শতঘ্নী আছে। লঙ্কার চতুর্দ্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর, উহা মণিরত্নখচিত ও দুর্লঙ্ঘ্য। উহার পরই একটি ভয়ঙ্কর পরিখা আছে। উহা অগাধ ও নক্রকুম্ভীরপূর্ণ। প্রত্যেক দ্বারে এক একটি

বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা যন্ত্র-লম্বিত, শত্রুসৈন্য উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্রদ্বারা সেতু রক্ষিত হয় এবং ঐ যন্ত্রবলেই তাহারা পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। লঙ্কায় নদীদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ ও চতুর্ব্বিধ কৃত্রিম দুর্গ আছে। ঐ পুরী দূরপ্রসারিত সমুদ্রের পারে। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুর্দ্দিক্ নিরুদ্দেশ।"

হনুমান্ গুণীর সম্মান জানিতেন। রাবণকে দেখিয়া হনুমানের মনে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল। তাহার ধর্ম্মশূন্যতাদর্শনে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সচল হিমাদ্রির ন্যায় সমুন্নতদেহ রাক্ষসরাজের প্রতাপ দেখিয়া হনুমান বলিয়া উঠিয়াছিলেন

'অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্ব্বলক্ষণযুক্ততা॥
যদ্যধর্ম্মো ন বলবান স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বর।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা॥

'ইঁহার কি অপূর্ব্ব রূপ, কি ধৈর্য্য, কি শক্তি, কি কান্তি, সর্ব্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ। যদি ইনি অধর্ম্মশীল না হইতেন, তবে সমস্ত দেবতারা, এমন কি ইন্দ্রও, ইঁহার আশ্রয়ভিক্ষা করিতে পারিতেন।' রামচন্দ্রকে হনুমান্ বলিয়াছিলেন

"রাবণ যুদ্ধার্থী, কিন্তু ধীরস্বভাব ও সাবধান, তিনি স্বয়ংই সতত সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।'

রামায়ণের সর্ব্বত্র হনুমান্ আশা ও শান্তির কথা বহন করিয়া আনিয়াছেন। অশোকবনে সীতা যখন চেড়ীগণপীড়িতা হইয়া দুঃখের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন,—যখন লঙ্কাপুরী কালরজনীর মত তাঁহাকে গ্রাস করিয়া অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন শুভ অঙ্গুরীয়কের অভিজ্ঞান লইয়া হনুমান্ তাঁহাকে নৈরাশ্যসমুদ্র হইতে আশার তরণীতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। রাম যখন বিরহখিন্ন হইয়া মরুভূর উত্তপ্তবায়ুপীড়িত পান্থের ন্যায় সীতার সংবাদের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন—বানরসৈন্যগণ যখন সুগ্রীবকৃত প্রাণদণ্ডের ভয়ে শুষ্কমুখে কাতর নৈরাশ্যে সমুদ্রের উদ্ধচর দাত্যূহ ও টিট্টিভপক্ষীর গতিতে কোন সুসংবাদের প্রত্যাশা করিয়া আশঙ্কাপীড়িত হইয়াছিল—তখন হনুমান্ অমৃতৌষধির ন্যায় সুবার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া নৈরাশ্যের রাজ্য আশার কলকোলাহলে মুখরিত করিয়াছিলেন। আর যেদিন চতুর্দ্দশবৎসরান্তে ফলমূলাহারী ও অনশনকৃশ রাজর্ষি ভরত নন্দিগ্রামের আশ্রমে ভ্রাতৃপাদুকাবিভূষিত মস্তকে রামের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, চতুর্দ্দশবৎসরান্তে রাম ফিরিয়া না আসিলে—"প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্"—অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন—সেই আদর্শভ্রাতা রাজর্ষির ঘোর আশা ও আশঙ্কার দিনে তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশী হনুমান্ বলিয়াছিলেন—

'বসন্তং দণ্ডকারণ্যে য ত্বং চীরজটাধরম্।
অনুশোচসি কাকুৎস্থং সত্বাং কুশলমব্রবীৎ॥"

'রাজন্, আপনি দণ্ডকারণ্যবাসী চীরজটাধর যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য অনুশোচনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।'

রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া সুগ্রীব ও অঙ্গদকে মণিময় হার এবং অন্যান্য আভরণ প্রদান করিলেন। সীতাদেবী তখন

স্বীয়কণ্ঠলম্বিত উজ্জ্বল মুক্তাহার খুলিয়া রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রাম বলিলেন, "তুমি এই হার যাহাকে দিয়া সুখী হও, তাহাকেই উহা দান কর।" সেই বহুমূল্য হার উপহার পাইয়া হনুমান্ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

হনুমানের এই কয়েকটি গুণের কথা বাল্মীকি লিখিয়াছেন—ধৈর্য্যমিশ্র তেজ, নীতির সহিত সরলতা, সামর্থ্য ও বিনয়,—যশ, পৌরুষ ও বুদ্ধি; পরস্পরবিরোধী গুণরাশি তাঁহার চরিত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল এবং তিনি তাহাদের সকলগুলিকেই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য কবি লিখিয়াছেন, সীতাদেবীর হারের তিনি সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন।

ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, সীতা, দশরথ প্রভৃতি সকলেরই রামের প্রতি অনুরাগ সহজে কল্পনা করা যায়,—ইহাঁরা রামের স্বগণ; কিন্তু কোথাকার এক বর্ব্বরদেশের অনুর্ব্বর মৃত্তিকায় এই ভক্তিকুসুম অসাধনে উৎপন্ন হইল—তাহা আমরা আশাতীতরূপে পাইয়া সবিস্ময়ে দর্শন করি। বিভীষণ ও সুগ্রীবের মৈত্রী হনুমানের প্রভুভক্তির তুল্য গভীর নহে এবং তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্যে আদানপ্রদানের ও স্বার্থের ভাব আছে, কিন্তু হনুমানের ভক্তি সম্পূর্ণ অহেতুকী। হনুমান্ আদর্শপ্রজ্ঞ, আদর্শভৃত্য, আদর্শসচিব ও আদর্শযোদ্ধা। রাম এবং সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অবিচল। পরবর্ত্তী হিন্দুগণ তাঁহার এই প্রভুপরায়ণতার প্রতিই বিশেষরূপে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু আমার বোধ হয়, ভক্তি অপেক্ষা উন্নত-কর্ত্তব্যের প্রেরণাই তাঁহাকে অধিকতররূপে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। তিনি কোন কার্য্যই শুধু হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে করেন নাই, তিনি প্রতি পাদক্ষেপে স্বীয় হৃদয়ের নিভৃতে বিতর্ক করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন দেখিতে পাই—তিনি আত্মান্বেষী সন্ন্যাসীর মত নিজে নির্লিপ্ত থাকিয়া অতিশয় কঠোর কর্ত্তব্যের পথে বিচরণ করিয়াছেন। বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায়, নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে, কর্ত্তব্যবুদ্ধির খরজ্যোতি পড়িয়া তাঁহাকে পথ চিনাইয়া দিয়াছে। সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধিই ভগবদ্দাস্যভাব,—বৈষ্ণবেরা এইজন্যই তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। আজ এই হিন্দুস্থানে বহুসহস্র লোক হনুমানের উপাসক—এই উন্নত কর্ত্তব্যবুদ্ধির আদর্শ চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতে পারিলে আমাদের জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম যে নবভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুণ্যপথে প্রধাবিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

নৌকাডুবি।

৩৩

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে! তুই কোথায় চলিয়াছিস্?"

উমেশ কহিল, "আমি মাঠাকরুণের সঙ্গে যাইতেছি।"

রমেশ। আমি যে তোর কাশী পর্য্যন্ত টিকিট্ করিয়া দিয়াছি। এ যে গাজিপুরের ঘাট। আমরা ত কাশী যাইব না।

উমেশ। আমিও যাইব না।

উমেশ যে তাহাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা রমেশের মনে ছিল না—কিন্তু ছোঁড়াটার অবিচলিত দৃঢ়তা দেখিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইল। কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কমলা, উমেশকেও লইতে হইবে নাকি?"

কমলা কহিল, "না লইলে ও কোথায় যাইবে?"

রমেশ। কেন, কাশীতে ওর আত্মীয় আছে।

কমলা। না, ও আমাদেরি সঙ্গে যাইবে বলিয়াছে। উমেশ, দেখিস্, তুই খুড়োমশায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিস্, নহিলে বিদেশে ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারাইয়া যাইবি।

কোন্ দেশে যাইতে হইবে, কাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, এ সমস্ত মীমাংসার ভার কমলা একলাই লইয়াছে। রমেশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বন্ধন পূর্ব্বে কমলা নম্রভাবে স্বীকার করিত, কিন্তু হঠাৎ এই শেষ কয়দিনের মধ্যে তাহা যেন সে কাটাইয়া উঠিয়াছে।

অতএব উমেশও তাহার ক্ষুদ্র একটি কাপড়ের পুঁটুলি কক্ষে লইয়া চলিল, এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা হইল না।

সহর এবং সাহেবপাড়ার মাঝামাঝি একটা জায়গায় খুড়োমশায়ের একটি ছোট বাংলা। তাহার পশ্চাতে আমবাগান, সম্মুখে বাঁধানো কূপ—সাম্নের দিকে অনুচ্চ প্রাচীরের বেষ্টন—কূপের সিঞ্চিত জলে কপি-কড়াইশুঁটির ক্ষেত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রথমদিনে কমলা ও রমেশ এই বাংলাতে গিয়াই উঠিল।

চক্রবর্ত্তিখুড়ার স্ত্রী হরিভাবিনীর শরীর কাহিল বলিয়া খুড়া লোকসমাজে প্রচার করেন, কিন্তু তাঁহার দৌর্ব্বল্যের বাহ্যলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বয়স নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু শক্ত-সমর্থ চেহারা। সাম্নের কিছু কিছু চুল পাকিয়াছে, কিন্তু কাঁচার অংশই বেশি। তাঁহার সম্বন্ধে জরা যেন কেবলমাত্র ডিক্রী পাইয়াছে, কিন্তু দখল পাইতেছে না।

আসল কথা, এই দম্পতিটি যখন তরুণ ছিলেন, তখন হরিভাবিনীকে ম্যালেরিয়ায় খুব শক্ত করিয়া ধরে। বায়ুপরিবর্ত্তন ছাড়া

আর-কোনো উপায় না দেখিয়া চক্রবর্ত্তী গাজিপুর-ইস্কুলের মাষ্টারি জোগাড় করিয়া এখানে আসিয়া বাস করেন। স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি চক্রবর্ত্তীর কিছুমাত্র আস্থা জন্মে নাই।

অতিথিদিগকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া চক্রবর্ত্তী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন —"সেজ বৌ!"

সেজবৌ তখন প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে রামকৌলিকে দিয়া গম ভাঙাইতেছিলেন এবং ছোটবড় নানাপ্রকার ভাড়ে ও হাঁড়িতে নানাজাতীয় চাট্‌নি রৌদ্রে সাজাইতেছিলেন।

চক্রবর্ত্তী আসিয়াই কহিলেন - "এই বুঝি! ঠাণ্ডা পড়িয়াছে গায়ে একখানা র‍্যাপার দিতে নাই?"

হরিভাবিনী। তোমার সকল অনাসৃষ্টি! ঠাণ্ডা আবার কোথায়—রৌদ্রে পিঠ পুড়িতেছে!

চক্রবর্ত্তী। সেটাই কি ভাল? ছায়াজিনিষটা ত দুর্ম্মূল্য নয়!

হরিভাবিনী। আচ্ছা সে হবে—তুমি আসিতে এত দেরি করিলে কেন?

চক্রবর্ত্তী। সে অনেক কথা। আপাততঃ ঘরে অতিথি উপস্থিত। সেবার আয়োজন করিতে হইবে।

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী অভ্যাগতদের পরিচয় দিলেন। চক্রবর্ত্তীর ঘরে হঠাৎ এরূপ বিদেশী অতিথির সমাগম প্রায় ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সস্ত্রীক অতিথির জন্য হরিভাবিনী প্রস্তুত ছিলেন না—তিনি কহিলেন—"ওমা, তোমার এখানে ঘর কোথায়?"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "আগে ত পরিচয় হোক্, তার পরে ঘরের কথা পরে হইবে। আমাদের শৈল কোথায়?"

হরিভাবিনী। সে তাহার ছেলেকে স্নান করাইতেছে।

চক্রবর্ত্তী তাড়াতাড়ি কমলাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিলেন। কমলা হরিভাবিনাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি দক্ষিণ করপুটে কমলার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিলেন এবং স্বামীকে কহিলেন, "দেখিয়াছ, মুখখানি অনেকটা আমাদের বিধুর মত।"

বিধু ইহাদের বড় মেয়ে—কানপুরে স্বামিগৃহে থাকে। চক্রবর্ত্তী মনে মনে হাসিলেন, তিনি জানিতেন, কমলার সহিত বিধুর কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু হরিভাবিনী রূপগুণে বাহিরের মেয়ের জয় স্বীকার করিতে পারেন না। শৈলজা তাহার ঘরেই থাকে, পাছে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ তুলনায় বিচারে হার হয়, এইজন্য অনুপস্থিতকে উপমাস্থলে রাখিয়া জয়পতাকা গৃহিণী আপন গৃহের মধ্যেই অচল করিলেন।

হরিভাবিনী। ইঁহারা আসিয়াছেন, তা বেশ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নতুন বাড়ীর ত মেরামত শেষ হয় নাই—এখানে আমরা কোনোমতে মাথা গুঁজিয়া আছি - ইঁহাদের যে কষ্ট হইবে।

বাজারে চক্রবর্ত্তীর একটা ছোট বাড়ী মেরামত হইতেছে বটে, কিন্তু সেটা একটা দোকান- সেখানে বাস করিবার কোনো সুবিধাও নাই, সঙ্কল্পও নাই।

চক্রবর্ত্তী এই মিথ্যার কোনো প্রতিবাদ

না করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "মা যদি কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিবেন, তবে কি উঁহাকে এ ঘরে আনি! যেখানে সন্তানের চলিয়া যায়, সেখানে মায়েরও চলে। কি বল মা! সত্য কথা বলিতেছি—একটু কষ্ট দিতে ভালও লাগে, নহিলে স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় না। (স্ত্রীর প্রতি) যাই হৌক্, তুমি আর বাহিরে দাঁড়াইয়ো না। শরৎকালের রৌদ্রটা বড় খারাপ।"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী রমেশের নিকট বাহিরে চলিয়া গেলেন।

হরিভাবিনী কমলার বিস্তারিত পরিচয় লইতে লাগিলেন। "তোমার স্বামী বুঝি উকিল? তিনি কতদিন কাজ করিতেছেন? তিনি কত রোজগার করেন? এখনো বুঝি ব্যবসা আরম্ভ করেন নাই? তবে চলে কি করিয়া? তোমার শ্বশুরের বুঝি সম্পত্তি আছে? জান না? ওমা কেমন মেয়ে গো? শ্বশুরবাড়ীর খবর রাখ না? সংসারখরচের জন্য স্বামী তোমাকে মাসে কত করিয়া দেন? শাশুড়ি যখন নাই, তখন ত সংসারের ভার নিজের হাতেই লইতে হইবে। তুমি ত নেহাৎ কচি মেয়েটি নও—আমার বড়-জামাই যা-কিছু রোজগার করে, সমস্তই বিধুর হাতে গণিয়া দেয়" ইত্যাদি প্রশ্ন ও মন্তব্যের দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যেই কমলাকে অর্ব্বাচীন প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। কমলাও যে রমেশের অবস্থা ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কত অল্প জানে এবং তাহাদের সম্বন্ধ বিচার করিলে এই অল্পজ্ঞান যে কত অসঙ্গত ও লোকসমাজে লজ্জাকর, হরিভাবিনীর প্রশ্নমালায় তাহা তাহার মনে স্পষ্ট উদয় হইল। সে ভাবিয়া দেখিল, আজ পর্য্যন্ত রমেশের সঙ্গে ভাল করিয়া কোনো কথা আলোচনা করিবার অবকাশমাত্র সে পায় নাই। সে রমেশের স্ত্রী হইয়া রমেশের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আজ ইহা তাহার নিজের কাছে অদ্ভুত বোধ হইল এবং নিজের এই অকিঞ্চিৎকরত্বে লজ্জা তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

হরিভাবিনী আবার সুরু করিলেন—"বৌমা, দেখি তোমার বালা? এ সোনা ত তেমন ভাল নয়? বাপের বাড়ী হইতে কিছু গহনা আন নাই? বাপ নাই? তাই বলিয়া কি এমন করিয়া গা খালি রাখে? তোমার স্বামী বুঝি কিছু দেন নাই? আমার বড় জামাই ছইমাস-অন্তর আমার বিধুকে একখানা করিয়া গহনা গড়াইয়া দেয়।"

এই সমস্ত সওয়াল-জবাবের মধ্যে শৈলজা তাহার দুইবৎসর বয়সের কন্যার হাত ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। শৈলজা শ্যামবর্ণ, তাহার মুখখানি ছোটখাট,—মুষ্টিমেয়, চোখ-দুটি উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত—মুখ দেখিলেই স্থির বুদ্ধি এবং একটি শান্ত পরিতৃপ্তির ভাব চোখে পড়ে।

শৈলজার ছোট মেয়েটি কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তকাল পর্য্যবেক্ষণের পর বলিয়া উঠিল—"মাসী" বিধুর সঙ্গে সাদৃশ্য বিচার করিয়া যে বলিল, তাহা নহে—একটা বিশেষ-বয়সের যে-কোন মেয়েকে তাহার অপ্রিয় বোধ না হইলেই তাহাকেই সে নির্ব্বিচারে মাসীনামে অভিহিত করে। কমলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

হরিভাবিনী শৈলজার নিকট কমলার

পরিচয় দিয়া কহিলেন—"ইঁহার স্বামী উকিল, নূতন রোজগার করিতে বাহির হইয়াছেন। পথে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তিনি ইঁহাদের গাজিপুরে আনিয়াছেন।"

শৈলজা কমলার মুখের দিকে চাহিল, কমলাও শৈলজার মুখের দিকে চাহিল, এবং সেই দৃষ্টিপাতেই একমুহূর্ত্তে উভয়ের সখ্য-বন্ধন বাঁধিয়া গেল। হরিভাবিনী আতিথ্যের আয়োজনে চলিয়া গেলেন—শৈলজা কমলার হাত ধরিয়া কহিল, "এস ভাই, আমার ঘরে এস!"

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে কথা আরম্ভ হইল। শৈলজার সঙ্গে কমলার বয়সের যে প্রভেদ ছিল, তাহা চোখে দেখিয়া সহসা বোঝা যায় না। শৈলজার সবসুদ্ধ একটু ছোটখাট সংক্ষিপ্তরকমের ভাব—কমলার ঠিক তাহার উল্টা—আয়তনে ও ভাবে-ভঙ্গীতে সে আপনার বয়সকে অনেকটা ছাড়াইয়া গেছে। বিবাহের পর হইতে তাহার মাথার উপরে শ্বশুরবাড়ীর কোন-রকমের চাপ না থাকাতেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্, দেখিতে দেখিতে সে অসঙ্কোচে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখের ভাবের মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ ছিল। তাহার সম্মুখে যাহা-কিছু উপস্থিত হয়, তাহাকে অন্তত মনে মনেও সে প্রশ্ন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। "চুপ কর", "যাহা বলি তাহাই করিয়া যাও", "বৌমানুষের অত 'নেই'করা শোভা পায় না"—এ সব কথা তাহাকে আজ পর্য্যন্ত শুনিতে হয় নাই। তাই সে যেন মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া উঠিয়াছে—তাহার সরলতার মধ্যে সবলতা আছে।

শৈলজার মেয়ে উমি উভয়ের মনোযোগ নিজের প্রতি সম্পূর্ণ একচেটে করিয়া লইবার বিধিমত চেষ্টা করিলেও, দুই নূতন সখীর মধ্যে কথাবার্ত্তা জমিয়া উঠিল। এই কথোপ-কথনব্যাপারে কমলা নিজের তরফের দৈন্য সহজেই বুঝিতে পারিল। শৈলজার বলিবার ঢের কথা আছে, কিন্তু কমলার বলিবার কিছুই নাই। কমলার জীবনের চিত্রপটে তাহার দাম্পত্যের যে একটা ছবি উঠিয়াছে, তাহা একটি পেন্সিলের ক্ষীণ রেখামাত্র—তাহার সকল জায়গা পরিস্ফুট সুসংলগ্ন নহে, তাহাতে আজও একটুও রং ফলানো হয় নাই। কমলা এতদিন এই শূন্যতা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার অবকাশ পায় নাই হৃদয়ের মধ্যে অভাব অনুভব করিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ভাবও উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার চেহা-রাটা তাহার চোখে ফুটিয়া ওঠে নাই। বন্ধু-ত্বের প্রথম আরম্ভেই শৈলজা যখন তাহার স্বামীর কথা বলিতে আরম্ভ করিল যে সুরে শৈলজার হৃদয়ের সব তারগুলি বাধা রহি-য়াছে, আঙুল পড়িবামাত্র যখন সেই সুর বাজিয়া উঠিল, তখন কমলা দেখিল, কমলার হৃদয় হইতে এ সুরের কোনো ঝঙ্কার দিবার নাই—স্বামীর কথা সে কি বলিবে, বলিবার বিষয়ই বা কি আছে। বলিবার আগ্রহই বা কোথায়। সুখের বোঝাই লইয়া শৈলজার ইতিহাস যেথা হুহু করিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, কমলার শূন্য নৌকাটা সেখানে মাটিতে ঠেকিয়া অচল হইয়া আছে।

শৈলজার স্বামী বিপিন গাজিপুরে অহিফেনবিভাগে কাজ করে। চক্রবর্ত্তীর দুটিমাত্র মেয়ে। বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ী

গেছে। ছোটটিকে প্রাণ ধরিয়া বিদায় দিতে না পারিয়া চক্রবর্ত্তী একটি নিঃস্ব জামাই বাছিয়া আনিলেন এবং সাহেবসুবাকে ধরিয়া এইখানেই তাহার একটা কাজ জুটাইয়া দিলেন। বিপিন ইঁহাদের বাড়ীতেই থাকে।

কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ একসময় শৈল বলিল, "তুমি একটু বোস ভাই, আমি এখনি আসিতেছি।"—পরক্ষণেই একটু হাসিয়া কারণ দর্শাইয়া কহিল—"উনি স্নান করিয়া ভিতরে আসিয়াছেন—খাইয়া আপিসে যাইবেন।"

কমলা সরল বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, "তিনি আসিয়াছেন, তুমি কেমন করিয়া জানিতে পারিলে ?"

শৈলজা। আর ঠাট্টা করিতে হইবে না। সকলেই যেমন করিয়া জানিতে পারে, আমিও তেম্‌নি করিয়া জানি। তুমি নাকি তোমার কর্ত্তাটির পায়ের শব্দ চেন না!

এই বলিয়া হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া আঁচলে-বদ্ধ চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া মেয়ে কোলে লইয়া শৈলজা চলিয়া গেল। পদ-শব্দের ভাষা যে এতই সহজ, তাহা কমলা আজও জানিতে পারে নাই। সে চুপ করিয়া বসিয়া জান্‌লার বাহিরে চোখ রাখিয়া তাই ভাবিতে লাগিল। জান্‌লার বাহিরে একটা পেয়ারা-গাছে ডাল ছাইয়া পেয়ারার ফুল ধরিয়াছে, সেই সমস্ত ফুলের কেশরের মধ্যে মৌমাছির দল তখন লুটোপুটি করিতেছিল।

৩৪

একটু ফাঁকা জায়গায় গঙ্গার ধারে একটা আলাদা বাড়ী লইবার চেষ্টা হইতেছে। রমেশ গাজিপুর-আদালতে বিধি অনুসারে প্রবেশলাভ করিবার জন্য ও জিনিষপত্র আনিতে একবার কলিকাতায় যাইতে হইবে, স্থির করিয়াছে—কিন্তু কলিকাতায় যাইতে তাহার সাহস হইতেছে না। কলিকাতার একটা বিশেষ গলির চিত্র মনে উঠিলেই রমেশের বুকের ভিতরটা এখনো যেন কিসে চাপিয়া ধরে। এখনো জাল ছেঁড়ে নাই—অথচ কমলার সহিত স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধ সম্পূর্ণ-ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে বিলম্ব করিলে আর চলে না। এই সমস্ত দ্বিধায় কলি-কাতায় যাত্রার দিন পিছাইয়া যাইতে লাগিল।

কমলা চক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুরেই থাকে। এ বাংলায় ঘর নিতান্ত কম বলিয়া রমেশকে বাহিরের ঘরেই থাকিতে হয়—কমলার সহিত তাহার সাক্ষাতের সুযোগ হয় না।

এই অনিবার্য্য বিচ্ছেদব্যাপার লইয়া শৈলজা কেবলি কমলার কাছে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। কমলা কহিল, "কেন ভাই তুমি এত হাহুতাশ করিতেছ? এমনী কি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?"

শৈলজা হাসিয়া কহিল, "ইস্, তাই ত! একেবারে যে পাষাণের মত কঠিন মন! ও সব ছলনায় আমাকে ভুলাইতে পারিবে না! তোমার মনের মধ্যে যে কি হইতেছে, সে কি আর আমি জানি না?"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই, সত্যি করিয়া বল, দুইদিন যদি বিপিনবাবু তোমাকে দেখা না দেন, তা হইলে কি অম্‌নি—"

শৈলজা সগর্ব্বে কহিল—"ইস্, দুইদিন

দেখা না দিয়া তার নাকি থাকিবার জো আছে।”

এই বলিয়া বিপিনবাবুর অধৈর্য্যসম্বন্ধে শৈলজা গল্প করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম বিবাহের পর বালক বিপিন গুরুজনের চক্ষুভেদ করিয়া তাহার বালিকা বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কবে কতপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল, কবে ব্যর্থ হইয়াছিল, কবে ধরা পড়িয়াছিল, দিবাসাক্ষাৎকারের নিষেধদুঃখলাঘবের জন্য বিপিনের মধ্যাহ্ন ভোজনকালে একটা আয়নার মধ্যে গুরুজনদের অজ্ঞাতে উভয়ের কিরূপ দৃষ্টিবিনিময় চলিত, তাহা বলিতে বলিতে পুরাতন স্মৃতির আনন্দকৌতুকে শৈলজার মুখখানি হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে যখন আপিসে যাইবার পালা আরম্ভ হইল, তখন উভয়ের বেদনা এবং বিপিনের যখন তখন আপিস-পলায়ন, সেও অনেক কথা! তাহার পরে একবার শ্বশুরের ব্যবসায়ের খাতিরে কিছুদিনের জন্য বিপিনের পাটনায় যাইবার কথা হয়, তখন শৈলজা তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “তুমি পাটনায় গিয়া থাকিতে পারিবে?” বিপিন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিল, “কেন পারিব না, খুব পারিব!” সেই স্পর্দ্ধাবাক্যে শৈলজার মনে খুব অভিমান হইয়াছিল—সে প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বিদায়ের পূর্ব্বরাত্রে সে কোনমতে লেশমাত্র শোক প্রকাশ করিবে না; কেমন করিয়া সে প্রতিজ্ঞা হঠাৎ চোখের জলের প্লাবনে ভাসিয়া গেল এবং পরদিনে যখন যাত্রার আয়োজন সমস্তই স্থির, তখন বিপিনের অকস্মাৎ এম্নি মাথা ধরিয়া কি-এক-রকমের অসুখ করিতে লাগিল যে, যাত্রা বন্ধ করিতে হইল, তাহার পরে ডাক্তার যখন ওষুধ দিয়া গেল, তখন সে ওষুধের শিশি গোপনে নর্দ্দামার মধ্যে শূন্য করিয়া অপূর্ব্ব উপায়ে কি করিয়া ব্যাধির অবসান হইল—এ সমস্ত কাহিনী বলিতে বলিতে কখন্ যে বেলা অবসান হইয়া আসে, শৈলজার তাহাতে হুঁস্ থাকে না—অথচ এমনসময় হঠাৎ দূরে বাহির-দরজায় একটা কিসের শব্দ হয়-কি-না-হয়, অমনি শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে। বিপিনবাবু আপিস্ হইতে ফিরিয়াছেন। সমস্ত গল্পহাসির অন্তরালে একটি উৎকণ্ঠিত হৃদয় সেই পথের ধারের বাহির দরজার দিকেই কান পাতিয়া বসিয়াছিল।

কমলার কাছে এ সমস্ত কথা যে একেবারেই আকাশকুসুমের মত, তাহা নয়—ইহার আভাস সে কিছু কিছু পাইয়াছে। প্রথম কয়েকমাস রমেশের সহিত প্রথম পরিচয়ের রহস্যের মধ্যে যেন এইরকমেরই একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার পরেও ইস্কুল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া কমলা যখন রমেশের কাছে ফিরিয়া আসিল, তখনো মাঝে মাঝে এমন-সকল ঢেউ অপূর্ব্ব সঙ্গীতে ও অপরূপ নৃত্যে তাহার হৃদয়কে আঘাত করিয়াছে—যাহার ঠিক অর্থটি সে আজ শৈলজার এই সমস্ত গল্পের মধ্য হইতে বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু তাহার এ সমস্তই ভাঙাচোরা, ইহার ধারাবাহিকতা কিছুই নাই। তাহাকে যেন কোন-একটা পরিণাম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে দেওয়া হয় নাই। শৈলজা ও বিপিনের মধ্যে যে একটা আগ্রহের টান, সেটা রমেশ ও তাহার মধ্যে কোথায়? এই

যে কয়েকদিন তাহাদের দেখাশোনা বন্ধ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার মনের মধ্যে এমনী কি অস্থিরতা উপস্থিত হইয়াছে—এবং রমেশও যে তাহাকে দেখিবার জন্য বাহিরে বসিয়া-বসিয়া কোনপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে, তাহা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ইতিমধ্যে যেদিন রবিবার আসিল, সেদিন শৈলজা কিছু মুস্কিলে পড়িল। তাহার নূতন সখীকে দীর্ঘকাল একেবারে একলা পরিত্যাগ করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—অথচ আজ ছুটির দিন একেবারে ব্যর্থ করিবে, এত-বড় ত্যাগশীলতাও তাহার নাই। এদিকে রমেশবাবু নিকটে থাকিতেও কমলা যখন মিলনে বঞ্চিত হইয়া আছে, তখন ছুটির উৎসবে নিজের বরাদ্দ পুরা ভোগ করিতে তাহার ব্যথাও বোধ হইল। আহা, যদি কোনোমতে রমেশের সহিত কমলার সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দেওয়া যায়!

এ সকল বিষয় লইয়া গুরুজনদের সহিত পরামর্শ চলে না—কিন্তু চক্রবর্ত্তী পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করিবার লোক নহেন। তিনি বাড়ীতে প্রচার করিয়া দিলেন, আজ তিনি বিশেষ কাজে সহরের বাহিরে যাইতেছেন। রমেশকে বুঝাইয়া গেলেন যে, বাহিরের লোক আজ কেহ তাঁহার বাড়ীতে আসিতেছে না—সদরদরজা বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন। এ খবর তাঁহার কন্যাকেও বিশেষ করিয়া শোনাইয়া দিলেন—নিশ্চয় জানিতেন, কোন্ ইঙ্গিতের কি অর্থ, তাহা বুঝিতে শৈলজার বিলম্ব হয় না।

স্নানের পর শৈলজা কমলাকে বলিল, "এস ভাই, তোমার চুল শুকাইয়া দিই!"

কমলা কহিল—"কেন, আজ এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

শৈলজা। "সে কথা পরে হইবে—তোমার চুলটা আগে বাঁধিয়া দিই।"—বলিয়া কমলার মাথা লইয়া পড়িল। আজ বিনানির সংখ্যা অনেক বেশি—খোঁপা একটা বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিল।

তাহার পরে কাপড় লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা বিষম তর্ক বাধিয়া গেল। শৈলজা তাহাকে যে রঙীন কাপড় পরাইতে চায়, কমলা তাহা পরিবার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে শৈলজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পরিতে হইল!

মধ্যাহ্নে আহারের পর শৈলজা তাহার স্বামীকে কানে-কানে কি-একটা বলিয়া ক্ষণকালের জন্য ছুটি লইয়া আসিল। তাহার পরে কমলাকে বাহিরের ঘরে পাঠাইবার জন্য পীড়াপীড়ি পড়িয়া গেল।

রমেশের কাছে কমলা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার অসঙ্কোচে গিয়াছে। এ সম্বন্ধে সমাজে লজ্জাপ্রকাশের যে কোনো বিধান আছে, তাহা জানিবার সে কোনো অবসর পায় নাই। পরিচয়ের আরম্ভেই রমেশ সঙ্কোচ ভাঙিয়া দিয়াছিল। নির্লজ্জতার অপবাদ দিয়া ধিক্কার দিবার সঙ্গিনীও তাহার কাছে কেহ ছিল না।

কিন্তু আজ শৈলজার অনুরোধ পালন করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। স্বামীর কাছে শৈলজা যে অধিকারে যায়, তাহা সে জানিয়াছে—কমলা সেই অধিকারের গৌরব যখন অনুভব করিতেছে না, তখন

দীনভাবে সে আজ কেমন করিয়া যাইবে।

কমলাকে যখন কিছুতেই রাজি করা গেল না, তখন শৈল মনে করিল, রমেশের 'পরে সে অভিমান করিয়াছে। অভিমান করিবার কথাই বটে। কয়টা দিন কাটিয়া গেল, অথচ রমেশবাবু কোনো ছুতা করিয়া একবার দেখাসাক্ষাতের চেষ্টাও করিলেন না!

বাড়ীর গৃহিণী তখন আহারান্তে ঘরে দুয়ার দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। শৈলজা বিপিনকে আসিয়া কহিল, "রমেশবাবুকে তুমি আজ কমলার নাম করিয়া বাড়ীর মধ্যেই ডাকিয়া আন। বাবা কিছু মনে করিবেন না, মা কিছু জানিতেই পারিবেন না।" বিপিনের মত চুপচাপ মুখচোরা লোকের পক্ষে এরূপ দৌত্য কোনমতেই রুচিকর নহে, তথাপি ছুটির দিনে এই অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে সে সাহস করিল না।

রমেশ তখন বাহিরের ঘরের জাজিম-পাতা মেজের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া এক পায়ের উচ্ছ্রিত হাঁটুর উপরে আর-এক পা তুলিয়া-দিয়া পায়োনিয়ার্ পড়িতেছিল। পাঠ্য অংশ শেষ করিয়া যখন কাজের অভাবে তাহার বিজ্ঞাপনের প্রতি মনোযোগ দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন-সময় বিপিনকে ঘরে আসিতে দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সঙ্গিহিসাবে বিপিন যে খুব প্রথম-শ্রেণীর পদার্থ, তাহা না হইলেও বিদেশে মধ্যাহ্নযাপনের পক্ষে রমেশ তাহাকে পরম-লাভ বলিয়া গণ্য করিল এবং বলিয়া উঠিল, "আসুন্ বিপিনবাবু, আসুন, বসুন্।"

বিপিন না বসিয়াই একটুখানি মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "আপনাকে একবার ইনি ভিতরে ডাকিতেছেন।"

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে, কমলা?"

বিপিন কহিল—"হাঁ।"

রমেশ কিছু আশ্চর্য্য হইল। রমেশ পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছে, কমলাকে সে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক-দ্বিধাগ্রস্ত মন তৎপূর্ব্বে এই কয়দিন অবকাশ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। কল্পনায় কমলাকে গৃহিণীপদে অভিষিক্ত করিয়া সে মনকে নানাপ্রকার ভাবী সুখের আশ্বাসে উত্তেজিত করিয়াও তুলিয়াছে—কিন্তু প্রথম আরম্ভটাই দুরূহ। কিছুদিন হইতে কমলার প্রতি যেটুকু দূরত্ব রক্ষা করা তাহার অভ্যস্ত হইয়া গেছে, হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া সেটা ভাঙিয়া ফেলিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না, এইজন্যই বাড়ীভাড়া করিবার দিকে তাহার তেমন সত্বরতা ছিল না।

কমলা ডাকিয়াছে শুনিয়া রমেশের মনে হইল, নিশ্চয় বিশেষ কোন-একটা প্রয়োজন পড়িয়াছে। তবু প্রয়োজনের ডাক হইলেও তাহার মনের মধ্যে একটা হিল্লোল উঠিল। বিপিনের অনুবর্ত্তী হইয়া পায়োনিয়র্‌টা ফেলিয়া-রাখিয়া যখন সে অন্তঃপুরে যাত্রা করিল, তখন এই মধুকরগুঞ্জরিত কার্ত্তিকের আলস্যদীর্ঘ জনহীন মধ্যাহ্নে একটা অভি-সারের আভাস তাহার চিত্তকে একটুখানি চঞ্চল করিল।

বিপিন কিছুদূর হইতে ঘর দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কমলা মনে করিয়া-ছিল, শৈলজা তাহার সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া-

দিয়া বিপিনের কাছে চলিয়া গেছে। তাই সে খোলা-দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া সাম্‌নের বাগানের দিকে চাহিয়া ছিল। শৈল কেমন করিয়া কমলার অন্তরে-বাহিরে একটা ভালবাসার সুর বাঁধিয়া দিয়াছিল। ঈষত্তপ্ত বাতাসে বাহিরে গাছের পল্লবগুলি যেমন মর্ম্মরশব্দে কাঁপিয়া উঠিতেছিল—কমলার বুকের ভিতরেও মাঝে মাঝে তেম্‌নি একটা দীর্ঘনিশ্বাসের হাওয়া উঠিয়া অব্যক্ত বেদনায় একটি অপরূপ স্পন্দনের সঞ্চার করিতেছিল। শৈল যে তাহাকে আজ একটু বিশেষ করিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল, সেই সাজ তাহাকে স্তরে-স্তরে বেষ্টন করিয়া তাহাকে যেন নীরবে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের একটি অপূর্ব্ব কাব্য শুনাইতেছিল। সে যেন আপনাকে স্বর্ণথালে সজ্জিত সুগন্ধ-বিহ্বল নৈবেদ্যের সদ্যোবিকশিত পুষ্পরাশির মত অনুভব করিতেছিল—চারিদিকে শরতের মধ্যাহ্ন নির্জ্জন সোনার মন্দিরটির মত নির্ম্মল নীলাকাশে চূড়া তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল—কিন্তু হায়, দেবতা কোথায়!

এমন সময়ে রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন তাহার পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—"কমলা", তখন সে চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল—তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত তরঙ্গিত হইতে লাগিল। যে কমলা ইতিপূর্ব্বে কখনো রমেশের কাছে বিশেষ লজ্জা অনুভব করে নাই, সে আজ ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। তাহার কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

আজিকার সাজসজ্জায় ও ভাবে-আভাসে রমেশ কমলাকে নূতন মূর্ত্তিতে দেখিল। হঠাৎ কমলার এই বিকাশ তাহাকে আশ্চর্য্য এবং অভিভূত করিল। সে আস্তে আস্তে কমলার কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কমলা, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ?"

কমলা চম্‌কিয়া-উঠিয়া অনাবশ্যক উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল—"না, না, না, আমি ডাকি নাই—আমি কেন ডাকিতে যাইব!"

রমেশ কহিল, "ডাকিলেই বা দোষ কি কমলা?"

কমলা দ্বিগুণ প্রবলতার সহিত বলিল—"না, আমি ডাকি নাই!"

রমেশ কহিল, "তা বেশ কথা! তুমি না ডাকিতেই আমি আসিয়াছি! তাই বলিয়াই কি অনাদরে ফিরিয়া যাইতে হইবে?"

কমলা। তুমি এখানে আসিয়াছ, সকলে জানিতে পারিলে রাগ করিবেন—তুমি যাও! আমি তোমাকে ডাকি নাই।

রমেশ কমলার হাত চাপিয়া-ধরিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি আমার ঘরে এস—সেখানে বাহিরের লোক কেহ নাই।"

কমলা কম্পিতকলেবরে তাড়াতাড়ি রমেশের হাত ছাড়াইয়া-লইয়া পাশের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

রমেশ বুঝিল, এ সমস্তই বাড়ীর কোনো মেয়ের ষড়্‌যন্ত্র—এই বুঝিয়া পুলকিতদেহে বাহিরের ঘরে গেল। চিৎ হইয়া পড়িয়া আর-একবার পায়োনিয়রটা টানিয়া-লইয়া তাহার বিজ্ঞাপনশ্রেণীর উপরে চোখ বুলাইতে

লাগিল, কিন্তু কিছুই অর্থগ্রহ হইল না। তাহার হৃদয়াকাশে নানারঙের ভাবের মেঘ উড়ো-বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শৈল রুদ্ধঘরে ঘা দিল কেহ দরজা খুলিল না। তখন সে দরজার খড়্‌খড়ি খুলিয়া বাহির হইতে হাত গলাইয়া-দিয়া ছিট্‌কিনি খুলিয়া ফেলিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, কমলা মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে।

শৈল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এম্‌নি কি ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহার জন্য কমলা এত আঘাত পায়! তাড়াতাড়ি তাহার পাশে বসিয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, "কেন ভাই, তোমার কী হইয়াছে—তুমি কেন কাঁদিতেছ!"

কমলা কহিল, "তুমি কেন উঁহাকে ডাকিয়া আনিলে? তোমার ভারি অন্যায়!"

কমলার এই সকল আকস্মিক আবেগের প্রবলতা তাহার নিজের পক্ষে এবং অন্যের পক্ষে বোঝা ভারি শক্ত। ইহার মধ্যে যে তাহার কতদিনের গুপ্তবেদনার সঞ্চয় আছে, তাহা কেহই জানে না!

কমলা আজ একটা কল্পনা-লোক অধিকার করিয়া বেশ গুছাইয়া বসিয়া ছিল! রমেশ যদি বেশ সহজে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত, তবে সুখেরই হইত। কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া ফেলা হইল। কমলাকে ছুটির সময়ে ইস্কুলে বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা, স্টীমারে রমেশের ঔদাসীন্য, এ সমস্তই মনের তলদেশে আলোড়িত হইয়া উঠিল। কাছে পাইলেই যে পাওয়া হইল, ডাকিয়া আনিলেই যে আসা হইল, তাহা নহে—আসল জিনিষটি যে কি, তাহা গাজিপুরে আসার পরে কমলা অতি অল্পদিনেই যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে।

কিন্তু শৈলর পক্ষে এ সব কথা বোঝা শক্ত। কমলা এবং রমেশের মাঝখানে যে কোনো প্রকারের সত্যকার ব্যবধান থাকিতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। সে বহুযত্নে কমলার মাথা নিজের কোলের উপর তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ভাই, রমেশবাবু কি তোমাকে কোনো কঠিন কথা বলিয়াছেন? হয় ত ইনি তাঁহাকে ডাকিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাগ করিয়াছেন। তুমি বলিলে না কেন যে, এ সমস্ত আমার কাজ।"

কমলা কহিল, "না না, তিনি কিছুই বলেন নাই। কিন্তু কেন তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে?"

শৈল ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই দোষ হইয়াছে, মাপ কর!"

কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া-বসিয়া শৈলর গলা জড়াইয়া ধরিল—কহিল—"যাও ভাই, যাও তুমি, বিপিনবাবু রাগ করিতেছেন!"

বাহিরে নির্জ্জনঘরে রমেশ পায়োনিয়রের উপর অনেকক্ষণ বৃথা চোখ বুলাইয়া একসময় সবলে সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর উঠিয়া-বসিয়া কহিল—"না, আর না। কালই কলিকাতায় গিয়া প্রস্তুত হইয়া

আসিব। কমলাকে আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে যত দিনবিলম্ব হইতেছে, ততই আমার অন্যায় বাড়িতেছে।"

রমেশের কর্ত্তব্যবুদ্ধি হঠাৎ আজ পূর্ণভাবে জাগ্রত হইয়া সমস্ত দ্বিধা-সংশয় একলম্ফে অতিক্রম করিল।

ক্রমশ।

সার সত্যের আলোচনা।

কাণ্ট্ ঘরের লোক।

আমরা এক্ষণে বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষে, ভেদজ্ঞান হইতে অভেদজ্ঞানে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছি। পথের মাঝে বিশেষ বিশেষ ঘাটি-স্থানে দুর্ভেদ্য প্রাচীর সমুত্থিত রহিয়াছে। সে প্রাচীরগুলার প্রতিষ্ঠাকর্ত্রী হ'চ্চেন ভেদবুদ্ধি। সেগুলা ভাঙিয়া-ফেলিয়া সম্মুখের পথ পরিষ্কার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। একটা প্রাচীর হ'চ্চে ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে দাঁড়-করাইয়া-তোলা কাল্পনিক প্রভেদ। আমি দেখাইতে চাই—প্রভেদ কেবল উপরে উপরে, ভিতরে-ভিতরে দুয়ের মধ্যে খুবই মিল রহিয়াছে। দেখাইতে চাই যে, ১-২-৩ এবং 1 2-3'র মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, সা-রে-গা-মা এবং Do-re-mi-fa'র মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান এবং ইউরোপীয় তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে অনেকটা সেই ধাঁচা'র প্রভেদ। যাঁহারা বলেন যে, "সোপাধিক," "নিরুপাধিক," "আভাসচৈতন্য," "কূটস্থচৈতন্য," এরূপ-ধরণের কোনো কথার উল্লেখ ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে খুঁজিলে পাওয়া যায় না, তাঁহারা যদি একবার একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া কাণ্টের দর্শনগ্রন্থখানি প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে। তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, Transcendental apperceptionএর নামই কূটস্থচৈতন্য; Empirical apperceptionএর নামই আভাসচৈতন্য; Transcendentএর নামই নিরুপাধিক; Immanentএর নামই সোপাধিক। তা ছাড়া, কাণ্টের দর্শনে সোপাধিক এবং নিরুপাধিকের সন্ধিস্থলে বেশীর ভাগ আর-একটি কথা দেখিতে পাইবেন—সেটি হ'চ্চে Transcendental। Transcedent মুখ্য-রকমের নিরুপাধিক, Transcendental গৌণরকমের নিরুপাধিক, অর্থাৎ-কিনা—সোপাধিকের কিনারা-ঘ্যাঁসা নিরুপাধিক।

কাণ্টের জন্য আমার কেন এত মাথাব্যথা? অবশ্যই তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে। সে কারণ এই যে, তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে কাণ্ট্ যাহা-যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভিতরে অনেকগুলি খাঁটি-সত্য চাপাচুপি দেওয়া আছে। কাণ্টের দর্শন-সমুদ্রে ডুব দিয়া সেই-

গুলি উদ্ধৃত করিয়া আনিয়া যদি দেশীয় পণ্ডিত-গণের চক্ষের সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, তাহার একটিও নূতন নহে – সমস্তই আমাদের দেশের বহুপুরাতন পৈতৃক-সম্পত্তি। দুঃখের বিষয় এই যে, কাণ্টের নিজের তত্ত্বান্বেষণের সেই প্রকৃষ্ট ফলগুলি তাঁহার নিজের ভোগে আসিল না—শুদ্ধকেবল ইউরোপীয় ধর্ম্ম-যাজকদিগের প্রচলিত মতামতের সঙ্গে সেগুলির মিল না-হওয়া-গতিকে। তেলে-জলে কেমন করিয়াই বা মিশ খাইবে। আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সার সত্যের দৃঢ় ডাঙাভূমিতে দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; কাণ্ট্ এক পা বাড়াইয়া সার সত্যের ডাঙায় ভর স্থাপন করিয়াছেন, আর, তাঁহার আর-এক পা রহিয়াছে সংশয়ের তরঙ্গ-দোলায় দোদুল্যমান পিছনের নৌকায় ভর দিয়া—ইত্যবসরে তিনি তাঁহার চারিদিকের ধর্ম্মযাজকদিগের ভ্রুকুটী-কুটিল মুখভঙ্গী দেখিয়া পিছনের পা ডাঙায় উঠাইতে সাহস পাইলেন না। কাণ্টের এক পা সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান—আর-এক পা ধ্রুব-সত্যে প্রতিষ্ঠিত, ইহা দেখিয়া আমার মনে এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, কাণ্ট্ অর্দ্ধ সংশয়বাদী—অর্দ্ধ স্থিরবাদী। তা বই, যাঁহারা বলেন যে, কাণ্ট্ প্রকৃতপক্ষেই সংশয়বাদী, তাঁহাদের কথায় আমি কোনোক্রমেই সায় দিতে পারি না। তবে, এটা আমি মানি যে, আধুনিক ইউরোপের (বিশেষত ইংলণ্ডের) আর-আর খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ কাণ্টের দর্শনের উপরি-স্তরের তরঙ্গ-দোলায় দুলিয়া বেড়ানো একটা খেলা পাইয়াছেন মন্দ না; তাঁহাদের মস্তিষ্ক-চালনার পক্ষে তাহা একপ্রকার ফুটবল্ বা লন্-টেনিস্ বা পোলো। এতদ্ব্যতীত, কাণ্টের দর্শ-নের অন্তস্থলে যে অগাধ নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত জল রহিয়াছে, তাহার তাঁহারা বড়-একটা খোঁজ-খবর রাখেন না। কাণ্টের এই-শ্রেণীর বহির্ভক্ত চেলারা সংশয়বাদের লৌহ-শৃঙ্খলকেই আপনাদের কণ্ঠের হার করিয়া-ছেন, এ কথা খুবই সত্য—কিন্তু সে দোষ কাণ্টের নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, ইউরোপের দেখাদেখি নব্য ভারতবাসীরা তাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগের আবিষ্কৃত তত্ত্ব-জ্ঞানের পথকে ব্যাঘ্রের মতো ডরাইতে শিখিয়াছেন। ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকদিগের সাম্প্রদায়িক স্থূলদৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞানের পথ যে অধঃপতনের পথ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে—তাহা তো হইবারই কথা! তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোক যদি তাঁহাদের অন্ধকারা-চ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক কোটরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সাধের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দ্যায়, তবে তাঁহাদের আর থাকিবে কি? কিন্তু আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের তো আর সেরূপ মর্ম্মান্তিক বিরোধ নাই! উল্টা বরং বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিমূল যদি কিছু থাকে, তবে তাহা তত্ত্বজ্ঞান। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, অবিদ্যাই সমস্ত অনর্থের মূল; কেবল তত্ত্বজ্ঞানই পরম-পুরুষার্থের সোপান। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা—নব্যভারতের বিদ্বন্মণ্ডলীর মুখে প্রায়শই এইরূপ একটা ইউরোপীয় বাঁধি-গৎ যখন-তখন শুনিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনাতে সত্যকে পাওয়া যায় না—

লাভের মধ্যে কেবল সংশয়ই সার হয়। যেন—তত্ত্বজ্ঞান অবিদ্যারই নামান্তর। ন্যায়-শাস্ত্রীয় ঢেঁকীর কচ্‌কচিকেই তাঁহারা জানেন একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান। এ বোধ তাঁহাদের নাই যে, তত্ত্বজ্ঞান ঢেঁকির কচ্‌কচিও নহে, আর, সংশয়ের বিভ্রান্তিও নহে; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান সেই ধ্রুবতত্ত্বের জ্ঞান, যাহার সংস্পর্শে - "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি,"—হৃদয়ের গাঁট খুলিয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় পাইয়া যায়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলে কাণ্ট্ সংশয়-বাদীর সর্দ্দার বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহা কাহারো অবিদিত নাই; ইহাও কাহারো অবিদিত নাই যে, আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ সংশয়ের দিক্ দিয়াও যা'ন নাই, পরন্তু তাঁহাদের গন্তব্যপথে তাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং নিষ্ঠার সহিত প্রতিপদে অগ্রসর হইয়াছেন; তবুও যে আমি কাণ্ট্‌কে আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের দলভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না কেন, তাহার কারণ ঐ যাহা আমি একটু পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি;—কি? না, কাণ্ট্ নিতান্তই দায়ে পড়িয়া সংশয়-বাদে আক্রান্ত হইয়াছেন; তা বই, সংশয়বাদ তাঁহার প্রকৃত মনের কথা নহে। তাঁহার আবিষ্কৃত পথ নিতান্তই একটা নূতন পার্ব্বত্য-পথ, যদিচ তাহা ইউরোপের কাছেই নূতন—ভারতের কাছে বহুপুরাতন; অমন একটা নূতন পথের উচ্চশিখরে দৃঢ়তার সহিত ভর দিয়া দাঁড়ানো প্রথম আবিষ্কর্ত্তার পক্ষে কিরূপ অসমসাহসিক-কার্য্য, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কাণ্ট্ যে তাহা করিতে ইতস্তত করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আমরা একটুও দোষ দিতে পারি না। একা হাতে তিনি যাহা করিয়াছেন—যথেষ্ট করিয়াছেন! তাহার সংশয়বাদের জটিল জঙ্গলের মধ্য হইতে প্রকৃত তত্ত্বের আলোক স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল আলোকিত করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে—ইহা অনেকে হয় তো জানেন না, কিন্তু যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা দেখিতে পা'ন।

কাণ্টের মর্ম্মস্থানীয় গোড়ার কথা বেশী নহে দুই-তিনটি। একটি হ'চ্চে—পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, কি? না,—Thoughts without contents are empty, intuitions without concepts are blind—সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতিরেকে ভাবনা ফাঁকা, ভাবনা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি অন্ধ। কাণ্টের এ কথাটি বড্ড একটা নূতন কথা হইত, যদি সাংখ্যদর্শনের গোড়াতেই না থাকিত যে, প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষ খঞ্জ, পুরুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতি অন্ধ। ভাবনা তো ফাঁকা হইবেই; ভাবনা জোগাইতেছেন কে? না, সংবিৎরূপী বা চৈতন্যরূপী পুরুষ; ইনি যে খঞ্জ অর্থাৎ চলৎশক্তিরহিত। সাক্ষাৎ উপলব্ধি তো অন্ধ হইবেই—সাক্ষাৎ উপলব্ধি জোগাইতেছেন কে? না, প্রকৃতি; ইনি যে অন্ধ। সাংখ্য বলেন যে, পুরুষ খঞ্জ হইয়াও—খঞ্জ নহেন কেবল প্রকৃতির গুণে; প্রকৃতি অন্ধ হইয়াও—অন্ধ নহেন কেবল পুরুষের গুণে। কাণ্ট্ বলেন, ভাবনা ফাঁকা হইয়াও—ফাঁকা নহে কেবল সাক্ষাৎ উপলব্ধির গুণে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি অন্ধ হইয়াও—অন্ধ নহে কেবল ভাবনার গুণে।

কাণ্টের আর-একটি গোড়ার কথা হচ্চে—Synthetic unity of apperception—সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য। কাণ্ট্ বলেন—The synthetic unity of consciousness is an objective condition of all knowledge, a condition, not necessary for myself only, in order to know an object, but one to which each intuition must be subject in order to become an object for me. ইহার অর্থঃ—

সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ঘটিত-(অর্থাৎ বস্তুঘটিত)-মূল-নিবন্ধন। এম্নি-একটা মূল-নিবন্ধন—অর্থাৎ যাহা নহিলে নয় এম্নি-একটা গোড়ার কথা—যে, বস্তু জানিবার জন্য তাহা জ্ঞাতার পক্ষে তো আবশ্যক বটেই, তা ছাড়া, জ্ঞাতার জ্ঞানগোচরে উপনীত হইবার জন্য জ্ঞেয়বস্তুর পক্ষেও তাহা আবশ্যক। কাণ্ট্ এ যাহা বলিয়াছেন, এটা একটা জটিল দার্শনিক তত্ত্ব বটে, কিন্তু যতটা জটিল মনে হইতেছে, ততটা নহে। উহার মুখ হইতে দার্শনিক-ভাষার মুখোস্ খুলিয়া লইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহা রাক্ষসও নহে, দৈত্যও নহে, অসুরও নহে, পরন্তু উহা আমাদের একটি চিরপরিচিত ঘরের লোক। অতএব নিম্নে প্রণিধান করা হোক্।

লৌকিক-ব্যবহারের পক্ষে এ কথা খুব সত্য যে, আগে কাঁচা-মাল (raw material), পরে তৈয়ারি-জিনিষ (manufactured articles)। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়াইবেষ যে, যাহাকে আমরা কাঁচা-মাল ঠাওরাই, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাঁচা-মাল নহে; তাহাও তৈয়ারি-জিনিষ। চর্কাকাটা বুড়ীর নিকটে তুলা কাঁচা মাল, সূতা তৈয়ারি-জিনিষ; তাঁতির নিকটে সূতা কাঁচা-মাল, বস্ত্র তৈয়ারি-জিনিষ; দর্জ্জির নিকটে বস্ত্র কাঁচা-মাল, পোষাক তৈয়ারি-জিনিষ। তেম্নি আবার, ইষ্টকনির্ম্মাতার নিকটে মৃত্তিকা কাঁচা-মাল ইঁট তৈয়ারি-জিনিষ, রাজমজুরের নিকটে ইষ্টক কাঁচা-মাল, দেয়াল তৈয়ারি-জিনিষ। প্রকৃতিমাতার কাছে তুলাও তৈয়ারি-জিনিষ, মৃত্তিকাও তৈয়ারি-জিনিষ। বস্ত্রবয়ন করিবার পূর্ব্বে যেমন সূত্র সংগ্রহ করা চাই, তেম্নি বৃক্ষ ভাবিবার পূর্ব্বে বৃক্ষ যে কিরূপ, তাহা চক্ষে দেখা চাই; এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, বৃক্ষের মূর্ত্তি যাহা আমরা চক্ষে দেখি, তাহা কাঁচা-মাল এবং বৃক্ষের ভাব যাহা আমরা মনে ভাবি, তাহা তৈয়ারি-জিনিষ। এই গেল একদিকের কথা; আর-এক দিকের কথা এই যে, বস্ত্রই যে কেবল তৈয়ারি-জিনিষ, তাহা নহে—সূতাও তৈয়ারি-জিনিষ। সূতাই যে কেবল তৈয়ারি-জিনিষ, তাহা নহে—তুলাও তৈয়ারি-জিনিষ। মনে-ভাবা বৃক্ষই যে তৈয়ারি-জিনিষ, তাহা নহে—চক্ষে-দেখা বৃক্ষও তৈয়ারি-জিনিষ। তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, মনে-ভাবা বৃক্ষ তৈয়ারি করিবার কর্ত্তা আমরা আপনারা; চক্ষে-দেখা বৃক্ষ তৈয়ারি করিবার কর্ত্রী হ'চ্চেন প্রকৃতি। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, চক্ষে-দেখা বৃক্ষই হো'ক, আর মনে-ভাবা বৃক্ষই হো'ক, তাহা গড়িয়া তুলিবার মূল প্রকরণ-পদ্ধতি একইপ্রকার—সে প্রকরণ-পদ্ধতি হ'চ্চে সংযোজনা synthesis। শাখা-পত্র-

ফল-ফুলের সংযোজনা ব্যতিরেকে মনে-ভাবা বৃক্ষেরও গঠনকার্য্য সমাধা হইতে পারে না, চক্ষে-দেখা বৃক্ষেরও গঠনকার্য্য সমাধা হইতে পারে না। গঠনকার্য্যের মূল প্রকরণ-পদ্ধতি উভয়ত্রই সমান—এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, গঠন-কার্য্যের নির্ব্বাহকর্ত্তা কি দুই স্থলে দুই বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা দুই স্থলেই একই অভিন্ন ব্যক্তি। এক ব্যক্তিকে আমি ইষ্টক তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছি, আর-এক ব্যক্তিকে থাম তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছি, তাই আমি বলি যে, ইষ্টকের গঠন-কর্ত্তা স্বতন্ত্র, আর, স্তম্ভের গঠন-কর্ত্তা স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে, প্রকৃতি-মাতাকে আমি বৃক্ষ তৈয়ারি করিতে দেখি নাই, অথচ যখনই আমি বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই একেবারেই একটা তৈয়ারি বৃক্ষ আমার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। ইহাতে দর্শকের মনোমধ্যে এই-রূপ একটা সন্দেহ হইতে পারে যে, তবে বুঝি প্রকৃতিমাতা বাহিরে বসিয়া কার্য্য করেন না; তবে বুঝি তিনি প্রতিজনের অন্তরের অন্তঃপুরে বসিয়া কার্য্য করেন? নহিলে তাঁহাকে কেহ চক্ষে দেখিতে না পায় কেন? তবে কি আমার অন্তরে দুই ব্যক্তি একত্রে যুগলে-বাঁধা থাকিয়া—এক ব্যক্তি রচনা করিতেছেন বৃক্ষের দৃশ্য-মূর্ত্তি, আর-এক ব্যক্তি রচনা করিতেছেন বৃক্ষের ভাব-মূর্ত্তি? রূপক-চ্ছলে বলিতে-চাও-বলো দুই ব্যক্তি। পরন্তু কাণ্ট্ ও-জায়গায় বলেন একই জ্ঞানের দুই পৃষ্ঠ। এক পৃষ্ঠ হ'চ্চে আভাসচৈতন্য Emperical consciousness; আর এক পৃষ্ঠ হ'চ্চে কূটস্থচৈতন্য Transcendental consciousness; তাহার মধ্যে আভাস-চৈতন্য আহঙ্কারিক subjective অর্থাৎ ব্যক্তি-গত; কূটস্থচৈতন্য objective বস্তুগত অর্থাৎ সত্ত্বগত। তার সাক্ষী কাণ্ট্ বলিয়াছেন, The synthetic unity of apperception is an *objective* condition of all knowledge "সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য সমস্ত জ্ঞানের বস্তু-ঘটিত-মূল-নিবন্ধন।" এই কথা বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরে বলিয়াছেন যে, a condition not necessary for myself only, in order to know an object, but one to which each *intuition must be subject in order* to become an object for me. "সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য জ্ঞানের এম্নি-একটা মূল-নিবন্ধন যে, বস্তু জানিবার জন্য তাহা জ্ঞাতার পক্ষে তো আবশ্যক বটেই, তা ছাড়া, জ্ঞাতার জ্ঞানগোচরে উপনীত হইবার জন্য তাহা জ্ঞেয়-বস্তুর পক্ষেও আবশ্যক।" মোটামুটি সহজ ভাষায় বলিলাম জ্ঞেয়-বস্তু- কিন্তু কাণ্টের চুল-চেরা ভাষায় জ্ঞেয়-বস্তু হ'চ্চে Intuition অর্থাৎ সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয়; যেমন—প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বৃক্ষ। কাণ্টের কথার মর্ম্মনিহিত তাৎপর্য্য এই যে, সেই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বৃক্ষমূর্ত্তি, যাহাকে আমরা সচরাচর বলি প্রকৃতির স্বহস্তবিরচিত, তাহাতেও সংবিতের যোগাত্মক ঐক্যের কার্য্যকারিতা রহিয়াছে। একটা তৈয়ারি বৃক্ষ যখন আমা-দের চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, তখন, তাহা সেই সাংবিত ঐক্যের যোগসূত্রে বাঁধা হইয়াই আমাদের চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত

হয়। কাণ্টের এই দুরূহ কথাটা খুব সহজ ভাষায় মোটামুটি বলিয়া বুঝানো যাইতে পারে এইরূপে: একই অভিন্ন ব্যক্তি দর্শন এবং চিন্তন, উভয় কার্য্যের কর্ত্তা। বৃক্ষ দেখিবার সময় যে ব্যক্তি চাক্ষুষ আলোকে শাখাপত্র-ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষের মূর্ত্তি সংগঠন করে, বৃক্ষ ভাবিবার সময়েও সেই ব্যক্তি মানসিক আলোকে শাখাপত্র-ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষের ভাব সংগঠন করে। সংযোজনা কার্য্য দুইস্থলেই সমান চলে; ভাবনা-কার্য্যেও যেমন চলে—দর্শন-কার্য্যেও তেমনি চলে। কাজেই বলিতে হয় যে, সংযোজনা-কার্য্য synthesis জ্ঞানের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। সংযোজনা মস্ত একটা টানা-জাল। সেই টানা জালে কালের এক মুহূর্ত্তের সঙ্গে আর-আর মুহূর্ত্তের এবং আকাশের এক দেশের সঙ্গে আর আর দেশের যোগ বাঁধা হইয়া পড়িতেছে নিত্য-নিয়ত। সেই মহাবিস্তীর্ণ যোগ-রশ্মিজালের কেন্দ্রস্থানে অধিষ্ঠান করিতেছে সাংবিত ঐক্যের জ্যোতির্ম্মণ্ডল। আর, সাংবিত ঐক্য ঐ মহাবিস্তীর্ণ যোগজালের কেন্দ্রাধিষ্ঠিত বলিয়া কাণ্ট্ সাংবিত ঐক্যের বিশেষণ দিয়াছেন যোগাত্মক। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যোজনা-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবিতের ঐক্য আমাদের জ্ঞানের উপলব্ধি-গোচর হয়। গায়ক যখন স্বরপরম্পরা সংযোজনা করিয়া গান করে, তখনই আপনাকে গায়করূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে। আমরা যখন আলোক-রশ্মিযোগে শাখাপত্র-ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষ দর্শন করি, তখনই আমরা বৃক্ষের দ্রষ্টারূপে আপনাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। যখন আমরা মনোমধ্যে শাখাপত্র-ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষের একটা ভাব দাঁড় করাইতে চেষ্টা করি, তখন আমরা বৃক্ষের মন্তারূপে আপনাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। যখন আমরা বৃক্ষের দৃশ্যমূর্ত্তিতে বৃক্ষের মানসিক ভাব সংযোজিত করিয়া বা অধ্যা-রোপিত করিয়া উভয়ের ঐক্য অবধারণ করি, তখন আমরা আপনাকে বোদ্ধারূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। সুষুপ্তিকালে যখন আমরা সংযোজনার জাল গুটাইয়া-লইয়া ও-সকল কিছুই করি না—তখন আমরা আপনাকে কোনো-কিছু-রূপেই উপলব্ধি করি না। প্রথমে কাণ্ট সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং ভাবনার মধ্যে প্রভেদের সূচনা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতিরেকে ভাবনা ফাঁকা—ভাবনা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি অন্ধ। তাহার পরে ভাবনা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধি দুইকে সংবিতের যোগাত্মক ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া অভেদ-জ্ঞানের গোড়া'র কথাটি ইঙ্গিতচ্ছলে ব্যক্ত করিয়াছেন। কাণ্টের ভিতরকার কথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তাহা-কেই বলা যাইতে পারে, যাহাতে ভাবনা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধি পরস্পরের সহিত একীভূত। অর্থাৎ যেখানে ভাবনাও যা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধিও তা, একই। এইরূপ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের নাম দিয়াছেন কাণ্ট্ Intellectual intuition।

কাণ্ট্ বলেন "And yet this (অর্থাৎ সাংবিত সংযোজনা) need not be a principle for every possible understanding, but only for that which gives nothing manifold through

its pure apperception in the representation, I am. An understanding which through its self-consciousness could give the manifold of intuition, and by whose representation the object of that representation should at the same time exist, would not require a special act of the synthesis of the manifold for the unity of its consciousness, while the human understanding which possesses the power of thought only, but not of intuition, requires such an act

ইহার তাৎপর্য্যার্থ :—

"আমি সব জ্ঞানের সম্বন্ধে বলিতেছি না—কেবল আমাদের জ্ঞানের সম্বন্ধেই বলিতেছি যে, সংযোজনা জ্ঞানের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। আমাদের জ্ঞানে আমি আছি বলিলেই কিছু আর সব আছে বুঝায় না। পরন্তু যে জ্ঞান এরূপ যে, তাহার আত্মসত্তাতেই সর্ব্বসত্তা সিদ্ধ হয়, সে জ্ঞানের সাংবিত ঐক্য প্রতিপাদনের জন্য বিচিত্র বিষয়সকলের সংযোজনা-রূপিণী স্বতন্ত্র একটি প্রক্রিয়া নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, মনুষ্যের বুদ্ধিতে কেবল ভাবনা-প্রবর্ত্তনেরই শক্তি আছে, তা বই, সাক্ষাৎ উপলব্ধি-সংঘটনের শক্তি নাই; তাই মনুষ্যবুদ্ধির সাংবিত ঐক্যের জন্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি-গোচর বিচিত্র বিষয়সকলের সংযোজন-ক্রিয়া নিতান্তই আবশ্যক।" কাণ্টের এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ভাবনাশক্তি আমাদের নিজের শক্তি; পরন্তু সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটাইবার শক্তি আমাদের নিজের নহে;—এ শক্তি ঐশী শক্তি। এইজন্য, সেই ঐশী শক্তির প্রসাদলব্ধ সাক্ষাৎ উপলব্ধি-গোচর বিষয়সকল আত্মসাৎ করিবার জন্য, সংযোজন-ক্রিয়ার বা ভাবনার পরিচালনা আমাদের জ্ঞানের পক্ষে আবশ্যক। পক্ষান্তরে, উপনিষদে আছে "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" -ঈশ্বরের জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐশ্বরিক জ্ঞান সংযোজনারূপিণী প্রক্রিয়ার বশবর্ত্তী নহে। কাণ্টের এই জায়গা'র কথাটি বিশেষমতে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক; অতএব বারান্তরে তাহার যথাবিহিত চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

কর্ম্মক্ষেত্র।—শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা।

আমাদিগকে দায়ে পড়িয়া অনেক বাঙ্গলা উপন্যাস পড়িতে হয়। তাহার অধিকাংশই পড়িতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, সময়ের অপব্যয় স্বীকার করিতে হয়, এবং

পরিচয় দিতে 'বঙ্গদর্শনে'র খানিকটা স্থান নষ্ট করিতে হয়। কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াই এই কষ্ট ও বিড়ম্বনা আমরা স্বীকার করি; ইচ্ছাধীন হইলে অনেক বাঙ্গলা উপন্যাসই দুইচারি পাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতাম। সেইজন্য, কদাচিৎ একআধখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস যখন হাতে আসে, তখন আমাদের বড়ই আহ্লাদ হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ উপেক্ষা করিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করে। এই উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি।

গ্রন্থকার যে মানবচরিত্রজ্ঞ এবং রসাবতারণায় সুনিপুণ, তাহার পরিচয় এই উপন্যাসের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। যেখানে যে রসের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে সেই রসই বেশ্ ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে হাস্যরসের চেষ্টা আছে, সেখানে না হাসিয়া থাকা যায় না; যেখানে করুণরসের উদ্যম, সেখানে হৃদয় আর্দ্র হইয়া আইসে, যেখানে মনুষ্যচরিত্রের পাশবিকতার অবতারণা, সেখানে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। ইহাই ত সাহিত্যিক দক্ষতা।

চরিত্রচিত্রণেও গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। বিরাজমোহিনী, তরঙ্গিণী, অদ্বৈত ঘোষ এবং তাহার পত্নী অনঙ্গমঞ্জরী, এই কয়টি চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে—নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারেই ফুটিয়াছে। ইহার মধ্যে অনঙ্গমঞ্জরী বিশেষরূপে উল্লেখের যোগ্য। এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ অভিনব, মৌলিক, অথচ স্বভাবানুবর্ত্তী। এই চরিত্রের কল্পনা ও পরিণতির জন্য দামোদরবাবুর বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। সনাতন মুখোপাধ্যায় এই উপাখ্যানের প্রাণস্বরূপ -সকল অনুষ্ঠানের, সকল ঘটনার, সকল পরিণতির তিনিই মূলীভূত—অথচ তাঁহার চরিত্র এই উপন্যাসে সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, কতকটা পুস্তকখানি পড়িয়া জানিতে হয়, কতকটা ভাবিয়া লইতে হয়; তবে, ভাবিয়া লইতে পারা যায়, এরূপ উপকরণ পুস্তকেই আছে। সনাতন-চরিত্রের এই অপরিস্ফুটতা, গ্রন্থকারের নিন্দার কথা নহে; বরং তাঁহার প্রশংসার কথা। কার্য্যত তিনি ত সংসারক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবেই বিচরণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার চরিত্র কতকটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন। আর, তিনিই উপন্যাসের প্রাণ বলিয়াই হয় ত পরিস্ফুট নহেন। প্রাণ ত চিরকালই এবং সর্ব্বত্রই প্রচ্ছন্ন—অন্তরালে অবস্থিত।

এই পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"সাধ্যমতে স্বার্থসিদ্ধির বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া যথাসম্ভব পরহিত-সাধনব্রত গ্রহণ করিতে পারিলে, মানব স্বকীয় আত্মার এবং সমাজের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত করিতে পারেন, এই তত্ত্বকথা বর্ত্তমান সামান্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।"

আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি যে, গ্রন্থকার ইহা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। উপন্যাসখানি সর্ব্বতোভাবে সমাদৃত হইবার উপযুক্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য।

যাপান।

১ম প্রস্তাব]

মুসলমানরাজশক্তি এশিয়াখণ্ডের জলে-স্থলে প্রবলপ্রতাপে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার পূর্ব্বকালপর্য্যন্ত ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের বাণিজ্যব্যাপারে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের নৌবিদ্যাবিশারদ অধিবাসিবর্গের একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবার কথা নানাদেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশান্তমহাসাগরের বহুসংখ্যক দ্বীপ-উপদ্বীপে অদ্যাপি তাহার নানা নিদর্শন বর্ত্তমান আছে।

কোন্ পুরাকালে এই বাণিজ্যপথ আবিষ্কৃত হইয়া ভারতবর্ষের প্রভুত্ববিস্তারের সূত্রপাত করে, তাহার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যতদিনের ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারও বহুপূর্ব্বে ভারতবাসীর সমুদ্রপথে বিবিধ দ্বীপে ধাবিত হওয়া সম্ভব। ইহা সমুদ্রোপকূলের মানবসমাজের সাধারণ কাহিনী। স্বাভাবিক কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা জীবিকার্জ্জনের অভিনব-উপায়-উদ্ভাবন-কামনায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী মানবসমাজ যে-কোন উপায়ে সমুদ্রপথে বিচরণ করিবার চেষ্টা করে; প্রথমে নিকটে-নিকটে ক্রমে দূরে-দূরে গমনাগমন করিতে করিতে অর্ণবপোতের গঠন ও চালনকৌশল আবিষ্কার করিয়া মানবসমাজ বাণিজ্যের সঙ্গে রাজ্য ও জ্ঞান বিস্তারের সূত্রপাত করিয়া থাকে। সকল দেশেই ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভারতবর্ষেও এইভাবেই অতি পুরাকালে সমুদ্রপথে গমনাগমন প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

দ্বিসহস্রবৎসর পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষের অধিবাসিবর্গের পক্ষে সমুদ্রপথে দেশবিদেশে বাণিজ্যযাত্রার প্রথা পূর্ণপ্রতাপে প্রচলিত ছিল, তাহার নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদুপলক্ষে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-উপদ্বীপে কতদূর পর্য্যন্ত ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য আমরা এ পর্য্যন্ত যথারীতি চেষ্টা না করিলেও, পাশ্চাত্য লেখকবর্গের গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে ক্রমশ নানা তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। প্রশান্তমহাসাগরের অসংখ্য

দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সাহিত্য, বর্ণমালা ও উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়া এশিয়াখণ্ডের জলে-স্থলে ভারতীয়-জ্ঞানসাম্রাজ্য-বিস্তারের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাহাদের অকুতোভয় অধ্যবসায়ে অতি পুরাকালে এই জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাদের কথা স্মরণ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

সেকালের লোকের নিকট বাষ্পবলে জলযান পরিচালনা করিবার কৌশল অপরিচিত ছিল; অর্ণবপোতের নির্ম্মাণকৌশলও পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। যাহাঁরা সেই অসম্পূর্ণ গঠন ও চালনকৌশলের উপর নির্ভর করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল অপরিজ্ঞাত সমুদ্রপথে দূরদেশে গমনাগমন করিত, তাহাদের সাহস ও অধ্যবসায় কাহার না বিস্ময় উৎপাদন করিবে?

ভারতবর্ষের লোকে অতি পুরাকালেই প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পর্য্যবেক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সমুদ্রপথে নৈসর্গিক নিয়মে যে বায়ুপ্রবাহ প্রচলিত আছে, তাহা পুরাকাল হইতে এক নিয়মে এক পথে এক ভাবেই চলাচল করিয়া আসিতেছে। ইহাকে আধুনিক সভ্যসমাজ "বাণিজ্যবায়ু" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই বায়ুপ্রবাহ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছে। দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত বাণিজ্যবায়ু কিয়ৎকাল পরে উত্তরপূর্ব্ব হইতে পুনরায় দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য সিংহল, সুমাত্রা ও প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে নৈসর্গিক বায়ুপ্রবাহের সহায়তায় পোতচালনা করা যাইতে পারে। এই পথেই ভারতীয় বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বঙ্গোপকূল হইতে প্রশান্তমহাসাগরে গমন করিতে হইলে প্রথমে দক্ষিণাবর্ত্তে সিংহলে উপনীত হইয়া তথা হইতে সুমাত্রাদ্বীপের শ্রীভোজনামক প্রসিদ্ধ বন্দরে ও তথা হইতে প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে অর্ণবপোত চালনা করিতে হইত। তজ্জন্য সিংহল ও সুমাত্রা ভারতীয় সমুদ্রযাত্রায় প্রধান আশ্রয়স্থলে পরিণত হইয়াছিল। এই পথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের জ্ঞানগৌরব বহুদূরদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচ্যশিল্পাদর্শের ইতিহাসলেখক যাপাননিবাসী স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত কাকাসু ও কাকুরা ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—মুসলমানের দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের নাবিকগণ পুরাতন বাণিজ্যপথে অগ্রসর হইয়া সিংহল, যবদ্বীপ ও সুমাত্রায় উপনিবেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক চীনসাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং তৎসূত্রে ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের সমুদ্রোপকূলে বর্ণসঙ্কর জাতির অভ্যুদয় সাধিত হয়।*

* Down to the days of the Mahomedan conquest went, by the ancient highways of the sea, the intrepid mariners of the Bengal coast, founding their colonies in Ceylon, Java and Sumatra, leaving Aryan blood to mingle with that of the seaboard races of Burma and Siam, and finding Cathay and India fast in mutual intercourse.—*Ideals of the East*

যে শক্তি এইরূপে নিকট হইতে দূরে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে,—ভারতবর্ষের প্রভাববিস্তারের সহায়তাসাধন করিয়াছিল, তাহা চীনরাজ্যে ব্যাপ্ত হইবার পর যাপানদ্বীপপুঞ্জেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তজ্জন্য যাপান বহুদূরে অবস্থিত হইয়াও আমাদের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ। যাঁহারা যাপানের নবজীবনদাতা ভুবনবিখ্যাত কর্ম্মবীর, তাঁহারা কেহই যাপানের আদিমনিবাসী বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—তাঁহারা সূর্য্যবংশসম্ভূত। যাহারা জাপানের আদিমনিবাসী, তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি উত্তরাংশে বাস করিতেছে। সূর্য্যবংশোদ্ভূত নবাগত বীরবৃন্দের আক্রমণে পরাভূত হইয়া তাহারা ক্রমে উত্তরাঞ্চলে পলায়ন করায় যাপানদ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলে দিগ্বিজয়িগণের উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। এই সূর্য্যবংশোদ্ভূত বীরবৃন্দ কোন্ দেশ হইতে যাপানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও তাহার উত্তরসীমাসংলগ্ন মালভূমির ক্ষত্রিয়গণই সূর্য্যবংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। সে হিসাবে যাপানের সহিত ভারতবর্ষের কোন সংস্রব থাকিলেও তাহার প্রমাণ আবিষ্কার করিবার সম্ভাবনা নাই। রক্তসংস্রবে যাপাননিবাসী সূর্য্যবংশীয়গণ ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত না হইলেও, জ্ঞানসংস্রবে উভয় দেশের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ সময়ে কি সূত্রে কোন্ পথে যাপানের ন্যায় সুদূর সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য এখনও প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

একদিকে আমেরিকা, অন্যদিকে রুষ ও চীনসাম্রাজ্য, তাহার মধ্যস্থলে যাপানদ্বীপপুঞ্জ এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের সন্ধিক্ষেত্ররূপে দণ্ডায়মান। তথায় চীনসাম্রাজ্যের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকায় ভাষা ও সাহিত্যে তাহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। চীনসাম্রাজ্যের ভিতর দিয়াই যাপানদ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ডের যুক্তরাজ্য অপেক্ষা আয়তনে কিঞ্চিৎ বড় অথচ ক্ষুদ্র-বৃহৎ তিনসহস্র দ্বীপে বিভক্ত যাপানরাজ্য কিরূপে ভারতবর্ষের প্রভাবে পুরাকালে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস নিরতিশয় কৌতূহলের আকর। এশিয়াখণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এরূপ সুদূরদেশে এত ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে ভারতবর্ষের জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

আধুনিক এশিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। কাহারও সহিত কাহারও আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করিবার উপায় নাই। তাহার উপর ভাষা, ধর্ম্ম ও আচারগত পার্থক্যে এশিয়ার আধুনিক অধিবাসিগণ পরস্পরের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে অসমর্থ। এই অসহায় অবস্থার সন্ধানলাভ করিয়া পাশ্চাত্য প্রবলপুরুষগণ এশিয়ার নানাবিভাগে অধিকার স্থাপন করিয়া এশিয়ার পূর্ব্বগৌরব বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন।

এখন সমগ্র এশিয়াখণ্ড ইউরোপের ক্রীড়া-কন্দুক।

পুরাকালে এশিয়ার অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল না। নদ নদী-পর্ব্বত-প্রান্তর এশিয়ার মধ্যে ভৌগোলিক সীমা নির্দ্দেশ করিয়া এশিয়াকে নানা দেশে বিভক্ত করিলেও, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে এক অখণ্ড জ্ঞানসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীনের শিক্ষা ও ভারতবর্ষের জ্ঞান সেই মহাদেশকে সমুন্নত করিয়া এশিয়া হইতে আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত জ্ঞানবিস্তার করিয়াছিল। অন্যান্য প্রমাণ অল্পাধিকপরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি এশিয়ার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের ধর্ম্মই সমগ্র সভ্যসমাজের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত রহিয়াছে।

অতি পুরাকাল হইতেই এশিয়ার লোকে জ্ঞানের সমাদর করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। বাণিজ্যপথে এক দেশের লোক অন্যদেশে গমনাগমন করিয়া এক দেশের জ্ঞান অন্যদেশে বিস্তৃত করিয়া দিত। কোন্ জ্ঞান প্রথমে কোন্ দেশে উদ্ভূত হইয়াছিল, এতকাল পরে তাহার তথ্যনির্ণয় করা অসম্ভব। পুরাকালে এশিয়াখণ্ডে যে জ্ঞানালোক জ্বলিয়া উঠে তাহা সকল বিভাগকেই আলোকিত করিয়াছিল। তাহা এশিয়াবাসীর সাধারণ সম্পত্তি। তজ্জন্য এশিয়া অন্যদেশের নিকট ঋণ স্বীকার করে না।

অধিবাসিগণ দুই ভাবে জীবনযাপন করিত বলিয়া দুই শ্রেণীর শিক্ষা এশিয়াবাসীকে সমুন্নত করিয়াছিল। একশ্রেণী ভ্রমণশীল, অপরশ্রেণী গৃহবাসী। যাহারা নিয়ত দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া নানাদেশে বাস করিত, তাহারা কালক্রমে চীনদেশে আসিয়া গৃহবাসী হয়; যাহারা ভ্রমণবিমুখ, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে আশ্রমস্থাপন করিয়াছিল। যাহারা মধ্য-এশিয়ায় বিচরণ করিত, তাহারা হয় চীন না হয় ভারতবর্ষের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইত। তজ্জন্য মধ্য-এশিয়ায় চীন ও পূর্ব্বপশ্চিমাংশে ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার আদর্শরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই উভয় পুরাতন রাজ্যেই বিবিধ বিদ্যা সমুন্নত হইয়া মানবসমাজের গৌরববর্দ্ধন করে। ভারতবর্ষে মানবসভ্যতা-বিকাশের ইতিহাস কিয়ৎপরিমাণে সুপরিচিত। চীনদেশে মানবসভ্যতাবিকাশের ইতিহাস সেরূপ সুপরিচিত নহে। তজ্জন্য তাহার আলোচনা আবশ্যক।

কাকাসু ও কাকুরা চীনদেশের ইতিহাসের দশটি ভিন্ন ভিন্ন সুবার কল্পনা করিয়াছেন। তদনুসারে খৃষ্টাবির্ভাবের সহস্রবৎসর পূর্ব্ব হইতে চীনদেশের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। চীন তদপেক্ষা বহুপুরাতন সভ্যদেশ। কোন্ সময়ে সে দেশে সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু তিনসহস্র বৎসরের বহুপূর্ব্বেও যে চীন-সাম্রাজ্য বিবিধ বিদ্যার অধিকারী হইয়া সভ্যতা-সোপানে সমুন্নত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিবার উপযুক্ত কারণের অভাব নাই।

তাতারদেশের চিরভ্রমণলোলুপ উদ্ধত-স্বভাব মানবসমাজ চীনদেশে উপনীত হইয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় হইতেই সে দেশে সভ্যতাবিকাশের সূত্রপাত হয়। যাহারা নিয়ত তরবারিহস্তে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিত, তাহারা একস্থানে সমাজবন্ধন করিয়া

হলকর্ষণে নিযুক্ত হইলেও, তাহাদের মধ্যে পুরাতন সংস্কার সহসা তিরোহিত হয় নাই। সময়ে সময়ে তাতার হইতে নূতন নূতন মানবপ্রবাহ চীনদেশের জনসমুদ্রে মিলিত হইয়া পূর্ব্বসংস্কার নিরন্তর জাগরূক রাখিত। তজ্জন্য চীনদেশে ব্যক্তিগত অপেক্ষা জাতিগত ভাব বিশেষভাবে বিকশিত হয়। ভারতবর্ষের অধিবাসিবর্গের মধ্যে কুলগত ভাব প্রবাহিত হইয়া কালে ব্যক্তিগত ভাব পরিস্ফুট করিয়াছিল। দুইটি বিভিন্ন কারণের উত্তেজনায় এই দুই পুরাতন মানবসমাজে দুই পথে সভ্যতার বিকাশ সাধিত হইতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নিয়ত আত্মোন্নতিসাধনের জন্য ধর্ম্মপ্রবণ হইয়া নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হয়; চীন কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া নিয়ত সমাজোন্নতিসাধনের জন্য কর্ম্মপ্রবণ হইয়া নানা কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ভারতের চিন্তা, ভারতের জ্ঞান প্রত্যেক মনুষ্যকে সমুন্নত করিয়া সমগ্র সমাজের সমুন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছে, চীনের চিন্তা, চীনের জ্ঞান সমগ্র সমাজকে সমুন্নত করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের সমুন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছে। তজ্জন্য উভয় দেশের চিন্তা বিভিন্নপথে ধাবিত হইলেও, মানবহিতৈষণা উভয় দেশেরই মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টাবির্ভাবের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীন ও ভারতবর্ষ এইরূপ বিভিন্ন উপায়ে মানবহিতাকাঙ্ক্ষা সাধন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে সহসা মতপার্থক্য বিদূরিত হইয়া উভয় সাম্রাজ্যের জ্ঞানসম্মিলন সাধিত হইয়া যায়। তাহার ফলে এশিয়াখণ্ডে কনফ্যুশস্ ও শাক্যসিংহের প্রচারিত ধর্ম্মমতের ঐক্য স্থাপিত হইয়া এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল।

'সু'নামক চীনদেশের সুবিখ্যাত রাজবংশের আধিপত্য প্রবল থাকিবার সময়ে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগে কনফ্যুশসের সমাজহিতৈষণার সুপরিচিত মূলমন্ত্র বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। পুরাকাল হইতে নানাভাবে চীনদেশে সে কথা সূত্ররূপে পুনঃপুন ব্যাখ্যাত হইয়া মানবসমাজকে সমাজোন্নতির জন্য কর্ম্মনিষ্ঠ করিতেছিল, কনফ্যুশসের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় তাহাই জনসমাজে সুপরিচিত হইয়া চীনের ধর্ম্মমত বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাকে ধর্ম্মমত বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। ইহার সহিত পরকালের সংস্রব নাই, মানবাত্মার সংস্রব নাই, সকল কথাই ইহকালের কথা, জনসমাজের কথা, প্রত্যক্ষ সুখ-দুঃখ ও উন্নতি-অবনতির কথা। সে কথা লোকে বুঝিত, লোকহৃদয়ে তাহার জন্য অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকিয়া মানবসমাজকে পুরাকাল হইতেই লোকহিতৈষণায় উদ্দীপিত করিত। তাহাই অভিনব উৎসাহে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া চীনের নরনারীর নিকট ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিতে লাগিল। কনফ্যুশসের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি সমাজোন্নতির কামনায় আত্মত্যাগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য অল্পলোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য জনসাধারণ ব্যাকুল হইল না; তাহারা কেবল আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যই শিক্ষা করিতে লাগিল।

শাক্যসিংহও আত্মত্যাগের শিক্ষায়

প্রত্যেক মনুষ্যকে সমুন্নত করিয়া সমগ্র মানবসমাজের সমুন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অল্পলোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল; জনসমাজ তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া কেবল আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যই শিক্ষা করিতে লাগিল। সমগ্র এশিয়াখণ্ডে আত্মত্যাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতীয় জ্ঞান ও চীনদেশের শিক্ষার সমন্বয় সাধন করিয়া সর্ব্বত্র নবযুগের প্রবর্ত্তন করিতে লাগিল। খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বেই এই অভিনব ধর্ম্মমত মধ্য-এশিয়ায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতবর্ষ হইতে পাশ্চমাভিমুখে ধাবিত হইয়া ভূমধ্যসাগরতীরে ও পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইয়া প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপ-উপদ্বীপে ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল। খৃষ্টাবির্ভাবের সমসময়ে তাহা চীনরাজ্যেও প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। চীন তাহাকে নূতন মত বলিয়া মনে করিতে পারিল না। সুতরাং কনফ্যুশস্ ও শাক্যসিংহ তুল্যভাবে পূজা প্রাপ্ত হইলেন।

এই সমন্বয় সাধিত হইবার পূর্ব্বে চীনদেশের পশ্চিমাংশে ও ভারতবর্ষের উত্তরাংশে এশিয়ার সমুন্নত মধ্যদেশে যে জাতি বাস করিত, তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের জ্ঞানের প্রভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইত। তাহারা সভ্যসমাজের ইতিহাসে নানা নামে অভিহিত; তাহাদের কোন শাখা ভারতে ও কোন শাখা চীনদেশে আপতিত হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব সাধিত করিত। 'সু'নামক রাজবংশের শাসনসময়ে মধ্য-এশিয়ার এই সকল উদ্ধত বীরপুরুষ চীনদেশে সারথির কার্য্যে নিযুক্ত হইত। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাহারা চীনদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া সিন্‌নামক রাজবংশের অধিকার স্থাপন করে এবং কিছুকালের মধ্যে তাহাদের অন্য শাখা কাশ্মীর ও মধ্যভারতে তুরুষ্করাজবংশের আধিপত্য বিস্তার করিয়া দেয়। কণিষ্কনামক ইতিহাসবিখ্যাত নরপতি ভারতাভিযানের নেতা হইলেও, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরক্ত ছিলেন। মহারাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়দর্শী অশোকের অনুশাসনে যে ধর্ম্ম নানাদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কণিষ্কের কল্যাণে তাহা আরও সুদূরদেশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তজ্জন্য চীন ও যাপানসাম্রাজ্যে কণিষ্কের নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

বৌদ্ধধর্ম্ম বহুদেশে ব্যাপ্ত হইয়া বহুপ্রকারে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এক দেশে একরূপ, অন্যদেশে অন্যরূপ আচারব্যবহার ও অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। নদীর উৎপত্তিস্থানের নদীর আয়তন, গতি ও বিমল জলরাশি যেমন নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইবার সময়ে ক্রমশ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, বৌদ্ধধর্ম্মের বিপুল প্রবাহের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে ধাবিত হইবার পূর্ব্বেই মতপার্থক্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, এখন তাহার শাখা গণনা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ উত্তর ও দক্ষিণ নামক দুইটি প্রধান বিভাগ কল্পনা করিয়া মহাযান ও হীনযান নামক দুইটি প্রধান শাখার বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই উভয় শাখাই নানারূপ মতপার্থক্যে বহুসংখ্যক প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণের পূর্ব্বসংস্কার

ও অজ্ঞানতার সহিত সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম নানাদেশে নানাভাবে প্রবেশলাভ করিয়া স্থানে স্থানে তাহার মূলমন্ত্র পর্য্যন্ত রূপান্তরিত করিতে ত্রুটি করে নাই। চীনসাম্রাজ্যে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়াছিল, নানা কারণে তাহার সহিত নানা মতভেদ ও মলিনতা সংযুক্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য চীনদেশ হইতে ধর্ম্মপিপাসু সন্ন্যাসিগণ নানা সময়ে গুরুস্থান ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। বাণিজ্যের সংস্রব অপেক্ষা ধর্ম্মের সংস্রব একসময়ে ভারতবর্ষের দিকে চীনদেশের লোকচিত্ত অধিকতর আগ্রহে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান প্রচারের ধর্ম্ম। তাহা যেখানে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া পুনরায় তথা হইতে অন্যস্থানে প্রচারিত হইয়াছে। প্রথম প্রচার-ক্ষেত্র বারাণসীধাম হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যা-বর্ত্তে ব্যাপ্ত হইবার সময়ে কাশ্মীর ও গান্ধারের পথে পশ্চিমাঞ্চলে এবং অঙ্গবঙ্গের পথে পূর্ব্বাঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছিল। কাশ্মীর হইতে উত্তরাঞ্চলে এবং পাটলিপুত্র হইতে দক্ষিণাঞ্চলে প্রচারিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম জলে-স্থলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদা কাশ্মীর ও গান্ধার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান আশ্রয়-স্থান হইয়া বহুসংখ্যক বিখ্যাত বৌদ্ধসন্ন্যাসীর জন্মভূমি বলিয়া ইতিহাসে গৌরবলাভ করে। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে বৌদ্ধধর্ম্মে বহুগ্রন্থ নির্ম্মিত ও প্রচারিত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে দিগ্-দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। চীনসাম্রাজ্যে অদ্যাপি তাহার প্রভাব বর্ত্তমান। চীনদেশ হইতে বৌদ্ধমত মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার পথে যাপানদ্বীপপুঞ্জে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সেই সূত্রে যাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে পরিচয় সংস্থাপিত হইলে ভারতবর্ষের অন্যান্য জ্ঞানও যাপানদ্বীপপুঞ্জে ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

যাপানে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্য-এশিয়ায় শক-হূন প্রভৃতি প্রবলজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে নানা নূতনরাজ্যে প্রবেশলাভ করে। ভারতবর্ষ হইতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধমত চীনদেশে প্রচারিত হইলেও হূনদিগের দ্বারা নানা ভ্রান্তসংস্কারও প্রচারিত হইয়াছিল। হূন-জাতি চীনসাম্রাজ্যে অধিকারবিস্তার করিয়াই সে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে। তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সন্ন্যাসিগণ চীন-দেশে আধিপত্যবিস্তার করিয়া তদ্দেশে ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভারতবর্ষের বৌদ্ধশ্রমণ চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কাকাসু ও কাকুরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নানারূপ তথ্যানুসন্ধানের পর লিখিয়া-ছেন,—বঙ্গোপকূল হইতে সমুদ্রপথে ও মধ্যভারতের* মরুভূমির পথে প্রচারকগণ ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমনাগমন করিতেন।

* This history of the long succession of important teachers, implying the constant flow of a stream of wandering thinkers from India to

এই উভয় পথই নিরতিশয় দুর্গম। সে পথে যাঁহারা গমনাগমন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মধ্যপথে জীবনবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেন। অথচ এই দুর্গমপথে ভারতবর্ষের ও চীনদেশের বৌদ্ধশ্রমণগণ কি অক্লান্ত অধ্যবসায়ে অকুতোভয় পদবিক্ষেপে ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মশিক্ষার অনুরাগে নিরন্তর ধাবিত হইতেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া ভারতবর্ষের যে প্রদেশ চীন ও যাপান-সাম্রাজ্যের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাঙালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রপথ বাঙালীর আয়ত্ত বলিয়া তাহারা প্রশান্তমহাসাগরের সর্ব্বস্থলে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্যের সঙ্গে ধর্ম্মবিস্তার করিত। যাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইবার পর তদ্দেশে ভারতবর্ষের শ্রমণগণের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়া ভারতীয় জ্ঞানবিস্তারের সহায়তাসাধন করে।

পৃথিবীতে বাঙালীর নাম চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাসের অভাবে সে কলঙ্ক কল্পনাবলে ক্রমে ঘনীভূত করিয়া লেখকবর্গ তাহাকে দুরপনেয় করিয়া তুলিতেছেন। বাঙালী আজি অধঃপতিত হইলেও, চিরদিন এরূপ অধঃপতিতভাবে জীবনযাপন করে নাই। তাহার জীবনেও একদা গৌরবের দিন আসিয়াছিল। সেদিন বাঙালীর বীরবাহু দিগ্বিজয়ে বিশ্ব বশীভূত করিয়া রাজসিংহাসন অপহরণ করিতে সমর্থ না হইলেও, জ্ঞানবিস্তারে ভারতবর্ষের মুখ সমুজ্জ্বল করিয়া জগতে কীর্ত্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার চিহ্ন প্রশান্তসাগরের দ্বীপপুঞ্জের ভগ্ন-মন্দিরে বা গিরিকোটরে অদ্যাপি পর্য্যটকবর্গের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। যাপানেও তাহার চিহ্ন লুপ্ত হয় নাই!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

China throughout the period, raises the interesting question of the means of intercourse. It appears that besides the searoute from the Bengal Coast by Ceylon to the mouth of the Yang-tse-kiang, there were two great landways, which both began at Fonko in China, at the mouth of the Gobi Desert, divided before reaching the Oxus, into the northern and southern passes of Tensan, and so on to the Indus.— *Ideals of the East.*

নৌকাডুবি।

৩৫

রমেশ ঠিক করিয়াছিল কলিকাতায় সে কেবল কাজ সারিয়া চলিয়া আসিবে, কলুটোলার সে গলির ধার দিয়াও যাইবে না। সেদিনকার শরৎ-মধ্যাহ্নে লজ্জায়, সজ্জায় অভিমানে বিজড়িত কমলার সেই মূর্ত্তিখানি রমেশের হৃদয়ের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। গাজিপুর হইতে রেলগাড়ি করিয়া যখন সে চলিয়াছিল দুই ধারে হেমন্তের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র অগ্রহায়ণের সোনার রৌদ্রে ঝলকিয়া উঠিতেছিল—তখন সেদিনকার সেই আরক্তিম মুখচ্ছবিটুকু এই হিল্লোলিত শ্যামলতার, এই দিগন্তব্যাপ্ত স্বর্ণপ্লাবনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঈষৎ শীতবায়ুর রোমাঞ্চস্পর্শ রমেশের শরীরে-মনে গভীরতর একটি স্পন্দনের সঞ্চার করিয়া দিল। রেলওয়ে-ষ্টেশনের গোলমাল, লোক-জনের ভিড়, সমস্ত তাহার কাছে স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।

রমেশ দর্জ্জিপাড়ার বাসায় আসিয়া উঠিল। দিনের মধ্যে অতি অল্প সময়ই কাজ-কর্ম্ম কাটে, বাকি সময়টা ফুরাইতে চায় না। রমেশ কলিকাতায় যে দলের সহিত মিশিত, এবারে আসিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে পারিল না। পাছে পথে কাহারো সহিত দৈবাৎ দেখা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে যথাসাধ্য সাবধানে থাকিত।

কিন্তু রমেশ কলিকাতায় আসিতেই একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিল। যে নির্জ্জন অবকাশের মাঝখানে, যে নির্ম্মল শান্তির পরিবেষ্টনে কমলা তাহার নব কৈশোরের প্রথম আবির্ভাব লইয়া রমেশের কাছে রমণীয় হইয়া দেখা দিয়াছিল, কলিকাতায় তাহার মোহ অনেকটা ছুটিয়া গেল। দর্জ্জিপাড়ার বাসায় রমেশ কমলাকে কল্পনাক্ষেত্রে আনিয়া ভালবাসার মুগ্ধনেত্রে দেখিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু এখানে তাহার মন কোনমতে সাড়া দিল না আজ কমলা তাহার কাছে অপরিণতা অশিক্ষিতা বালিকার রূপে প্রতিভাত হইল। কেমন করিয়া যে সে তাহাকে কোনোদিন প্রেয়সীর ভাবে দেখিয়াছিল, আজ তাহা রমেশ ভাল বুঝিতেই পারিল না। যে বালিকা পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া সবে-মাত্র শিখিয়াছে এবং এখনো আয়ত্ত করিতে পারে নাই—যে বালিকা স্বপ্নেও জানে না প্রথম চার্লসের কি কারণে মুণ্ডপাত হইয়া-ছিল, সে-ও যে শিক্ষিত স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া উঠিতে পারে, তাহারো কল্যাণময় সেবাকুশলতা যে দুর্ম্মূল্য, তাহারো পরিপূর্ণ হৃদয়োৎসর্গ যে বহুপুণ্যের পুরস্কার, কলি-কাতার হাওয়ায় রমেশের মন তাহা স্বীকার করিতে পারিল না। যাহা সরল, যাহা অযাচিত, যাহা চেষ্টা করিয়া পাওয়া যায়

না,—যাহা বসন্তে দক্ষিণের বাতাসের মত আপনার বিচিত্র সুগন্ধের সম্পূর্ণভাব বহন করিয়া অকস্মাৎ পূর্ণপরিণতভাবে প্রবাহিত হইয়া যায়—চেষ্টানিরত জনতার অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের মধ্যে তাহার দুর্লভতা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। তা ছাড়া, কলিকাতার হাওয়ায় রমেশের পুরাতন যে স্মৃতিসঞ্চয় স্তরে স্তরে মেঘস্তূপের মত জমিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে রমেশের মনকে চারিদিক্ হইতে ঘনাইয়া-ধরিয়া আর-সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিল।

তবু রমেশ নিজের সহিত যুদ্ধ করিতে ছাড়িল না। যেমনি হউক, কমলাকে রমেশ মনে মনে পরিণীত-স্ত্রী-রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে কমলাকে অবিলম্বে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ না করিলে অন্যায় হয়, অধর্ম্ম হয়। হেমনলিনীর সম্বন্ধেও অন্যায় কিছু যে হয় না, তাহা নহে কিন্তু তুলনা করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত লঘুতর এবং সম্ভবত এতদিনে হেমনলিনী রমেশের প্রতি বিরক্ত ও বিমুখ হইয়া সেই অন্যায়ের দায়িত্বভার হইতে রমেশকে নিষ্কৃতি দিয়াছে। এই ভাবিয়া সে দর্জ্জিপাড়ার শূন্য বাসা আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল—কোনমতেই কলুটোলার দিকে ঘেঁসিল না।

জোর যতই অতিরিক্তমাত্রায় প্রয়োগ করা যায়, জোর ততই কমিয়া আসিতে থাকে। হেমনলিনীকে কোনোমতেই মনের মধ্যে আমল দিবে না, এই পণ করিতে করিতেই অহোরাত্র হেমনলিনার কথা রমেশের মনে জাগরূক থাকে। ভুলিবার কঠিন সঙ্কল্পই স্মরণে রাখিবার প্রবল সহায় হইয়া উঠিল।

রমেশের যদি কিছুমাত্র তাড়া থাকিত, তবে বহুপূর্ব্বেই কলিকাতার কাজ শেষ করিয়া সে ফিরিতে পারিত। কিন্তু সামান্য কাজ গড়াইতে গড়াইতে বাড়িয়া চলিল। অবশেষে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গেল।

কাল রমেশ প্রথমে কার্য্যানুরোধে এলাহাবাদে যাত্রা করিয়া সেখান হইতে গাজিপুরে ফিরিবে। এতদিন সে ধৈর্য্যরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে ধৈর্য্যের কি কোনো পুরস্কার নাই? বিদায়ের আগে গোপনে একবার কলুটোলার খবর লইয়া আসিলে ক্ষতি কি?

সেইদিন দুপুরবেলায় তাহার বাসায় একটি ডেস্কের দেরাজ খুলিতেই হঠাৎ একখানি কাগজ তাহার হাতে উঠিয়া আসিল। সেই কাগজখানিতে যাহা লেখা ছিল, তাহা কোনো অর্থবিশিষ্ট ভাষা নহে তাহা একটি হার্ম্মোনিয়মের গতের স্বরলিপি, হেমনলিনীর হাতে লেখা।

রমেশ হঠাৎ এই কাগজখানি হাতে তুলিয়া লইবামাত্র একটি নিস্তব্ধ-নিঃশব্দ গীতসমুদ্র ভৈরবাতে, বেহাগে, মুলতানে দিক্ হইতে দিগন্তরে জাগিয়া উঠিল; আকাঙ্ক্ষার আবেগে, বিচ্ছেদের বেদনায়, মিলনের আশ্বাসে এক কূল হইতে আর-এক সুদূর অদৃশ্য উপকূল পর্য্যন্ত স্বরসাগর তরঙ্গিত হইতে লাগিল। বুকের ভিতরে একটি হার্ম্মোনিয়ম্ বাজিয়া-বাজিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার শ্রবণাতীত কোমল করুণধ্বনিতে এই মধ্যাহ্নকালীন রাজধানীর প্রবল কর্ম্মালোড়ন একেবারে প্লাবিত ও আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রমেশ এই কাগজখণ্ডটিকে ললাটে-কপোলে স্পর্শ

করিল, প্রাণপণে ইহার ঘ্রাণ লইল, ডেস্কের উপরে প্রসারিত করিয়া ইহার 'পরে মাথা রাখিয়া ক্ষণকাল পড়িয়া রহিল।

আজ কলুটোলার সেই গলিতে যাওয়া স্থির করিয়া সে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। তাহাতে কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ আদ্যোপান্ত বিস্তারিত করিয়া লিখিল। এবারে গাজিপুরে ফিরিয়া-গিয়া সে অগত্যা হতভাগিনী কমলাকে নিজের পরিণীত-পত্নী-রূপে গ্রহণ করিবে, তাহাও জ্ঞাপন করিল। এইরূপে হেমনলিনীর সহিত তাহার সর্ব্বতো-ভাবে বিচ্ছেদ ঘটিবার পূর্ব্বে সত্যঘটনা সম্পূর্ণভাবে জানাইয়া এই পত্রদ্বারা সে বিদায়গ্রহণ করিল।

চিঠি লিখিয়া লেফাফার মধ্যে পূরিয়া উপরে কাহারো নাম লিখিল না, ভিতরেও কাহাকেও সম্বোধন করিল না। অন্নদাবাবুর ভৃত্যেরা রমেশের প্রতি অনুরক্ত ছিল - কারণ রমেশ হেমনলিনীর সম্পর্কীয় স্বজন-পরিজন সকলকে একটা বিশেষ মমতার সহিত দেখিত। এইজন্য সেই বাড়ীর চাকর-বাকরেরা রমেশের নিকট হইতে নানা উপ-লক্ষ্যে কাপড়চোপড়পার্ব্বণী হইতে বঞ্চিত হইত না। রমেশ ঠিক করিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে কলুটোলার বাড়ীতে গিয়া একবার সে দূর হইতে হেমনলিনীকে দেখিয়া আসিবে এবং কোনো একজন চাকরকে দিয়া এই চিঠি গোপনে হেমনলিনীর হাতে পৌঁছাইয়া দিয়া সে চিরকালের মত তাহার পূর্ব্ববন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে।

সন্ধ্যার সময় রমেশ চিঠিখানি হাতে লইয়া সেই চিরপরিচিত গলির মধ্যে কম্পিতবক্ষে কম্পিতপদে প্রবেশ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল—দ্বার রুদ্ধ, উপরে চাহিয়া দেখিল—সমস্ত জানালা বন্ধ, বাড়ী শূন্য, অন্ধকার।

তবু রমেশ দ্বারে ঘা দিল। দুইচারবার আঘাত করিতে করিতে ভিতর হইতে এক-জন বেহারা দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেও সুখন্ নাকি ?"

বেহারা কহিল, "হাঁ বাবু, আমি সুখন্।"

রমেশ। বাবু কোথায় গেছেন।

বেহারা। দিদিঠাকরুণকে লইয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।

রমেশ। কোথায় গেছেন ?

বেহারা। তাহা ত বলিতে পারি না।

রমেশ। আর কে সঙ্গে গেছেন্ ?

বেহারা। নলিন্‌বাবু সঙ্গে গেছেন।

রমেশ। নলিন্‌বাবুটি কে ?

বেহারা। তাহা ত বলিতে পারি না।

রমেশ প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিল, নলিন্-বাবু যুবাপুরুষ, কিছুকাল হইতে এই বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছেন। যদিও রমেশ হেম-নলিনীর আশা ত্যাগ করিয়াই যাইতেছিল, তথাপি নলিনবাবুটির প্রতি তাহার সদ্ভাব আকৃষ্ট হইল না।

রমেশ। তোর দিদিঠাকরুণের শরীর কেমন আছে ?

বেহারা কহিল, "তাঁহার শরীর ত ভালই আছে!"

সুখন্-বেহারাটা ভাবিয়াছিল, এই সু-সংবাদে রমেশবাবু নিশ্চিন্ত ও সুখী হইবেন। অন্তর্যামী জানেন, সুখন্-বেহারা ভুল বুঝিয়া-ছিল।

রমেশ কহিল, "আমি একবার উপরের ঘরে যাইব।"

বেহারা তাহার ধূমোচ্ছ্বসিত কেরোসিনের ডিপা লইয়া রমেশকে উপরে লইয়া গেল! রমেশ ভূতের মত ঘরে ঘরে একবার ঘুরিয়া বেড়াইল—দুই-একটা চৌকি ও সোফা বাছিয়া-লইয়া তাহার উপরে বসিল। জিনিষ-পত্র, গৃহসজ্জা, সমস্তই ঠিক পূর্ব্বের মতই আছে, মাঝে হইতে নলিনবাবুটি কে আসিল? পৃথিবীতে কাহারো অভাবে অধিকদিন কিছুই শূন্য থাকে না। যে বাতায়নে রমেশ একদিন হেমনলিনীর পাশে দাঁড়াইয়া ক্ষান্ত-বর্ষণ শ্রাবণদিনের সূর্য্যাস্ত-আভায় দুটি হৃদয়ের নিঃশব্দ মিলনকে মণ্ডিত করিয়া লইয়াছিল—সেই বাতায়নে আর কি সূর্য্যাস্তের আভা পড়ে না? সেই বাতায়নে আর কেহ আসিয়া আর একদিন যখন যুগলমূর্ত্তি রচনা করিতে চাহিবে, তখন পূর্ব্ব ইতিহাস আসিয়া কি তাহাদের স্থানরোধ করিয়া দাঁড়াইবে, নিঃশব্দে তর্জ্জনী তুলিয়া তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিবে? ক্ষুণ্ণ অভিমানে রমেশের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরদিনে রমেশ এলাহাবাদে না গিয়া একেবারে গাজিপুরে চলিয়া গেল।

৩৬

কলিকাতায় রমেশ প্রায় মাসখানেক কাটাইয়া আসিয়াছে। এই একমাস কমলার পক্ষে অল্পদিন নহে। কমলার জীবনে একটা পরিণতির স্রোত হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুতবেগে বহিতেছে। উষার আলো যেমন দেখিতে দেখিতে প্রভাতের রৌদ্রে ফুটিয়া পড়ে—কমলার নারীপ্রকৃতি তেম্নি অতি অল্প-কালের মধ্যেই সুপ্তি হইতে জাগরণের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। শৈলজার সহিত যদি তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইত, শৈলজার জীবন হইতে প্রেমালোকের ছটা ও উত্তাপ যদি প্রতিফলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের উপরে না পড়িত, তবে কতকাল তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইত বলা যায় না।

এখন বাহিরের দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ তাহাকে মাঝে মাঝে অনির্ব্বচনীয় ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের সিংহদ্বারটি যেন খুলিয়া গেছে, তাই বিশ্বজগৎ সেখানে প্রবেশ করিবার পথ পাইয়াছে। এখন প্রতিদিন প্রভাত তাহার কাছে নূতন হইয়া ফোটে। মধ্যাহ্নে শীতের রৌদ্র জানালার উপর দিয়া বাঁকিয়া তাহার ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়ে, সেই রৌদ্রে পা মেলিয়া-দিয়া বাহিরের বনস্থলীর মর্ম্মরগুঞ্জনের সহিত তাহার হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে কি সকল অব্যক্ত কথা গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া উঠে। শৈলজার প্রফুল্লমুখ, তাহার স্মিতহাস্য, তাহার সাজসজ্জা, তাহার আসা-যাওয়া, সমস্ত তাহার কাছে একটি কাব্যের মত, সঙ্গীতের মত, কাহিনীর মত লাগে। পূর্ব্বে বেশভূষায় কমলার নিতান্ত অনাদর ছিল, চুল বাঁধিতে, ভাল করিয়া সাজিতে তাহার অত্যন্ত বিরক্তি-বোধ হইত। এখন আর সে ভাব নাই। এখন সে বিশেষ অনুরোধ করিয়া শৈলজার কাছ হইতে বিচিত্র-রকমের চুল-বাঁধা শিখিয়া লইয়াছে। এখন সে আপনিই একটু নৈপুণ্যের সহিত কাপড়টি পরে, আঁচলটি পরিপাটি করিয়া বিন্যাস করে—সীঁথাটি সোজা করিয়া, সরু করিয়া কাটিতে যথেষ্ট যত্ন করে এবং

সীঁথায় সিঁদুরের রেখাটি যেমন-তেমন করিয়া লাগায় না। খুড়ার বাগান হইতে শীত-কালের নানারঙের বিলাতীফুল সংগ্রহ করিয়া কমলা অনেকক্ষণ বসিয়া একটি কাঁচের পাত্রের উপরে নানারকম করিয়া সাজাইতে চেষ্টা করে—মনের মত সাজানটি হইলে তাহার উপরে জলের ছিটা দিয়া দেয়ালের একটি শেল্‌ফের উপরে রাখিয়া দেয়। কমলা পশম-বোনা এবং সেলাই কিছু-কিছু শিখিয়া-ছিল, কিন্তু তাহা তাহার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ছিল—এখন সে অবকাশের সময় সেলাইয়ের বাক্স খুলিয়া নানা রঙের পশম মিলাইয়া নানা ছাঁদের অনাবশ্যক কারুকার্য্য রচনা করিবার চেষ্টা করে। কমলা কোনোকালে গাহিতে শেখে নাই, সেজন্য কোনো অভাবও অনুভব করে নাই—আজকাল শৈলজার বাংলা বইগুলি হইতে গান বাছিয়া একটি ছোট খাতায় কাপি করিয়া গান গাহিবার সাধ মিটাইতেছে।

ইতিমধ্যে রমেশের আসিবার দেরি দেখিয়া শৈলজার বিশেষ অনুরোধে খুড়া কমলাদের বাসের জন্য সহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে একটি বাংলা ঠিক করিয়াছেন। অল্পস্বল্প আস্‌বাব সংগ্রহ করিয়া বাড়ীটি বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছেন এবং নূতন ঘরকন্নার জন্য আবশ্যকমত চাকরদাসীও ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

অনেকদিন দেরি করিয়া রমেশ যখন গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল, তখন খুড়ার বাড়ীতে পড়িয়া থাকিবার আর কোনো ছুতা থাকিল না। এতদিন পরে কমলা নিজের স্বাধীন ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাংলাটির চারিদিকে বাগান করিবার মত জমি যথেষ্ট আছে। দুই সারি সুদীর্ঘ শিশু-গাছের ভিতর দিয়া একটি ছায়াময় রাস্তা গিয়াছে। শীতের শীর্ণগঙ্গা বহুদূরে সরিয়া-গিয়া বাড়ী এবং গঙ্গার মাঝখানে একটি নীচু চর পড়িয়াছে—সেই চরে চাষারা স্থানে স্থানে গোধূম চাষ করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে তরমুজ ও খরমুজা লাগাইতেছে। বাড়ীর দক্ষিণসীমানায় গঙ্গার দিকে একটি বৃহৎ বৃদ্ধ নিমগাছ আছে, তাহার তলা বাঁধানো।

বহুদিন ভাড়াটের অভাবে বাড়ী ও জমি অনাদৃত অবস্থায় থাকাতে বাগানে গাছপালা প্রায় কিছুই ছিল না এবং ঘরগুলিও অপরি-চ্ছন্ন হইয়া ছিল। কিন্তু কমলার কাছে এ সমস্তই অত্যন্ত ভাল লাগিল। গৃহিণীপদ-লাভের আনন্দ আভায় তাহার চক্ষে সমস্তই সুন্দর হইয়া উঠিল। কোন্ ঘর কি কাজে ব্যবহার করিতে হইবে, জমির কোথায় কিরূপ গাছপালা লাগাইতে হইবে, তাহা সে মনে মনে ঠিক করিয়া লইল। খুড়ার সহিত পরামর্শ করিয়া কমলা সমস্ত জমিতে চাষ দিয়া লইবার ব্যবস্থা করিল। নিজে উপস্থিত থাকিয়া রান্নাঘরের চুলা বানাইয়া লইল এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভাঁড়ার ঘরে, যেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা সাধন করিল। সমস্তদিন ধোয়া-মাজা, গোছানো-গাছানো,—কাজকর্ম্মের আর অন্ত নাই। চারিদিকেই কমলার মমত্ব আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এ সমস্তই আমার, আমার

হাতেই গড়িয়া উঠিবে—এই জমির বাগান, এই ঘরের পারিপাট্য, এই ঘরকন্নার আরাম, সমস্তই আমার ইচ্ছা ও চেষ্টার অপেক্ষায় অনাগত ভবিষ্যৎ হইতে আমার দিকে তাকাইয়া আছে এই কথা স্মরণ করিয়া এবং তাহার নিজরচিত সুগঠিত সেই ভাবী গার্হস্থ্যটিকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়া কমলা নীড়রচনারত বিহগীর মত কর্ম্মপরায়ণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

রমেশ হেমনলিনীর প্রতি অভিমানের আক্ষেপ হৃদয়ের মধ্যে লইয়া গাজিপুরে আসিয়াছিল। সে মনে মনে বলিতেছিল, "হেমনলিনী যদি আমাকে এত সহজে এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইতে পারে, তবে আমিও তাহার জন্য বৃথা খেদ করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিব না।" এই বলিয়া হেমনলিনীর সহিত তুলনায় কমলাকে সে জোর করিয়া বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। রূপে কমলা যে হেমনলিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে কথা কাহারো অস্বীকার করিবার জো নাই। অবশ্য কমলা গাহিতে-বাজাইতে, ইংরাজি লিখিতে-পড়িতে জানে না, কিন্তু স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনায় সে কাহারো চেয়ে ন্যূন নহে; তাহার বোধশক্তির একটা অসামান্যতা আছে—বোধ করি বেশি বানান মুখস্থ ও পড়া মুখস্থ করিতে হয় নাই বলিয়াই তাহার বুদ্ধি এরূপ আশ্চর্য্য তাজা রহিয়াছে।

এইরূপে রমেশ নানা তর্ক দ্বারা কমলাকেই হৃদয়রাজ্যে জয়ী করিয়া হেমনলিনীর চপল ব্যবহারের সমুচিত প্রতিশোধ লইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিল। এ সম্বন্ধে মনে মনে নিজের প্রতি এতই বল-প্রয়োগ করিতেছিল, যেন ব্যাপারটা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

কিন্তু দুরূহতা অধিকক্ষণ রহিল না। গৃহকর্ম্মের মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য্য যেমন বিচিত্র, যেমন মধুর, এমন আর কোথাও নহে—এইজন্য আলস্য বরঞ্চ পুরুষকে শোভা পায়, কিন্তু নারীকে সাজে না;—স্রোতের অবিশ্রাম প্রবাহ যেমন নদীর শোভা এবং স্বাস্থ্যকরতাকে জাগাইয়া রাখে—তেমনি কর্ম্মের ধারা রমণীর দেহমনের সমস্ত কান্তিকে নানাভাবে নানাভঙ্গীতে খেলাইয়া তরঙ্গিত করিয়া রাখে।

রমেশ আজ কমলাকে কর্ম্মের মাঝখানে দেখিল—সে যেন পাখীকে খাঁচার বাহিরে আকাশে উড়িতে দেখিল। তাহার প্রফুল্ল মুখ, তাহার সুনিপুণ পটুত্ব, তাহার কর্ম্মোদ্যমের লীলালহরী রমেশের মনে এক নূতন বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিয়া দিল।

এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ভাব তাহার মনের মধ্যে পুলকসঞ্চার করিতে লাগিল,—রমেশ চিরকাল একলা ছিল, বিচ্ছিন্ন ছিল—আজ সে ঐ কমলাকে কেন্দ্রস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজেকে একটি সংসারপরিধির অন্তর্ভূত দেখিল। নিজের একটা মূল্য, একটা গৌরব বুঝিল, একটা বিশেষ অধিকার লাভ করিল। এই সুন্দরী, এই কিশোরী, এই কল্যাণী রমেশের সংসারকে গড়িয়া তুলিবার, বাঁধিয়া রাখিবার জন্য আপনাকে কেমন পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত উৎসর্গ করিয়াছে। ইহার মধ্যেই সে আপনার সমস্ত সার্থকতা অনুভব করিতেছে- আপনার সমস্ত লাবণ্য, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত প্রীতি এই

সংসারসৃজনের মধ্যে নিঃশেষে নিযুক্ত হইয়াছে ;—কমলার ব্যস্ত চরণের গতি, তাহার তৎপর হস্তের কর্ম্ম প্রতি-মুহূর্ত্তে রমেশের কাছে কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীতের পদের মত বোধ হইতে লাগিল। রমেশ মনে মনে একটি গর্ব্ব অনুভব করিল। সে বুঝিল, সে এবং তাহার সংসার কমলার দ্বারা মহামূল্য হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন কমলাকে রমেশ তাহার স্বস্থানে দেখে নাই—আজ তাহাকে আপন নূতন সংসারের শিখরদেশে যখন দেখিল, তখন তাহার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একটা মহিমা দেখিতে পাইল।

কমলার কাছে আসিয়া রমেশ কহিল—"কমলা, করিতেছ কি ? শ্রান্ত হইয়া পড়িবে যে !"

কমলা তাহার কাজের মাঝখানে একটুখানি থামিয়া রমেশের দিকে মুখ তুলিয়া তাহার মিষ্টমুখের হাসি হাসিল—কহিল, "না, আমার কিছু হইবে না।"

রমেশ যে তাহার তত্ত্ব লইতে আসিল, এটুকু সে পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার কাজের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মুগ্ধ রমেশ ছুতা করিয়া আবার তাহার কাছে গিয়া কহিল—"তোমার খাওয়া হইয়াছে ত কমলা ?"

কমলা কহিল, "বেশ, খাওয়া হয় নাই ত কি ! কোন্‌কালে খাইয়াছি !"

রমেশ এ খবর জানিত—তবু এই প্রশ্নের ছলে কমলাকে একটুখানি আদর না জানাইয়া থাকিতে পারিল না—কমলাও রমেশের এই অনাবশ্যক প্রশ্নে যে একটুখানি খুসি হয় নাই, তাহা নহে।

রমেশ আবার একটুখানি কথাবার্ত্তার সূত্রপাত করিবার জন্য কহিল, "কমলা, তুমি নিজের হাতে কত করিবে—আমাকে একটু খাটাইয়া লও না !"

কর্ম্মিষ্ঠ লোকের দোষ এই, অন্য লোকের কর্ম্মপটুতার উপরে তাহাদের বড়-একটা বিশ্বাস থাকে না। তাহাদের ভয় হয়, যে কাজ তাহারা নিজে না করিবে, সেই কাজ অন্যে করিলেই পাছে সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়। কমলা হাসিয়া কহিল, "না, এ সমস্ত কাজ তোমাদের নয়।"

রমেশ কহিল, "পুরুষরা নিতান্তই সহিষ্ণু বলিয়া পুরুষজাতির প্রতি তোমাদের এই অবজ্ঞা আমরা সহ্য করিয়া থাকি, বিদ্রোহ করি না—তোমাদের মত যদি স্ত্রীলোক হইতাম, তবে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিতাম। আচ্ছা, খুড়াকে ত তুমি খাটাইতে ত্রুটি কর না—আমি এতই কি অকর্ম্মণ্য।"

কমলা কহিল, "তা জানি না, কিন্তু তুমি রান্নাঘরের ঝুল ঝাড়াইতেছ, তাহা মনে করিলেই আমার হাসি পায়। তুমি এখান থেকে সর—এখানে ভারি ধুলা উড়াইয়াছে।"

রমেশ কমলার সহিত কথা চালাইবার জন্য বলিল "ধুলা ত লোকবিচার করে না, ধুলা আমাকেও যে চক্ষে দেখে, তোমাকেও সেই চক্ষে দেখে !"

কমলা। আমার কাজ আছে বলিয়া ধুলা সহিতেছি, তোমার কাজ নাই, তুমি কেন ধুলা সহিবে ?

রমেশ ভৃত্যদের কান বাঁচাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কাজ থাক্ বা না থাক্, তুমি যাহা সহ্য করিবে, আমি তাহার অংশ লইব।"

কমলার কর্ণমূল একটুখানি লাল হইয়া উঠিল—রমেশের কথার কোন উত্তর না দিয়া কমলা একটু সরিয়া গিয়া কহিল—"উমেশ, এইখানটায় আর এক-ঘড়া জল ঢাল্‌না—দেখছিস্‌নে কত কাদা জমিয়া আছে! ঝাঁটাটা আমার হাতে দে দেখি।"—বলিয়া ঝাঁটা লইয়া খুব বেগে মার্জ্জনকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

রমেশ কমলাকে ঝাঁট দিতে দেখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "আহা, কমলা, ও কি করিতেছ?"

পিছন হইতে শুনিতে পাইল, "কেন রমেশবাবু, অন্যায় কাজটা কি হইতেছে? এদিকে ইংরাজি পড়িয়া আপনারা মুখে সাম্য প্রচার করেন; ঝাঁট দেওয়ার কাজটা যদি এতই হেয় মনে হয়, তবে চাকরের হাতেই বা ঝাঁটা দেন কেন? আমি মূর্খ আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, সতী মায়ের হাতের ঐ ঝাঁটার প্রত্যেক কাঠি সূর্য্যের রশ্মিচ্ছটার মত আমার কাছে উজ্জ্বল ঠেকে। মা, তোমার জঙ্গল আমি একরকম প্রায় শেষ করিয়া আসিলাম, কোন্‌খানে তরকারীর ক্ষেৎ করিবে, আমাকে একবার দেখাইয়া দিতে হইবে।"

কমলা কহিল, "খুড়ামশায়, একটুখানি সবুর কর, আমার এ ঘর সারা হইল বলিয়া!"

এই বলিয়া কমলা ঘরপরিষ্কার শেষ করিয়া কোমরে-জড়ানো আঁচল মাথায় তুলিয়া বাহিরে আসিয়া খুড়ার সহিত তরকারীর ক্ষেৎ লইয়া গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। তরকারীর ক্ষেৎসম্বন্ধে কোনোপ্রকারে অনধিকার প্রবেশ হইতে পারে না, উমেশের এইরূপ ধারণা ছিল, সুতরাং এই প্রসঙ্গের মাঝখানে বিশেষ ঔৎসুক্যসহকারে সে-ও আসিয়া প্রবেশ করিল। রমেশও কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু কপি-বীট-শালগমের আবাদসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য বশত আলোচনার গভীর মাঝখানে তাহার স্থান হইল না। সে যা দুইএকটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল, তাহা প্রাসঙ্গিক না হওয়াতে আলোচনাসমিতি তাহাতে বিশেষ কর্ণপাত করিল না।

এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া গেল, কিন্তু ঘরগোছানো এখনো ঠিকমত হইয়া উঠিল না। বাংলাঘর অনেকদিন অব্যবহৃত ও রুদ্ধ ছিল, আরো দুইচারিদিন ঘরগুলি ধোয়া-মাজা করিয়া জান্‌লা-দরজা খুলিয়া না রাখিলে তাহা বাসযোগ্য হইবে না দেখা গেল।

কাজেই আবার আজ সন্ধ্যার পরে খুড়ার বাড়ীতেই আশ্রয় লইতে হইল। আজ তাহাতে রমেশের মনটা কিছু দমিয়া গেল। আজ তাহাদের নিজের নিভৃত ঘরটিতে সন্ধ্যাপ্রদীপটি জ্বলিবে এবং কমলার সলজ্জ স্মিতহাস্যটির সম্মুখে রমেশ আপনার পরিপূর্ণ হৃদয় নিবেদন করিয়া দিবে, ইহা সে সমস্তদিন থাকিয়া-থাকিয়া কল্পনা করিতেছিল। আরো দুইচারিদিন বিলম্বের সম্ভাবনা দেখিয়া রমেশ তাহার আদালতপ্রবেশসম্বন্ধীয় কাজে পরদিন এলাহাবাদে চলিয়া গেল।

৩৭

কাজের উৎসাহে, এবং সেদিন রমেশের কাছ হইতে যেটুকু আদরের সুস্পষ্ট ভূমিকা পাইয়া—

ছিল তাহাতে, কমলার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে খুড়ার বাড়ীতে ফিরিয়া অকারণে শৈলজার গলা জড়াইয়া ধরিল, শৈলর মেয়ে উমিকে কোলে তুলিয়া বক্ষের উপর সবেগে পীড়ন করিয়া শিশুর ভাষায় তাহার সহিত যা-তা বকিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলাকার রান্নার কাজে যোগ দিবার জন্ম সে রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। হরিভাবিনী কহিলেন, "আজ সমস্ত-দিন খাটিয়াছ, যাও একটু বিশ্রাম করগে।"

কমলা কহিল, "না, আমার কিছুই শ্রান্তিবোধ হইতেছে না—খুড়ামশায় আমার হাতের কাঁপর-ডাল্‌না খাইতে চাহিয়াছিলেন, আমি আজ রাঁধিব।"

পরদিন কমলার নূতন বাসায় শৈলর চড়িভাতির নিমন্ত্রণ হইল। বিপিন আহারান্তে আপিসে গেলে পর শৈল নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গেল। কমলার অনুরোধে খুড়া সেদিন সোমবারের ইস্কুল কামাই করিয়াছিলেন। দুইজনে মিলিয়া নিমগাছতলায় রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন, উমেশ সহায়কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

রান্না ও আহার হইয়া গেলে পর খুড়া ঘরের মধ্যে গিয়া মধ্যাহ্ননিদ্রায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুই সখীতে নিমগাছের ছায়ায় বসিয়া তাহাদের সেই চিরদিনের আলোচনায় নিবিষ্ট হইল। এই গল্পগুলির সহিত মিশিয়া কমলার কাছে এই নদীর তীর, এই শীতের রৌদ্র, এই গাছের ছায়া বড় অপরূপ হইয়া উঠিল,—ঐ মেঘশূন্য নীলাকাশের বহু সুদূর উচ্চে যেখায় মত্ত হইয়া চিল ভাসিতেছে, কমলার বক্ষোবাসী একটা উদ্দেশহারা আকাঙ্ক্ষা ততদূরেই উধাও হইয়া উড়িয়া গেল।

বেলা যাইতে না যাইতেই শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার স্বামী আপিস হইতে আসিবে। কমলা কহিল, "একদিনো কি ভাই তোমার নিয়ম ভাঙিবার জো নাই?"

শৈল তাহার কোনো উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিল এবং বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পিতার ঘুম ভাঙাইয়া কহিল, "বাবা, আমি বাড়ী যাইতেছি।"

কমলাকে খুড়া কহিলেন, "মা, তুমিও চল!"

কমলা কহিল, "না, আমার কাজ বাকি আছে, আমি সন্ধ্যার পরে যাইব।"

খুড়া তাহার পুরাতন চাকরকে ও উমেশকে কমলার কাছে রাখিয়া শৈলকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে গেলেন, সেখানে তাহার কিছু কাজ ছিল—কহিলেন, "আমার ফিরিতে বেশি বিলম্ব হইবে না!"

কমলা যখন তাহার ঘর-গোছানোর কাজ শেষ করিল, তখনো সূর্য্য অস্ত যায় নাই। সে মাথায়-গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া নিমগাছের তলায় আসিয়া বসিল। দূরে ওপারে যেখানে বড়-বড় গোটা-দুই-তিন নৌকার মাস্তুল অগ্নিবর্ণ আকাশের গায়ে কালো আঁচড় কাটিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারই পশ্চাতের উঁচু পাড়ির আড়ালে সূর্য্য নামিয়া গেল। সম্মুখের সুদূরবিস্তৃত উদার বৃক্ষের উপর দিনান্তের যে করুণ আভাটি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহা কমলার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত মনের ভাবকে রাঙাইয়া তুলিল।

কমলা আজকাল আপনার মনের ভিতরকার একটি রক্তিমা, একটি গীতধ্বনি, একটি গন্ধোচ্ছ্বাস বেশ স্পষ্ট অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তাহার সখী শৈলর সঙ্গে সে আপনার ভাব সমস্তটা মিলাইয়া পাইতেছে না। বিপিন শৈলজার অন্তরে-বাহিরে যেমন সুনির্দ্দিষ্ট, সুস্পষ্ট, সুবৃহৎ হইয়া আছে— শৈল যেমন কোনো মুহূর্ত্তেই তাহাকে ভোলে না, সকল অবস্থাতেই বিপিনের জন্য তাহার মন সচেতন হইয়া থাকে রমেশের সম্বন্ধে কমলার মনের মধ্যে সেরূপ পরিপূর্ণভাব এখনো ত জন্মায় নাই। ঔদাসীন্য পরিহার করিয়া রমেশ কমলার প্রতি মনোযোগ দিলে সে খুসি হয় বটে, কিন্তু কমলার চিত্ত ত দিনরাত্রি রমেশের জন্য প্রস্তুত হইয়া নাই, উৎকণ্ঠিত হইয়া নাই, রমেশের কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে সে ত বিশেষ কোনো রস অনুভব করে না!

নিজের হৃদয়ের এই অভাব লইয়া, শৈলজার সহিত তুলনায় নিজের এই দীনতা লইয়া কমলা আপনাকে আজ পীড়ন করিতে লাগিল। তাহার গৃহ ত প্রস্তুত হইয়া উঠিল, এইবার তাহার ভালবাসিবার পালা। সে ভালবাসিবেই! ভালবাসায় সে তাহার ঘর, তাহার মন ভরিয়া ফেলিবে, কোথাও কিছু ফাঁক থাকিবে না। এই স্থির করিয়া, এখনি এই সন্ধ্যা-বেলায়, এই নির্জ্জন তরুতলে সে তাহার সমস্ত মন প্রয়োগ করিয়া রমেশের কথা চিন্তা করিতে চেষ্টা করিল, সে রমেশের জন্য একটা আগ্রহ, একটা বেদনা বোধ করিতে চাহিল। ষ্টীমারে রমেশ তাহার সহিত অকারণে অদ্ভুত আচরণ করিয়াছিল, সে সব কথা মনে আসিয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ কমলা তাহা দূরে ঠেলিয়া দেয়; রমেশ তাহাকে ছুটির সময় অনাবশ্যক ইস্কুলে ফেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, সে কথাও সে জোর করিয়া কোনোমতে সরাইয়া ফেলে—সে সম্পূর্ণভাবে, একান্তভাবে ভালবাসিতে চায়। অনেকদিন পরে আজ সে আপনাকে একলা পাইয়াছে, আজ সে বসিয়া-বসিয়া ভালবাসায় আপনাকে যেন ভরিয়া লইতে লাগিল। মনে মনে রমেশকে ডাকিয়া কহিল, "আমার স্বামী।" স্বামী বলিবামাত্র কমলার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়া রমেশের মানসমূর্ত্তিকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। স্বামিভক্তির সুর শৈল কমলার মনে বাঁধিয়া দিয়াছিল।

এমন-সময় উমেশটা একটা ছুতা করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "মা, অনেকক্ষণ তুমি পান খাও নাই— ও বাড়ী হইতে আসিবার সময় আমি পান জোগাড় করিয়া আনিয়াছি।" বলিয়া একটা কাগজে মোড়া কয়েকটা পান কমলার হাতে দিল।

কমলার তখন চৈতন্য হইল—সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উমেশ কহিল, "চক্রবর্ত্তিমশায় গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

কমলা গাড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে বাংলার মধ্যে ঘরগুলি আর একবার দেখিয়া লইবার জন্য প্রবেশ করিল।

বড় ঘরে শীতের সময় আগুন জ্বালিবার জন্য বিলাতী ছাঁদের একটি চুলী ছিল। তাহারি সংলগ্ন থাকের উপরে কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছিল। সেই থাকের উপর

কমলা । মোড়ক রাখিয়া কি-একটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতেছিল। এমন-সময় হঠাৎ কাগজের মোড়কে রমেশের হস্তাক্ষরে তাহার নিজের নাম কমলার চোখে পড়িল।

উমেশকে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাগজ তুই কোথায় পেলি ?"

উমেশ কহিল—"বাবুর ঘরের কোণে পড়িয়াছিল, ঝাঁট দিবার সময় তুলিয়া আনিয়াছি।"

কমলা সেই কাগজখানা মেলিয়া-ধরিয়া পড়িতে লাগিল।

হেমনলিনীকে রমেশ সেদিন যে বিস্তারিত চিঠি লিখিয়াছিল, এটা সেই চিঠি। স্বভাবশিথিল রমেশের হাত হইতে কখন্ সেটা কোথায় পড়িয়া গড়াইতেছিল, তাহা তাহার হুঁস ছিল না।

কমলার পড়া হইয়া গেল। উমেশ কহিল, "মা, অমন করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে যে ! রাত হইয়া যাইতেছে।"

ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কমলার মুখের দিকে চাহিয়া উমেশ ভীত হইয়া উঠিল। কহিল, "মা, আমার কথা শুনিতেছ না ? ঘরে চল, রাত হইল।"

কিছুক্ষণ পরে খুড়ার চাকর আসিয়া কহিল, "মাঠাকুরাণী, গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। চল আমরা যাই।"

ক্রমশ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গ-বিভাগ।

বঙ্গ-বিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্ব্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সাম্লাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া ... কোনো কোনো ... যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই,—এমনতর নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

কন্‌গ্রেস্ প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বরাবর দুই কূল বাচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজভক্তির অজস্র গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা আমরা সর্ব্বপ্রথমেই শ্রোতার মনোহরণব্যাপার সমাধা করিয়া লইয়াছি।

হতভাগ্য হতবল ব্যক্তিদের এইরূপ নানা-প্রকার নিষ্ফল কলকৌশল দেখিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অনেকদিন হইতে হাস্য করিয়া আসিয়াছে।

এবারে কিন্তু দুর্ব্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই—পাকা প্রবীণব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা-সোজা কথা কহিয়াছেন।

ইহার কারণ এই, যে-দুটো ব্যাপার লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, সে দুটোই আমাদের মনে গোড়াতেই একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এ দুটো ব্যাপারের ভিত্তিই অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসের যথার্থ হেতু আছে কি না আছে, তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা—কারণ চাণক্য স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক এবং রাজা উভয়ের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। এবং যাহা দুর্জ্ঞেয়, আত্মরক্ষার জন্য দুর্ব্বল লোকে তাহাকে গোড়াতেই অবিশ্বাস করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

বর্ত্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি যে, য়ুনিবর্সিটি-বিলের দ্বারা তোমরা এদেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তোমরা বাঙালী-জাতিকে দুর্ব্বল করিতে ইচ্ছা কর।

শিক্ষা এবং ঐক্য, এই দুটাই জাতি-মাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল। এই দুটার প্রতি ঘা পড়িয়াছে, এমন যদি সন্দেহমাত্র মনে জন্মায়, তবে ব্যাকুল হইয়া উঠি[illegible] কথা। [illegible]

জানি

কোনো উপায় নাই, এবং যাঁ[illegible] [illegible]-দিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আমাদের সহায় ও সখা বলিয়া আহ্বান করিতে হইবে!

কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনায় আমাদের কাছে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই [illegible]নে হয় যে, আমরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিতে পারি নাই। ইহাকেই বলে ওরিয়েণ্টাল—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে। আমরা ক্ষণ-কালের জন্য রাগ করি আর যাই করি, অন্তরের মধ্যে আমরা পূরাপুরি অবিশ্বাস করিতে পারি না। ষোল-আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে শক্তি, তাহা আমাদের নাই—আমরা ভুলিতে চাই, আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি।

আমি জানি, আমার একজন বাঙালী বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ইংরাজ মিথ্যা চক্রান্ত করিয়াছিল। সেই মিথ্যা যখন প্রমাণ হইয়া গেল, তখন তাঁহাকে তাঁহার এক ইংরাজ সুহৃদ্ বলিয়াছিলেন, "Spare him not, crush him like a worm!" কিন্তু বাঙালী সে সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া-ছিলেন এবং তাহার ফল এখনো ভোগ করিতেছেন। নিঃশেষে দলন করিতে, নিঃশেষে অবিশ্বাস করিতে, নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে আমরা জানি না—আমাদের চির-ন্তন প্রকৃতি এবং শিক্ষা আমাদিগকে বাধা [illegible]র [illegible]ন বলিয়া [illegible]র কাজ

নাই, আর থাক্।" পরিপূর্ণ ত বিশ্বাসের মধ্যে যে একটা কাঠিন্য, যে একটা নির্দ্দয়তা আছে, আমাদের গার্হস্থ্যপ্রধান, আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চ্চা করিতে দেয় নাই—সম্বন্ধ বিস্তার করিবার জন্যই আমরা সর্ব্বতোভাবে চির দিন প্রস্তুত হইয়াছি, সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিবার জন্য নহে। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও আত্মভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনো জিনিষকেই ঝাড়ে-মূলে উপড়াইয়া একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই—আত্মরক্ষার পক্ষে, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা সুশিক্ষা নহে।

য়ুরোপ যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহা বিদ্রোহ করিয়া পাইয়াছে; আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি, তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন, বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুস্কিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধা করে না।

চাণক্যপণ্ডিতের "স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" শ্লোক বাঙালীর কণ্ঠস্থ—কিন্তু বাঙালীর তদপেক্ষা কণ্ঠলগ্ন তাহার স্ত্রী। সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না কারণ, শুষ্ক পুঁথির চেয়ে সরস রক্তমাংসের প্রমাণ ঢের বেশি আদরণীয়। কিন্তু রাজকুলসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হাতে-হাতেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখ:—

যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালাজাতিকে দুর্ব্বল করিবার উদ্দেশেই বঙ্গ শকে খণ্ডিত করা হইতেছে, যদি তোমার বিশ্বাস যে, মুনিবর্গ সেই বিলের ইচ্ছাপূর্ব্বক মুমূর্ষু বঙ্গসিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সে কথার উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? উদ্যত কুঠারকে গাছ যদি করুণস্বরে এই কথা বলে যে, "তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব", তবে সেটা কি নিতান্ত বাহুল্য হয় না? গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, ছিন্ন করিতে নহে?

আর, মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ কেন? অমন চড়াসুরে কথা কহিতেছ কেন? কেন বলিতেছ, "তোমাদের মৎলব আমরা বুঝিয়াছি, তোমরা আমাদিগকে নষ্ট করিতে চাও।" এবং তাহার পরক্ষণেই কাঁদিয়া বলিতেছ, 'তোমরা যাহা সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও।" বলিহারি এই "অতএব"।

আমাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষার বৈষম্যে সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মুখে অবিশ্বাস দেখাইতে পারি, কিন্তু আচরণে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাহাতে সকল দিকই নষ্ট হয়—ভিক্ষাধর্ম্মও যথানিয়মে পালিত হয় না—স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেও প্রবৃত্তি থাকে না।

আমাদের মনে সত্যই যদি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাসের মধ্য হইতে যেটুকু লাভের বিষয়, তাহা গ্রহণ না করি কেন? আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজে রাজার-প্রজায় মিলনের নীতি ও প্রীতিসম্বন্ধই চির-

কাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে, সেইটেই আমরা বুঝি ভাল, সেইটেই আমাদের পক্ষে সহজ। সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দ্বারা আমরা কি লাভ করিতে পারিতাম, তাহা বর্ত্তমানে কল্পনা করিয়া কোন ফল নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রতি রাজাপ্রজার মাঝখানে খুব যে একটা মনকষাকষি চলিতেছে, তাহা এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে, কোনো পলিসি উপলক্ষ্যেও তাহা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা এবং লজ্জাকর। আমরা যদি বা কপটভাবে তাহা ঢাকিতে ইচ্ছা করি, কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে তাহা ঢাকা পড়ে না। কারণ, ইংরাজ ও দেশী কোনোপক্ষেই প্রেমের ছড়াছড়ি নাই—এমন অবস্থায় রাস্তায়-ঘাটে, আপিসে-আদালতে, রেলে-ট্র্যামে, কাগজে-পত্রে, সভাসমিতিতে উত্তমরূপে পরস্পরের মনজানাজানি হইয়া থাকে।

আমরা ঘরে-ঘরে বলিয়া থাকি, বাঙালী-জাতির প্রতি ইংরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে, এবং কর্ত্তৃপক্ষেরা বাঙালীজাতকে দমন করিতে উৎসুক। ইংরাজি সাহিত্যে, বিলাতি কাগজে বাঙালীজাতির প্রতি প্রায় মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়া আমা-দিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া থাকে।

ইহাতে অধীন দুর্ব্বলজাতির চাকরি-বাকরি, সাংসারিক সুযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটিবার কথা। তাহা আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে যেটুকু সুবিধা স্বভাবত প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত, তাহারো কোনো লক্ষণ দেখিতে পাই না কেন? গালেও চড় পড়িবে, মশাও মরিবে না, আমাদের কি এমনি কপাল।

পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পর-তন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড় কোনো জিনিষ গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কি করিলাম? বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কত আসিলাম? আবার ত সেই রাজ-দরবারেই ছুটিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহার মীমাংসার জন্য নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিলাম না?

আন্দোলন যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়া-ছিল, তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই, এখন বলিবার সময় আসিয়াছে।

দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্ব্বল হইব না। কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন। মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎকশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইবে! আমা-দের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে না? সে নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে প[illegible], তবে [illegible] শ্রেয় লেশমাত্র কারণ দেখি না! [illegible] কিছুতে আমা-দিগকে বিচ্ছিন্ন ক[illegible] এ কথা আমরা

কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্ব্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আন্তরিক ঐক্য উদ্বেল হইয়া উঠিবে—তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, এই পূর্ব্বপশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমাদিগকে কিছুতে পৃথক্ করিতে পারে, এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্ব্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে, ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে, সুখে-দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলনপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এ হইল প্রাণের কথা, —ইহার মধ্যে
সুবিধা-অ লাভ-ক্ষতির কথা
যদি কি এমন সন্দেহ মনে
জন্মিয়া গৃহচ্ছেদে ক্রমে চির-
স্থায়ী হ হইতে পারে, আমাদের চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতে পারে, তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পারে বটে। কিন্তু কি করিবে? কর্তৃপক্ষ যদি মনে মনে একটা পলিসি আঁটিয়া থাকেন, তবে আজ হোক্, কাল হোক্, গোপনে হোক্, প্রকাশ্যে হোক্, সেটা তাঁহারা সাধন করিবেনই

আমাদের তর্ক শুনিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন কেন? মনে কর না কেন, কথামালার বাঘ যখন মেষশাবককে খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল, "তুই আমার জল ঘোলা করিতেছিস্, তোকে মারিব"—তখন মেষশাবক বাঘকে তর্কে পরাস্ত করিল, কহিল, "আমি ঝরণার নীচের দিকের জল খাইতেছি, তোমার উপরের জল ঘোলা হইল কি করিয়া?' তর্কে বাঘ পরাস্ত হইল, কিন্তু মেষশিশুর কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল?

অনুগ্রহই যেখানে অধিকারের নির্ভর, সেখানে মমতা বাড়িতে দেওয়া কিছু নয়। ম্যুনিসিপালিটির স্বায়ত্তশাসন এক রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আর এক রাজপ্রতিনিধি তাহা স্বচ্ছন্দে কাড়িয়া লইলেন। উপরন্তু গাল দিলেন, বলিলেন, 'তোমরা কোনো কর্ম্মের নও!' আমরা হাহাকার করিয়া মরিলাম, 'আমাদের অধিকার গেল!' অধিকার কিসের! এ মোহ কেন! মহারাণী একসময়ে আমাদের একটা আশ্বাসপত্র দিয়াছিলেন যে, যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে আমরাও রাজকার্য্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিব—কালো চামড়ার অপরাধ গণ্য হইবে না। আজ যদি কর্ম্মশালা হইতে আমরা ক্রমে বহিষ্কৃত হইতে থাকি, তবে সেই পুরাতন দলিলটির দোহাই পাড়িয়া

লাভ কি? সেই দলিলের কথা কি রাজপুরুষের অগোচর আছে? ময়দানে মহারাণীর প্রস্তরমূর্ত্তি কি তাহাতে বিচলিত হইবে? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজও স্থায়ী আছে, সে কি আমাদের অধিকারের জোরে, না রাজার অনুগ্রহে। যদি পরে এমন কথা উঠে যে, কোনো বন্দোবস্তই স্থায়ী হইতে পারে না, শাসনকার্য্যের সুবিধার উপরেই স্থায়িত্বের নির্ভর, তবে সত্যরক্ষার জন্য লর্ড্ কর্ণওয়ালিসের প্রেতাত্মাকে কলিকাতা টাউনহল্ হইতে উদ্বেজিত করিয়া লাভ কি হইবে! এ সমস্ত মোহ আমাদিগকে ছিন্ন করিতে হইবে, তবে আমরা মুক্ত হইব। নতুবা প্রতিদিনই পুনঃপুন বিলাপের আর অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু যেখানে আমাদের নিজের জোর আছে, সেখানে আমরা দৃঢ় হইব। যেখানে কর্ত্তব্য আমাদেরই, সেখানে আমরা সচেতন থাকিব। যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে, সেইখানে আমরা নির্ভর স্থাপন করিব। আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ, নিরাশ্বাস হইব না! এ কথা কোনোমতেই বলিব না যে, গবর্মেণ্ট একটা কি করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি আমাদের সকলদিকে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল—তাহাই যদি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে, তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে, কোনো ভিক্ষালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে বেশিদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন, তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি, তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন, যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না।

বৃটিশ গবর্মেণ্ট নানাবিধ অনুগ্রহের দ্বারা লালিত করিয়া কোনোমতেই আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহ—অনুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পদে হতাশ করিয়া তাঁহাদের দ্বার হইতে দূর করিয়া দিবেন, তখনই আমাদের নিজের ভাণ্ডারে কি আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর হইবে,—আমাদের নিজের শক্তিদ্বারা কি সাধ্য, তাহা জানিবার সময় হইবে,—আমাদের নিজের পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত, তাহাই বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবেন। যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না, বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া, দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না—তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব—তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব. প্রোভিন্‌শাল্ কন্‌ফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্ব্বোধ বক্তৃতা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান
করিব না —এবং ... যাগিবে,
... দিগকে
ইংরাজ যখন যাতে ...
... চেষ্টায়
আমাদের নিজের ঘ ...
... পারিবে,
দিকে জোর করিয়া
... তখনি
তখনি ব্রিটিশ গবর্মে ...

অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান! হে রাজন্, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ, তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জ্জন করিতে দাও! আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে! আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্রমূর্ত্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে;—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে!

বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত-পদাবলী।

অতঃপর বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত-পদাবলী। গ্রিয়ার্সন্‌কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৮২টি পদ ও সেগুলির ইংরাজি অনুবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন সঙ্কলনে সেগুলি সংবলিত হয় নাই। এ দেশে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে কয়েকটি বিদ্যাপতির স্বরচিত, এ কথা গ্রিয়ার্সন্ স্বীকার করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গে তাঁহার সঙ্কলিত কবিতা ৭৬টি। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। দীর্ঘ জীবনে রাধাকৃষ্ণসম্বন্ধে মোটে ৭৬টি পদ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। গ্রিয়ার্সন্ যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পুঁথির অন্বেষণ করেন নাই, গায়কদিগের মুখে বিদ্যাপতির গান সংগ্রহ করেন। তাঁহার সঙ্কলনে ভাবসম্মিলনের একটিও পদ নাই; বিদ্যাপতির গম্ভীর স্তোত্র "কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি-অবসানা। তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর-লহর-সমানা॥"— অথবা আর কোন স্তোত্র নাই, মাধবের পূর্ব্বরাগের একটিও পদ নাই। উৎকৃষ্ট পদ অনেকগুলি আছে, কিন্তু সমুদায় একত্র করিয়া কাব্য-সৌন্দর্য্যে বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীর সহিত তুলনা হয় না। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনপ্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। বিদ্যাপতির কতকগুলি অশ্লীল পদ আছে শুনিতে পাওয়া যায়। লেখকগণ সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ পদ উদ্ধৃত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এ কথার বিস্তৃত আলোচনার এ অবসর নহে। একটি বৃহৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যাপতির পদাবলী ধর্ম্মগ্রন্থতুল্য, সঙ্কীর্ত্তনে চৈতন্যদেব স্বয়ং এই সকল গীত শুনিয়া মুগ্ধ, মূর্চ্ছিত হইতেন, স্থানে স্থানে পদাবলীর পুঁথি অদ্যাবধি তুলসী-পুষ্পে পূজিত হয়; কাব্যে কাহাকে অশ্লীল বলা যাইতে পারে, কাহাকে পারে না, সে সকল কথার বিচারে এখন প্রবৃত্ত হইব না। যে দেশের শিক্ষার গুণে

আমাদের রুচি বিশুদ্ধ ও সমুন্নত হইয়াছে, আজ কেবল সেইজাতীয় সাক্ষী ডাকিয়া ক্ষান্ত হইব। অতিশয় অশ্লীল ও নিন্দিত পদ গ্রিয়ার্সনের গ্রন্থে অনেকগুলি আছে এবং তিনি ভাষান্তর করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বলেন, "I have grouped the songs into classes, according to the subjects of which they treat ; one class, for instance, treating of the first yearnings of the soul after God, another of the full possession of the soul by love for God, another for the estrangement of the soul, and so on To understand the allegory, it may be taken as a general rule that Radha represents the soul, the messenger or *duti* the evangelist or else the mediator, and Krishna of course the deity." স্থানান্তরে, The glowing stanzas of Vidyapati are read by the devout Hindu with as little of the baser part of human sensuousness as the Song of Solomon is by the Christian priest। অন্যত্র, "They (Vidyapati's poems) became great favourites of the more modern Vaishnava reformer of Bengal-- Chaitanya, and through him, songs purporting to be by Vidyapati have become as well known in Bengali households as the Bible is in an English one." জন বীম্‌স বিশেষ কিছু বুঝিতেন না, কিন্তু তিনিও *Indian Antiquary* পত্রে বিদ্যাপতি ও বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যের ভক্তিমার্গ পারস্যদেশের সুফী কাব্য ও ভক্তির সহিত উপমিত করেন। যাঁহারা জগদ্বিখ্যাত দিওয়ান-ই-হাফিজের গজল ও জলালুদ্দীন রুমীর মস্‌নবী মূল কিংবা অনুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই তুলনার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। বিচিত্রভাষী বিশ্বপ্রেমিক আমেরিকান্ কবি Walt Whitman। মুক্ত-বন্ধন কবির সর্ব্বতোমুখী বাণী তূর্য্যনাদে ঘোষণা করিয়াছেন—

"No more modest than immodest.

* * * *

Through me forbidden voices,
Voices of sexes and lusts, voices
veiled and I remove the veil,
Voices indecent by me clarified
and transfigured."

গ্রিয়ার্সনের সংগ্রহ অতি সামান্য, মিথিলায় বিদ্যাপতির আরও অনেক পদ আছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় চিরকাল বিদ্যাপতির ভক্ত, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া সম্প্রতি মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির পদাবলী আনাইয়াছেন। দ্বারভাঙার মহারাজা উৎসাহের সহিত এই উদ্যমে যোগদান করিয়াছেন এবং প্রধানত তাঁহারই যত্নে এই পদগুলি পাওয়া গিয়াছে। সারদাবাবুর নিকট হইতে পদগুলি আমি পাইয়াছি। এই পদগুলিই এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান ও পুঁথি হইতে

সংগৃহীত হইতেছে বলিয়া পুঁথির কালনির্ণয় করা কিছু সময়সাপেক্ষ এবং অনেক পদ মুখে মুখে সংগৃহীত। এ পর্য্যন্ত আমরা ১৫১টি পদ পাইয়াছি, ইহাতে গ্রিয়ার্সনের প্রকাশিত ৬৩টি, পদ আছে, অপর সঙ্কলনে প্রকাশিত ৭টি এবং এদেশে প্রচলিত ৭টি পদের পাঠান্তর আছে। ইহার মধ্যে ১০টি অপ্রকাশিত শিবগীত। আমাদের পক্ষে প্রায় সকলগুলিই একেবারে নূতন। এখন নূতন, কিন্তু চিরকাল কি নূতন ছিল? এখন বঙ্গদেশীয় ও মৈথিল, দুইরূপ পদবিভাগ করিতে পারা যায়, কিন্তু চিরকাল কি এইরূপ প্রভেদ ছিল? যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিদ্যাপতির দুইচারিটি পদ ব্যতীত এ দেশে আর পাওয়া যায় না, অপরগুলি কেবল অনুকরণ কিংবা জাল, গ্রিয়ার্সনের এই মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতেছে। তিনি মিথিলার সমস্ত পুঁথি দেখেন নাই, পদকল্পতরুও উত্তমরূপে দেখিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ দেশের সঙ্কলনকারগণ এক ভণিতা ছাড়া আর কিছুই দেখেন নাই। পদকল্পতরুতেই ভণিতাশূন্য অথবা অপরভণিতাযুক্ত বিদ্যাপতির বহুসংখ্যক পদ আছে। ভণিতাবিযুক্ত যে পদ পদকল্পতরুতে, পদামৃতসমুদ্রে, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে পাইয়াছি, এবং যে কারণে কোন সঙ্কলনকার বিদ্যাপতির পদ বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই, ভণিতাযুক্ত সেই পদ মৈথিল পুঁথিতে পাইতেছি। গোবিন্দদাসের এরূপ পদ পাইয়াছি, যাহাতে বিদ্যাপতির মৈথিল পদের ভাব অবিকল গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকবির সে পদ এখন এ দেশে প্রচলিত নাই। চণ্ডীদাস বাঙালী, তাঁহার পুঁথি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইবার কথা, এইজন্য অধিকসংখ্যক পদের ভণিতা পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি বিদেশী, তাঁহার পদ দুর্ব্বোধ, পুঁথির অক্ষরে কিছু প্রভেদ, হয় ত তাঁহার পদাবলী অধিকতর গীত হইত, ভণিতা সময়ে সময়ে লুপ্ত বা বিকৃত হওয়া বিচিত্র নহে। এ দেশে বিদ্যাপতির সঙ্কলনে যতগুলি পদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা অধিকসংখ্যক পদ এ দেশে যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বৈষ্ণবদাস অনেক পদ সম্পূর্ণ পান নাই, কিন্তু তিনি যাহাও পাইয়াছিলেন, সে সকলগুলিও কোন সঙ্কলনে প্রকাশিত হয় নাই। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে চৈতন্যদেবের সময় ও তাঁহার কিছুকাল পরেও বিদ্যাপতির সমগ্র পদাবলী এ দেশে প্রচলিত ছিল, এই অনুমানই সঙ্গত বিবেচনা হয়।

মৈথিল পদাবলী ও এদেশের পদাবলীতে ভাষাগত পার্থক্য অনেক, কিন্তু ভাবগত সাদৃশ্য আরও অধিক। বঙ্গদেশের অপেক্ষা মিথিলায় পাঠ ও রচনা পরিবর্ত্তন অল্প। বিদ্যাপতির পর তাঁহার সমকক্ষ বৈষ্ণবকবি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। চৈতন্যদেবের ভক্তিস্রোত উজান বহিয়া মিথিলা ভাসাইতে পারে নাই, এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম সে প্রদেশে কখনও প্রবল হয় নাই। সে দেশে মৈথিলী জানকী ও তাঁহার পতি রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি এখনও অচলা। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে একটি পদে 'হরি'শব্দের পরিবর্ত্তে 'রঘুপতি', এবং কয়েকটি পদের ভণিতায় 'জয় রাম' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'দশ-

রথসুত অরু জনকনন্দিনী' মিথিলার উপাস্য দেব-দেবী, বিদ্যাপতির পদাবলী বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত। দ্বারভাঙা মজঃফরপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্যাপতির প্রায় কিছুই জানেন না। বিদ্যাপতির রচিত সংস্কৃত পুঁথি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ মৈথিল-ভাষায় রচিত পদাবলী এ পর্য্যন্ত সে আকারে প্রকাশিত হয় নাই, ইহাতেই তাঁহার বৈষ্ণব গীতাবলীর কিরূপ সমাদর, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সমাদর নাই বলিয়াই পাঠবিকৃতিরও বাহুল্য নাই। বিদ্যাপতির রচনা আধুনিক মৈথিল ব্যাকরণের অনুযায়ী করিবার চেষ্টা হওয়াতে স্থানে স্থানে আধুনিক মৈথিল ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার অধিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। যেখানে শব্দপরিবর্ত্তন, সেখানেই শ্রুতিপরুষতা-দোষ ঘটিবে। গীতে ও কাব্যে প্রভেদ এই যে, গীত রাগিণী ও লয়ের অবলম্বনে মিষ্ট, তাহার বিচ্ছেদে শব্দযোজনামাত্র; যে শব্দ-মালা রাগরাগিণীর মুখপ্রেক্ষী নহে, যাহার ছন্দে ছন্দে ঝঙ্কৃত হিল্লোলিত রাগিণী সঞ্চরণ করে, শ্লোকের বন্ধনীতে বন্ধনীতে সম রক্ষিত হয়, তাহাই কাব্য। বিদ্যাপতির রচনা উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য, সুরেও সঙ্গীত, শব্দেও সঙ্গীত, শব্দ-পরিবর্ত্তনের প্রয়াস হইলেই রসভঙ্গ হইবে। এ দেশে প্রচলিত পদাবলীর তুলনায় মৈথিল পদগুলিতে ভাষার ও ভঙ্গীর সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য আছে। শব্দলালিত্যে ও ছন্দের তরল গতিতে ঝরঝর নির্ঝরপাততুল্য শ্রবণাভি-রাম। অপ্রকাশিত পদগুলির মধ্যে এমন অনেক পদ আছে, যাহা পাঠ করিতে বিস্ময় ও পুলকে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কয়েকটি মৈথিল পদ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রত্যেক পদের সংক্ষিপ্ত অন্বয়ার্থ করিয়াছি। প্রথম ৩টি পদ আমাদের পুঁথিতে এবং গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনেও আছে।—

কানন কান্থ কান হম্ শুনল
ভই গেল আনক আনে।
হেরইত শঙ্কররিপু মোহি হরলনি
কি কহব তনিক গেয়ানে॥
চানন চান অঙ্গ হম লেপলি
তঁই বাঢ়ল অতি দাপে।
অধরক লোভসৌঁ বিষধর সসরল
ধরই চাহ ফেরি সাপে॥
ভণহি বিদ্যাপতি দুহুক মুদিত মন
মধুকর লোভিত কেলি।
অসহ সহতি কত কোমল কামিনী
যামিনী জীব দয় গেলি॥

কাননে কানাই (আসিয়াছে) শুনিয়া আমি অন্যমনা হইলাম। (যখন কানাইকে) দর্শন করিলাম, (তখন) শঙ্কররিপু মদন আমাকে হরণ করিলেন (আমার চৈতন্য হরণ করিলেন), তাঁহার (মদনের) বিবেচনার (কথা) কি বলিব? (প্রথম বিকার শ্রবণজনিত, দ্বিতীয় বিকার দর্শনে।) চন্দন (এবং) চন্দ্র আমি অঙ্গে লেপন করিলাম (অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া শীতল হইবার আশায় জ্যোৎস্না-লোকে বসিলাম), তাহাতে (শ্রবণ ও দর্শন জনিত বিকার) অত্যন্ত দর্পের সহিত বাড়িল। অধরের লোভে বিষধর সর্প নীচে নামিল (বেণী মুক্ত হইয়া মুখের উপর পড়িল), সর্পকে ফিরিয়া ধরিতে চাহিলাম (মুক্ত বেণী যুক্ত করিতে চাহিলাম)। বিদ্যাপতি কহিতেছে, দুই জনের প্রীত মন, মধুকর কেলিলুব্ধ। কোমল কামিনী অসহ কত

সম্ভব করিবে? যামিনী জীবন দিয়া গেল (রজনীতে উভয়ের মিলন হইল)।

দ্বিতীয় পদটি নূতন ধরণের। পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান প্রভৃতি যে সকল পদের বিভাগ আছে, মিথিলায় তাহার অতিরিক্ত 'লাথ'-শীর্ষক একটি বিভাগ দেখা যায়। লাথের অর্থ ছলনা, অপরাধগোপনমানসে কৌশলবাক্য-প্রয়োগ। বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদেও এই শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি—'ভণই বিদ্যাপতি ন করহ লাথ'। অভিসার হইতে সদ্য প্রত্যাগত রাধা ননদের নিকট অপরাধ গোপন করিতেছেন। কবিতার কৌশল এই যে, ছল প্রত্যক্ষ, অথচ গূঢ় রূপকের ভাষায় অভিসারিকা সত্য বর্ণন করিতেছেন।—

ননদি সরূপ নিরূপহ দোষে।
বিনু বিচার অভিচার বুঝইবহ
শাশু করইবহ রোষে॥
কৌতুক কমল নাল হম তোড়লি
করই চাহলি অবতংসে।
রোষ কোষসোঁ মধুকর ধাওল
তেহি অধর কর দংশে॥
সরোবরঘাটবাট সঙ্কটতর
হেরি নহি শকলহু আগ।
সোঁ কর বাট উবটি হম চললহু
তেঁই কুচ কণ্টক লাগ॥
গরুয় কুম্ভ শির থির নহি থাকয়
তেঁই উধসল কেশপাশে।
সখীজনসোঁ হম পাছু পড়লহু
তেঁই ভেল দীঘ নিশাসে॥
পথ অপরাধ পিশুন পরচারল
তথি হুঁ উত্তর হম দেলা।
অমরখতাহি ধৈরজ নহি রহলে
তেঁই গদগদ স্বর ভেলা॥
ভণহি বিদ্যাপতি শুনু বরযৌবতি
ই সভ রাখহ গোই।
ননদিসোঁ রসরীতি বচায়ব
গুপত বেকত নহি হোই॥

ননদ, (আমার) অবয়ব দেখিয়া দোষ নিরূপণ করিতেছ। বিনা বিচারে (দোষ নিরূপণ করিলে) বিদ্বেষ বুঝাইবে (ও) শাশুড়ী রাগ করিবেন। কৌতুক করিয়া মৃণাল হইতে পদ্ম ছিঁড়িয়া আমি শিরোভূষণ করিতে চাহিলাম, কমলকোষ হইতে ক্রুদ্ধ মধুকর ধাবিত হইয়া আমার অধরে দংশন করিল। সরোবরঘাটের পথে তরুসঙ্কট পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই, ফিরিয়া অন্য পথে যাইতে কুচে কণ্টক লাগিল। গুরুভার পূর্ণকুম্ভ শিরে স্থির থাকে না, সেই কারণে কেশপাশ আলুলিত হইয়াছে। সখীজনের পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম, (দৌড়িয়া আসিতে) নিশ্বাস দীর্ঘ হইয়াছে। পথে দুষ্টলোকে আমাকে বিদ্রূপ করিল, তাহাতে আমি উত্তর দিলাম, ক্রোধে ধৈর্য্য রহিল না, সেইজন্য কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়াছে। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, এ সকল গোপন করিয়া রাখ। ননদা হইতে রসরীতি রক্ষা করিবে, (তাহা হইলে) গুপ্ত ব্যক্ত হইবে না।

বিরহ-আশঙ্কার একটি পদ। এটিও রাধার উক্তি।—

মাধব তোঁহে জনি যাহ বিদেশে।
হমরো রঙ্গ-রভস লই যয়বহ
লয়বহু কোন সন্দেশে॥
বনহি গমন কর হোয়তি দোসরমতি
বিসরি যায়ব পতি মোরা
হীরা মণি মানিক একো নহি মাগব
ফেরি মাগব পহু তোরা॥
গমন গমন কর নয়ন নোর ভরু
দেখিও ন ভেল পহু ওরা।

একহি নগর বসি পহু ভেল পরবশ
কইসে পুরত মন মোরা॥
পহুসঙ্গ কামিনী বহুত সোহাগিনী
চন্দ্রনিকট যইসে তারা।
ভণহি বিদ্যাপতি শুনু বর যৌবতি
অপন হৃদয় ধরু সারা।

মাধব তুমি বিদেশে যাইও না, আমার রঙ্গ রহস্য (আনন্দ) লইয়া যাইবে, (পরে কি) কোন সংবাদ লইবে? বনে (ব্রজপুরী ও মথুরার মধ্যস্থিত বন) গমন করিয়া অনুমতি হইবে, হে প্রাণপতি, আমাকে ভুলিয়া যাইবে। হীরা, মণি, মাণিক্য একটিও চাহিব না, প্রভু তোমাকেই ফিরিয়া চাহিব। যখন গমন কর, (আমার) চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, প্রভু, দর্শনেরও সীমা হয় না (চক্ষু ভরিয়া তোমাকে দেখিতেও পাই না)। এক নগরে বাস করিয়া প্রভু পরবশ হইল (অপর রমণীর প্রেমপ্রার্থী হইল), আমার মনস্কামনা কিরূপে পূর্ণ হইবে? প্রভুর সঙ্গে (থাকিলে) কামিনী অত্যন্ত ভাগ্যবতী হয়, যেমন চন্দ্রের নিকটে তারা। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, আপনার হৃদয়ে সার ধর (আত্ম-নির্ভর কর)।

গ্রিয়ার্সন্ যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, পদাবলীর অর্থগ্রহণে তদনুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ও অনেকস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহার একটি কৌতুকাবহ কারণ আছে। মৈথিল পণ্ডিতেরা লক্ষ্মণাব্দ ধরিয়া বৎসর গণনা করেন, কিন্তু বিদ্যাপতির পদের অর্থ করিবার সময় প্রাচীন কিংবা আধুনিক বাংলাভাষার সহিত প্রাচীন মৈথিলভাষার যে কোন সাদৃশ্য আছে, কোনমতেই তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। গ্রিয়ার্সন্ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আধুনিক মৈথিলভাষায় 'পারা' (করিবার শক্তি) অর্থে 'পাব'শব্দের ব্যবহার নাই, কিন্তু বিদ্যাপতির পদে যে সে অর্থে প্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যথা, "লুবুধল নয়ন হটয় কে পার," লুব্ধনয়নকে কে হটাইতে (নিবারণ করিতে) পারে? মৈথিল পণ্ডিতেরা এ অর্থ কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। সংস্কৃতে বিশেষ্য 'পার'-শব্দের যে অর্থ, তাঁহারা তাহাই গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের অর্থ—পরপারগামী (অর্থাৎ বাঞ্ছিতপ্রাপ্ত) লুব্ধনয়নকে কে ফিরাইতে পারে? গ্রিয়ার্সন্ এই কষ্টকল্পিত অর্থ গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা বাংলাভাষার অনুরূপ অনুবাদ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহাদের সে প্রতিজ্ঞা 'হটয় কে পার'? বিদ্যাপতির আর এক স্থলে আছে—"কহিয় ন পারিয় পহু-মুখ-ভাষা", প্রভুর মুখের ভাষা (তিনি যাহা কহিয়াছিলেন), কহিতে পারি না। পণ্ডিতের অর্থ—প্রভুর মুখের ভাষার কথন (পুনরাবৃত্তি) পারপ্রাপ্ত হইল না। গৌণার্থে বড় প্রভেদ নাই, তবে পণ্ডিতের অর্থে মুণ্ডপরিভ্রমণ করিয়া নাসিকাধারণের ব্যায়াম-কৌশল আছে। আরও এক স্থানে বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন, "আকম্প কঠিন সহয় কে পার, কঠিন আলিঙ্গন কে সহিতে পারে? পণ্ডিতদিগের অর্থ—কঠিন আলিঙ্গনের চরম-সীমা কে সহ্য করিতে পারে? এমন পণ্ডিতমণ্ডলীকে পারিয়া উঠা দায়। কিন্তু যাঁহাদিগকে গ্রিয়ার্সন্ দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা

ছাড়া মিথিলায় অপর উত্তম পণ্ডিত আছেন, ও তাঁহারা পদাবলীর সুন্দর সদর্থ করিয়া থাকেন।

যে সকল পদ ইতিপূর্ব্বে একেবারেই প্রকাশিত হয় নাই, অথবা দুইএকটি পদ-কল্পতরুর অতি মনোরমা অথচ অতি দুর্গম অরণ্যে অজ্ঞাতবাসে থাকিলেও আমাদের অপরিচিত, এমন কয়েকটি শ্রবণ করুন। এই কবিতা-কয়েকটি আমার বিবেচনায় বিদ্যাপতির মূল রচনা, কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা বিকৃতি ঘটে নাই।—

নন্দক নন্দ কদম্বেরি তরু তরই
ধীরই ধীরই মুরলী বোলাব।
সময় সঙ্কেতনিকেতন বইসল
বেবি বেবি বোলি পঠাব॥
শ্যামরি, তোরা লাগি
অনুখনে বিকল মুরারি॥
যমুনাক তীরই উপবন উদবেগল
ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।
গোরস বিকই অবইত যাইতেঁ
জনি জনি পুছ বনমারী॥
তোঁহই মতিমান সুমতি মধুসূদন
বচন শুনহ কিছু মোরা।
ভণই বিদ্যাপতি শুনু বরযৌবতি
বন্দহ নন্দকিশোরা॥

নন্দের নন্দন কদম্বতরুতলে ধীরে ধীরে মুরলী বাজায়। সঙ্কেতনিকেতনে বসিয়া (মিলন-) সময় (আগত জানিয়া) বারবার আহ্বান-ধ্বনি পাঠায়। সুন্দরি, তোর লাগিয়া মুরারি অনুক্ষণ বিকল। যমুনার তীরে উপবনে উদ্বিগ্ন হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেই দিকেই (সঙ্কেতনিকেতনের অভিমুখে) দেখিতেছে। (যে সকল গোপী) দুগ্ধবিক্রয় করিতে আসিতেছে (বা) যাইতেছে, (তাহাদিগের) প্রত্যেককে বনমালী (তোর কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছে। সুমতি, আমার কথা কিছু শোন্, মধুসূদন তোর প্রতি অনুরক্ত (হইয়াছে)। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, নন্দকিশোরকে বন্দনা কর।

মাধবকে দেখিয়া রাধা সখীকে কহিতেছেন—

হমে হসি হেরলা থোরারে।
সফল ভেল সখি কৌতুক মোরারে॥
এ সোএ।
হেবিতহি হরি ভেল আনে রে।
জনি মনমথ মন বেধল বাণে রে॥
লখল ললিত তনু গাতে রে।
মন ভেল পরশিয় সরসিজপাতে রে॥
তনু পসবল বিন্দু রে।
নেউছি নডাওল সনখত ইন্দু রে॥
কাঁপল পরম রসালে
জনি মনসিজ গরই জপেলু তমালে রে।
বিদ্যাপতি কবি ভাণেরে।
করত কমলমুখী হরি সাবধানে রে॥

আমাকে অল্প হাসিয়া দেখিল; সখি, আমার কৌতূহল সফল হইল। সই (আমাকে) দেখিয়া হরি অন্যমনা হইল, যেন মন্মথ তাহার চিত্তে বাণ বিদ্ধ করিল। তাহার ললিত গাত্র লক্ষ্য করিলাম, মনে হইল সর-সিজপত্র স্পর্শ করিতেছি। (তাহার) অঙ্গে স্বেদবিন্দু প্রসারিত হইল, (সেই রূপ দেখিয়া) তারাসনাথ চন্দ্র ফিরিয়া পলায়ন করিল। (অনুরাগ-আতিশয্যে) রসার্দ্র হইয়া (তাহার কলেবর) কম্পিত হইল, যেন তমাল কন্দর্পের নামকীর্ত্তন করিতে করিতে গলিয়া গেল। বিদ্যাপতি কবি

কহিতেছে, হরি কমলমুখীকে সচেতন করিতেছেন, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে অনঙ্গ জাগরণ করিতেছে।

একটি কবিতায় রাধার সহজ-সুন্দর রূপ বর্ণিত হইয়াছে। অঙ্গে দুইটিমাত্র অলঙ্কারের উল্লেখ আছে কর্ণে কুণ্ডল ও কণ্ঠে বৈদূর্য্য-মণি। এই স্বল্পালঙ্কৃত রূপ কবি তাঁহার অতুল শব্দৈশ্বর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন।—

সহজ সুন্দর চিকুর চামর
সজল-জলদ-সমূহ-শামর
সিঁউথি সরণি সুচার
সিন্দূর-রাগ আঁকুর রে॥
অতি শোহাওন বদনমণ্ডল
নিয়র চঞ্চল কনককুণ্ডল
নয়ন বাণ কমান জনি লুর
আন নহি ফুর রে॥
রূপই রতি অতি অনুপ দেখলি
ললিত কনকলতা বিশেখলি
বিধিহ জনি বিনু পরশই সিবিজলি
মদনই অরজলি রে॥
ভূমিতল রাকেশছবিধর
বদনসুষমা অতি মনোহর
কনকলতিকা যেহন সঞ্চর
দোষবরজলি রে॥
দুলভ দৌরী গহল গীমা
দেখল দুহু মিলি রূপসীমা
গুরু পয়োধরভার নিয়রহি
সে ন হোয় কহিরে॥
বাহু বন্ধুর বিপুল হরষল
চারু চন্দনখণ্ড ঘরষল
বলয়যুগ সন আন কিছু
নহি লাগি রহয়হি রে॥
মাঁঝ পিশুনক নেহসম খীণ
সুজননেহ নিতম্বই জনি জিন
চরণ চটুল মরালসম গতি
কুন্দনখ ভতি রে॥
সবকলাময় গুণক আগরী
লখলি বিধিবশই নগর নাগরী
সুকবি বিদ্যাপতি ভণিত রস
বুঝই যদুপতিরে॥

চামর-(তুল্য) কেশ সজল জলদসমূহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ (ও) স্বভাবত সুন্দর, সিন্দূর-রাগের সুন্দর অঙ্কুর সীমন্তপ্রসারী। অতি শোভন বদনমণ্ডলের নিকট চঞ্চল কনক-কুণ্ডল নয়নধনুকের বাণতুল্য দোলায়মান, আর কিছু মনে হয় না। রতিরূপ ললিত কনকলতাশ্রেষ্ঠ অতি অনুপম দেখিলাম, বিধি যেন বিনা স্পর্শে (স্পর্শমলিন না করিয়া) মদনের অর্চ্চনাঞ্জলি সৃজন করিয়াছেন। অতি মনোহর বদনসুষমা ভূমিতলে পূর্ণচন্দ্রচ্ছবি ধারণ করিয়াছে, যেন দোষবর্জ্জিতা অনিন্দ্য কনকলতিকা সঞ্চরণ করিতেছে। গ্রীবা দুর্লভ বৈদূর্য্যমণি ধারণ করিয়াছে, (কণ্ঠ ও মণি) উভয়ে মিলিয়া রূপের সীমা দেখাইতেছে; (তাহার) সমীপেই গুরু পয়োধরভার, তাহা কহা যায় না (বর্ণনাতীত)। বিপুল হর্ষিত (পুলকাঙ্কিত) বন্ধুর বাহুতে বলয়যুগলতুল্য চারু চন্দনখণ্ড ঘর্ষিত, আর কিছু লাগিয়া নাই (হস্তে আর কোন অলঙ্কার নাই)। কটি পিশুনের স্নেহের ন্যায় ক্ষীণ (ক্রূর ব্যক্তির প্রেম যেরূপ ক্ষণস্থায়ী, কটি সেইরূপ ক্ষীণ); নিতম্ব সুজনের স্নেহকে যেন জয় করিয়াছে (সুজনের প্রেম যেরূপ চিরস্থায়ী, নিতম্ব যেন তদপেক্ষা বিপুল): গমন মরালতুল্য, চরণ চটুল, তাহাতে কুন্দকুসুম-(তুল্য) নখ-পংক্তি। সকলকলাময় গুণের অগ্রগণ্যা নাগরী বিধির কৃপায় নগরে দর্শন করিলাম। সুকবি বিদ্যাপতি-(কৃত) কথিত রস যদুপতি বুঝেন।

একটি রূপক শ্রবণ করুন—

সাঁঝহি নিজমুখপ্রেম পিয়াই।
কমলিনী ভমরা রখল ছিপাই॥
শেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাসে।
কতয় ভমরা মোর পবল উপাসে॥
ভমি ভমি ভমরী বালভু নিজ খোজে।
মধু পিবি মধুকর শুতল সরোজে॥
নহি ফুল কহেস নহি উগই ন সুরে।
সিনেহো নহি যায় জীব সৌ মোরে।
কেও নহি কহই সখি বালভু বাতই।
রইন সমাগম ভই গেল প্রাতই॥
ভণহি বিদ্যাপতি শুনি এ ভমরী।
বালভু অছি তোব অপনহি নগরী॥

নিজমুখপ্রেমসুধা পান করাইয়া কমলিনী সন্ধ্যাকালেই ভ্রমরকে গোপন করিয়া রাখিল। ফুল বাসস্থান ও পরিমল শয্যা হইল। ভ্রমরী ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া আপনার পতিকে অন্বেষণ করে, (ও কহে), কোথায় আমার ভ্রমর উপবাসী রহিল। (ওদিকে) মধুকর মধু পান করিয়া কমলের মধ্যে শয়ন করিল। ফুলও কিছু কহে না, সূর্য্যও উদয় হয় না। (ভ্রমরী কহিতেছে) স্নেহে, অর্থাৎ স্নেহজনিত বিচ্ছেদ-যাতনায় আমার প্রাণও যায় না। সখি, বল্লভের কথা (সংবাদ) কেহ কহে না, রাত্রে সমাগম (হইবার কথা), প্রভাত হইয়া গেল। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন ভ্রমরি, তোর বল্লভ নিজেরই নগরীতে আছে।

বিরহের প্রথম অবস্থায় রাধা কহিতেছেন—

গমনই গমাউলি গরিমা
অগমন জীবনসন্দেহ।
দিনই দিনই তনু অবসন ভেল
হিমকমলিনীসম নেহ॥
অবহু ন সুমিরত মধুরিপু
কি করতি সুন্দরীনাম।
বিনু দোষ মোহি বিসরল হু
কহিনী রহতি বহু ঠাম॥
এক দিশ কান্হ অওকাদিশ
সুবিদিত বংশ বিশালা।
দুই পথ চটলি নিতম্বিনী
সংশয় পড়ু কুলবালা॥
পাঁচবাণ অতি আতয
ধৈরজ করু মন থির।
বিদ্যাপতি কবিবর ভণ
ঝাঁখ নয়ন বহু নীরে॥

গমনে (অভিসারে) গরিমা হারাইলাম, না যাইলে জীবনসংশয়। দিনে দিনে তনু অবসন্ন হইল, কমলিনীর সহিত তুষারের যেমন স্নেহ। মধুরিপু (মধুসূদন) এখনও আমাকে স্মরণ করেন না, সুন্দরীনামে (আমার) কি করিবে? বিনা দোষে আমাকে বিস্মৃত হইলেন, (এই) কাহিনী বহু স্থানে থাকিবে। একদিকে কানাই, আর একদিকে সুবিদিত বিশাল বংশ; দুই পথে নিতম্বিনী আরোহণ করিলেন, কুলবালা সংশয়ে পড়িল। মদন অত্যন্ত দহন করিতেছে, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া মন স্থির কর। বিদ্যাপতি কবিবর কহে, শোকে (আমার নয়নে) অশ্রু বহিতেছে।

অনুভবমিলনের একটি পদ—

সপনে আয়ল সখি মঝ পিয়া পাশে।
তখনুক কি কহব হৃদয়হুলাসে॥
ন দেখিয় ধনুগুণ ন দেখু সন্ধানে।
চৌদিশ পরয়ে কুসুমশরবাণে॥
মঝ বিলোচন বিকসিত খোরা।
চান উগল জনি সমুদ্রহিলোরা॥
উঠলি চেহায় আলিঙ্গন বেরি।
রহলি লজায় পুনি শেজ হেরি॥
ভনই বিদ্যাপতি শুনহ সপনে।
জত দেখলহ তত পুরতোহ মনে॥

সখি, স্বপ্নে প্রিয় আমার নিকটে আসিল; তখনকার হৃদয়ের আনন্দ কি কহিব! ধনু-গুণ অথবা সন্ধান (কিছুই) দেখি না, (মাত্র দেখিলাম) চতুর্দ্দিকে মদনের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অল্পবিকশিত বঙ্কিম নয়ন, যেন সমুদ্রহিল্লোলে চন্দ্রোদয় হইল (সমুদ্রতরঙ্গে আন্দোলিত ভগ্ন-চঞ্চল চন্দ্র-বিম্বের ন্যায় ঈষদুন্মীলিত বঙ্কিম নয়ন)। আলিঙ্গনের সময় চমকিত হইয়া উঠিলাম, শূন্য শয্যা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রহিলাম। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন, স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ, তাহা মনে পূর্ণ হইবে।

দুইটি অপ্রকাশিত পদের ভণিতার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। প্রথমটি এই—

দশ অবধান ভণ পুরুষ পেম গুণি
প্রথম সমাগম ভেলা।
আলমশাহ পহু ভাবিনি ভজি রহ
কমলিনী ভমর ভুললা॥

দশ অবধান কে? এই উপাধি অথবা নাম পূর্ব্বে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পুঁথিতে মৈথিলভাষায় একটি টীকা আছে—

বিদ্যাপতিকা উপাধি দশাবধান ছল যে দিল্লীদরবারসো ভেটল ছল।

পদটি ভণিতাযুক্ত অর্থে রাধাকৃষ্ণবিষয়ে নহে, কিন্তু রচনার একই প্রণালী। অভি-সার হইতে প্রত্যাগত কোন রমণীকে কবি পথে কহিতেছেন—

গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর
মৃগমদ পঙ্কে লেপলা।
জনি সুমেরু শশিখণ্ড উদিত ভেল
জলধর জালই ঝপলা॥
অভিসারিণি হে কপট করহ কাঁ লাগি।
কোন পুরুষ গুণই লুবুধ তোহর মন
নয়নী গমউলহ জাগি॥

ভণিতার অর্থ—দশাবধান কহিতেছে, গুণ-বান্ পুরুষের সহিত প্রথম প্রেমসমাগম হইল। কমলিনী যেমন ভ্রমরে ভুলিয়া থাকে, হে ভাবিনি, আলমশাহ প্রভুকে ভজনা করিয়া তাঁহাতে সেইরূপ অনুরক্ত হও। মৈথিল টীকায় রহিয়াছে, বিদ্যাপতির উপাধি দশাব-ধান ছিল যাহা দিল্লীদরবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, শিবসিংহকে যখন দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া যায়, সেই সময় বাদশাহ বিদ্যাপতির রচিত গীত শুনিয়া, প্রীত হইয়া, শিবসিংহকে মুক্ত করিয়া দেন। গ্রিয়ার্সন্ অনুমান করেন—"কামিনী করু অস-নানে, হেরইতে হির্দয় হনল পচমানে"—এই পদটি বিদ্যাপতি বাদশাহের সাক্ষাতে রচনা করেন। মিথিলায় এইরূপ বিশ্বাস আছে। হয় ত এই পদটিও সেই সময়ের রচনা। যে উপাধি দিল্লীদরবার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভণিতায় তাহাই প্রয়োগ করিয়া অপরা রমণীর বর্ণনা করিয়া বাদ-শাহের চিত্তবিনোদন করা কবির পক্ষে অধিক-তর সম্ভব মনে হয়। দশাবধান-উপাধি-যুক্ত আর কোন পদ দেখিতে পাই নাই।

দ্বিতীয় পদটির বিষয় ও অর্থ অবিকল প্রথম পদের অনুরূপ, কেবল ভণিতা ভিন্ন।—

বেকতেও চোরী গুপত কর কতিখণ
বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলম যুগপতি চিরইজীব জীবথু
গ্যাসদেব সুলতান॥

বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, প্রকাশ্য চুরী কতক্ষণ গোপন করিবে? যুগপতি সুলতান

গ্যাসদেব (এই চুরীর বার্ত্তা) বিদিত আছেন, (তিনি) চিরজীবী হইয়া জীবিত হউন। বোধ হয়, এই গ্যাসদেব গ্যাসউদ্দীন, বঙ্গদেশের পাঠানবংশীয় রাজা। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে গ্যাস-উদ্দীনের মৃত্যু হয়। শিবসিংহের দানপত্রের কাল প্রচলিত বিশ্বাসমতে খৃষ্টাব্দ ১৪০০। গ্রিয়ার্সনের বিশ্বাস, খৃষ্ট-চতুর্দ্দশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭৩ সালের পূর্ব্বে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে সংশয়ের কোন কারণ নাই। মহলম (মালুম) ও সুলতান, এই দুই শব্দের সন্নিবেশনে অনুমান হয় যে, পদটি গ্যাসউদ্দীনের মনস্তুষ্টির জন্য রচিত ও সম্ভবত তাঁহার সাক্ষাতে গীত।

আর এক শ্রেণীর কবিতা গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে ও মৈথিল পুঁথিতে পাওয়া যায় এবং এ দেশেও ভাষান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত আছে। সেগুলি প্রহেলিকা অথবা হেঁয়ালি কবিতা। যখন মৈথিল ও এদেশে প্রচলিত এরূপ পদে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে এগুলি বিদ্যাপতির রচিত নয়, এমন কথা বলা যায় না। এগুলি যে রাজসভায় অথবা রাজাদেশে রচিত, অথবা ক্ষণে-তুষ্ট ক্ষণে-রুষ্ট অব্যবস্থিত রাজচিত্ত প্রসাদনের নিমিত্ত বিরচিত, তাহা কল্পনা করিতে পারা যায়। এই কঠিন সমস্যাগুলি কোন পণ্ডিত পূরণ করিয়া দিতেন, অথবা পণ্ডিতেরা অক্ষম হইলে কবি নিজে অর্থ করিয়া দিতেন ও সাধুধ্বনিতে রাজসভা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত, এরূপ অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না। পুঁথিতে এই শ্রেণীর একটি পদের ভণিতা এইরূপ—

ভণ বিদ্যাপতি শুনু উমাপতি
সকলগুণনিধান।
যে ই পদক অর্থ লগাবধি
সো জন বড় সেয়ান॥

বিদ্যাপতি কহিতেছে, সকলগুণনিধান উমাপতি শুন, যে এই পদের অর্থ লাগাইবে (করিবে), সে জন বড় চতুর। বিদ্যাপতির সমকালীন উমাপতিনামক আর একজন কবি ছিলেন। কবি ভণিতায় তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন।

রাধাকৃষ্ণপদাবলী ব্যতীত বিদ্যাপতি শিববিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা এখন সকলেই জানেন ও মিথিলায় সেগুলি বিশেষ প্রচলিত। একটি অপ্রকাশিত পদ উদ্ধৃত করি।—

হে হর তোঁহ প্রভু ত্রিভুবননাথে।
হম নিরদাশ অনাথে॥
করম ধরম তপ হীনে।
পড়ল্‌হু পাপ অধীনে॥
বেড় ভাসল মাঁঝ ধারে।
ভৈরব ধরু করু আরে
সাগরসম দুখভারে।
অবহু করিয় প্রতিকারে।
ভণহি বিদ্যাপতি ভাণে,
সংকট করিয় ত্রাণে।

পদের ভাষা নিতান্ত সরল, কেবল একটি পদ কিছু দুর্ব্বোধ "বেড় ভাসল মাঁঝ ধারে, ভৈরব ধরু করু আরে", অর্থ, (আমার) নৌকা স্রোতের মধ্যে ভাসিল, হে ভৈরব, ধরিয়া কিনারায় কর।

আমাদের দেশে বিদ্যাপতির পদাবলী যাহা প্রচলিত আছে, সেগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। মিথিলার পদগুলি ছাড়িয়া দিয়াও এক পদকল্পতরুতে যতগুলি পদ পাওয়া যায়, তাহাও কখন সংগৃহীত হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে

অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ভণিতায় নানাবিধ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু কোন সঙ্কলনকার সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই। ভণিতা ভিন্ন তাঁহারা আর কিছু দেখেন নাই, যে সকল রচনা কোনমতেই বিদ্যাপতির হইতে পারে না, সংশয়শূন্যচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। আবার রচনাগৌরবে যাহা নিঃসন্দেহ বিদ্যাপতির, ভণিতা নাই বলিয়া তাহা অসঙ্কোচে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেকগুলি মৈথিল পদ একজন ইংরাজের অধ্যবসায়, যত্ন, গুণগ্রাহিতা, উদারতা ও ভাবুকতায়, বিশ বৎসরের উপর হইল, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আরও বহুসংখ্যক অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। মাধুর্য্যে, লালিত্যে, লিপিকৌশলে, ভাবসৌন্দর্য্যে, কাব্যগৌরবে অপ্রকাশিত-পদাবলী প্রকাশিত-পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এগুলি কি হইবে? বিদ্যাপতি ত আমাদের কবি, তাহাতে ত তর্ক কিংবা আপত্তির অবসরমাত্র নাই। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর সহিত এই কবির অমৃতময়ী গীতি বিজড়িত—বৈষ্ণবকাব্যকল্পতরুর গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুম প্রধানত এই কবির প্রতিভাসৌরভে সুরভিত! এই সকল নূতন পদ সংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য, কতক বর্ণমালা ও ভাষার বিভীষিকায় ভীত হইয়া, কিন্তু প্রধানত আমাদিগের নিজের আলস্য-ঔদাস্যে আমরা এই কর্ত্তব্যপালনে বিরত রহিয়াছি। নাতিরত্নবহুলা জননীর মুখের দিকে চাহিয়া, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া, খণ্ডকবির অখণ্ডকীর্ত্তি সাহিত্যমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

প্রবন্ধসমাপ্তিতে বিদ্যাপতিবিরচিত একটি অপ্রকাশিত স্তোত্র আপনাদিগকে উপহার দিতেছি। শিবসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, এই স্তোত্র শক্তির। ভণিতায় শিবসিংহের নাম নাই, তাঁহার পিতা দেবসিংহ ও মাতা হাসিনী-দেবীর (হংসিনী) নাম আছে। রাজপণ্ডিত হইয়া বিদ্যাপতির যে সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল, বোধ হয় এই স্তোত্ররচনাকালে সেরূপ হয় নাই, কারণ যাচ্ঞাকারী ব্রাহ্মণের মত তিনি দেবসিংহকে 'যাচকজনের গতি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু মূল স্তোত্র অতুলনীয়। পরিত্রাণ অথবা মুক্তির কোন প্রার্থনা নাই, আছে কেবল বিস্ময়াভিভূত জ্ঞানলিপ্সুর অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানালোকের প্রার্থনা। ঘনকুঞ্চিতকেশশোভনে, স্লিথিল বিশ্বে দ্বন্দ্বমায়াপ্রসারিণি, একে অনেক, সহস্রধারিণি, রিপুরঙ্গস্থলপূর্ণকারিণি, সিতাসিতবরণি, কালি পুঞ্জীকৃততিমিরমধ্যবর্ত্তিনি, বাণি বিমলবিদ্যাবিধায়িনি, গায়ত্রী-জননি, রবিমণ্ডল-উদ্ভাসিনি, সুরসরিৎ-অলকনন্দাচারিণি, ত্রিমূর্ত্তিগেহিনি, অজ্ঞাত-সম্ভবে দেবি, প্রকাশিতা হও, প্রকাশিতা হও!

বিদিতা দেবি বিদিতা হো
অবিরলকেশী শোহন্তী।
একানেক সহসকো ধারিণী
অরিরঙ্গা পুরণন্তী॥
কজ্জলরূপ তুয় কালী কহিয়ও
উজ্জ্বল রূপ তুয় বাণী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিয়ে
গঙ্গা কহিয়ে পানী॥
ব্রহ্মাঘর ব্রহ্মাণী কহিয়ে
হরঘর কহিয়ে গৌরী।

নারায়ণঘর কমলা কহিয়ে
কে জান উতপতি তোবি ।।
বিদ্যাপতি কবিবর এহো গাওল
যাচক জনকে গতি।
হাসিনী দেই পতি গরুড় নরায়ণ
দেবসিংহ নরপতি ।।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সাহিত্যপ্রসঙ্গ।

ইস্‌লামের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব। গত ৩০শে মার্চ্চ অধ্যাপক গোল্ডজিহার হাঙ্গেরির একাডেমি অফ্ সায়েন্স সভার একটি সাধারণ অধিবেশনে উক্তনামধেয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। গত জানুয়ারিমাসের রয়াল্ এশিয়াটিক্ সোসাইটির জার্ণালে সেই প্রবন্ধটির সার সঙ্কলিত হইয়াছে।

অধ্যাপক গোল্ডজিহার বলেন—পূর্ব্বে আরবদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম ছিল "আল শামানিয়া"। এই শব্দ শ্রামণ্যশব্দ হইতে উৎপন্ন। মুসলমানধর্ম্মের উন্নতির সময়ে উক্তধর্ম্মাবলম্বী দুইএকজন দার্শনিক প্রকাশ্য-ভাবে কতকগুলি শ্রামণ্যসূত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "ধার্ম্মিক ব্যক্তি কষ্টভোগ করেন কেন?"—এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলিতেন, পূর্ব্বজন্মে তিনি অবশ্যই কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরব-অভিধানে "বুদ্"-শব্দের অর্থ মূর্ত্তি,বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি হইতে এই শব্দ আরব্য-ভাষায় প্রতিমূর্ত্তিবাচক সাধারণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরব্য উপন্যাসে অনেকস্থলে "তাহার কপালে লেখা ছিল" প্রভৃতিরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, এই ভাবের কথা হিন্দুস্থানের প্রচলিত বিশ্বাসের অনুযায়ী। খাঁটি মুসল-মানী পুস্তকে এস্থলে "স্বর্গীয়গ্রন্থে লিখিত আছে" বা তদ্রূপ অপর কোন উক্তি থাকিবার কথা। লোকের অদৃষ্ট বিধাতা-পুরুষ ললাটে লিখিয়া যান, ইহা ভারতবর্ষীয়-গণেরই ধারণা। আরব্য-উপন্যাসে অদৃষ্ট-বাদের যেরূপ প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে অধ্যাপক সাহেব মনে করেন, উহাতে হিন্দু-প্রভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় অনেকগুলি গল্প "সহস্রাধিক এক রজনী"র অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিজাতীয় পরিচ্ছদে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক ইতিহাসচর্চ্চার দিনে তাহারা আর আত্ম-গোপন করিতে পারে নাই।

মুসলমানধর্ম্ম ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া এশিয়ার সর্ব্বত্র স্বীয় বিজয়পতাকা উড্ডীন করিল। সেই সময়ে এশিয়ার প্রধান

ধর্ম্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম্ম। বিজয়ী মুসলমানের ধর্ম্ম-প্রভাবে উক্ত ধর্ম্ম ক্রমে স্থানচ্যুত ও বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, কিন্তু লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্মের উপাদানে নানদেশে প্রাচ্য ইস্‌লাম বিচিত্র-ভাবে পুষ্ট হইয়া নূতন আকার ধারণ করিল। খৃষ্টীয় একাদশশতাব্দীতে বোগ্দাদনগরে "জিন্দিকের" দল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল,—এই "জিন্দিক" শব্দ মুসলমানগণ বিধর্ম্মীদিগের, (প্রধানত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের) প্রতি প্রয়োগ করিত। সলিয়া বেন আবদল কাদ্দাস একজন প্রধান 'জিন্দিক' ছিলেন। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যেন মক্কা-নগরীকে ধ্বংস করেন।" ৭৮৩ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। হারুণ আল-রসিদের রাজত্বকালে আবুল অথাইয়া নামক প্রসিদ্ধ মোসলেম পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন, "যদি তোমরা জগতের শ্রেষ্ঠতম পুরুষকে দেখিতে চাও, তবে ভিক্ষুবেশী রাজকুমারের প্রতি লক্ষ্য কর—তাঁহার সাধুত্বই জগতে শ্রেষ্ঠ।" এই লেখক উক্তমত প্রচার করায় অপরাধে ৮২৮ খৃঃ অব্দে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রও এই মতাবলম্বনের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। ঘা' খাইয়া জিন্দিকের দল ক্রমে বলসঞ্চয় করিয়াছিল। ইহার দুই শতাব্দী পরে সুপ্রসিদ্ধ আবুল আল আল'মারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিরামিষভোজী ছিলেন এবং ইস্‌লামধর্ম্মকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানের বিকাশকেই প্রকৃত ধর্ম্ম মনে করিতেন এবং নির্ব্বাণের শান্তিই তাঁহার কামনা ছিল। ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

পরবর্ত্তী সুফী-সম্প্রদায়ের মত এই সকল ধর্ম্মমতের পরিপুষ্ট ও সর্ব্বশেষ বিকাশস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। হৃদয়ের কোমলবৃত্তির বিকাশপক্ষে খাটি ইস্‌লাম বিশেষ কোন সুযোগ উপস্থিত করে নাই। সুফী-সম্প্রদায়ের মত এই অভাব পূরণ করিতে সযত্ন। ইস্‌লামের ভিতর দিয়া এই সুফীমত বৌদ্ধধর্ম্মেরই জয়পতাকা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শোপেন্‌হাওয়ার বলেন, এই সুফী-সম্প্রদায় ভারতীয় ধর্ম্মমতকেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। বৌদ্ধদিগের "নির্ব্বাণ" এবং সুফীদিগের "ফণা," বৌদ্ধদিগের "পন্থা" ও সুফীদিগের "তারিক", বৌদ্ধদিগের "ধ্যান" এবং সুফীদিগের "মুরাকাবা", এ সমস্তই একপ্রকারের। সুফী-সম্প্রদায়ের নেতা ইব্রাহিম ইবন এদ্‌হামের জীবনসম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালে যে সকল উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবনের অনেক ঘটনাই তাহার প্রতি আরোপিত। এদহামও জনৈক রাজপুত্র, এক ভিক্ষুর চিত্তশান্তি লক্ষ্য করিয়া গৃহত্যাগী হন, তিনিও 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' মত প্রচার করেন। এই সকল ঘটনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কথার সঙ্গেও বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীর আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য লক্ষিত হয়।

বিজয়ী মুসলমানধর্ম্মাবলম্বিগণ যে অনেক-সময় বৌদ্ধগৌরব এইভাবে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার আরও বিবিধ প্রমাণ অধ্যাপকমহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন; তন্মধ্যে সম্রাট্ হারুণ আলরসিদের পুত্র আল'সব্‌তির গৃহত্যাগ এবং সন্ন্যাসগ্রহণ একটি। এই উপাখ্যানটি আরব্য-উপন্যাসেও লিপিবদ্ধ

হইয়াছে—উহা নিশ্চয়ই বৌদ্ধ ইতিহাসের অনুকৃতি। সিংহলে বুদ্ধদেবের পদচিহ্নকে মুসলমানগণ আদিম পদচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় প্রাচীন ধারণা পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন। বোখরা-শব্দের অর্থ পারস্যভাষায় "ধর্ম্মাশ্রম", উহা সম্ভবত বৌদ্ধ "বিহার"শব্দের বিকৃতি। এক সময়ে বোখরা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এই স্থানের সন্নিহিত বহুসংখ্যক বৌদ্ধস্তূপ এখন মুসলমান-উপাখ্যানোক্ত কোন সাধু বা বীরের সমাধিস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিজয়ী ইস্‌লাম জনসাধারণের ভক্তির তীর্থ-স্থানগুলি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এই-ভাবে তাহাদের উপর স্বীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। আমরা পুরীর জগন্নাথমন্দিরকেও এইভাবে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি—ইহাই বর্ত্তমান ইতিহাসের আবিষ্কার। সুফী-সম্প্রদায়ের মত বৌদ্ধমত হইতে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু উহা যে উত্তরকালে বেদান্ত-ধর্ম্মের প্রচুর উপাদান পাইয়া পুষ্টিলাভ করে, এবং "সোহং"বাদকে নিজের কুক্ষিগত করিয়া লয়—অধ্যাপক গোল্ডজিহার তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মুসলমানগণ বৌদ্ধ-ভিক্ষু হইতে জপমালা গ্রহণ করিয়াছিল—ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত।

অধ্যাপক-গোল্ডজিহার-বর্ণিত বৌদ্ধধর্ম্মের এই প্রভাবের উল্লেখে ইস্‌লামের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যে ধর্ম্ম বেগশালী প্লাবনের মত আসিয়া পড়ে—তাহা স্বীয়পথান্বিত ভিন্ন মতের কূপ ও সরিৎকে আত্মসাৎ করিয়া প্রবল হয়। যাহা বৃহৎ, তাহা সর্ব্ব-গ্রাস করিয়া নিজের নিজত্বকে আরও উজ্জ্বল ও ব্যাপক করিয়া দেখায়। কিন্তু যাহার গতি নাই, তাহা নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা বাহিরের হাওয়ার স্পর্শে শিহরিত হইয়া উঠে—পাছে তাহার নিজত্বটুকু কেহ কাড়িয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কা। প্রবল আসিয়া পরের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া স্বাধিকারভুক্ত করিয়া ফেলে, দুর্ব্বল নিজের ক্ষুদ্র সম্বল লইয়া স্বীয় কুটীরের দ্বাররোধ করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হয়। প্রবলবেগ-শালিনী নদী যেরূপ বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর সদর্পে নিজের পন্থা আবিষ্কার করিয়া লয়—অঙ্গে পাছে পঙ্ক লগ্ন হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় আবর্ত্ত মন্দীভূত কিংবা উদার পন্থা সঙ্কীর্ণ করে না—পঙ্ককে পবিত্র এবং মলিনকে নির্ম্মল করিয়া লইয়া যায়—ইস্‌লাম স্বীয় প্রভাবের সময় পৃথিবীর উপর সেইরূপ দুর্জ্জয় দর্পে নিজের পন্থা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিল—সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রচলিত বিশ্বাস গ্রহণ করিয়া উহা স্বীয় চরিতার্থতা ও পুষ্টি সাধন করিয়াছিল,—সেই সকল উপাদানে ইস্‌লামের বিকৃতি ঘটে নাই, তাহার বিরাট্ দেহ পুষ্ট হইয়াছিল মাত্র।

ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা।

গত বৈশাখমাসের ভারতীতে চীনপ্রবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয়-স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্রবন্ধলেখক বলেন, আমাদের দেশে গৃহে গৃহে অনেক অনাথা হিন্দুরমণী আছেন, তাঁহারা শিশু পুত্রকন্যা লইয়া অর্থাভাবে নিতান্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন। এরূপ উদা-

হয়ণ একটি দুইটি নয়, শত শত। ইঁহাদিগকে ভগবান্ শক্তি দিয়াছেন, ইচ্ছা দিয়াছেন কিন্তু সাংসারিক দুর্গতি ও অভাব নিবারণের জন্য সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার কোন সুবিধা তাঁহারা সমাজ হইতে পান না। অর্থকরী শিল্পশিক্ষা প্রদানই তাঁহাদিগের সম্ভ্রম-রক্ষা ও জীবিকাসংস্থানের একমাত্র উপায়। প্রবন্ধলেখক বলেন—পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশে ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা "দেশী মোটা সূতার মোজা বুনিয়া ও বাজারে তাহা ভাল-মন্দ অনুসারে আট হইতে বার পয়সা জোড়া বিক্রয় করিয়া যে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে, তাহা শতবার প্রশংসনীয়।"

প্রকৃত আমাদের মহিলাকুলের এইরূপ অর্থকরী শিল্পশিক্ষা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের বিশেষরূপে চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত।

হিন্দুরমণীর ইতিপূর্ব্বে সমাজে যে স্থানটি ছিল, এখন আর তাহা নাই। যৌথ-পরিবারে অনাথিনীগণের অন্তত দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন পাইবার সুবিধা ছিল, বিধবাগণ অনেক সংসারেই প্রভুত্ব করিতেন। কোন কোন স্থলে তাঁহারা নানারূপে নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেন বটে, কিন্তু নিকটসম্পর্কিত ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে পথে দাঁড়াইতে দিতেন না,—দূরসম্পর্কিতা রমণীও উদরের দায়ে গৃহত্যাগিনী হইলে আত্মীয়গণের নিন্দার অবধি থাকিত না। যৌথ-পরিবার স্বীয় বিশাল পক্ষপুট উদ্ঘাটন করিয়া ভদ্রমহিলাকুলকে আশ্রয় দিয়াছে;—কোন কোন স্থলে সেই আশ্রয় আরামজনক না হইলেও তাহার উপর সর্ব্বদা নির্ভর করা চলিত।

এখন যৌথ-পরিবারের সেই আশ্রয় অতীতের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। এখন অনেকসময় পুত্র মাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বীকার করে না, সহোদরাগণ জীবিকার জন্য ভ্রাতাদের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। হিন্দুর বিশাল পরিবার এখন শুধু ভার্য্যার নামে রূপান্তরিত হইতে বসিয়াছে। ঘরে ঘরে নিরাশ্রয় রমণীকুলের দারিদ্র্য অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে; সেই সকল অনাথিনীর সাহায্য করিবার কথায় ভীত আত্মীয়, কথা উপস্থিত হইলে, স্বীয় ব্যয়ের লম্বা ফর্দ্দ বাহির করেন—সমাজও তাহাদের দুর্দ্দশানিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করেন নাই।

জীবনসংগ্রামের এই বিষম দুশ্চিন্তা অবলাগণের স্কন্ধে চাপাইলে তাহাদের নৈতিক অধোগতি অনিবার্য্য,—য়ুরোপ তাহার উৎকট দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। হিন্দুর গৃহ যদি হিন্দুরমণীকে রক্ষা না করে, তবে তাহারা কোথায় যাইবে? এ দেশে এই যে বৎসর-বৎসর হতভাগিনীদের সংখ্যা দ্রুতবেগে পুষ্টিলাভ করিতেছে—এজন্য কাহারা দায়ী?—হিন্দুসমাজের ঔদাসীন্য প্রধানে অসহনীয়।

অর্থকরী শিল্পশিক্ষার একটা বিধান করিয়া মহিলাগণের জীবিকাসংস্থানের উপায় করিয়া দেওয়া এখন আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। কি উপায়ে এই শিল্পশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বিচার্য্য। ইহার জন্য স্কুল স্থাপন করিলে এখনকার রীতি অনুসারে দশবৎসর বয়সের বেশিকাল আর তাহারা বিদ্যালয়ে পড়িতে পারিবে না,—একাদশ বর্ষে অবগুণ্ঠনবতী

হইয়া তাহারা অন্তঃপুরের গণ্ডীতে প্রবেশ করিবে,—এই অল্পকালের মধ্যে তাহারা আর কি শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইবে? বয়স্থা বিধবারা ঘরের বাহিরে কোন শিক্ষালাভের সুযোগ পান না; এ অবস্থায় ইতিকর্ত্তব্য কি, নির্দ্ধারণ করা কঠিন।

প্রবন্ধলেখক বলেন, বিবাহের বয়সের যে সীমা আছে, তাহা আর স্ত্রীলোকের পক্ষে ঠিক রাখা চলে না। যৌবনে পদার্পণ না করিলে তাহাদের বিবাহ যাহাতে না হয়, এরূপ বিধান করা উচিত, অন্তত আট-দশ বৎসর তাহারা শিক্ষা করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত আবশ্যক; একটা শেষপরীক্ষা থাকা দরকার, যাহাতে উত্তীর্ণ হইলে তাহারা সমাজের কাছে বিশেষভাবে বরণীয়া হইতে পারে।

স্ত্রীশিক্ষার অনুশীলন না হইলে আমাদের বালকগণের শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ হইবে না,—আমরা য়ুরোপীয়দের সঙ্গে সহস্র বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিব না, শিশুগণের শিক্ষার জন্য আমাদিগকে প্রাইভেট্‌-টিউটার্‌-নামক যন্ত্রের উপর নিঃসহায়ভাবে নির্ভর করিতে হইবে। এই স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে এখন নানারূপ উদ্যোগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে,—বালিকাদিগকে কোথাও অমরকোষের শ্লোক, কোথাও বা মেরীর গান কণ্ঠস্থ করিতে দেওয়া হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িক মতবিস্তারের আগ্রহপ্রসূত চেষ্টার মধ্যে পড়িয়া তাহারা যে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণজ্ঞান লাভ করিতেছে, তাহা কার্য্যত কোন উপকারেই আসিতেছে না, —ধর্ম্মপ্রচারের আগ্রহে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে না—এবং যে শিক্ষা এখনকার অভাব পূর্ণ করিয়া প্রকৃতরূপে গৃহিণী ও জননী গড়িয়া তুলিবে,—দুর্দ্দিনে হস্তে বল ও গৃহে আরাম প্রদান করিবে—যাহাতে কল্যাণ ও শ্রী এই দুয়ের সমাবেশে হিন্দুর গৃহ বরেণ্য হইয়া উঠিবে, সেদিকে কোনরূপ চেষ্টা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের সমাজ বালিকাদিগকে খেলার সামগ্রী বলিয়া মনে করেন—অল্পবয়সে তাহাদের বিবাহ দিয়া সর্ব্বপ্রকার দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ কল্পনা করেন, কিন্তু যৌথ-পরিবারের ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবা[র] এই ঘোর দুর্দ্দিনে তাহাদের ভবিষ্যতের গুরুতর চিন্তার কারণ উপস্থিত হই[য়াছে।] অর্থকরী শিল্পশিক্ষা অন্তঃপুরবাসি[নীদিগকে] কি প্রণালীতে প্রদান করা য[ায়, তাহা] বিবেচ্য। তাহাদের কাম[্য ও তাহাদের] নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করি[য়া সু]দিনে যেন স্বগণবর্গ গৌরবান্বি[ত হইত]ে পারেন—এবং দুর্দ্দিনে তাহাই যে [ত]াহাদের জীবিকাসংস্থানের উপায় করি[তে পারে,—হি]ন্দুর পর্ণকুটীরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রা[খিতে] পারে—সেইদিকে আমাদের অন্তঃপু[রচারিণীদে]র উদ্যম প্রসারিত করিবার প্রয়োজন [আ]ছে।

অবস্থাপন্ন [লো]কের গৃহেও স্ত্রীলোকের জন্য কতকগু[লি] কার্য্য অবধারিত হওয়া উচিত। প্রাচীন অন্নপূর্ণাদের দল ক্রমশ লুপ্ত হইতে বসিয়াছেন। এখন "রাঁধুনী [বা]মনী"র সংখ্যা যেরূপ দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে, সেই হারে ধনীর গৃহে রমণীগণ উপন্যাস পড়িবার সুবিধা পাইতেছেন, সেবাধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত সুকোমলবাহু

কেবলই নূতন প্যাটারণের ব্র্যাস্‌লেটের সন্ধান করিতেছে—জগতের জন্য যেন তাঁহাদের কোন কার্য্যই নাই, তাঁহাদের কার্য্যের গণ্ডী ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে এখন তাঁহারা গৃহসৌষ্ঠবসাধক চিত্রপুত্তলীর শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

য়ুরোপের রমণীগণের কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ নহে, সামাজিক আমোদপ্রমোদের উপযোগিনী করিবার জন্য বাল্যকাল হইতে তাহাদের শ্রমসাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের রমণীগণের জন্যও কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া আছে—তাহা হইতে তাহাদের মুক্তি ই, কৃত্রিম মুক্তি ভাবী দুর্দ্দশার পূর্ব্বাভাস ছ মাত্র। প্রাচীন আদর্শ চূর্ণবিচূর্ণ হ পড়িতেছে, কিন্তু পূর্ব্বশিক্ষার স্থলে সাম অভাবের অনুরূপ নব আদর্শের প্রতিষ্ঠা খন একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়া

স্ত্রীলোক রে বা মার্চেন্ট-আফিসে পুরুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বিতা করিয়া অর্থ-অর্জ্জনের চেষ্টা ক ন, এই উৎকট কল্পনা প্রাচ্যজগতে অসম্ভব সাম্যবাদের নামে স্ত্রীলোকদিগকে কঠো বিনসংগ্রামে উপস্থিত করা অতি ভন—তাঁহাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনা কিছু কল্পনা করা যায় না। ত রা অন্তঃপুরে বাস করিয়া যে সকল শিল্পচর্চ্চা দ্বারা সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জন করি পারেন, তাহাই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। প্রাচীনাগণ সুতা কাটিয়া, স্থানবিশেষে কাপড়ের উপর রেশমী ফুল ও নানারূপ বিচিত্র কারুকার্য্য সম্পাদন করিয়া পূর্ব্বে অর্থোপার্জ্জন করিতেন। ভারতীর প্রবন্ধকার কোন কোন ভদ্রপরিবারের মহিলাদের প্রতি ফুলের মালা গাঁথিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকগণের অনেকসময় হাতে কোন কাজ থাকে না। অবসরকালে যদি নিয়মিতভাবে তাঁহারা কোনরূপ অর্থকরী শিল্পচর্চ্চা করেন, তবে বহুপরিবারের নানারূপ অভাবমোচন হইতে পারে;—অনেকস্থলে অর্দ্ধভুক্ত শিশুগুলি ভাল খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে—অনেক স্থলে পিতা কিংবা স্বামীর দুশ্চিন্তাকুঞ্চিত ললাট প্রসন্নতার আভা ধারণ করিতে পারে। গৃহলক্ষ্মীগণ এই কাজ কত আন্তরিকতার সহিত সম্পাদন করিবেন, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তাঁহাদের হৃদয়ের পবিত্র স্নেহ এই সকল উদ্যমে তাঁহাদের কোমল বাহুকে অধ্যবসায় শিখাইবে। তাঁহাদের রন্ধনকার্য্যে যে যত্ন ও আগ্রহ দেখা যায়, তাহার তুলনা নাই,—কারণ তাহা গভীরস্নেহপ্রণোদিত। সেই হৃদয়ের ঐকান্তিকতার সঙ্গেই শিল্প তাঁহাদের হস্তে উন্নতিলাভ করিবে। তাঁহাদের কষ্টের একশেষ দেখিয়াও যদি সমাজ কোন প্রতিকারের চেষ্টা না পান, সুযোগ থাকিতে সে সুযোগ যদি তাঁহাদিগকে না দেন, তবে হে সর্ব্বং, গৃহবর্জ্জিত গৃহলক্ষ্মীগণ তোমাকে আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে যেন হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব না থাকে!

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

মাধবী।

১

আরম্ভিল আবাহন অর্ঘ্যভার বহিয়া অটবী
"মাধবি! মাধবি!"
মৃদুপদসঞ্চরণে সচকিত করি মম হিয়া
এস তুমি প্রিয়া
বিরহী এ বনতল তোমা' লাগি' ব্যাকুলহৃদয়
চাহে বিস্ময়ময়।

২

জাগাও চরণপাতে ধরণীর স্তব্ধ হিয়াখানি
সজীবতা আনি'
সহসা জাগিয়া উঠি' মরমে সে র'বে মূরছিয়া
তোমারে হেরিয়া
বকুলবাসিত তার অঙ্গে তব নব বাসখানি
দিয়ো তুমি টানি'।

৩

বর্ষপরে হর্ষে তার সুখদুঃখ উঠিবে কাঁপিয়া
তোমারে হেরিয়া
যূথিকার রন্ধ্র বহি' বাহিরিবে নিশ্বাসে তাহার
মুক্ত হৃদিভার
স্বাগত সুধাবে তোমা' উদয়-অচলে নব-রবি.
"মাধবি! মাধবি!"

৪

নবগীতি সন্ধ্যারুণ গগনের তারকাসভা
পূজিবে তোমায়
পিকবধূ নিদ্রাজড় নিশীথের ধ্বনি' ছন্দায়
তুলিবে ঝঙ্কার
গর্ব্ব হবে ধরণীতলে তব রূপে বিমোহিত কবি
"মাধবি মাধবি!'

৫

অশোককাননমাঝে প্রবেশিবে বহি অর্ঘ্যডালা
বিরহিণী বালা
একান্তে ডাকিবে তোমা' প্রেমে বিদ্ধ মুগ্ধ মুখচ্ছবি
কোথায় মাধবি
লহ আসি পুষ্পবনে অবতরি' প্রেমবিধুরার
পূজা-অর্ঘ্যভার।

৬

আকুল আহ্বান তুলি মর্ম্মরিয়া উঠিবে মলয়
সারাবিশ্বময়
অকস্মাৎ শান্তচিত্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে চাহিবে নিশ্বাসি'
কার সুধাহাসি
সুপ্ত ষোড়শীর বক্ষে গোপনে করিবে আনাগোনা
অপূর্ব্ব বেদনা।

৭

সহসা গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনি' মুহু বজ্রসম হাঁক
আসিবে বৈশাখ
ছুটিবে কালাগ্নিশিখা পিঙ্গল নয়ন হ'তে তার
দহিয়া সংসার
হায় ওই কান্তিটুকু মিশাইবে নিমেষের ভরে
সে বহ্নিভিতরে।

৮

গরিয়া উঠিবে বিশ্ব বিরহের আকুল নিস্বনে
বিলাপি' সঘনে
ধীরা রহিয়া কাঁদি' ফিরে যাবে দখিনের বায়
"কোথায় কোথায়!"
চন্দ্রহীন বনতলে সহসা কাঁদিবে পিকবধূ
"কোথা তুমি মধু!"

৯

অকস্মাৎ রুদ্ধ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিবে মুগ্ধ কবি —
"কোথায় মাধবি?"

অকস্মাৎ ঝঙ্কারিয়া উঠিবে সে ব্যর্থ বনচ্ছবি—
"মাধবি মাধবি!"
ডাকিবে নিশ্বাস ফেলি' সেদিনের অস্তাচলে রবি—
"মাধবি মাধবি!"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র।

হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত সমস্ত দর্শনের উদ্দেশ্যই মোক্ষ। যাহাতে জীবের দুঃখনিবৃত্তি হইয়া সুখবৃদ্ধি হয়, তাহা উপদেশ করিবার জন্য দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয়। জীবের যত-প্রকার দুঃখ আছে, তন্মধ্যে জন্ম জরা-মরণের চিরপ্রবাহ "আত্যন্তিক-দুঃখ" নামে কথিত হয়। শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা তাহা অনেকাংশে এবং সুদীর্ঘকালের নিমিত্ত প্রশমিত হইতে পারে,—অশুভ-গতির পরিবর্ত্তে শুভগতি হইতে পারে। কিন্তু সেই শুভসম্ভোগের ক্ষয় আছে। ভোগান্তে এই পৃথিবীতে বা অন্যলোকে পুনর্জ্জন্ম আছে—পুনর্মৃত্যু আছে। এইরূপে জন্মের পর জন্ম,—বহুলক্লেশসঙ্কুল জীবন এবং মৃত্যুর স্রোত থামিবে না। একমাত্র আত্মজ্ঞানই ঐ আত্যন্তিক-দুঃখের নিঃশেষ-বিনাশবীজ-স্বরূপে উক্ত হইয়াছে। তাহারই নাম কৈবল্য, মুক্তি, অপবর্গ বা মোক্ষ। বেদানু-যায়িরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান অবলম্বনে তাহাতে যথাধিকারী মানবগণকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত দর্শনশাস্ত্রের উদয়। এই সকল মহাশাস্ত্র,—বেদ, উপনিষৎ এবং স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানলাভের চক্ষুস্বরূপ এবং শাস্ত্র-বিহিত স্বয়ম্প্রকাশ আত্মজ্ঞানালোক দেখাইবার গুরুস্বরূপ।

কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষই এখন বিষয়ে উন্মত্ত। জীবের অন্তিম মহামোক্ষ লক্ষ্য করিয়া কেহ সে সমস্তের আলোচনা করেন না। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রলয়তত্ত্ব, পরলোক-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পরিভাষার বিচার, তর্ক, যুক্তি প্রভৃতি, যাহা দর্শনের অবান্তর শিক্ষা এবং মোক্ষাধিকারে যাহা সমূলে পরিত্যক্ত ও দূরী-ভূত হইয়াছে, তাহাই জনসমাজে এখন আদরণীয়। কেন না, সে সব তত্ত্ব সামাজিক বিদ্যার সহায়স্বরূপ এবং ছাত্রগণের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিবার উপায়বিশেষ।

এ অবস্থায় আমার বিবেচনায় দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা বৃথা। কারণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া শাস্ত্রের আলোচনায় মুখ্যফল লাভ হয় না। কেবল অবিদ্যা, তর্ক ও কলহ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। তথাপি লক্ষ্যধারণে যতদূর সম্ভবে, যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে ছয়-খানিমাত্র প্রধান। অর্থাৎ দুই ন্যায়, দুই সাংখ্য ও দুই মীমাংসা। মহর্ষি গৌতমের প্রণীত ন্যায়দর্শন এবং মহর্ষি কণাদের প্রণীত বৈশেষিকদর্শন, এই উভয়ই ন্যায়শাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। মহর্ষি কপিলের প্রকাশিত সাংখ্য-দর্শন এবং মহর্ষি পতঞ্জলির কৃত যোগদর্শন সাধারণত সাংখ্যনামে কথিত হয়। উহার প্রথমটিতে ঈশ্বর স্বীকৃত না হওয়ায় তাহার নাম নিরীশ্বর-সাংখ্য এবং দ্বিতীয়টিতে ঈশ্বর আদৃত হওয়ায় তাহার নাম সেশ্বর-সাংখ্য। মহর্ষি জৈমিনির কৃত মীমাংসা কর্ম্মমীমাংসা নামে খ্যাত, তাহাতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতির বিচার আছে। আর মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃত মীমাংসা ব্রহ্মমীমাংসা বলিয়া উক্ত হয়, তাহাতে বেদের জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতির বিচার আছে। এই ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র ষড়্‌দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপ, কাশী, মহারাষ্ট্র, মিথিলা প্রভৃতি স্থানে এই সমস্তের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইয়া থাকে। এবং এখনও এই সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের বিস্তর বড় বড় অধ্যাপক ও বিদ্যার্থী দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

এই সকল দর্শন, সমস্তই বেদমূলক। তাহা য়ুরোপীয় দর্শনসমূহের ন্যায় গ্রন্থকার্দিগের স্ব স্ব মত নহে। বেদের মধ্যে সৃষ্টি, প্রলয়, প্রকৃতি, অদৃষ্ট, কর্ম্ম, পরমাণু, ব্রহ্ম, মোক্ষ, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল বিচারযোগ্য অবয়ব আছে, এক এক দর্শনে তাহার পরম্পরান্বিত অবয়বসকল বিস্তারপ্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, দর্শনকারগণ সকলেই একবাক্যে বেদবিহিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মকে মান্য করিয়াছেন। তাহা লঙ্ঘন করিয়া কোন দর্শনকার পূজা-অর্চ্চনা ও উপাসনা সম্বন্ধে কোনরূপ অভিনব সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন নাই। ন্যায়বৈশেষিকে এক ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু সে ঈশ্বরের কোন স্বতন্ত্র উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, নৈয়ায়িকগণ সকল হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীর সহ সমভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহাদেবী প্রভৃতিকে উক্ত ঈশ্বরপদে মানিয়া বেদাগমবিহিতরূপে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেশ্বর-সাংখ্য অর্থাৎ যোগদর্শনের পণ্ডিত, তাঁহারাও এক ঈশ্বর মানেন, কিন্তু তাঁহাদেরও উপাসনার স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নাই। অতএব উপরি-উক্ত-রূপে একমাত্র ঈশ্বরে অন্বিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ও মহাশক্তিগণের পূজা করিয়া থাকেন। নিরীশ্বর-সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না; এক অচেতন জড়প্রকৃতি মানেন এবং প্রকৃতির বন্ধন হইতে আত্মার মোক্ষ যাহাতে হয়, তাহার উপদেশ দেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোন নিরীশ্বর সম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই; এবং প্রকৃতি হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্যসম্বন্ধে জ্ঞানসাধন করা উচিত বলিয়াও, বেদবিহিত ক্রিয়া ত্যাগ করিতে বলেন নাই। বরং পক্ষান্তরে ঐ সকল দেবদেবীর উদ্দেশে শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অবশ্যকর্ত্তব্যতার উপদেশ করিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা এযাবৎকাল তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। কর্ম্মমীমাংসার তো কথাই নাই। কেন না, তাঁহারই মতে সমস্ত যাগযজ্ঞাদি চলিয়া আসিতেছে। তিনি স্পষ্টবাক্যে ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও,—দেবতাদের চৈতন্য ও শরীর অস্বীকার করিলেও, ক্রিয়ার প্রধান

অঙ্গ যে মন্ত্র, তাহার চৈতন্য মানায়, যজ্ঞানুষ্ঠানকালের নিমিত্ত দেবতার আবির্ভাব ও প্রভাব মানিয়াছেন। বেদান্ত একমাত্র পরমাত্মস্বরূপ সর্ব্বোপাধিশূন্য ব্রহ্মচৈতন্য স্বীকার করেন এবং এই সিদ্ধান্তবাক্য বলেন যে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বতোভাবে অবিদ্যানিবৃত্তি হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মার তাঁহাতে আত্মজ্ঞান জন্মিলে, দেহাদির মমত্বঘটিত সর্ব্বোপদ্রব বিগত হইয়া অনাময় ব্রহ্মপদলাভ হয়। এইপ্রকার জ্ঞানেই মোক্ষস্থাপন করিয়া এবং মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের পক্ষে দেহাদি-উপাধি-শূন্য উপনিষদুক্ত পরমাত্মজ্ঞানের অনুশীলন করার কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াও, ব্রহ্মার্পণন্যায়ে অথবা লোকশিক্ষার্থে আশ্রমবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম ও যজ্ঞোৎসবাদি অনুষ্ঠানের বিধি দিয়াছেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের পক্ষে এইরূপ কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়া আত্মগ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম্মফললাভের নিমিত্ত বিধিবিহিত ধর্ম্মক্রিয়া পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং কর্ম্মমীমাংসা, এই পাঁচখানি দর্শনের মতে তাঁহাদের স্বস্ব-সাম্প্রদায়িক-লক্ষণাক্রান্ত কোন নিরাকার চৈতন্যময় ঈশ্বরের উপাসনা পাওয়া যায় না। এস্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, মহর্ষি কপিলের মতে যে, কোনরূপ নিরাকার ঈশ্বর বা অবতীর্ণ ঈশ্বর নাই, এমন নহে। সে কথা পরে বলিব। বেদান্তমতেও ব্রহ্মের ব্যক্তিধর্ম্মবিরহিত মায়োপহিত ঔপাধিক আবির্ভাববিশেষ ঈশ্বরনামে কথিত হন। তাঁহার নানা সংজ্ঞা আছে। কিন্তু উপাসনার অধিকারে এই ভারতবর্ষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপেই তাঁহার বেদবিহিত অর্চ্চনা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্ররূপে তাঁহার পূজার কোন নিয়ম নাই। বেদান্তের নানাসংজ্ঞিত উক্ত ঈশ্বরোপাধি-সকল পরব্রহ্মোপাসনার অবলম্বন বটে এবং সেজন্য তাঁহাদের বেদবিহিত অর্চ্চনা সগুণ-ব্রহ্মোপাসনারূপে উক্ত হয় বটে, কিন্তু তাদৃশ ঈশ্বরার্চ্চনা চিত্তশুদ্ধিজনক কর্ম্মযোগ মাত্র।

উপনিষৎ হইতেই ব্রহ্মোপাসনার উদ্ভব। বেদান্তদর্শনে তাহার নানা বিভাগ ও বিচার আছে। ফলত, সগুণ-ব্রহ্মোপাসনাই উচ্চ-নিম্ন নানা বিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে যাহা উচ্চ, তাহা সাবলম্ব হইলেও আত্মজ্ঞানে অধিকতর যুক্ত এবং আত্মজ্ঞানের সোপান। যাহা নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসনা, তাহা নিরবলম্ব এবং কেবল আত্মজ্ঞানের অনুশীলনমাত্র বলিলেও হয়। সে কথা পরে বলা হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রুতিবেদান্তাদির পাঠ ও আলোচনামাত্রই তাহার সাধন। ইহার মধ্যে কোনটিই সম্প্রদায়লক্ষণাক্রান্তধর্ম্মরূপী নহে। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি হিন্দু-উপাসক-সম্প্রদায়স্থ যে কোন ব্যক্তির শাস্ত্রবিহিত আত্মজ্ঞান উপার্জ্জনে ইচ্ছা জন্মে, তিনি স্বীয় কুলপরম্পরাগত আশ্রমধর্ম্মে থাকিয়া তাহা সাধন করিতে পারেন। তাদৃশ মহাত্মার পক্ষে আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ম্মযোগ বা লোকশিক্ষায় পরিণত হয়। তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ। আত্মজ্ঞানের অনুশীলন নহে, অথবা আত্মবিদ্যাতে সংযুক্ত নহে, অথবা সমাধিযোগ বা ব্রহ্মোদ্দিষ্ট কর্ম্মযোগ নহে, এমন-ভাবের বহিরঙ্গ ঈশ্বরোপাসনা বেদান্তমতে

দৃষ্ট হয় না। সাংখ্যের ও ন্যায়েরও অন্তিমোদ্দেশ্য ঐ আত্মজ্ঞান। কেহ বা ব্রহ্মকে আত্মত্বে গ্রহণ করেন, কেহ বা আত্মাকেই কৈবল্যরূপে গ্রহণ করেন, এইমাত্র প্রভেদ। কেহ বা একমাত্র পরমাত্মাকে সকল আত্মার নিরুপাধিক কেন্দ্রস্বরূপে গ্রহণ করেন, কেহ বা প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিরুপাধিত্ব মানায় মোক্ষাবস্থায় সবগুলি যেন নিরুপাধিরূপ অনির্ব্বচনীয় একত্ব লাভ করে, এইমাত্র প্রভেদ। নতুবা সংসারাবস্থায়, সকলের মতেই, প্রতিদেহে ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিযুক্ত আত্মা পৃথক্ পৃথক্। মোক্ষাধিকারে আত্মজ্ঞান ও তদবিরোধে সম্যক্ আশ্রমবিহিত আচার ঊর্দ্ধদিকে; এবং সংসারাধিকারে বিধিবিহিত জিজীবিষাসহকৃত আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিম্নভাগে; এই উভয়প্রকার অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য ঈশ্বরোপাসনার উপদেশ দৃষ্ট হয় না। তাহাতে সাংখ্য ও কর্ম্মমীমাংসায় ঈশ্বর না মানায় কোন ক্ষতি হয় নাই। বেদান্ত ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দিয়া সকল ক্ষতির পূরণ করিয়াছেন।

সর্গারম্ভসম্বন্ধে প্রধান প্রধান দর্শনকারদিগের প্রস্থানভেদ, ইহার পর ক্রমে বিবৃত হইল। 'সর্গ'শব্দে সৃষ্টি। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুকে উপাদানকারণ, ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ এবং জীবের অদৃষ্ট বা মায়াকে সহকারিণী সৃষ্টিশক্তি ধরিয়া সর্গারম্ভ করিয়াছেন। পরমাণুসকল সাংখ্যের পঞ্চতন্মাত্রস্থানীয়; ঈশ্বর বেদান্তের সর্ব্বেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মার স্থানীয় এবং মায়া অবিদ্যাস্থানীয়। সাংখ্যদর্শন পঞ্চতন্মাত্র বা পরমাণুর প্রপিতামহী মহামাত্রাস্বরূপিণী প্রকৃতিকে সৃষ্টির মূল উপাদানকারণ, পুরুষ অর্থাৎ জীবকে নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতির সমনা মূর্ত্তিবিশেষ জৈবিক-অনাদিকর্ম্ম ও অবিবেকতাকে সহকারিকারণ ধরিয়া সর্গারম্ভ করিয়াছেন। প্রকৃতি বেদান্তের মায়াস্থানীয়, পুরুষ আত্মার স্থানীয়, এবং কর্ম্ম অবিদ্যাস্থানীয়। কর্ম্মমীমাংসা জীবের অনাদি কর্ম্মমূল ধরিয়া সৃষ্টির অনাদিত্ব মানিয়াছেন। সেজন্য নিমিত্তকারণরূপ স্বতন্ত্র এক ঈশ্বরের অনুমানোপন্যাস বা অবতারণার প্রয়োজন হয় নাই। অতএব তথায় জীবই নিমিত্তকারণ। বেদান্ত ব্রহ্মরূপ ঊর্দ্ধমূল হইতে চিরপ্রবৃত্তস্বভাব দৃষ্টনষ্টস্বরূপ সংসারের সর্গারম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার শক্তিই উপাদান, নিমিত্ত, সহকারী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কারণের একমাত্র অনির্ব্বচনীয় বীজ। প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি। সর্ব্বজীবের তিনি পরমায়ণ। মোক্ষরূপে তিনি পরমাত্মা; এবং সকল ঈশ্বরোপাধির তিনিই আশ্রয়।

সর্গ-বিসর্গ-সম্বন্ধে প্রধান প্রধান দর্শনের মত এখন ক্রমে নিবেদন করিব। ফলে, আমি ন্যায়বৈশেষিকের পদার্থবিচার, সাংখ্যের তত্ত্বশ্রেণীর বিচার, মীমাংসার শ্রুতিস্মৃতিবিচার এবং বেদান্তের পরিভাষাবিচার সম্বন্ধে কিছু বলিব না। সে সব বিদ্যায় হস্তক্ষেপ করা আমার ন্যায় বিষয়কর্ম্মী ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে; বিশেষত সে সব তর্কানুমানদ্বারা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ঈশ্বর, কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞানের অন্তরায়স্বরূপ কর্ম্ম, অদৃষ্ট, মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান—এই সব তত্ত্বসম্বন্ধে

প্রধান প্রধান দর্শনের মত অল্পবিস্তর আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। কেন না, আমি বিবেচনা করি যে, এই বর্ত্তমান সময়ের বিভিন্ন যুক্তিপরায়ণ উপাসকবৃন্দ এবং কৃতবিদ্য ধীমান্ মহাশয়দিগের জানা উচিত যে, ঐসকল দর্শনশাস্ত্রের কোন মতের সহ তাঁহাদের মত-সকলের ঐক্য আছে কি না। আমার বক্ষ্যমাণ সংক্ষেপবিবরণ হইতে ঐ উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ-পরিমাণে সফল হইলে সুখের বিষয় হইবে। অতএব আমি তৎসমস্ত প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

অপূর্ব্বকাহিনী—উপন্যাস। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রকাশক। মূল্য ১৲ এক টাকা।

'ফতেশনা আজায়েব' নামক একখানি উর্দ্দু উপন্যাস অবলম্বনে ইহা লিখিত। আমাদের মনে হয় যে, আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, তুরুষ্কোপন্যাস, হাতেমতাই, চাহার দরবেশ্ প্রভৃতির পর এই উপন্যাস রচিত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্, যে মনে করে আমি লিখিতে জানি, সে ত লিখিতে ছাড়ে না। মূল গ্রন্থকারের পক্ষে বোধ করি ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৈফি[illegible]

গ্রন্থের নাম সার্থক হইয়াছে। ইহা অপূর্ব্বই বটে! ইহাতে বাদশাহজাদা ও বাদশাহজাদি আছে, তাঁহাদের মিলন আছে, বিরহ আছে, এবং এ শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদিগের নিয়মানুসারে তাঁহাদের পুনর্মিলন অবশ্যই আছে; তদ্ব্যতীত দৈত্য আছে, দানব আছে, ঐন্দ্রজালিক আছে, এবং যাহা না থাকিলে উপন্যাসের বিশেষ অঙ্গহানি হয়—ইন্দ্রজালের দ্বৈরথযুদ্ধও আছে। সুতরাং বলা যায় যে, এরূপ উপন্যাসে যাহা-কিছু থাকা আবশ্যক, সে সকলই আছে। সবই আছে, তবু দুর্ভাগ্যবশত বলিতে হইতেছে যে, সাহিত্যিক নিপুণতা ইহাতে কিছুমাত্র নাই। তবে রাধানাথবাবু তাহার জন্য দায়ী নহেন—তিনি অনুবাদকমাত্র। তাঁহার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু মূল কল্পনায় ভাবের ত্রুটি, ভাষার লালিত্যে শোধরাইবার নহে। যে স্বভাবত কুৎসিত, অলঙ্কার পরিলে তাহাকে আরও কুৎসিত দেখায়. [illegible] আমাদের [illegible]। [illegible] যাঁহারা অদ্ভুত গল্প পড়িতে ভালবাসেন, এই উপন্যাসখানি তাঁহাদের ভাল লাগিতে পারে।

ভাষা-প্রবন্ধ।—শ্রীকৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা।

ভাষাশিক্ষার সঙ্গে বালকদিগের যাহাতে নীতিশিক্ষা হয়, এই উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ

সিদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের রুচি, নীতি ও ভাষা, সকলই ভাল, তবে আমাদের বোধ হয় যে, বালকদিগের জন্য পুস্তকের ভাষা আরও সরল হইলে আরও ভাল হইত। পুস্তকখানি যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে ইহা 'বোধোদয়ের' পরে এবং 'সীতার বনবাসের' পূর্ব্বে পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের যে নূতন ও অদ্ভুত ব্যবস্থা বিদ্যাদিগ্‌গজেরা করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক অবশ্যই বিদ্যালয়ের (?) পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবে না। কিন্তু বালকদিগকে ইহা ঘরে পড়াইলেও তাহাদের ভাষাশিক্ষার আনুকূল্য হইবে, এইরূপ আমাদের ধারণা।

History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full Report of The Nil Durpan Case, Compiled by Lalit Chandra Mitra, M. A. Price Rs. 2.

বাঙ্গলা মাসিকপত্রে ইংরেজি পুস্তকের সমালোচনা হওয়া সঙ্গত কি না, এই ভাবিয়া আমরা একটু ইতস্তত করিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গলা সাময়িক পত্র যাঁহারা পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যখন ইংরেজি জানেন, তখন ইহা অসঙ্গতই বা হইবে কেন। বিশেষতঃ বঙ্গদর্শনের [illegible] ইহা[illegible] নজির আছে।

এই ইতিহাসের সঙ্কলনকর্ত্তা শ্রীমান্ ললিতচন্দ্র মিত্র, ৺ দীনবন্ধু মিত্রের আত্মজ—প্রতিভাশালী পিতার উপযুক্ত পুত্র। এই পুস্তক যে কেবলমাত্র প্রভূত পরিশ্রম ও আন্তরিক যত্নের পরিচয়স্থল, এরূপ নহে; ইহা পিতৃভক্তিরও নিদর্শন। সেই ভক্তিই বোধ হয় এই আন্তরিকতার মূল কারণ।

নালটা আমাদের দেশেরই জিনিষ। আমাদের দেশের নামানুসারেই প্রাচীন ইউরোপে ইহার নামকরণ হইয়াছিল—ইণ্ডিকম্ (Indicum)। ইংরেজি কথাটা এই কথারই রূপান্তর। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে নীলই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য ছিল। পশ্চিম ইণ্ডিজে উৎকৃষ্টতর নীল হয় বলিয়া একবার তাঁহারা এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন; কিন্তু কিছুকাল পরে আবার অবলম্বন করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বারলক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা এই ব্যবসায় তাঁহাদের চাকর ও আশ্রিতদিগকে ছাড়িয়া দেন। সেই অবধিই অত্যাচারের আরম্ভ, এবং তাহা ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া শেষে এমন পৈশাচিকতায় উঠিয়াছিল যে, এ দেশের অতিমাত্র নিরীহ, প্রায় সর্ব্বংসহ, কৃষিজীবীরাও আর সহ্য করিতে পারিল না। এই অবস্থায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই 'নীলবিভ্রাট' বলিয়া পরিচিত। সেই বিভ্রাটের আমূল ও বিস্তারিত বিবরণ অতি বিশদভাবে ও দক্ষতার সহিত এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি পড়িয়া [illegible] করিয়াছি। লং-সাহেবের মোকদ্দমার সম্পূর্ণ বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজি জানেন, তাঁহারা এই পুস্তক একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিলে নীলবিভ্রাটের প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই জানিতে পারিবেন। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৩৮

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, আজ কি তোমার শরীর ভাল নাই? মাথা ধরিয়াছে?"

কমলা কহিল, "না। খুড়ামশায়কে দেখিতেছি না কেন?"

শৈল কহিল, "ইস্কুলে বড়দিনের ছুটি আছে—দিদিকে দেখিবার জন্য মা তাঁহাকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছেন—কিছুদিন হইতে দিদির শরীর ভাল নাই।"

কমলা কহিল—"তিনি কবে ফিরিবেন?"

শৈল। তার ফিরিতে অন্তত হপ্তাখানেক দেরি হইবার কথা। কেন ভাই, তাঁর কাছে কি তোমার কোনো দরকার আছে?

ঠিক কি দরকার, তাহা কমলার পক্ষে বলা শক্ত, কিন্তু খুড়ার জন্য তাহার মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতাবোধ হইতেছে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কমলা নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় অনুভব করিয়া একটা নির্ভরের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কি করিবে, কি হইবে, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া উঠিবার এখনো সময় পায় নাই, কেবল ত্রস্ত হৃদয় ভিতরে-ভিতরে একটা-কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

শৈল কহিল, "তোমাদের বাংলা-সাজানো লইয়া তুমি সমস্তদিন বড় বেশি পরিশ্রম কর, আজ তোমাকে বড় খারাপ দেখাইতেছে। আজ সকাল সকাল খাইয়া শুইতে যাও!"

শৈলকে কমলা যদি সকল কথা বলিতে পারিত, তবে বাঁচিয়া যাইত—কিন্তু বলিবার কথা নয়। "যাহাকে এতকাল আমার স্বামী বলিয়া জানিতাম, সে আমার স্বামী নয়," এ কথা আর যাহাকে হৌক্, শৈলকে কোনোমতেই বলা যায় না।

কমলা শোবার ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রদীপের আলোকে আর একবার রমেশের সেই চিঠি লইয়া বসিল। চিঠি যাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইতেছে, তাহার নাম নাই, ঠিকানা নাই—কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক এবং রমেশের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল ও কমলাকে লইয়াই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে, তাহা চিঠি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। যাহাকে চিঠি লিখিতেছে, রমেশ যে তাহাকেই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে এবং দৈবদুর্ব্বিপাকে কোথা হইতে কমলা তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়াতেই অনাথার প্রতি দয়া করিয়া এই ভালবাসার বন্ধন সে অগত্যা চিরকালের মত ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ কথাও চিঠিতে গোপন নাই।

সেই নদীর চরে রমেশের সহিত প্রথম

মিলন হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আর এই গাজিপুরে আসিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত স্মৃতি কমলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইল। যাহা অস্পষ্ট ছিল, সমস্ত স্পষ্ট হইল।

রমেশ যখন বরাবর তাহাকে পরের স্ত্রী বলিয়া জানিতেছে এবং ভাবিয়া অস্থির হইতেছে যে, তাহাকে লইয়া কি করিবে, তখন যে কমলা নিশ্চিন্তমনে তাহাকে স্বামী জানিয়া অসঙ্কোচে তাহার সঙ্গে চিরস্থায়ী ঘরকন্নার সম্পর্ক পাতাইতে বসিয়াছে, ইহার লজ্জা কমলাকে বারবার করিয়া তপ্ত শেলে বিঁধিতে থাকিল। প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনা মনে পড়িয়া সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। এ লজ্জা তাহার জীবনে একেবারে মাথা হইয়া গেছে—ইহা হইতে কিছুতেই আর তাহার উদ্ধার নাই।

এখন কমলা কি করিবে? আজ ত শৈল তাহার প্রাণের বন্ধু, আজ ত খুড়ার গৃহে তাহার পরম সমাদর, আজ ত তাহার জন্য বাংলাঘর ভাড়া লইয়া গৃহসজ্জা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু এ সমস্তই যে একটিমাত্র লজ্জাকর মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত—সেই মিথ্যাটুকু সরিয়া গেলেই মুহূর্ত্তপরেই সমস্ত জগৎসংসারে কমলার একেবারেই আর বন্ধু নাই, আদর নাই, আশ্রয় নাই! কমলা কি করিবে।

রুদ্ধঘরের দরজা খুলিয়া-ফেলিয়া কমলা খিড়্‌কির বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার শীতের রাত্রি—কালো আকাশ কালো পাথরের মত কন্‌কনে ঠাণ্ডা। কোথাও বাষ্পের লেশ নাই; তারাগুলি সুস্পষ্ট জ্বলিতেছে।

প্রকাণ্ড বিশ্বের এই অবিচলিত স্তব্ধতা কমলাকে পীড়া দিতে লাগিল। সমস্ত এত বড়, এত বিপুল, অথচ ইহার মাঝখানে কোথাও কমলার জন্য একটিমাত্র উপায় একটুমাত্র চিহ্ন নাই। যাহা হইয়াছে, তাহার একচুল নড়চড় হইবার জো নাই। সমস্ত নিরাশ্রয় লজ্জা, সমস্ত নিরুপায় দুঃখ লইয়া একলা কমলা কাহার দিকে তাকাইবে। একটা কথা কেহ বলুক, একটিমাত্র ইঙ্গিত কেহ করুক—এই বিশ্বব্যাপী অসহ্য নীরবতার মধ্যে কমলার মত অনভিজ্ঞ বালিকার উপরে কি নিদারুণ। অসাধ্য সমস্যার মীমাংসাভার পড়িয়াছে।

সম্মুখে প্রকাণ্ডাকার কলমের আমের বন অন্ধকার বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা কোনমতেই কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে ঠাণ্ডা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল, কাঠের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া একফোঁটা জল বাহির হইল না।

এমন কতক্ষণ সে বসিয়া থাকিত বলা যায় না—কিন্তু তীব্র শীত তাহার হৃৎপিণ্ডকে দোলাইয়া দিল—তাহার সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রোদয় যখন নিস্তব্ধ তালবনের অন্তরালে অন্ধকারের একটি প্রান্তকে ছিন্ন করিয়া দিল, তখন কমলা ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

সকালবেলা কমলা চোখ মেলিয়া দেখিল, শৈল তাহার খাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। অনেক বেলা হইয়া গেছে বুঝিয়া লজ্জিত কমলা তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

শৈল কহিল, "না ভাই, তুমি উঠিয়ো না, আর একটু ঘুমাও—নিশ্চয় তোমার শরীর ভাল নাই। তোমার মুখ বড় শুক্‌নো দেখাইতেছে, চোখের নীচে কালী পড়িয়া গেছে। কি হইয়াছে ভাই আমাকে বল না!"—বলিয়া শৈলজা কমলার পাশে বসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কমলার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার অশ্রু আর বাধা মানে না। শৈলজার কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া তাহার কান্না একেবারে ফাটিয়া বাহির হইল। শৈল একটি কথাও না বলিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

একটু পরেই কমলা তাড়াতাড়ি শৈলজার বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়িল—চোখ মুছিয়া-ফেলিয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল। শৈল কহিল, "নাও নাও, আর হাসিতে হইবে না! ঢের ঢের মেয়ে দেখিয়াছি, তোমার মত এমন চাপা মেয়ে আমি দেখি নাই। কিন্তু তুমি মনে করিতেছ আমার কাছে লুকাইবে আমাকে তেমন হাবা পাও নাই। তবে বলিব? রমেশবাবু এলাহাবাদে গিয়া অবধি তোমাকে একখানি চিঠি লেখেন নি তাই রাগ হইয়াছে—অভিমানিনী! কিন্তু তোমারো বোঝা উচিত, তিনি সেখানে কাজে গিয়াছেন, দুদিন বাদেই আসিবেন—ইহার মধ্যে যদি সময় করিয়া উঠিতে না পারেন, তাই বলিয়া কি অত রাগ করিতে আছে! ছি! তাও বলি ভাই, তোমাকে আজ এত উপদেশ দিতেছি—আমি হইলেও ঠিক ঐ কাণ্ডটি করিয়া বসিতাম। তুমি যদি তখন আমাকে বুঝাইতে আসিতে, আমি কি বুঝিতাম মনে কর? এমন মিছামিছি কান্না মেয়েমানুষকে অনেক কাঁদিতে হয়। আবার এই কান্না ঘুচিয়া-গিয়া যখন হাসি ফুটিয়া উঠিবে, তখন কিছুই মনে থাকিবে না!"

এই বলিয়া কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া-লইয়া শৈল কহিল—"আজ তুমি মনে করিতেছ, রমেশবাবুকে আর কখনো তুমি মাপ করিবে না, তাই না? আচ্ছা সত্যি বল।"

কমলা কহিল—"হাঁ, সত্যিই বলিতেছি!"

শৈল কমলার গালে করতলের আঘাত করিয়া কহিল—"ইস্! তাই বই কি। দেখা যাইবে। আচ্ছা বাজি রাখো!"

এই কান্না এবং হাসি, এই রাগ করা এবং ক্ষমা করা, দাম্পত্যপ্রেমের এই যে তরঙ্গলীলায়িত স্রোতের খেলা—ইহারি একটি ছায়ালোকখচিত সুদূরবিস্তৃত শান্তিময় নিভৃত সুখের ছবি, শৈলজার কথায় মুহূর্ত্তের মধ্যে কমলার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল এবং তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইল।

শৈল অমনি চিবুক ধরিয়া কমলার মুখ তুলিয়া ধরিল। কহিল, "একেই বলে বাড়াবাড়ি। অতটা ভাল নয় ভাই—তুই আমাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিস্! আমার অভিমানের এত জোর নাই। অমন করিয়া কি নিশ্বাস ফেলিতে আছে—শুধু চোখের জলের উপর দিয়া যায়, সেই ভাল!"

আজ শৈলজার ঘরে বিশেষ একটা উৎসব ছিল। আজ তাহাদের বিবাহের সাংবৎসরিক পর্ব্ব। এই পর্ব্বপালন বিপিনের একটা বিশেষ

খেয়াল। পাছে পিতামাতা এবং বাহিরের লোক কেহ জানিতে পারে, এইজন্য এই উৎসবের দিনে শৈল ভারি লজ্জায় থাকে। ইহার আয়োজন এবং অনুষ্ঠান গোপনেই সম্পন্ন হয়। এতকাল পরে বাহিরের লোকের মধ্যে আজ কমলাই কেবল এই উৎসবের সংবাদ জানিয়াছে। শৈল তাহার কাছে গোপন করিতে পারে নাই। বিপিন যে বর্ষে বর্ষে তাহাদের বিবাহের দিনকে বিশেষ গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে চায়, ইহার গর্ব্ব শৈল সখীর কাছে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে কি করিয়া? গতকল্য মধ্যাহ্নে এই ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। কমলা বলিয়াছিল, "এ বেশ ভাই। আমার কাছে এ বড় ভাল লাগিতেছে।"—শৈল বলিয়াছে, "তোমাদেরও বিবাহের তারিখে এই-রকম আমোদ করা যাইবে। কি বল ভাই!"—কমলা তাহাতে সম্মতিপ্রকাশ করিয়াছে। শৈল বলিয়াছে, বরণ না হইলে সমস্ত বড় খালি-খালি ঠেকে—উঁহারা যদি রাজি হন, তবে ইহার পর হইতে আমাদের বিবাহের দিনে তুমি আমাদের দুজনকে বরণ করিয়া লইবে, আর তোমাদের বিবাহের দিনে আমি তোমাদের দুজনকে বরণ করিয়া লইব। কি বল ভাই?"—এ প্রস্তাবও কমলার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। এম্‌নি করিয়া দুই সখীর দুই দাম্পত্যসুখের ধারা কত পুনঃপুন-উদিত পূর্ণচন্দ্রের আলোকে, কত বারবার-প্রত্যাবর্ত্তিত আনন্দস্মৃতির উৎসবহিল্লোলে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পাশাপাশি বহিয়া চলিয়া যাইবে, এই কথা মনে করিয়া কাল মধ্যাহ্নে কমলার মনের মধ্যে একটা সুখের আবেশ রহিয়া-রহিয়া ঢেউ দিয়া গিয়াছে।

এই উৎসবে স্বামিস্ত্রীর মধ্যে যে মালা-বদল হয়, সে মালা শৈল প্রতিবৎসর নিজের হাতে গাঁথিয়া থাকে, এইবারেও তাই গাঁথিবে। কিন্তু কমলা এবার জেদ্ করিয়া ধরিয়া বসিয়াছে—তাহাদের ফুলশয্যার ফুলের আয়োজন কমলা নিজে প্রস্তুত করিয়া দিবে। এইজন্য কালই তাহার দূত উমেশকে ফুল-সংগ্রহের জন্য সে উৎসাহিত করিয়াছে উমেশও কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই শীতকম্পিতকলেবরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া প্রহরীর চক্ষু এবং ন্যায়-অন্যায়-বোধ বর্জ্জন করিয়া পুষ্পলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

গতকল্য মধ্যাহ্নে নিভৃতঘরে, বাতায়ন-প্রবিষ্ট শীতরৌদ্রে চুল এলো করিয়া, পা মেলিয়া-দিয়া, মৃদুগুঞ্জিত স্বরকে মাঝে মাঝে কৌতুকহাস্যে মুখরিত করিয়া দুই সখীতে অত্যন্ত বিস্তারিত-পল্লবিত-ভাবে এই সমস্ত আন্দোলন-আলোচনা হইয়া গেছে। তাহার পরে কাল সন্ধ্যা আসিয়াছে এবং রাত্রিও কাটিয়া গিয়াছে! সিসুতরুশ্রেণীর শুষ্কপত্র-গুলাকে উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণের দিকে উড়াইয়া-দিয়া শীতের মধ্যাহ্ন নির্জ্জন শয়ন-ঘরের বাতায়নদ্বারে তেম্‌নি করিয়াই স্খলিত রৌদ্রের একটা প্রান্ত মেলিয়া দিল—কিন্তু কালিকার বিশ্বসংসার হইতে আজ কমলা একেবারে ভ্রষ্ট হইয়া গেছে।

তাই বলিয়া কি কমলা কালিকার দিনকে ফিরিয়া পাইতে চায়? তাও নয়। কিছু না জানিয়া সে যে বিষম লজ্জার মধ্যে তলাইতে বসিয়াছিল, সেদিকে ফিরিয়া তাকাইতেও

তাহার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় বিমুখ হয়। আজিকার এই হতাশ্বাস শূন্যময়তা—এও ভাল!

শৈল কহিল, "আজ আর তোমার কিছুতে হাত দিয়া কাজ নাই—দুপুরবেলায় একটুখানি ঘুমাইয়া লও, তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাইতেছে!'

না, আজ কমলা ঘুমাইবে না। সখীত্ব আর ত বেশিদিন চলিবে না, যে দুইএকদিন অবকাশ আছে, প্রণয়ের শেষ কাজগুলি সে সারিয়া-দিয়া যাইতে চায়—এমন সুখের ঘরে এমন সুখের কাজ আর তাহার জীবনে কখনো ঘটিবে কি? নিজের সুখশয্যায় ত আগুন লাগিল, এবার সখীর ফুলশয্যার মালাগাঁথা শেষ করিয়া সে এই রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। সমস্তদিন নিজেকে কমলা লেশমাত্র বিশ্রাম দিল না। শৈলর শয়নগৃহ সাজাইল, নানারকম খাবার তৈরি করিল—শীতকালের দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল।

হরিভাবিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল, তোদের আজ ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি?"

শৈল কহিল, "কি জানি মা, কমলের মাথায় পাগ্‌লামি চাপিয়াছে!"

হরিভাবিনী কহিলেন, "আজ বুঝি তোদের পুতুলের বিয়ে?"

শৈল কহিল—"হাঁ মা, বিয়েরই ব্যাপার!" —এই বলিয়া গোপনে কমলাকে মৃদু একটুখানি চিম্‌টি কাটিল।

সন্ধ্যার সময় কমলা শৈলকে গা ধোয়াইয়া চুল বাঁধিয়া লাল বেনারসী শাড়ী পরাইল। তাহার সীঁথায় বড় করিয়া সিঁদুরের রেখা কাটিল, কপালে শ্বেতচন্দন দিল। বলিল, "দিদি, তোমার পায়ে আমি আল্‌তা পরাইয়া দিব!"

শৈল কহিল, "দূর পাগ্‌লি, তোর আর অত করিতে হইবে না।"

কমলা কিছুতেই ছাড়িল না,- লাইন্ ঠিক পরিপাটি হইল না, কিন্তু বহুযত্নে সে কমলার পায়ে আল্‌তা রাঙাইয়া দিল। দিয়া, হঠাৎ দুই পা দুই হাতে জড় করিয়া তুলিয়া মাথা নীচু করিয়া চুম্বন করিল। শৈল চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "ও কি ও! অমন কর যদি, তবে আমি যাই!'

এম্‌নি করিয়া কমলা তাহার পত্নীধর্ম্মব্রতের অবসানদিনে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই সতী নারীর, এই ভাগ্যবতী গৃহলক্ষ্মীর চরণবন্দনা করিয়া লইল। মনে মনে ভাবিল, "এ জন্মের আশা ত নাই, আর জন্মে যদি শৈলর মত এম্‌নি ভাগ্যলাভ করিতে পারি, তবে কৃতার্থ হইব।"

শৈলর মেয়ে উমিকে এতক্ষণ হিন্দুস্থানী ঝি ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যা হইতেই সে "মা কাছে যাব" বলিয়া ভারি গোলমাল বাধাইয়া দিল। মাতার সুসজ্জিত বেশভূষা তাহার ভাল লাগিল না—ইহা মায়ের পরিচিত বেশ নহে। সে তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিতে যাবামাত্র কমলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল—কহিল, "আয় উমি, মাসীর কাছে আয়!"—কিন্তু সে কি হয়, সন্ধ্যাবেলায় আর কাহাকেও নয়, মাকে চাই। কমলা গল্প বলিবার লোভ দেখাইয়া অনেক করিয়া উমিকে আপনার ঘরে লইয়া-গিয়া বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প ফাঁদিল। তাহাকে ভুলাইয়া, গল্প বলিয়া, খাওয়াইয়া, বুকে চাপিয়া-ধরিয়া,

দোলাইয়া, ঘুম পাড়াইয়া নিজের বিছানার উপরে শোয়াইয়া দিল;- কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া চুম্বন করিল। কচি মুখটি চুম্বন করিতেই কমলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। শিশুকে লালন করিবার তৃষ্ণা সমস্ত অপরিতৃপ্ত ভবিষ্যতের বেদনাকে একত্র করিয়া লইয়া আজ তাহার বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, উমির ঘুম ভাঙাইয়া আবার তাহাকে কোলের মধ্যে করিয়া তাহাকে লইয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া বকে, তাহার মুখে মাসীসম্বোধন শোনে।

খানিকবাদে শৈলজা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"উমি ঘুমাইয়াছে?"

কমলা কহিল, "হাঁ, ঘুমাইয়াছে।"

শৈল। তবে এইবেলা ওকে ওর বিছানায় শোয়াইয়া দিই গে।

কমলা তাড়াতাড়ি কহিল, "না দিদি, না, আজ ও আমার বিছানাতেই থাক্।"

শৈল। ছোট বিছানায় তোমার যে অসুবিধা হবে ভাই।

কমলা। কিছু অসুবিধা হইবে না। ও এখানেই থাক্!

তার পর বিপিন ঈষৎ লজ্জিতভাবে শয়নঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শৈলের তাড়নায় পাশের ঘর হইতে সে লাল বেনারসী জোড় পরিয়া আসিল। শৈল রূপার থালায় ঘষা চন্দনের বাটি, গোলাপপাশ ও ফুলের মালা আনিয়া প্রথমে বিপিনের ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিল, পরে তাহার চাদরের উপর গোলাপ ছিটাইয়া দিয়া তাহার গলায় দুইগাছি মালা পরাইয়া গড় হইয়া তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিপিন আপনার গলার একগাছি মালা খুলিয়া শৈলকে পরাইয়া দিল এবং আলজ্জ হাস্যমুখে শৈলর চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া মাথা নত করিতে যাইতেছিল—কিন্তু শৈল আজ নিয়মভঙ্গ করিল। সে হঠাৎ মুখ সরাইয়া নীরব সঙ্কেতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল—বিপিন বুঝিল, অন্তরাল হইতে তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অনুষ্ঠানের এই অসম্পূর্ণতা সংশোধন করিয়া লইবার যথেষ্ট সময় আছে জানিয়া বিপিন ক্ষান্ত হইল। শৈলজা ফলমূলমিষ্টান্নের বিচিত্র পাত্র বহিয়া মেজের উপর সাজাইয়া দিল। বিপিন খাইতে বসিল এবং শৈল সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে ধুনার পাত্রে ধূপধুনা ও চন্দনের গুঁড়া দিয়া ভূষণঝঙ্কৃত বাহুতে পাখা করিয়া সুগন্ধ ধূমরাশি ঘনাইয়া তুলিতে লাগিল।

কমলা অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ একসময়ে চলিয়া-গিয়া আপনার ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে মেঝের উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। অন্যদিন শৈলজা তাহাকে যথাসময়ে ডাকিয়া-লইয়া একসঙ্গে খাইতে যায়। আজ শৈলর অবকাশ ছিল না। আজ সে স্বামীর পাত্রে প্রসাদ পাইয়া পুষ্পাসনে বসিয়া বিপিনের কাছ হইতে একটা ইংরাজিগল্পের তর্জ্জমা শুনিতেছে। কমলার ঘরের এক কোণে আজিকার প্রস্তুত মিষ্টান্ন প্রভৃতি ঢাকা দেওয়া ছিল—তাহা ঢাকাই রহিয়া গেল। কমলা তাহার অসংস্কৃত কেশ-

রাশি ভূমির উপরে ছড়াইয়া প্রসারিত বাম-বাহুর উপর মাথা রাখিয়া বিস্রস্ত বস্ত্রাঞ্চলে কঠিন-শীতল গৃহতলে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল।

খানিক রাত্রে কমলার বিছানার উপর হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, "মা, মা।"

"কি মা"—বলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া-পড়িয়া বিছানার মধ্যে গিয়া গুন্‌গুন্ শব্দে উমির ললাটে মৃদুমৃদু করাঘাত করিতে লাগিল—উমি তৎক্ষণাৎ কমলাকে মা মনে করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল বুকের কাছে এই শিশুদেহকে চাপিয়া-ধরিয়া কমলার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল।

৩৯

কাল সকালে কমলার সঙ্গে কথাবার্তা হইবার পরেই শৈল এলাহাবাদে তাহার বাপকে চিঠি পাঠাইল। তাহাতে লিখিল, 'কমলা রমেশবাবুর কোন চিঠিপত্র না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছে। একে বেচারা নূতন বিদেশে আসিয়াছে, তাহার পরে রমেশবাবু যখন-তখন তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন এবং চিঠিপত্র লিখিতেছেন না, ইহাতে তাহার কি কষ্ট হইতেছে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! তাঁহার এলাহাবাদের কাজ কি আর শেষ হইবে না নাকি? কাজ ত ঢের লোকের থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া দুইছত্র চিঠি লিখিবার কি অবসর পাওয়া যায় না?"

খুড়া রমেশের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার কন্যার পত্রের অংশবিশেষ শুনাইয়া ভর্ৎসনা করিলেন।

কমলার দিকে রমেশের মন যথেষ্টপরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা সত্য, কিন্তু আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহার দ্বিধা আরও বাড়িয়া উঠিল। এলাহাবাদে আসিয়া কমলার সেই গৃহরচনার চিত্রটি যখন তাহার মনের সামনে হইতে কিছুতেই আর সরিতে চাহিল না, যখন তাহাকে বিচিত্র সুখের কল্পনায় প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, তখনই তাহার মনে হইল, আমার কর্ত্তব্যটা ঠিক কি, তাহা বুঝি প্রবৃত্তির ঝোঁকে আর ঠাহর করিবার শক্তি রহিল না। যাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া ঠিক করিয়াছিল, তাহা একান্ত লোভনীয় হইয়া ওঠাতেই তাহার মনে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। কেবলি ভাবিতে লাগিল, কমলাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়া চিরজীবন একটা মিথ্যাকে বহন করিয়া বেড়াইব কি করিয়া? ইহার পরে প্রকৃত ঘটনা আর কোনোকালেই ত কমলাকে বলা যাইবে না!

এই দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া রমেশ কোনোমতেই এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে পারিতেছিল না। ইতিমধ্যে খুড়ার কাছ হইতে সে শৈলর চিঠি শুনিল।

চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারিল, কমলা রমেশের জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে—সে কেবল নিজে লজ্জায় লিখিতে পারে নাই।

ইহাতে রমেশের দ্বিধার দুই শাখা দেখিতে দেখিতে একটাতে আসিয়া মিলিয়া গেল। এখন ত কেবলমাত্র রমেশের সুখ-দুঃখ লইয়া কথা নয়, কমলাও যে রমেশকে ভালবাসিয়াছে। বিধাতা যে কেবল নদীর চরের উপরে তাহাদের দুইজনকে মিলাইয়া

দিয়াছেন, তাহা নহে, হৃদয়ের মধ্যেও এক করিয়াছেন। যতদিন রমেশের ভালবাসার গতি অন্যদিকে ছিল, ততদিন যথার্থ মিলনের সময় আসে নাই আজ যখন রমেশ সম্পূর্ণভাবেই কমলার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তখন আর সংশয় করিবার বিষয় কি আছে? একটা আছে বটে—প্রকৃত ঘটনাটা কমলাকে বলা হয় নাই। তা, কোনো একদিন সেটাও বলিবার সুযোগ নিশ্চয় আসিবে!

এই ভাবিয়া রমেশ আর বিলম্বমাত্র না করিয়া কমলাকে এক চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল—

"প্রিয়তমাসু—

"কমলা, তোমাকে এই যে সম্ভাষণ করিলাম, ইহাকে চিঠি লিখিবার একটা প্রচলিত পদ্ধতিপালন বলিয়া গণ্য করিয়ো না। যদি তোমাকে আজ পৃথিবীতে সকলের চেয়ে প্রিয় বলিয়া না জানিতাম, তবে কখনই আজ 'প্রিয়তমা' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিতাম না। যদি তোমার মনে কখনো কোনো সন্দেহ হইয়া থাকে, যদি তোমার কোমল হৃদয়ে কখনো কোনো আঘাত করিয়া থাকি, তবে এই যে আজ সত্য করিয়া তোমাকে ডাকিলাম 'প্রিয়তমা', ইহাতেই আজ তোমার সমস্ত সংশয়, সমস্ত বেদনা নিঃশেষে ক্ষালন করিয়া দিক্! ইহার চেয়ে তোমাকে আর বেশি বিস্তারিত করিয়া কি বলিব! এ পর্য্যন্ত আমার অনেক আচরণ তোমার কাছে নিশ্চয় ব্যথাজনক হইয়াছে সেজন্য যদি তুমি মনে মনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাক, তবে আমি প্রতিবাদী হইয়া তাহার লেশমাত্র প্রতিবাদ করিব না—আমি কেবল বলিব, আজ তুমি আমার প্রিয়তমা, তোমার চেয়ে প্রিয় আমার আর কেহই নাই ইহাতেও যদি আমার সমস্ত অপরাধের, সমস্ত অসঙ্গত আচরণের শেষ জবাব না হয়, তবে আর কিছুতেই হইবে না।

"অতএব কমলা, আজ তোমাকে এই 'প্রিয়তমা'সম্বোধন করিয়া আমাদের পরিচয়হীন সংশয়াচ্ছন্ন অতীতকে দূরে সরাইয়া দিলাম, এই 'প্রিয়তমা'সম্বোধন করিয়া আমাদের সুখ-শান্তি-ভালবাসার ভবিষ্যৎকে আরম্ভ করিলাম। তোমার কাছে আমার একান্ত মিনতি, তুমি আজ আমার 'প্রিয়তমা' এই কথাটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর! ইহা যদি ঠিক তুমি মনে গ্রহণ করিতে পার, তবে কোনো সংশয় লইয়া আমাকে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না!

"তাহার পরে, আমি তোমার ভালবাসা পাইয়াছি কি না, সে কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিবও না। আমার এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের অনুকূল উত্তর একদিন তোমার হৃদয়ের ভিতর দিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া পৌঁছিবে, ইহাতে আমি সন্দেহমাত্র করি না। ইহা আমি আমার ভালবাসার জোরে বলিতেছি;—আমার যোগ্যতা লইয়া অহঙ্কার করি না, কিন্তু আমার সাধনা কেন সার্থক হইবে না?

"আমি বেশ বুঝিতেছি, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা কেমন সহজ হইতেছে না—তাহা রচনার মত শুনাইতেছে—ইচ্ছা করিতেছে, এ চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলি! কিন্তু যে চিঠি

মনের মত হইবে, সে চিঠি এখনি লেখা সম্ভব হইবে না। কেন না, চিঠি দুজনের জিনিষ —কেবল এক পক্ষ যখন চিঠি লেখে, তখন সে চিঠিতে সব কথা ঠিক করিয়া লেখা চলে না—তোমাতে আমাতে যেদিন মনজানাজানির বাকি থাকিবে না, সেইদিনই চিঠির মত চিঠি লিখিতে পারিব। সাম্‌নাসামনি দুই দরজা খোলা থাকিলে তখনি ঘরে অবাধে হাওয়া খেলে। কমলা, প্রিয়তমা, তোমার হৃদয় কবে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিব।

"এ সব কথার মীমাংসা ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে হইবে—ব্যস্ত হইয়া ফল নাই। যেদিন আমার চিঠি পাইবে, তাহার পরের দিন সকালবেলাতেই আমি গাজিপুরে পৌঁছিব। তোমার কাছে আমার অনুরোধ এই, গাজিপুরে পৌঁছিয়া আমাদের বাসাতেই যেন তোমাকে দেখিতে পাই। অনেকদিন গৃহহারার মত কাটিল—আর আমার ধৈর্য্য নাই এবারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিব—হৃদয়লক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মীর মূর্ত্তিতে দেখিব। সেই মুহূর্ত্তে দ্বিতীয়বার আমাদের শুভদৃষ্টি হইবে। মনে আছে - আমাদের প্রথমবার সেই শুভদৃষ্টি? সেই জ্যোৎস্নারাত্রে, সেই নদীর ধারে, জনশূন্য বালুমরুর মধ্যে? সেখানে ছাদ ছিল না, প্রাচীর ছিল না, পিতামাতাভ্রাতা-আত্মীয়-প্রতিবেশীর সম্বন্ধ ছিল না সে যে গৃহের একেবারে বাহির। সে যেন স্বপ্ন, সে যেন কিছুই সত্য নহে। সেইজন্য আর একদিন স্নিগ্ধ-নির্ম্মল প্রাতঃকালের আলোকে গৃহের মধ্যে, সত্যের মধ্যে সেই শুভদৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করিয়া লইবার অপেক্ষা আছে। পুণ্যপৌষের প্রাতঃকালে আমাদের গৃহদ্বারে তোমার সরল সহাস্য মূর্ত্তিখানি চিরজীবনের মত আমার হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইব, এইজন্য আমি আগ্রহে পরিপূর্ণ হইয়া আছি। প্রিয়তমে, আমি তোমার হৃদয়ের দ্বারে অতিথি—আমাকে ফিরাইয়ো না।

প্রসাদভিক্ষু রমেশ।"

৪০

শৈল ম্লান কমলাকে একটুখানি উৎসাহিত করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, "আজ তোমাদের বাংলায় যাইবে না?"

কমলা কহিল—"না, আব দরকার নাই।"

শৈল। তোমার ঘরসাজানো শেষ হইয়া গেল?

কমলা। হাঁ ভাই, শেষ হইয়া গেছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার শৈল আসিয়া কহিল, "একটা জিনিষ যদি দিই ত কি দিবি বল্?"

কমলা কহিল, "আমার কি আছে দিদি?"

শৈল। একেবারে কিছুই নাই?

কমলা। কিছুই না।

শৈল কমলার কপোলে করাঘাত করিয়া কহিল, "ইস্, তাই ত,—যা কিছু ছিল, সমস্তই বুঝি একজনকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিস্? এটা কি বল্ দেখি?"—বলিয়া শৈল অঞ্চলের ভিতর হইতে একটা চিঠি বাহির করিল।

লেফাফায় রমেশের হস্তাক্ষর দেখিয়া কমলার মুখ তৎক্ষণাৎ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—সে একটুখানি মুখ ফিরাইল।

শৈল কহিল—"ওগো, আর অভিমান দেখাইতে হইবে না, ঢের হইয়াছে। এদিকে চিঠিখানা ছোঁ মারিয়া লইবার জন্য মনটার

ভিতরে ধড়্ফড়্ করিতেছে—কিন্তু মুখ ফুটিয়া চাহিলে আমি দিব না—কখনো দিব না —দেখি কতক্ষণ পণ রাখিতে পার!”

এমনসময় উমা একটা সাবানের বাক্সে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া-আনিয়া কহিল “মাসি, গ-গ!”

কমলা তাড়াতাড়ি উমিকে কোলে তুলিয়া বারংবার চুমো খাইতে খাইতে শোবার ঘরে লইয়া গেল। উমি তাহার শকটচালনায় অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল কিন্তু কমলা কোনোমতেই ছাড়িল না—তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া-গিয়া নানাপ্রকার প্রলাপবাক্যে তাহার মনোরঞ্জন-চেষ্টায় প্রবলবেগে প্রবৃত্ত হইল।

শৈল আসিয়া কহিল—“হার মানিলাম —তোরই জিৎ—আমি ত পারিতাম না! ধন্যি মেয়ে! এই নে ভাই—কেন মিছে অভিশাপ কুড়াইব!”

এই বলিয়া বিছানার উপরে চিঠিখানা ফেলিয়া উমিকে কমলার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

লেফাফাটা লইয়া একটুখানি নাড়াচাড়া করিয়া কমলা চিঠিখানা খুলিল প্রথম দুই-চারি লাইনের উপরে দৃষ্টিপাত করিবাই তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। লজ্জায় সে চিঠি-খানা একবার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। প্রথম ধাক্কার এই প্রবল বিতৃষ্ণার আক্ষেপ সাম্লা-ইয়া-লইয়া আবার সেই চিঠি মাটি হইতে তুলিয়া সমস্তটা সে পড়িল। সমস্তটা সে ভাল করিয়া বুঝিল কি না বুঝিল, জানি না, কিন্তু তার মনে হইল, যেন সে হাতে করিয়া কি একটা পঙ্কিল পদার্থ নাড়িতেছে। চিঠি-খানা আবার সে ফেলিয়া দিল। যে ব্যক্তি তাহার স্বামী নহে, তাহারই ঘর করিতে হইবে, এইজন্য এই আহ্বান। রমেশ জানিয়া-শুনিয়া এতদিন পরে তাহাকে এই অপমান করিল! গাজিপুরে আসিয়া রমেশের দিকে কমলা যে তাহার হৃদয় অগ্রসর করিয়া দিয়া-ছিল, সে কি রমেশ বলিয়া, না তাহার স্বামী বলিয়া? রমেশ তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিল, সেইজন্যই 'অনাথার' প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে আজ এই ভালবাসার চিঠি লিখি-য়াছে! ভ্রমক্রমে রমেশের কাছে যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছিল, সেটুকু কমলা আজ কেমন করিয়া ফিরাইয়া লইবে—কেমন করিয়া! এমন লজ্জা, এমন ঘৃণা কমলার অদৃষ্টে কেন ঘটিল! সে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে। এবারে 'ঘর' বলিয়া একটা বীভৎস জিনিষ কমলাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে কমলা কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে! রমেশ যে তাহার কাছে এত-বড় বিভীষিকা হইয়া উঠিবে, দুইদিন আগে তাহা কি কমলা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিত?

ইতিমধ্যে দ্বারের কাছে উমেশ আসিয়া একটুখানি কাশিল। কমলার কাছে কোনো সাড়া না পাইয়া সে আস্তে আস্তে ডাকিল “মা!” কমলা দ্বারের কাছে আসিল, উমেশ মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, “মা, আজ সিধুবাবুরা মেয়ের বিবাহে কলিকাতা হইতে একটা যাত্রার দল আনাইয়াছেন।”

কমলা কহিল, “বেশ ত উমেশ, তুই যাত্রা শুনিতে যাস্।”

উমেশ। কাল সকালে কি ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতে হইবে?

কমলা। না না, ফুলের দরকার নেই!

উমেশ যখন চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কমলা তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল কহিল, "ও উমেশ, তুই যাত্রা শুনিতে যাইতেছিস্, এই নে, পাঁচটা টাকা নে।"

উমেশ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যাত্রা শুনিবার সঙ্গে পাঁচটা টাকার কি যোগ, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কহিল—"মা, সহর হইতে কি তোমার জন্য কিছু কিনিয়া আনিতে হইবে?"

কমলা। না না, আমার কিছু চাই নে। তুই রাখিয়া দে, তোর কাজে লাগিবে।

হতবুদ্ধি উমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে কমলা আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "উমেশ, তুই এই কাপড় পরিয়া যাত্রা শুনিতে যাইবি নাকি—তোকে লোকে বলিবে কি?"

লোকে যে উমেশের নিকট সাজসজ্জা-সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি প্রত্যাশা করে এবং ত্রুটি দেখিলে আলোচনা করিয়া থাকে, উমেশের এরূপ ধারণা ছিল না—এই কারণে ধুতির শুভ্রতা ও উত্তরচ্ছদের একান্ত অভাব-সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। কমলার প্রশ্ন শুনিয়া উমেশ কিছু না বলিয়া একটু-খানি হাসিল।

কমলা তাহার দুই জোড়া শাড়ী বাহির করিয়া উমেশের কাছে ফেলিয়া-দিয়া কহিল, "এই নে, যা, পরিস্।"

শাড়ীর চওড়া বাহারে পাড় দেখিয়া উমেশ অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কমলার পায়ের কাছে পড়িয়া ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল, এবং হাস্যদমনের বৃথাচেষ্টায় সমস্ত মুখখানাকে বিকৃত করিয়া চলিয়া গেল। উমেশ চলিয়া গেলে কমলা দুই-ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া জান্‌লার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈল ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ভাই কমল, আমাকে তোর চিঠি দেখাবিনে?"

কমলার কাছে শৈলর ত কিছুই গোপন ছিল না—তাই শৈল এতদিন পরে সুযোগ পাইয়া এই দাবী করিল।

কমলা কহিল, "ঐ যে দিদি, দেখ না।" -বলিয়া, মেজের উপরে চিঠি পড়িয়া ছিল, দেখাইয়া দিল। শৈল আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, "বাস্‌রে, এখনো রাগ যায় নাই!"- মাটি হইতে শৈল চিঠি তুলিয়া-লইয়া সমস্তটা পড়িল। চিঠিতে ভালবাসার কথা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু তবু এ কেমনতর চিঠি! মানুষ আপনার স্ত্রীকে কি এম্‌নি করিয়া চিঠি লেখে! এ যেন কি-এক-রকম! শৈল জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামী কি নভেল লেখেন?"

"স্বামী"শব্দটা শুনিয়া চকিতের মধ্যে কমলার দেহমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। সে কহিল—"জানি না!"

শৈল কহিল, "তা হ'লে আজ তুমি বাংলাতেই যাইবে?"

কমলা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, যাইবে।

শৈল কহিল, "আমিও আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিতাম, কিন্তু জান ত ভাই, আজ নরসিংবাবুর বউ আসিবে। মা বরঞ্চ তোমার সঙ্গে যান্।"

কমলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না, মা গিয়া কি করিবেন? সেখানে ত চাকর আছে।"

শৈল হাসিয়া কহিল, "আর তোমার বাহন উমেশ আছে, তোমার ভয় কি ?"

উমা তখন কাহার একটা পেন্সিল সংগ্রহ করিয়া যেখানে-সেখানে আঁচড় কাটিতেছিল এবং চীৎকার করিয়া অব্যক্ত ভাষা উচ্চারণ করিতেছিল, মনে করিতেছিল 'পড়িতেছি'। শৈল তাহার এই সাহিত্যরচনা হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল—সে যখন প্রবল তারস্বরে আপত্তিপ্রকাশ করিল, কমলা বলিল, "একটা মজার জিনিষ দিতেছি আয়!"

এই বলিয়া ঘরে লইয়া-গিয়া তাহাকে বিছানার উপর ফেলিয়া আদরের দ্বারা তাহাকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। সে যখন প্রতিশ্রুত উপহারের দাবী করিল, তখন কমলা তাহার বাক্স খুলিয়া একজোড়া সোনার ব্রেস্‌লেট্‌ বাহির করিল। এই দুর্লভ খেলেনা পাইয়া উমি ভারি খুসি হইল। মাসী তাহার হাতে পরাইয়া দিতেই সে সেই ঢল্‌ঢলে-গহনাজোড়া-সমেত দুটি হাত সন্তর্পণে তুলিয়া-ধরিয়া সগর্ব্বে তাহার মাকে দেখাইতে গেল। মা ব্যস্ত হইয়া যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্রেস্‌লেট্‌ কাড়িয়া লইল—কহিল, "কমল, তোমার কিরকম বুদ্ধি! এ সব জিনিষ উহার হাতে দাও কেন ?"

এই দুর্ব্যবহারে উমির আর্ত্তনাদের নালিশ গগন ভেদ করিয়া উঠিল। কমল কাছে আসিয়া কহিল, "দিদি, এ ব্রেস্‌লেট্‌-জোড়া আমি উমিকেই দিয়াছি।"

শৈল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"পাগল নাকি!"

কমলা কহিল—"আমার মাথা খাও দিদি, এ ব্রেস্‌লেট্‌জোড়া তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিবে না! ইহা ভাঙিয়া উমির হার গড়াইয়া দিয়ো।"

শৈল কহিল, "না, সত্য বলিতেছি, তোর মত ক্ষ্যাপা মেয়ে আমি দেখি নাই!"

এই বলিয়া কমলার গলা জড়াইয়া ধরিল। কমলা কহিল, "তোদের এখান হইতে আমি ত আজ চলিলাম দিদি—খুব সুখে ছিলাম—এমন সুখ আমার জীবনে কখনো পাই নাই।"—বলিতে বলিতে ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া তাহার চোখের জল পড়িতে লাগিল।

শৈলও উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া বলিল—"তোর রকমটা কি বল্‌ দেখি কমল, যেন কতদূরেই যাইতেছিস্‌! যে সুখে ছিলি, সে আর আমার বুঝিতে বাকি নাই এখন তোর সব বাধা দূর হইল, সুখে আপন ঘরে একলা রাজত্ব করিবি—আমরা কখনো গিয়া পড়িলে ভাবিবি আপদ্‌ বিদায় হইলেই বাঁচি!"

বিদায়কালে কমলা শৈলকে প্রণাম করিলে পর শৈল কহিল, "কাল দুপুরবেলা আমি তোদের ওখানে যাইব।"

কমলা তাহার উত্তরে 'হাঁ-না' কিছুই বলিল না।

বাংলায় গিয়া কমলা দেখিল, উমেশ আসিয়াছে। কমলা কহিল—"তুই যে! যাত্রা শুনিতে যাবি না ?"

উমেশ কহিল, "তুমি যে আজ এখানে থাকিবে, আমি— "

কমলা। আচ্ছা আচ্ছা, সে তোর ভাবিতে হইবে না। তুই যাত্রা শুনিতে যা—এখানে বিষণ আছে। যা, দেরি করিস্‌ নে!"

উমেশ। এখন ত যাত্রার অনেক দেরি!

কমলা। তা হোক্ না, বিয়ে-বাড়ীতে কত ধুম হইতেছে, ভাল করিয়া দেখিয়া আয় গে যা!

এ সম্বন্ধে উমেশকে অধিক উৎসাহিত করিবার প্রয়োজন ছিল না। সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কমলা হঠাৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিল—"দেখ্, খুড়োমশায় আসিলে তুই—"

এইটুকু বলিয়া কথাটা কি করিয়া শেষ করিতে হইবে ভাবিয়া পাইল না। উমেশ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল—"মনে রাখিস্, খুড়োমশায় তোকে ভালবাসেন—তোর যখন যা দরকার হইবে, আমার প্রণাম জানাইয়া তুই তাঁর কাছে চাস্, তিনি দিবেন—তাঁকে আমার প্রণাম দিতে কখনো ভুলিস্‌নে—জানিস্।"

উমেশ এই অনুশাসনের কোনো অর্থ না বুঝিয়া "যে আজ্ঞে" বলিয়া চলিয়া গেল।

অপরাহ্নে বিষণ জিজ্ঞাসা করিল, "মা-জি, কোথায় যাইতেছ?"

কমলা কহিল, "গঙ্গায় স্নান করিতে চলিয়াছি।"

বিষণ কহিল, "সঙ্গে যাইব?"

কমলা কহিল—"না, তুই ঘরে পাহারা দে।"—বলিয়া তাহার হাতে অনাবশ্যক একটা টাকা দিয়া কমলা গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল।

ক্রমশ।

ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য।

যাপান।

[২য় প্রস্তাব]

খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরতীর পর্য্যন্ত এশিয়ার সমগ্র পশ্চিমাংশে ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রমণগণের প্রচারকৌশলে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"র মূলমন্ত্র পুনঃপুন বিঘোষিত হইয়া জনসাধারণের হৃদয়ে প্রীতি-পবিত্রতা বিকশিত করিয়া সাধু-সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষের প্রতি লোকচিত্ত আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া ধর্ম্মের নামে যে যাহা বলিত, নরনারী তাহার গূঢ়মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, ভক্তিপ্রদর্শনে ত্রুটি করিত না। শ্রমণগণের সৌম্য-শান্ত-পবিত্র বেশ ও অলোকসামান্য বিশ্বপ্রেম সভ্য-অসভ্য সকল শ্রেণীর নরনারীর উপরেই অল্পাধিক-প্রভাব বিস্তারে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। অশোকের অনুশাসনে উৎসাহলাভ

করিয়া প্রভাবপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, এশিয়াখণ্ডের জলে-স্থলে বৌদ্ধমত-প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিল। তজ্জন্য কত রাজপুত্র রাজসিংহাসনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, ভিক্ষাপাত্রহস্তে নগরে নগরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া, ধর্ম্মসঙ্ঘ ও বুদ্ধের মহিমা প্রচারে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই নবধর্ম্মের কথা চীনসাম্রাজ্যে অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু অশোকের প্রচারকবর্গের সে দেশে ধর্ম্মপ্রচারে গমন করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চীনদেশের পশ্চিমাংশে,—মধ্য-এশিয়ার সমুন্নত জনসমাজে,—বৌদ্ধধর্ম্ম দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতীয় জ্ঞানগৌরবের প্রতি চীনসাম্রাজ্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার সন্ধান লাভ করিয়া, চীনাধিপতি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে সৈয়ান-নামক সুবিখ্যাত অধ্যাপককে অষ্টাদশ সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্যানুসন্ধানের জন্য মধ্য-এশিয়ায় প্রেরণ করেন। সৈয়ান ও তদীয় সহাধ্যায়িবর্গ মধ্য-এশিয়ায় উপনীত হইয়া, তদ্দেশে বহুসংখ্যক ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে মতঙ্গ ও হোয়ান্ নামধেয় দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণ তাঁহার সহিত চীনসাম্রাজ্যে প্রবেশ-লাভ করেন। সেই সময় হইতে চীনদেশে ভারতীয় শ্রমণগণের ধর্ম্মপ্রচারের সূত্রপাত হয়। তজ্জন্য মতঙ্গের নাম অদ্যাপি চীন-দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের জন্মভূমি হইতে তাঁহাদের নাম-গোত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! যাঁহারা ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যবিস্তারে জীবন উৎসর্গ করিয়া নানা দূরদেশে ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইয়াছিলেন, স্বদেশে তাঁহাদের নাম-গোত্র বিলুপ্ত হইলেও, পৃথিবী হইতে তাঁহাদের আত্মত্যাগের পুণ্যপ্রতাপ বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। অদ্যাপি চীনসাম্রাজ্যের বিবিধ বিভাগে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত থাকিয়া, সেই সকল বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসিশিক্ষকের আত্মত্যাগের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মতঙ্গ চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; তিনি চিত্রাঙ্কন করিয়া চৈত্য ও স্তূপ নির্ম্মাণের শিক্ষাপ্রদানে চীনসাম্রাজ্যের শিল্পবিদ্যার উন্নতিসাধন করেন।

মতঙ্গের প্রচারযাত্রার সময়ে লহয়াঙ্গ-নামক স্থানে চীনসাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় যে রাজপ্রাসাদে ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণ প্রথম আতিথ্যস্বীকার করেন, তাহা রাজাদেশে বৌদ্ধবিহারে পরিণত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্র বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি পুণ্যতীর্থরূপে পূজিত হইয়া থাকে। এই ইতিহাসবিখ্যাত বৌদ্ধবিহার কতকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, কোন্ সময়ে কি সূত্রে ধ্বংসমুখে পতিত হয়, তাহার কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত তাতার ও ভারতবর্ষ হইতে উপনীত হইয়া শ্রমণগণের এই বিহারে জ্ঞান-বিস্তারে নিযুক্ত থাকিবার কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পশ্চিমাংশ হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশলাভ করে, তজ্জন্য চীনদেশের অধি-বাসিবর্গের নিকট মধ্য-এশিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের আকর বলিয়া পরিচিত

ছিল। তখনও চীনদেশের লোকে ভারতবর্ষের দিকে ধাবিত হয় নাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইবার নূতন সুযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। কোচিন্-বন্দরের পথে পূর্ব্বাঞ্চল হইতেও চীনদেশে ভারতবর্ষীয় লোকের সমাগমের সূত্রপাত হইল। তখন জলস্থল উভয় পথে ভারতবর্ষ ও চীন এক-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহিত বিশেষ-ভাবে পরিচিত হইয়া উঠিল। ইহার ফল অল্পকালেই প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশের ভাষায় ভারতীয় বৌদ্ধসাহিত্যের অনুবাদকার্য্য আরব্ধ হইয়া চীনদেশের সাহিত্যে এক অভিনব শক্তিসঞ্চারের সূত্রপাত করিল। সংস্কৃত-কাব্যাদির অনুবাদকার্য্যও অসম্পন্ন রহিল না। মূলগ্রন্থানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার টীকা ও ভাষ্য রচনার প্রথাও প্রচলিত হইতে লাগিল। এইরূপে চীনদেশে যে বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বিনষ্ট হয় নাই; বৌদ্ধবিহারের পুস্তকালয়ে সুরক্ষিত হইয়া, পুনরায় পুরাকীর্ত্তি প্রচার করিবার জন্য উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। যেদিন ভারতবর্ষ বা পাশ্চাত্য-সমাজ সেই গ্রন্থরাশির অধ্যয়ন ও মর্ম্মানু-সন্ধানে কৃতকার্য্য হইবে, সেদিন ভারতবর্ষের বিলুপ্ত ইতিহাসের বহুবিস্ময়াস্পদ প্রমাণ-পরম্পরা আবিষ্কৃত হইয়া ভারতীয় জ্ঞান-সাম্রাজ্যের গৌরব ঘোষণা করিবে। গ্রীস ও রোমের অধঃপতনের পর দীর্ঘকাল ইউ-রোপের লোকের নিকট গ্রীস ও রোমের পুরাতন জ্ঞানগৌরব অপরিজ্ঞাত ছিল; কালে পুরাতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও অনূদিত হইয়া গ্রীক্ জ্ঞানসাম্রাজ্যের পূর্ব্বগৌরবে আধুনিক ইউরোপকে গর্ব্বান্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যের পূর্ব্বগৌরব পুন-রায় জনসমাজে সুপরিচিত হইবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই —তিব্বত, চীন, যাপানের অসংখ্য পুরাতন গ্রন্থে তাহার পরিচয় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যেদিন তাহা পুনরায় সভ্যসমাজে প্রচারিত হইবে, সেদিন আমরাও আত্মমর্য্যাদায় সমুন্নত হইতে পারিব।

বৌদ্ধধর্ম্ম এশিয়ার জনসাধারণের প্রকৃতি ও পূর্ব্বসংস্কারের অনুকূল বলিয়া যেখানে প্রচারিত হইয়াছে, সেখান হইতে পুনরায় অন্যদেশে প্রচারিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য ভারতবর্ষের শ্রমণগণকে একাকী পরিশ্রম করিতে হয় নাই। পশ্চি-মাংশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার সময়ে মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধগণ বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন, চীনসাম্রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিবার সময়েও তাঁহারা ভারতবর্ষের শ্রমণগণের সহচর হইয়া-ছিলেন। কোরিয়া ও যাপানদ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের সময় চীনদেশের লোকে সেইরূপ সহায়তা করিয়াছিল। বরং কোরিয়া ও যাপানে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের প্রধান গৌরব চীনদেশের;—ভারতবর্ষীয় শ্রমণগণ পরোক্ষভাবে তাহার সহায়তাসাধন করেন।

বৌদ্ধ শ্রমণগণের ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে এশিয়াখণ্ডে বিবিধ জ্ঞান প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য,—ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতা, ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যের অধীন হইয়া সমগ্র এশিয়াখণ্ডে বিবিধ বিস্তার

সমন্বয় সাধন করে। কাকাসু ও কাকুরা এই কথা বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছেন,—ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল দুইটি প্রবল সাম্রাজ্যের সন্ধিক্ষেত্রে পরিণত হইয়া এক মহাযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। সে যুগের পর্য্যটক, তীর্থযাত্রী ও বণিগবর্গ নিয়ত একদেশ হইতে অন্যদেশে গমনাগমন করিয়া সকল দেশের জ্ঞানগৌরবের সমন্বয়সাধনের সহায়তা করিয়াছিলেন।*

সভ্যতাবিকাশের প্রথমাবস্থায় এশিয়ার অধিবাসিবর্গ যে জ্ঞান লইয়া দেশবিদেশে উপনিবেশ-সংস্থাপনে ধাবিত হইয়াছিল, তাহা কালে দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারসময়ে আবার তাহার সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তজ্জন্য এশিয়াখণ্ডে যে জ্ঞানসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা এশিয়ার সাধারণ সাম্রাজ্য; তাহাতে সকল দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা একক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ তাহার মূল বলিয়া, তাহা ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য নামে অভিহিত। এই সাম্রাজ্যবিস্তারে ভারতবর্ষ শিক্ষাদানে নিযুক্ত হইয়া ভিন্নদেশ হইতে নানা তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে, একদিকে মুক্তহস্তে বিতরণ, অন্যদিকে অকুতোভয়ে গ্রহণ করিয়া, জ্ঞানের আদান প্রদানের সনাতন নিয়ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আধুনিক সভ্যসমাজ অসভ্য সমাজকে শিক্ষা দিবার সময়ে তাহাদের সংস্রবে আসিয়া নানা তত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন, তদ্দ্বারা ইউরোপীয় জ্ঞান পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পুরাকালে ভারতবর্ষের জ্ঞানও এইরূপে সমগ্র এশিয়ার জ্ঞানগৌরবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা দান করিয়াছি, গ্রহণ করি নাই,—ইতিহাস এরূপ আত্মশ্লাঘার পক্ষসমর্থন করিতে অসমর্থ।

বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় শ্রমণগণকে বিদেশের ভাষা শিক্ষা করিতে হইত; ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। চীনদেশের ভাষায় বৌদ্ধসাহিত্য অনূদিত হইবার সময়ে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতবর্গের অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত হইবার কথা অদ্যাপি চীনদেশে প্রচলিত আছে। মুসলমান খলিফাগণ যখন আরবীয়ভাষায় সাহিত্যসঙ্কলন করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষীয় বহু পণ্ডিতও অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত হন, এ কথা আরবীয় সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে-চীনে, শ্যামে-সিংহলে,—এশিয়াখণ্ডের নানা স্থানে —ভারতবর্ষের লোক বাসস্থান লাভ করিয়া, তদ্দেশের ভাষা ও সাহিত্য গঠনের সহায়তা করিয়াছিলেন, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কাকাসু ও কাকুরা চীনদেশসম্বন্ধে ইহার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণের অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন,- এক সময়ে লইয়াঙ্গনগরে তিনসহস্র ভারতবর্ষীয় শ্রমণ ও দশসহস্র ভারতবর্ষীয় পরিবারের বাস ছিল।

* We have here the clue to a great era, when North-Western India was a central point between two empires, and through a living world of communication, travellers, pilgrims, and traders carried the common culture back and forth.– *Ideals of the East.*

তাহারা চীনদেশের ধর্ম্ম ও শিল্পাদির উপর ভারতীয়ভাব দৃঢ়মুদ্রিত করিবার জন্যই চীনদেশে বাস করিত। তাহাদের প্রভাবে চীনদেশের ভাবব্যঞ্জক বর্ণমালার শব্দব্যঞ্জক সামর্থ্য কল্পিত হইয়া, কালক্রমে যাপানদেশের অভিনব বর্ণমালা গঠিত হয়।'*

এশিয়ার যে সকল জনপদে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্য প্রচলিত হইয়াছিল, তদ্দেশের লোকে যে ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া মূলগ্রন্থ পাঠে, ব্যাখ্যায় ও অনুবাদে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা স্বাভাবিক কথা। হিয়ঙ্গের এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার কথা সভ্যসমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। হিয়ঙ্গের ন্যায় শত শত লোকে নানা দেশে এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষের জ্ঞান, কখন ভারতবর্ষের মূলগ্রন্থের ভিতর দিয়া, কখন বা ভাষান্তরিত হইয়া, নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ভাব যে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানেই নানা দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় মানবসমাজকে সমুন্নত করিয়াছে। কলহ-কোলাহল পশুধর্ম্ম; শান্তি ও সদ্ভাববর্দ্ধনই প্রকৃত মানবধর্ম্ম। ভারতবর্ষ মানবধর্ম্মপ্রচারে এশিয়ার কলহ-কোলাহল শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার প্রভাবে দেশে দেশে কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীতের সমুন্নতি সাধিত হইয়া সমগ্র এশিয়াখণ্ডে কিয়ৎকালের জন্য সভ্যতার সমুন্নতি সাধন করিয়াছিল। প্রাচ্যশিল্পাদর্শের ইতিহাসলেখক কাকাসু ওকাকুরা নানা প্রমাণের আলোচনা করিয়া, এশিয়ার এই জ্ঞানপ্রচারের চিত্রাঙ্কনে ভারতবর্ষের বিজয়ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য এই অভিনব গ্রন্থের সমুচিত সমালোচনায় অগ্রসর হয় নাই।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ যে সকল প্রমাণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অপ্রচুর হইলেও, তদ্দ্বারা ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনদেশ হইতে বিদ্যাশিক্ষা বা তীর্থদর্শনের জন্য যাহারা নানা ক্লেশে ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যত লোকে এই ভাবে ভারতভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতবর্ষের জ্ঞানবিস্তারে পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যানির্ণয় করা অসম্ভব। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই চীনদেশের লোকের ভারতভ্রমণের চেষ্টায় বহির্গত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈৎসিং-নামক সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতভ্রমণগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে ইহার উল্লেখ

* There were at one time in Loyang itself, to impress their national religion and art on Chinese soil, more than three thousand Indian Monks and ten thousand Indian families; their great influence may be judged from their having given phonetic values to the Chinese ideographs, a movement which, in the eighth century, resulted in the creation of the present Japanese alphabet.—*Ideals of the East.*

সমন্বয় সাধন করে। কাকাসু ও কাকুরা এই কথা বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছেন,—ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল দুইটি প্রবল সাম্রাজ্যের সন্ধিক্ষেত্রে পরিণত হইয়া এক মহাযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। সে যুগের পর্য্যটক, তীর্থযাত্রী ও বণিগ্‌বর্গ নিয়ত একদেশ হইতে অন্যদেশে গমনাগমন করিয়া সকল দেশের জ্ঞানগৌরবের সমন্বয়সাধনের সহায়তা করিয়াছিলেন।*

সভ্যতাবিকাশের প্রথমাবস্থায় এশিয়ার অধিবাসিবর্গ যে জ্ঞান লইয়া দেশবিদেশে উপনিবেশ-সংস্থাপনে ধাবিত হইয়াছিল, তাহা কালে দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারসময়ে আবার তাহার সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তজ্জন্য এশিয়াখণ্ডে যে জ্ঞানসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা এশিয়ার সাধারণ সাম্রাজ্য; তাহাতে সকল দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা একক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ তাহার মূল বলিয়া, তাহা ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য নামে অভিহিত। এই সাম্রাজ্যবিস্তারে ভারতবর্ষ শিক্ষাদানে নিযুক্ত হইয়া ভিন্নদেশ হইতে নানা তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে,—একদিকে মুক্তহস্তে বিতরণ, অন্যদিকে অকুতোভয়ে গ্রহণ করিয়া, জ্ঞানের আদান প্রদানের সনাতন নিয়ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আধুনিক সভ্যসমাজ অসভ্য সমাজকে শিক্ষা দিবার সময়ে তাহাদের সংস্রবে আসিয়া নানা তত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন, তদ্দ্বারা ইউরোপীয় জ্ঞান পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পুরাকালে ভারতবর্ষের জ্ঞানও এইরূপে সমগ্র এশিয়ার জ্ঞানগৌরবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা দান করিয়াছি, গ্রহণ করি নাই,—ইতিহাস এরূপ আত্মশ্লাঘার পক্ষসমর্থন করিতে অসমর্থ।

বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় শ্রমণগণকে বিদেশের ভাষা শিক্ষা করিতে হইত; ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। চীনদেশের ভাষায় বৌদ্ধসাহিত্য অনূদিত হইবার সময়ে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতবর্গের অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত হইবার কথা অদ্যাপি চীনদেশে প্রচলিত আছে। মুসলমান খলিফাগণ যখন আরবীয়ভাষায় সাহিত্যসঙ্কলন করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষীয় বহু পণ্ডিতও অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত হন, এ কথা আরবীয় সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে-চীনে, শ্যামে-সিংহলে,—এশিয়াখণ্ডের নানা স্থানে—ভারতবর্ষের লোক বাসস্থান লাভ করিয়া, তদ্দেশের ভাষা ও সাহিত্য গঠনের সহায়তা করিয়াছিলেন, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কাকাসু ও কাকুরা চীনদেশসম্বন্ধে ইহার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণের অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন,- এক সময়ে লইয়াঙ্গনগরে তিনসহস্র ভারতবর্ষীয় শ্রমণ ও দশসহস্র ভারতবর্ষীয় পরিবারের বাস ছিল।

* We have here the clue to a great era, when North-Western India was a central point between two empires, and through a living world of communication, travellers, pilgrims, and traders carried the common culture back and forth.— *Ideals of the East.*

তাহারা চীনদেশের ধর্ম্ম ও শিল্পাদির উপর ভারতীয়ভাব দৃঢ়মুদ্রিত করিবার জন্যই চীনদেশে বাস করিত। তাহাদের প্রভাবে চীনদেশের ভাবব্যঞ্জক বর্ণমালায় শব্দব্যঞ্জক সামর্থ্য কল্পিত হইয়া, কালক্রমে যাপানদেশের অভিনব বর্ণমালা গঠিত হয়।'*

এশিয়ার যে সকল জনপদে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্য প্রচলিত হইয়াছিল, তদ্দেশের লোকে যে ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া মূলগ্রন্থ পাঠে, ব্যাখ্যায় ও অনুবাদে প্রবৃত্ত হইবে, ইহাও স্বাভাবিক কথা। হিয়াঙ্গের এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার কথা সভ্যসমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। হিয়াঙ্গের ন্যায় শত শত লোকে নানা দেশে এই কার্য্যে নিযুক্ত হইযাছিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষের জ্ঞান, কখন ভারতবর্ষের মূল গ্রন্থের ভিতর দিয়া, কখন বা ভাষান্তরিত হইয়া, নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ভাব যে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানেই নানা দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় মানবসমাজকে সমুন্নত করিয়াছে। কলহ-কোলাহল পশুধর্ম্ম; শান্তি ও সদ্ভাববন্ধনই প্রকৃত মানবধর্ম্ম। ভারতবর্ষ মানবধর্ম্মপ্রচারে এশিয়ার কলহ-কোলাহল শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার প্রভাবে দেশে দেশে কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীতের সমুন্নতি সাধিত হইয়া সমগ্র এশিয়াখণ্ডে কিয়ৎকালের জন্য সভ্যতার সমুন্নতি সাধন করিয়াছিল। প্রাচ্য-শিল্পাদর্শের ইতিহাসলেখক কাকাসু ও কাকুরা নানা প্রমাণের আলোচনা করিয়া, এশিয়ার এই জ্ঞানগৌরবের চিত্রাঙ্কনে ভারতবর্ষের বিজয়ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য এই অভিনব গ্রন্থের সমুচিত সমালোচনায় অগ্রসর হয় নাই।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ যে সকল প্রমাণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অপ্রচুর হইলেও, তদ্দারা ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনদেশ হইতে বিদ্যাশিক্ষা বা তীর্থদর্শনের জন্য যাহারা নানা ক্লেশে ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কত লোকে এই ভাবে ভারতভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতবর্ষের জ্ঞানবিস্তারে পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যানির্ণয় করা অসম্ভব। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই চীনদেশের লোকের ভারত-ভ্রমণের চেষ্টায় বহির্গত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈৎসিং-নামক সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতভ্রমণ-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে ইহার উল্লেখ

* There were at one time in Loyang itself, to impress their national religion and art on Chinese soil, more than three thousand Indian Monks and ten thousand Indian families; their great influence may be judged from their having given phonetic values to the Chinese ideographs, a movement which, in the eighth century, resulted in the creation of the present Japanese alphabet—*Ideals of the East.*

করিয়া গিয়াছেন। * সে সময়ে যাহারা চীনদেশ হইতে বুদ্ধগয়ায় উপনীত হইয়াছিল, তাহাদের জন্য শ্রীগুপ্তনামধেয় নরপতি একটি স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন ;—ঈৎসিং তাহার ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে মধ্য-এশিয়ায় খোটাননগরের বৌদ্ধবিদ্যালয়ে চীনদেশের চু-সিহিঙ্গ-নামক তীর্থযাত্রীর উপনীত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর ফা-লিঙ্গ-নামক তীর্থযাত্রী মধ্য-ভারতে উপনীত হন। বুদ্ধগয়ার নিকট চীনদেশের ভাষায় খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়া, ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। দুইখানি খোদিতলিপিতে চি-আই এবং হো-য়ুন নামক চীনদেশের তীর্থযাত্রীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; এবং চি-আই যে বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। † এই সকল তীর্থযাত্রীর ভারতভ্রমণকাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; তাহাদের লিখিত গ্রন্থাদি চীনদেশে বর্ত্তমান আছে কি না, এ পর্য্যন্ত তাহাও নির্ণীত হয় নাই। ফা-হিয়ান্ ও হিয়ঙ্গ-থ্সাঙ্গের লিখিত ভারতভ্রমণকাহিনী ঘটনাক্রমে পাশ্চাত্য সভ্যজাতির হস্তগত ও অনুবাদিত হইয়া, ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। অদ্যাপি তাহার উপরে নির্ভর করিয়াই নানা বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা প্রচলিত রহিয়াছে। এই সকল ভারতবিবরণী পাঠে জানা যায়,—মধ্য-এশিয়ার নানা স্থানে ভারতবর্ষের সাহিত্য ও বর্ণমালাও প্রচলিত হইয়াছিল। §

চীনদেশে গমনাগমন করিবার সহজ পথ আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল। স্থলপথে গোবি-মরুভূমি অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করা নিরতিশয় আশঙ্কাজনক হইলেও, সে পথে বহুলোকে বিচরণ করিত ; জলপথে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের বহু বাধা অতিক্রম করিয়া চীনদেশে গমনাগমন করা কষ্টসাধ্য হইলেও, লোকে তাহা হইতে বিরত হইত না। তিব্বতের তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া গমনাগমনের পথ আবিষ্কৃত হইলে, দূরত্বের হ্রাস হইলেও, গমনাগমনের ক্লেশ বা আশঙ্কার হ্রাস হইতে পারিল না। তথাপি লোকে এই সকল পথের

* We are told by I-tsing who lived about 670 A.D. that 500 years before his time 20 men, or about that number had found their way to the *Mahabodhi* tree in India, and for them and their fellow countrymen a Maharaja called Srigupta built a temple. The establishment was called the "Tchina temple". In I-tsing's days it was in ruins......... Buddhistic Records of the Western World, Introduction.

† J. R. A. S. (New Series) Vol. XIII. 552—572.

§ The customs and spoken language are like those of the people of Khotan, but the written character in use is that of the Brahmans.—Buddhistic Recoreds of the Western World, Vol. I,

আবিষ্কারে ও ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কেবল কৌতূহলচরিতার্থতা ইহার ফল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইহার প্রভাব চীনদেশের সমগ্র শিক্ষাদীক্ষার উপর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই শিক্ষা চীন হইতে কোরিয়া এবং কোরিয়া হইতে যাপানদ্বীপপুঞ্জে ব্যাপ্ত হইবার সময়ে, সে সকল দূরদেশেও ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়া, এশিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে ভারতবর্ষের প্রভাববিস্তার করে। যাপানে তাহার নিদর্শন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই।

যাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, সে দেশের প্রবল পুরুষদিগের মধ্যে কনফুশসের শিক্ষার প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎপূর্ব্বে যাপানের ধর্ম্ম পিতৃলোকপূজার সরল ও স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে দীর্ঘকাল শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের উপর প্রভাববিস্তার করিয়াছিল। সাগরবেষ্টিত যাপানদ্বীপপুঞ্জ এশিয়ার বিস্তৃত জনপদ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া, নানা বিষয়ে এশিয়ার অনুগামী হইয়াও, অনেক বিষয়ে স্বাধীনচিন্তার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিয়াছে। তজ্জন্য যাপানসাম্রাজ্য আদিকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, নীতি ও লোকশিক্ষার কোন প্রথাই একেবারে লুপ্ত হইবার অবসর প্রদান করে নাই। সে দেশে আদিযুগের পিতৃলোকপূজা, পরবর্ত্তী কনফুশস্ ও শাক্যসিংহের শিক্ষা অদ্যাপি তুল্যভাবে সমাদর লাভ করিতেছে। যাপানবাসীর স্বাধীনচিন্তাপ্রিয় সরল স্বভাব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নানা উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়া, কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে, বিবিধ সৌন্দর্য্যের বিকাশসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যাপানবাসীর প্রতিভা যে পথে ধাবিত হইত, উত্তরকালে তাহার গতি ভারতবর্ষীয়-ভাবানুরক্ত হইয়া, অভিনব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উপায় উদ্ভাবনে ধাবিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম চীন ও কোরিয়ারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, যাপানদ্বীপপুঞ্জে সহসা প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে যাপানের শাসনপ্রণালী পৃথক্ ছিল। মহারাণী জিঙ্গো যাপানের প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, কোরিয়ারাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর বংশ "সোগাবংশ" নামে পরিচিত। এই বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই মহারাণী জিঙ্গোর সময় হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যাপানের শাসনকার্য্যে আধিপত্য করিতেন। "সোগাবংশীয়" মন্ত্রিবর্গ শাসনকার্য্যে সর্ব্বময় কর্তৃত্ব পরিচালনা করিলেও, "মনোনোববংশীয়গণ" সেনাবিভাগের কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতেন। "নাকোচোমীবংশীয়গণ" নৌসেনার অধিপতি থাকিয়া "মনোনোববংশের" দলভুক্ত ছিলেন। "সোগাবংশীয়গণ" উন্নতিশীল, উদারস্বভাব ও জ্ঞানলিপ্সু বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত। "মনোনোববংশীয়গণ" স্থিতিশীল, সংস্কারবিরোধী, স্বদেশজাত-সর্ব্বপ্রকার-পুরাতন-সংস্কাররক্ষার্থ নিয়ত বদ্ধপরিকর। এই উভয় দলে প্রাধান্যলাভের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, এক সময়ে নানা বিপ্লবে সমগ্র দেশ বিপর্য্যস্ত করিয়া নরহত্যা ও রাজহত্যায় যাপানের ইতিহাস কলঙ্কিত করেন। সেই সময়ে কোরিয়া হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি যাপান দেশে প্রেরিত হয়। যাপানসম্রাট্ তখন

উভয় দলের মনোমালিন্যে বিপর্য্যস্ত ; স্বাধীনভাবে কোন কার্য্যে অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। তিনি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে মতজিজ্ঞাসু হইলে, উভয় দলে মতভেদ উপস্থিত হইল।

সম্রাট্ স্বয়ং বুদ্ধমূর্ত্তির সমাদর করিবার জন্য উৎসুক হইয়াও, "মনোনোব" ও "নাকোচোমীবংশীয়" রাজপুরুষগণের প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতে বাধ্য হইলেন। "সোগাবংশীয়" মন্ত্রী আপন উদ্যানবাটীতে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, শাক্যসিংহের সম্মানরক্ষা করিলেন। পরবৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ ও মারাভয় উপস্থিত হইবামাত্র, অজ্ঞানান্ধ জনসাধারণ বুদ্ধমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাকে তাহার কারণ মনে করিয়া, বলপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি হ্রদের জলে বিসর্জ্জন দিল। কিন্তু চীন ও কোরিয়া হইতে যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি ক্রমে যাপান দ্বীপে বাস করিবার জন্য উপনীত হইতে লাগিলেন, তাহাদের সঙ্গে বুদ্ধমূর্ত্তি পুনঃপুন আনীত হইতে লাগিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজকুমার উমায়াদো বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরক্ত এবং নাগার্জ্জুনের মতানুসরণ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষ্যরচনায় নিযুক্ত হইয়া, যাপানদ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে "অভিধর্ম্ম মোক্ষশাস্ত্র" নামক গ্রন্থ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এই গ্রন্থ চীন, যাপান প্রভৃতি বহু দূরদেশের ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তজ্জন্য এই গ্রন্থের রচয়িতা বসুবন্ধুর নাম বসুন্ধরায় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি গান্ধারদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার বাসস্থান উত্তরকালে পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল ; তীর্থযাত্রিগণ তথায় উপনীত হইয়া বসুবন্ধুর স্মৃতিসমাদর রক্ষা করিতেন। স্থাননির্দ্দেশের জন্য একখানি ফলকলিপিও রক্ষিত হইয়াছিল। হিয়ঙ্গ-থ্সাঙ্গ তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বসুবন্ধু একজন বোধিসত্ত্বরূপে বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত। এই পর্য্যন্ত সকল দেশের বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। কিন্তু বসুবন্ধুসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ে নানা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে তিনি বিংশ বা একবিংশ মহাস্থবির বা বৌদ্ধধর্ম্মনেতা। মোক্ষমূলর বলেন, —বসুবন্ধু খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা সত্য হইলে, চীনদেশের বৌদ্ধগ্রন্থের অনেক উক্তি নিতান্ত অলীক হইয়া পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে মোক্ষমূলরের অনুমান অপেক্ষা চীনদেশের বৌদ্ধসাহিত্যের উক্তি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। কাকাসু ও কাকুরা বলেন, বসুবন্ধুর প্রভাব যাপান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, বসুবন্ধুর শিষ্য মিত্রসেনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, হিয়ঙ্গ-থ্সাঙ্গ চীনদেশে প্রত্যাগমন করিলে, তদ্দেশে ধর্ম্মসংস্কারের সূত্রপাত হইয়া "হোস্সো"নামক অভিনব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। হিয়ঙ্গ-থ্সাঙ্গের নিকট জ্ঞানশিক্ষার জন্য যাপান হইতেও ছাত্রগণ অধ্যয়নার্থ উপনীত হইতেন। যাপানী শিষ্যগণের মধ্যে দোশো-নামক শ্রমণ হিয়ঙ্গের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, ৬৭৭ খৃষ্টাব্দে

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং কোরিয়া হইতে যাপানদ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও, কালে ভারতবর্ষের বসুবন্ধুর শিক্ষাই সে রাজ্যে ধর্ম্মসংস্কারসাধনের সূত্রপাত করিয়াছিল। তজ্জন্য কাকাসু ও কাকুরা ভারতবর্ষকে "ভাবের মাতৃভূমি" বলিয়া শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—অতীতের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, যাপান পুনরায় ভারতবর্ষের দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট হইতেছে।*

প্রার্থনা।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকলেই জানেন একটা গল্প আছে—দেবতা একজনকে তিনটে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এত-বড় সুযোগটাতে হতভাগ্য কি যে চাহিবে, ভাবিয়া বিহ্বল হইল—শেষকালে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে যে তিনটে প্রার্থনা জানাইল, তাহা এম্‌নি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার পরে চিরজীবন অনুতাপ করিয়া তাহার দিন কাটিল।

এই গল্পের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা মনে করি, পৃথিবীতে আর কিছু জানি বা না জানি, ইচ্ছাটাই বুঝি আমাদের কাছে সব চেয়ে জাজ্বল্যমান আমি সব চেয়ে কি চাই, তাহাই বুঝি সব চেয়ে আমার কাছে সুস্পষ্ট —কিন্তু সেটা ভ্রম। আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।

অগোচরে থাকিবার একটা কারণ আছে—সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। যে বিরাট্ ইচ্ছা সমস্ত মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে উদ্যোগী, সেই ইচ্ছাই আমার অন্তরে থাকিয়া কাজ করিতেছে। ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ইচ্ছা লুকাইয়া কাজ করে,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আপনাকে সর্ব্বাংশে তাহার অনুকূল করিয়া তুলিতে না পারি। তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরা লাভ করি নাই বলিয়াই সে আমাদিগকে ধরা দেয় না।

আমার সব চেয়ে সত্য ইচ্ছা, নিত্য ইচ্ছা কোন্‌টা? যে ইচ্ছা আমার সার্থকতাসাধনে নিরত। আমার সার্থকতা আমার কাছে যতদিন পর্য্যন্ত রহস্য, সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরিবে, আমার নাম হইবে, তাহা বলা শক্ত নয় কিন্তু কিসে আমি সম্পূর্ণ হইব, তাহা পৃথিবীতে কয়জন লোক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? আমি কি, আমার মধ্যে যে

* And now, in spite of the separation of ages, Japan is drawn closer to the motherland of thought.—*Ideals of the East.*

একটা প্রকাশচেষ্টা চলিতেছে তাহার পরিণাম কি, তাহার গতি কোন্ দিকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কে জানে?

অতএব দেবতা যদি বর দিতে আসেন, তবে হঠাৎ দেখি, প্রার্থনা জানাইবার জন্যও প্রস্তুত নই। তখন এই কথা বলিতে হয়, আমার যথার্থ প্রার্থনা কি, তাহা জানিবার জন্য আমাকে সুদীর্ঘ সময় দাও। নহিলে উপস্থিতমত হঠাৎ একটা-কিছু চাহিতে গিয়া হয় ত ভয়ানক ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

বস্তুত আমরা সেই সময় লইয়াছি—আমাদের জীবনটা এই কাজেই আছে। আমরা কি প্রার্থনা করিব, তাহাই অহরহ পরখ করিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি ধন, পরদিন বলিতেছি মান—এম্‌নি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম মন্থন করিতেছি,—আলোড়ন করিতেছি। কিসের জন্য? আমি যথার্থ কি চাই, তাহারই সন্ধান পাইবার জন্য। মনে করিতেছি টাকা খুঁজিতেছি, বন্ধু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি, কিন্তু আসলে আর কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি, তাহাই নানাস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—আমার প্রার্থনা কি, তাহাই জানি না।

যাঁহারা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলেন,—শোনা গিয়াছে তাঁহারা কি বলেন। তাঁহারা বলেন, একটি মাত্র প্রার্থনা আছে, তাহা এই—

> অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
> মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
> আবীরাবীর্ম্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
> তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা কর।

কিন্তু কানে শুনিয়া কোনো ফল নাই এবং মুখে উচ্চারণ করিয়া যাওয়া আরো বৃথা। আমরা যখন সত্যকে, আলোককে, অমৃতকে যথার্থ চাহিব, সমস্ত জীবনে তাহার পরিচয় দিব, তখনি এ প্রার্থনা সার্থক হইবে। যে প্রার্থনা আমি নিজে মনের মধ্যে পাই নাই, তাহা পূর্ণ হইবার কোনো পথ আমার সম্মুখে নাই। অতএব, সবই শুনিলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণগোচর হইল—কিন্তু তবু এখনো প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে প্রার্থনাটিকে সমস্ত জীবন দিয়া খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্যাংশের মধ্যে সংহতভাবে, নিগূঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে—কিন্তু যতক্ষণ তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আকাশে, আলোকে মাথা না তুলিয়াছে, ততক্ষণ তাহা না থাকারই তুল্য হইয়া আছে। সত্যের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত, কিন্তু ততক্ষণ আমরা তাহাকে জানিই না, যতক্ষণ না সে আমাদের সমস্ত ধূলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া মুক্ত আকাশে পাতা মেলিতে পারে।

আমাদের এই যথার্থ প্রার্থনাটি কি, তাহা অনেকসময় অন্যের ভিতর দিয়া আমাদিকগকে জানিতে হয়। জগতেশ্বর মহাপুরুষেরা আমা

দিগকে নিজের অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাটিকে জানিবার সহায়তা করেন। আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি, আমরা বুঝি পেট ভরাইতেই চাই, আরাম করিতেই চাই—কিন্তু যখন দেখি, কেহ ধন-মান-আরামকে উপেক্ষা করিয়া সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, তখন হঠাৎ একরকম করিয়া বুঝিতে পারি যে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করিতেছে, তাহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমার ইচ্ছাকে যখন তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্যও জানিতে পারি—কিসের প্রতি আমার যথার্থ ভক্তি, কি আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা!

তখন আরো একটা কথা বোঝা যায়। ইহা বুঝিতে পারি যে, যে সমস্ত ইচ্ছা প্রতিক্ষণে আমার সুগোচর, যাহারা কেবলি আমাকে তাড়না করে, তাহারাই আমার অন্তরতম ইচ্ছাকে, আমার সার্থকতালাভের প্রার্থনাকে বাধা দিতেছে, স্ফূর্ত্তি দিতেছে না, তাহাকে কেবলি আমার চেতনার অন্তরালবর্ত্তী, আমার চেষ্টার বহির্গত করিয়া রাখিয়াছে।

আর, যাঁহার কথা বলিতেছি, তাঁহার পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। যে মঙ্গল-ইচ্ছা, যে সার্থকতার ইচ্ছা বিশ্বমানবের মজ্জাস্বরূপ, যাহা মানবসমাজের মধ্যে চিরদিনই অকথিত বাণীতে এই মন্ত্র গান করিতেছে—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়—এই ইচ্ছাই তাঁহার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, আর সমস্ত ইচ্ছা ছায়ার মত তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী, তাহার পদতলগত। তিনি জানেন—সত্য, আলোক, অমৃতই চাই, মানুষের ইহা না হইলেই নয়—অন্নবস্ত্রধনমানকে তিনি ক্ষণিক ও আংশিক আবশ্যক বলিয়াই জানেন। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছাশক্তি তাহার ভিতর দিয়া জগতে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, প্রমাণিত হয় বলিয়াই তিনি চিরকালের জন্য মানবের সামগ্রী হইয়া উঠেন। আর আমরা খাই-পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই—মানবের চিরন্তন সত্য ইচ্ছাকে আমাদের যে জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারি না, মানবসমাজে সে জীবনের ক্ষণিক মূল্য ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আনিলে একটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। মনে হইতে পারে যে, ক্ষমতাসাধ্য, প্রতিভাসাধ্য কর্ম্মের দ্বারাতেই বুঝি মানুষ সত্য, আলোক ও অমৃতানুসন্ধানের পরিচয় দেয়।

তাহা কোনোমতেই নহে। তাহা যদি হইত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অমৃতের আশামাত্র করিতে পারিত না। যাহা সাধারণ বুদ্ধিবল-বাহুবলের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহাতেই প্রতিভা বা অসামান্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহা কেবল একান্তভাবে, যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম্ম। ইহা আর-কিছু নয়—যাহা কাছেই আছে, তাহাকেই পাওয়া।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, আমাদিগকে যাহা-কিছু দিবার, তাহা আমাদের প্রার্থনা-

বহুপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়া গেছে। আমাদের যথার্থ ঈপ্সিতধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল লইবার চেষ্টা—তাহাই যথার্থ প্রার্থনা।

ঈশ্বর এইখানেই আমাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই সব দিয়াছেন, অথচ এটুকু আমাদের বলিবার মুখ রাখিয়াছেন যে, আমরাই লইয়াছি। এই লওয়াটাই সফলতা, ইহাই লাভ,—পাওয়াটা সকল সময়ে লাভ নহে—তাহা অধিকাংশস্থলেই পাইয়াও না পাওয়া, এবং অবশিষ্টস্থলে বিষম একটা বোঝা। আর্থিক-পারমার্থিক সকল বিষয়েই এ কথা খাটে।

ঋষি বলিয়াছেন—আবিরাবীর্ম্ম এধি! হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।—তুমি ত স্বপ্রকাশ, আপনা-আপনি প্রকাশিত আছই, এখন, আমার কাছে প্রকাশিত হও, এই আমার প্রার্থনা। তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই, আমার পক্ষে সেই প্রকাশ উপলব্ধির সুযোগ বাকি আছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখিব, ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণপ্রকাশ হইলেও আমার কাছে দেখা দিবে না। সূর্য্য ত আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হইয়াই আছেন, এখন আমারি কেবল চোখ খুলিবার, জাগ্রত হইবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোখ খুলিবার ইচ্ছা হয়,—আমরা চোখ খুলি, তখন সূর্য্য আমাদিগকে নূতন করিয়া কিছু দেন না, তিনি যে আপনাকে আপনি দান করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতে পারি।

অতএব দেখা যাইতেছে—আমরা যে কি চাই, তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারাই প্রার্থনার আরম্ভ। যখন তাহা জানিতে পারিলাম, তখন সিদ্ধির আর বড় বিলম্ব থাকে না, তখন দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। তখন বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত মানবের নিত্য আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে—এই সুমহৎ-আকাঙ্ক্ষাই আপনার মধ্যে আপনার সফলতা অতি সুন্দরভাবে, অতি সহজভাবে বহন করিয়া আনে।

আমাদের ছোট-বড় সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড় ইচ্ছা, এই মর্ম্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদিগকে খর্ব্ব করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

এ যে কেবল আমাদের খাওয়া-পরা, আমাদের ধন-মান-অর্জ্জন সম্বন্ধেই খাটে, তাহা নহে—আমাদের বড় বড় চেষ্টাসম্বন্ধে আরো বেশি করিয়াই খাটে!

যেমন দেশহিতৈষা। এ প্রবৃত্তি যদিও আমাদিগকে আত্মত্যাগ ও দুষ্কর তপঃসাধনের দিকে লইয়া যায়, তবু ইহা মানবত্বের গুরুতর-অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। ইহার প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই, আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিরা ইহাকেই তাহাদের চরম লক্ষ্য, পরম ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে, আলোককে, অমৃতকে য়ুরোপের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতেছে। য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে, সার্ব-

কতালাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপ কেবলি মাটি চাহিতেছে, সোনা চাহিতেছে, প্রভুত্ব চাহিতেছে—এমন লোলুপভাবে, এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে,—সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা, তাহা য়ুরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ—পথ নহে,—ইহাই মৃত্যু।

আমাদের সম্মুখে, আমাদের অত্যন্ত নিকটে য়ুরোপের এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে প্রতিদিন মোহাভিভূত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই কথাই কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য-আলোক-অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী—বিষয়ানুরাগই হৌক আর দেশানুরাগই হৌক, আপনার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ে যেখানেই এই সত্য, আলোক ও অমৃতকে অতিক্রম করিতে চাহে, সেখানেই তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতে হইবে—"বিনিপাত"! বলা কঠিন, প্রলোভন প্রবল, ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য, তবু ভারতবর্ষ এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

ত্যাগস্বীকার ও তপশ্চরণই যে মহৎ লক্ষ্যের প্রমাণ, তাহা নহে। কৃপণের মত ত্যাগস্বীকার ও তপস্যা কাহার আছে? কিন্তু তাহাতে কেবল টাকাই সঞ্চিত হয়—মনুষ্যত্ব নহে, সার্থকতা নহে। ইংলণ্ড এক-কালে আর্ত্তজাতির সহায় ছিল, দাসত্বের বিরোধী ছিল, তখন তাহার ঐশ্বর্য্য আজিকার ন্যায় এত অধিক ছিল না—আজ সেই ইংলণ্ড চীনকে আফিম গেলাইতেছে, ভারতবর্ষকে মদ ধরাইতেছে, নিরস্ত্র তিব্বতের নিষ্কলঙ্ক তুষারমণ্ডপ নিরীহমানবরক্তে কলঙ্কিত করিতেছে—ইংলণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য্য এই অধঃপতন হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল কি? ঐশ্বর্য্যনাশই কি একমাত্র পতন, অনিষ্ট ঘটাইবার ক্ষমতাই কি একমাত্র ক্ষমতা? আমরাও কি এই কথাই বলিব?

জর্ম্মণি যখন জ্ঞানীদের তপোভূমি হইয়া উঠিয়াছিল, যখন হর্ডর্, লেসিঙ্, গেটে, শিলর্, কাণ্ট্, হেগেলের অভ্যুদয়ে সমস্ত দেশ আলোকিত হইয়াছিল, তখন দরিদ্র জর্ম্মণির এত প্রতাপ ছিল না, তখন তাহার পোলিটিকাল্ অবস্থা হীন ছিল, সেই জর্ম্মণি আজ তপস্যার আসনে সম্রাটের মহার্ঘ সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে, ছুরিছোরায় আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে—আজ তাহার জ্যোতিষ্কলোক ম্লান, তাহার তপস্যা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত, তাহার ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী, আজ সে নির্ম্মম;—অল্পদিন হইল, সে চীনে যে বীভৎস আচরণ করিয়াছে, তাহাতে তৈমুর-জঙ্গিসের বিপুল অপযশ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে—আমরাও কি ইহাকে উন্নতি বলিব? বিস্তারই কি উন্নতি, মেদবৃদ্ধিই কি মানুষের সার্থকতা?

য়ুরোপ ভুলিতেছে মানুষের যথার্থ প্রার্থনা কি—আমরা য়ুরোপের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়াছি, আমরাও যেন না ভুলি!—মাতালের দারস্থ যে অনুচর দুঃখভোগ করিতেছে, সে যেন

অন্তত এ কথাটা স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, মত্ততার অবাধ স্বাধীনতাই জীবনের শ্রেয় নহে। যে দরিদ্র হতভাগ্য, ধনী মাতালের পাশে দাঁড়াইয়া, তাহার মদের বোতলটাকেই লোভ করিতে শিখিতেছে, ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করুন্!

বেদান্তের প্রথম কথা।

বেদান্ত শুদ্ধ যে একটা দার্শনিক বাদানুবাদ, তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতি বেদান্তের দ্বারা পরিচালিত। হিন্দুর যোগ-ভক্তি-কর্ম্ম, হিন্দুর সাধন-ভজন-ধর্ম্ম, হিন্দুর রাজনীতি, সমাজনীতি, চতুরাশ্রম ও চতুর্বর্ণবিধি—সমস্তই বেদান্তপ্রতিপাদিত শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানের উপরে সংস্থাপিত। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট হইয়াছে। সম্পদে-বিপদে প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবে অদ্বৈতমুখীন-নিষ্কামধর্ম্ম-পালনে হিন্দুত্ব মরণকে অতিক্রম করিয়াছে। কত-না সভ্যজাতি কালগর্ভে বিলীন হইল, কিন্তু হিন্দু অমর- কেন না, বেদান্তরস তাহার অস্থিমজ্জাকে সততই স্নিগ্ধ করিতেছে। হিন্দুর দর্শনে ও ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও বিধিব্যবস্থায় বেদান্ত কিরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, তাহার সম্যক্ বোধ আবশ্যক। বেদান্তবিজ্ঞানের এই ধারাবাহিক ব্যবহারসঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম না হইলে কোন ফল হয় না—কেবল বাগ্বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় মাত্র। আমি এই প্রবন্ধে বেদান্তের মূলকথা স্থূলত ব্যাখ্যা করিব। এই ব্যাখ্যা পরে যাহাতে ব্যবহারোপযোগী হয়, সেই দিকে আমার লক্ষ্য রহিল।

বেদান্তবিজ্ঞানের আরম্ভ অজ্ঞানে ও পর্য্যবসান জ্ঞানে।

নৈয়ায়িকেরা অজ্ঞানকে অভাবাত্মক (negative) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত একটি ঘোর প্রমাদ। অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী। কিন্তু জ্ঞান ভাবপদার্থ (positive)। আত্যন্তিক অভাব কি কখন ভাবের বিরোধী হইতে পারে। যাহা একান্তই নাই, তাহা আবার কি করিয়া বিরোধ ঘটাইবে। বৈদান্তিকেরা অজ্ঞানকে অভাবাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন না। সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারগ্রন্থে অজ্ঞানকে—"জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপম্"—বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অজ্ঞান আংশিক-জ্ঞানরূপেই দৃষ্ট হয়। যখন কেহ বলে, 'আমি অজ্ঞান, আমি জানি না', তখন সে তাহার আংশিক জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। 'কিঞ্চিৎ জানি, কিঞ্চিৎ জানি না'—ইহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে গেলে, 'আমি অজ্ঞান'—এইরূপ বলিতে হয়। মৃত ব্যক্তিকে অজ্ঞান বলা যায় না, কিন্তু মূর্চ্ছিত ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়াছে—এইরূপ বলা হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, মূর্চ্ছাকালে জ্ঞান

একান্ত নষ্ট হয় না, কিন্তু সুপ্তভাবে সূক্ষ্মাকারে থাকে। অজ্ঞান জ্ঞানের আত্যন্তিক অভাব নহে। উহা বস্তুসম্বন্ধে আংশিক জ্ঞান উৎপন্ন করে। পরে দর্শিত হইবে যে, আংশিক জ্ঞান বিপরীতবুদ্ধি বা ভ্রম উৎপন্ন করে। তজ্জন্যই আংশিক জ্ঞান অজ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞানের বিরোধী।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিরোধকে একত্বে পর্য্যবসিত করা। তজ্জন্য বিরোধকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র সূচিত হয়। বিরুদ্ধধর্ম্মীর বিরোধের অপবাদ করিয়া অভেদভাবের প্রতিষ্ঠাকে অপবাদন্যায় (dialectic) বলে। এই অপবাদরীতি অবলম্বনে বেদান্তবিজ্ঞান ভেদবহুলতাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর একতায় লইয়া যায়—অবশেষে ভূমার অনন্ত অধিকারে সমস্ত দ্বৈতবিরোধের তিরোধান নিষ্পন্ন করে।

পাশ্চাত্য নবীন ন্যায়ের আরম্ভ সদসদ্বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সৎ (being) অসত্তের (non-beingএর) বিরোধী—এই সিদ্ধান্তটি উহার মূলে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই সদসত্তের বিরোধ কাল্পনিক। প্রথমত সৎ কিংস্বরূপ, তাহা আমার জানা প্রয়োজন। আমার জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া যদি অস্তিকে ধরিতে যাই, তাহা হইলে শূন্যে লম্ফপ্রদান করা হয়। দ্বিতীয়ত অসৎ—যাহা :সম্পূর্ণ অভাবময়—ন্যায়ের তর্কজালবিস্তারের একটা কাল্পনিক উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। এপ্রকার শূন্যতা বিরোধ তুলিতে পারে না। তজ্জন্য জ্ঞানবিরোধী [illegible] অজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞান (exper[illegible]e) অদ্বৈতসিদ্ধির উপযোগী নয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞান আংশিক জ্ঞানরূপে দৃষ্ট হয়। আবার আংশিক জ্ঞান বিপরীতবুদ্ধি উৎপন্ন করে। "অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ" —যে বস্তু যাহা নয়, উহাকে তাহাই মনে করা বিপরীতবুদ্ধি। ইহার অপর সংজ্ঞা ভ্রম বা অধ্যাস। আমাদের সমস্ত ধারণা এই ভ্রমাত্মক-অধ্যাস-রচিত। তবে আমি যে লেখনীর দ্বারা লিখিতেছি, তাহা লেখনী নহে, কিন্তু সর্প—এতদ্রূপ ভ্রম নহে। জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে কখন প্রবঞ্চিত করে না। অন্ধকারে রজ্জু সর্পবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। ইন্দ্রিয়গণ কি এস্থলে আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া ভ্রমে নিক্ষেপ করে? —কদাচ নহে। রজ্জুতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ পঞ্চবিষয়ই বর্ত্তমান। যদি আমি নেত্রত্বগাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা রজ্জুকে পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে রজ্জু রজ্জুরূপেই প্রতীত হইত, সর্পরূপে প্রকাশ পাইত না। অন্ধকারে চক্ষুর যতদূর কার্য্য করা সাধ্য, ততদূর করিয়াছে ;—অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না পাইয়া রজ্জুর সর্পসাদৃশ্যকে সর্পদৃশ্যে পরিণত করিয়াছে। যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্ণেয়, তাহাকে একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা। তবে যদি কেহ বলে যে, সকল ইন্দ্রিয়গুলি মিলিয়া প্রতারণা করিতে পারে, সে বলার কোন অর্থ নাই। নিখিল মানবকুল যদি প্রবঞ্চক হয়, তাহা হইলে বঞ্চনাকেই সাধুতা বলিতে হইবে। অধ্যাসের অর্থ ইহা নয় যে, যখন একটি অশ্ব দৃষ্ট হয়, সেটি অশ্ব নহে, কিন্তু গর্দ্দভ বা অন্য কোন জন্তু, অথবা তাহা বস্তুপরিনিষ্ঠিত নহে, কেবল কল্পনা। কোন

বস্তু আমার ইন্দ্রিয়গোচর হইলে জ্ঞানের প্রক্রিয়া বা বিষয়বিষয়ীর সামঞ্জস্যে কোন ত্রুটি বা প্রতারণা ঘটে না। কিন্তু যেক্ষণে আমি ঐ বস্তুকে কোন এক ব্যতিরিক্ত আত্মসঙ্গত পদার্থ বলিয়া ধারণা করি, তৎক্ষণেই আমার অধ্যাসভ্রম হয়। যাহা অসঙ্গত (contradictory), তাহাকে সঙ্গত (consistent) মনে করা—যাহা অনাত্ম ও অপ্রতিষ্ঠ, তাহাকে আত্মস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া ধারণা করা—যাহা প্রাতিভাসিক (appearance), তাহাকে পারমার্থিক (real) বিবেচনা করা—এতদ্রূপ বিপরীতবুদ্ধিকে অধ্যাস কহে। অন্ধকারে রজ্জু সর্পবৎ প্রতিভাত হয়। প্রতিভাত সর্পের নিজের কোন সঙ্গতি বা প্রতিষ্ঠা নাই। তথাপি রজ্জুর আত্মসঙ্গতি বা আত্মপ্রতিষ্ঠা অনাত্ম সর্পে আরোপিত হয়।

অন্ধের হস্তিদর্শনকথায় অধ্যাসের লক্ষণ অতি স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। একদা সাতজন অন্ধ হস্তিতত্ত্ব জানিতে উৎসুক হইয়াছিল। কোন বন্ধুকর্তৃক হস্তিসন্নিধানে নীত হইলে তাহাদের মধ্যে একজন হস্তীর কর্ণস্পর্শ করিয়া বলিল—"অহো, হস্তী সূর্পাকার।" দ্বিতীয় অপর একজন শুণ্ডস্পর্শ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"সূর্পাকার নহে, সর্পাকার।" তৃতীয় পাদস্পর্শ করিয়া সদর্পে ঘোষণা করিল—"সূর্পও নহে, সর্পও নহে, স্তম্ভ" —ইত্যাদি। অন্ধেরা তাহাদের ইন্দ্রিয়কর্তৃক প্রতারিত হয় নাই। তাহারা কর্ণাদি অবয়বসকলের যাহা পরিচয় পাইয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। তবে ভ্রম কি প্রকারে আসিল। আংশিক জ্ঞানই এই প্রমাদ ঘটাইয়াছে। অবয়বসকলের আত্মস্থিতি নাই, অবয়বী হস্তীরই তাহা আছে। সূর্পরূপ কর্ণ নিজেতেই স্থিত, আধারের অপেক্ষা করে না —এইরূপ ধারণাই ভ্রম। কর্ণেতে হস্তিত্ব-আরোপ, আর অনাত্মে আত্মত্ব-আরোপ, একই কথা। যদি অন্ধেরা দৃষ্টিশক্তি পাইত, তাহা হইলে দেখিত যে, তাহারা তাহাদের সূর্প বা সর্পের আকারপ্রকারগুণক্রিয়াদির সম্বন্ধে ভ্রান্ত হয় নাই, কিন্তু স্বরূপধারণায় তাহাদের অধ্যাসভ্রম হইয়াছে।

বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, আমাদের সমস্ত ধারণা (logical judgment) এই অধ্যাসরূপ-ভ্রমবিজড়িত। আমি সূর্য্য দেখিলাম, আর আমার ধারণা হইল যে, সূর্য্য স্বতন্ত্র,—স্বপ্রতিষ্ঠ,— আপনাতে আপনি থাকিতে পারে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা আমার অজ্ঞানকে সংশোধিত করিয়া বলিলেন যে, সূর্য্য স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু সৌরজগতের কেন্দ্র। যদ্রূপ গ্রহতারকাসকল তাহাদের স্থিতির জন্য সূর্য্যের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ সূর্য্যও স্বকীয় প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের অপেক্ষা করে। এই তত্ত্ব শিখিয়া ও জানিয়াও সূর্য্যের স্বাতন্ত্র্যের সংস্কার যায় না। জ্যোতিষকে অগ্রাহ্য করিয়া নির্ব্বিঘ্নে মনে করা যায় যে, সূর্য্য চিরদিন আকাশে একাকী সম্বন্ধনিরপেক্ষ হইয়া দোদুল্যমান থাকিতে পারে। বিজ্ঞানের দ্বারা সংস্কার যদি বিশেষরূপ পরিমার্জ্জিত হয়, তাহা হইলে সৌরজগৎকে ছাড়িয়া সূর্য্যের ধারণা না হইতে পারে, কিন্তু সৌরজগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা আরোপ না করিয়া সূর্য্যের ... পা হইবে না। অশিক্ষিত ব্যক্তি ... সূর্

আত্মত্ব আরোপ করে। শিক্ষিত ব্যক্তি সৌরজগতে আত্মস্থিতি আরোপ করিয়া সূর্য্যের ধারণা করে।

সকল ধারণার মূলে দেশ ও কাল বর্ত্তমান। দেশ ও কালের ন্যায় ভ্রমাত্মক আর কিছুই নাই। আমি একটি ত্রিভুজ মনে করিলাম। ত্রিভুজটিকে আত্মসঙ্গতি দিয়া কতই চিত্রবিচিত্র করিলাম। অবশেষে দেখিলাম যে, ত্রিভুজটির কোন আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই। উহা এক বৃহত্তর ত্রিভুজ বা বহুভুজের অংশরূপে গৃহীত না হইলে একেবারেই তিষ্ঠিতে পারে না। বৃহত্তর ত্রিভুজের দশাও সেইরূপ। কাহারও আত্মস্থিতি নাই। তবে প্রতিষ্ঠা কোথায়? গত্যন্তর না দেখিয়া আমরা এক স্বপ্রতিষ্ঠ আকাশ বা মহাদেশের কল্পনা করি ও সমস্ত আংশিক দেশ তাহারই অন্তর্গত করিয়া দেখি। এইরূপ অসঙ্গতির আশ্রয়গ্রহণ না করিলে আমরা কোনপ্রকার ধারণা করিতে অক্ষম। জানি যে, দেশই হউক আর মহাদেশই হউক, যাহা অংশী, তাহা নিজে একটি অংশ—স্বতন্ত্র বা স্বস্থ হইতে পারে না। ইহা জানিয়াশুনিয়া আমরা ভ্রমের পূজা করি, কেন না, আমরা নিরুপায়। আমাদের কালসম্বন্ধে ধারণাও এইরূপ ভ্রমমূলক। অধ্যাসমূলক সংস্কারের এত প্রবলতা যে, আমরা ইতরেতরাশ্রিত পদার্থসমূহকে বিচারের দ্বারা অনাত্ম ও অপ্রতিষ্ঠ জানিয়াও তাহাদিগকে আত্মস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া ব্যবহার করি। এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলাবিত বিশ্বে কোন বস্তু ব্যতিরিক্ত (individual) আত্মবস্তু নহে। আর অনাত্মার সমবায়ে আত্মস্থিতি গঠিত হইতে পারে না, তবে আমরা মহান্ অনবস্থাগর্ত্তে ডুবিয়া যাইবার ভয়ে অংশে পূর্ণতা আরোপ করিয়া ব্যবহারোপলক্ষ্যে বস্তুসকলের আত্মসঙ্গতি সৃষ্টি করি।

অজ্ঞানের কতক পরিচয় পাওয়া গেল। এখন জ্ঞানের পরিচয় আবশ্যক। জ্ঞানবস্তু পূর্ণ ও সর্ব্বময়। কিছুই জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না। যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে জ্ঞান আংশিক জ্ঞান হইয়া যাইবে। জ্ঞানবস্তুতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ে একাকার। জ্ঞান শুদ্ধ জানা নয়, কিন্তু জানাজানির ভূমানন্দ।

পাশ্চাত্য নবীন দার্শনিকেরা জ্ঞানসম্বন্ধে এক ঘোর প্রমাদে পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞেয় (object) ও জ্ঞাতার (subjectএর) মুখামুখি স্থিতি (opposition) হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ কথা সত্য। কিন্তু ইহা আংশিক জ্ঞান—পূর্ণজ্ঞান নহে। ঘটপটাদি অনাত্মবস্তু যতটা আত্মস্থ হয়, ততটা জ্ঞেয়; যতটা আত্মস্থ না হয়, ততটা অজ্ঞেয়। এইজন্য দ্বৈতজ্ঞান আংশিক জ্ঞান। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানে দ্বৈতের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানবস্তুতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মুখামুখি স্থিতি হইতে পারে না। যদি হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ব্যতিরিক্ততা ঘটিবে ও জ্ঞান আংশিক জ্ঞানে পরিণত হইবে। আংশিক জ্ঞান (experience) ও জ্ঞানের (knowledgeএর) ভেদ বুঝিতে না পারায় পাশ্চাত্যদেশে অদ্বৈতের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। একপ্রকার প্রতীচ্য অদ্বৈতবাদ আছে, তাহা জ্ঞানে দ্বৈত আশঙ্কা করে এবং আত্মা চিদানন্দের অতীত কোন অজ্ঞেয় বস্তু, এইরূপ সিদ্ধান্ত করে। জ্ঞানের শুদ্ধাদ্বৈতস্বরূপ না জানায়

এই প্রমাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র বেদান্তের ইহাই নিষ্পত্তি যে, চিদানন্দই চরমবস্তু। আচার্য্যদিগেরও এই সিদ্ধান্ত। গৌড়পাদ আচার্য্য জ্ঞানকে তুরীয় অবস্থা বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের ত কথাই নাই। সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারে ঐরূপ বলিয়াছেন। পঞ্চদশীকার বলেন যে, স্বয়ম্প্রভা সংবিৎই পরমাত্মা।

জ্ঞানাতীত বা জ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু থাকিতে পারে না। জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্বের পূর্ণ সমন্বয়ই জ্ঞান। জ্ঞান দ্বৈতভেদের (differentiationএর) অপেক্ষা রাখে না। তাহার অন্তরেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের আদান-প্রদান। জ্ঞান আত্মস্থিত, স্বপ্রতিষ্ঠ, আত্মসঙ্গত। জ্ঞান পূর্ণ, নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ, আত্মরত।

জ্ঞানবস্তুর অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আংশিক জ্ঞান অসম্ভব। আংশিক জ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ণতার দিকেই ধাবিত হয়। আমরা আমাদের সকল ধারণাতেই জ্ঞানময় আত্মত্বকে বরণ করি। অনাত্মে আত্মসঙ্গতি আরোপ না করিলে কোন পদার্থের বোধ হইতে পারে না। অংশের আরম্ভ পূর্ণত্বে ও শেষ পূর্ণত্বে। সর্ব্বময় জ্ঞান না থাকিলে অংশময় ভ্রম বা অধ্যাস কল্পনায় আসে না। দ্বৈতবিশিষ্ট আংশিক জ্ঞান অবশিষ্ট অদ্বৈতজ্ঞানকে অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করে।

এই বিশ্বসংসার জ্ঞানেরই রঙ্গভূমি—জানাজানির এক বৃহৎ আড়ম্বর। ঐ যে শিশু অর্দ্ধস্তিমিতলোচনে স্তন্যপান করিতেছে, আর জননীকে সুখস্পর্শে বিহ্বল করিতেছে—ঐ যে পেটুক পায়সসিক্ত স্রুক্তী লেহন করিতেছে—ঐ যে বিলাসী স্রক্‌চন্দনাদি-সম্ভোগ-লালসায় আকুল হইয়াছে— ঐ যে কঙ্কালসার সমাধিমগ্ন যোগী ভূমানন্দে আত্মহারা হইতে প্রয়াস করিতেছে—এই সমস্ত ব্যাপার জ্ঞানসাগরের তরঙ্গভঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হর্ষ-শোক, প্রীতি-দ্বেষ, ধর্ম্ম-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা, শীল-সভ্যতা—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের এক সুনিয়ত মিলনচেষ্টামাত্র। অচেতন জড়ও জ্ঞানের অন্তর্গত। বেদান্ত বলেন যে, জড় অস্তিমাত্র নহে, উহা ভাতি অর্থাৎ জ্ঞেয় হইয়া জ্ঞাতাকে সদাই আহ্বান করিতেছে। জড় জ্ঞানপক্ষে একেবারে নিষ্ক্রিয় নহে। জ্ঞাতাই নিজবলে জড়কে জানে, কিন্তু জড় জ্ঞানপ্রক্রিয়ায় কোনরূপ কর্তৃত্ব করে না—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। ঐ যে সূর্য্যচন্দ্রতারা জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে, উহা কেবল জড়ময় ক্রিয়া নহে—উহা পূর্ণজ্ঞান, জ্ঞেয়রূপে স্ফুরিত হইয়া জ্ঞাতৃপক্ষকে আমন্ত্রণ করিতেছে। যদি আমন্ত্রণ না করিয়া জ্ঞাতৃত্বের প্রতিকূল আচরণ করিত, সাধ্য কি যে, কেহ তাহাদিগকে জ্ঞানের অধিকারভুক্ত করে। তরঙ্গিত নদী বা মলয়সমীরণ বা শ্যামল উপবন প্রিয়জনের ন্যায় আদৃত, গৃহীত ও অধিকৃত হইতে ধীরে ধীরে ইঙ্গিতভঙ্গি প্রদর্শন করে বলিয়াই আমি উহাদের মাধুরী সম্ভোগ করিতে পারি। আমি একটি বস্তু জানি, অথচ উহা আমার জ্ঞানাধিকার স্বীকার করে না—ইহা অসম্ভব। চেতন হউক বা অচেতন হউক, সকল পদার্থই ভাতিরূপ—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়স্বরূপে জ্ঞানবস্তুর প্রকাশ। জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে আকর্ষণ করে, জ্ঞেয় জ্ঞাতাকে আহ্বান করে ও তাহার বশ্যতা স্বীকার করে। কোন এক

প… সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে জ্ঞানের স্ফুরণ হইত না। কেহ বলিতে পারেন যে, তপ্ত বালুকারাশি বা পূতিগন্ধ জ্ঞাতাকে আমন্ত্রণ করিবার পরিবর্ত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াই থাকে। তবে সেই ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসর কিরূপ হয়? এখানেও জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের আমন্ত্রণ ও আদানপ্রদান আছে। জ্ঞানের নিষ্পত্তি হইয়া গেলে পর অন্যান্য কারণে প্রত্যাখ্যান ঘটে। জ্ঞানক্রিয়ার সমাধান না হইলে—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মিলন না হইলে, বিরক্তি বা প্রীতির স্ফুরণ হইতে পারে না।

এই যে বৃহৎ জগদ্ব্যাপার, ইহা জ্ঞানবস্তুরই উদ্বেলন—জানাজানির বিচিত্র লীলা—জ্ঞানজ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের পূর্ণসমন্বয়। এই পূর্ণতাই বিষয়বিষয়িরূপ-দ্বৈতভেদ-ক্রমে প্রতিভাত হয়। অন্ধকারে রজ্জুতে যেরূপ সর্প বা যষ্টির ভ্রম হয়, তদ্রূপ অদ্বৈত জ্ঞানবস্তুতে অজ্ঞান-প্রভাবে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভেদবিলসিত বহুত্বের ভাণ হয়। ব্যাবহারিক রজ্জু কেবল ছায়াময় সর্প বা যষ্টি প্রসব করে। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞানরজ্জু—যাহাতে বিশ্ব আলম্বিত—অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত হইয়া ঈশ্বর-দেব যক্ষ…, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারকা, গিরি-নদী-সাগর-বন, মন-বুদ্ধি-চেতনা-বেদনা, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম-পাপ-পুণ্য, অহংপ্রত্যয়—ইত্যেবম্প্রকার অস্মদ্-যুষ্মদ্দ্বৈতভাবে (duality of subject and objectএ) প্রতিভাত হয়। এই দ্বৈতপ্রকাশে যে শীতোষ্ণসুখদুঃখাদির দ্বন্দ্ববোধ, তাহা স্বপ্নকল্পনা নহে, কিন্তু যথার্থই বস্তুপরিনিষ্ঠিত। তথাপি সর্পের সহিত রজ্জুর যে সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক সৃষ্টির সহিত পরমজ্ঞানের সেই সম্বন্ধ। রজ্জু যদ্রূপ পরিণাম-প্রাপ্ত না হইয়াও যষ্টি বা সর্পরূপে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অদ্বৈতজ্ঞান অবিকারী থাকিয়াও বহুরূপে ব্যাকৃত হয়। উদয়াস্তহীনা স্বয়ম্প্রভা সংবিৎ অখণ্ড ও সর্ব্বময়ী, কিন্তু আংশিক জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডরূপে গৃহীত হইলে ঈশ্বররূপে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন, অমররূপে স্বর্গভোগ করেন, নররূপে মর্ত্ত্যে বিচরণ করেন, সূর্য্য হইয়া উত্তাপ দেন, চন্দ্র হইয়া মনোহরণ করেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"- নিশ্চয়ই এই সমস্তই ব্রহ্ম। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। সেই একই বিভিন্নরূপে অনুভূত হয়। পূর্ণজ্ঞানময় আত্মা ভিন্ন আমাদের অনুভূতির অন্য কোন বিষয় নাই। তজ্জন্য খণ্ডপদার্থে পূর্ণতা আরোপ না করিয়া আমাদের কোনপ্রকার ধারণা হইতে পারে না। উচ্চ হইতে নিম্নে দেখিলে পূর্ণে অংশের অধ্যারোপ হয়, আর নিম্নদেশ হইতে ঊর্দ্ধে দেখিলে অংশে পূর্ণের অধ্যাস হয়।

অহো কি মহদ্বস্তু! যাহা অংশতঃ উপলব্ধ হইলে কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপ ধারণ করে, তাহার মহত্ত্বের কে পরিমাণ করিবে? অজ্ঞানপ্রসূত যষ্টি বা সর্পের যোজনায় রজ্জু হয় না। কিন্তু রজ্জুতত্ত্বে যষ্টি ও সর্পদৃষ্টের কোন এক সাদৃশ্যসমন্বয় আছে, তাহা না হইলে রজ্জুতে যষ্টি বা সর্পভ্রম হইত না। চিন্ময় আত্মা সকল যোগবিয়োগের অতীত, কিন্তু যাঁহার গর্ভে এই অনন্তলোকব্যাপী বিরোধবিশালতা সমন্বয়লাভ করে, তাঁহার স্বরূপজ্ঞানে মনবুদ্ধি নিশ্চয়ই বিলীন হইয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অজ্ঞান—

যাহা আংশিকজ্ঞানরূপে দৃষ্ট হয়—তাহা কোথা হইতে আসিল ?

যথায় গভীরতা, যথায় আনন্দ আছে, তথায় উপচয় আছে, উচ্ছ্বাস আছে। লৌকিক ব্যবহারে ইহা বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। প্রেমিকের হৃদয় প্রিয়বস্তুর দ্বারায় পূর্ণ। সে মিলনানন্দে মত্ত, তাহার অপর সুখসম্ভোগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে যদি তাহার প্রিয়জনের একটি ছবি পায়, নিশ্চয়ই তাহার প্রীতি ও পুলকের সঞ্চার হয়। তাহার ঐ ছবির কোন প্রয়োজন ছিল না। দশসহস্র ঐপ্রকার ছবি আনীত ও অপনীত হইতে পারে, তথাপি তাহার প্রিয়জনমিলনজন্য সুখের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। এইপ্রকার অপ্রয়োজনসত্বেও ঐ ছবি তাহার প্রীতি ও আদরের বস্তু। প্রতিরূপে প্রীতি স্বরূপানন্দের উপচয়মাত্র। তাহা আংশিক ভাবে পূর্ণপ্রেমকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই অংশকে কোটিগুণ করিলে পূর্ণতালাভ করা যায় না। অগণন প্রতিরূপের প্রতি অজস্র উচ্ছ্বাস স্বরূপপ্রেমের গভীরতায় লুপ্ত হইয়া যায়, কারণ খণ্ডপ্রীতি প্রেমের পূর্ণতাপক্ষে থাকা না থাকা দুইই সমান। এই লৌকিক দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, গভীরতার উপচয় কাহাকে বলে। আনন্দের উপচয় অনেকস্থলে দৃষ্ট হয়। সচরাচর আমরা প্রয়োজনানুসারে সাবধানে ব্যয় করি। কিন্তু উৎসবের দিনে আমরা প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া বাহুল্যসম্ভোগে প্রস্তুত হই। অন্নব্যঞ্জন, পিষ্টকপায়স ও সুস্বাদু ফলের ফেলাফেলি-ছড়াছড়ি। এই প্রচুর আয়োজন হইতে দুইএকটা লেহ্যপেয় অপসারিত করিলে উৎসবের কোন অঙ্গহানি হয় না। পৃথিবীতে আমাদের উদরপূর্ত্তি ও রসনার তৃপ্তির জন্য এত আয়োজন যে, প্রয়োজনের তালিকায় তাহা গণনা করা চলে না। যদি কপাটভাঙা আম বা লিচুফল বঙ্গদেশে না থাকিত, বঙ্গবাসীর সুখভোগের বোধ হয় বিশেষ কোন বিঘ্ন হইত না। আমরা প্রবৃত্তির দাস, তজ্জন্য এই বাহুল্যলীলার মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না।

চিদ্বস্তুর জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভেদক্রমে যে আংশিক প্রকাশ হয়, তাহা অনন্ত গভীরতার উপচয়। কিন্তু ঐ উপচিত আংশিক প্রকাশ বিপরীতবুদ্ধি বা অধ্যাস ব্যতীত হইতে পারে না। হস্তীর জ্ঞান না থাকিলে শুণ্ডকে শুণ্ড বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু ঐ অনাত্ম আংশিক অবয়বটিকে আত্মস্থিত সর্পতুল্য কোন পদার্থ বলিয়া ধারণা হয়। স্বরূপের ভেদবহুল প্রতিভাতি অজ্ঞানপ্রভাবেই ঘটিতে পারে, সুতরাং উপচয় বা আংশিক প্রকাশ স্বীকার করিলে অজ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়। পূর্ণবস্তুসম্বন্ধে যদি পূর্ণজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহার বিকাশবহুত্বের সম্ভাবনা থাকে না। অজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞানই কেবল অদ্বৈতকে ঐশ্বর্য্যবিলসিত করিয়া প্রতিভাত করে। এই অজ্ঞান জ্ঞানের আনুষঙ্গিক। অংশ যেরূপ পূর্ণতার মধ্যে বাস করে, ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে অবস্থিত, তদ্রূপ অজ্ঞান জ্ঞানের সঙ্গী। কিন্তু ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্ণতা অংশনিরপেক্ষ—যোজনা করিয়া পাওয়া যায় না। আমি একটি বৃক্ষকে অংশ করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যে পূর্ণতা আরোপ করিয়া আমি বৃক্ষ-

বস্তুর ।। করি, তাহা অংশযোজনায় প্রতিষ্ঠিত নহে। জ্ঞানবস্তু আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মারাম, আত্মক্রীড়। তাহার কোন প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষা বা অভাব নাই। এই নিষ্প্রয়োজন নিরাকাঙ্ক্ষ পূর্ণতা আছে বলিয়াই উপচয়বাহুল্য সম্ভবে। যাহার প্রয়োজন আছে—অভাব আছে, তাহা অপূর্ণ, তাহার আবার উপচয় কি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত প্রমাদপূর্ণ। তাহা অদ্বৈতকে বস্তুগত দ্বৈতভেদের অপেক্ষী বলিয়া নির্ণয় করে ও জগদ্ব্যাপার যে অজ্ঞান প্রসূত, এই শ্রৌত রাদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে।

সংক্ষেপে বেদান্তের প্রথম কথা বলিলাম। কিরূপে জ্ঞান ত্রিগুণাত্মক-অজ্ঞান-প্রভাবে ত্রিপাদে বিভক্ত হয় ও কিরূপে জ্ঞানাজ্ঞানের বিরোধসোপান অপবাদচ্ছলে আরোহণ করিয়া তুরীয়ানন্দের একত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহা দ্বিতীয় কথায় যথাসময়ে দেখাইব।

শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

য়ুনিভার্সিটি বিল্।

য়ুনিভার্সিটি বিল্ পাস্ হইয়া গেছে, আমরাও নিস্তব্ধ হইয়াছি। যতক্ষণ পাস্ হয় নাই, ততক্ষণ আমরা এমন ভাব ধারণ করিয়াছিলাম, যেন আমাদের মহা অনর্থপাতের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। যদি বস্তুতই আমাদের সেইরূপ বিশ্বাসই হয়, তবে বিল পাস্ হইয়া গেল বলিয়াই অমনি সুনিদ্রার আয়োজন করিতে হইবে, ইহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দেশের সত্যই যদি কোনো দারুণ অনিষ্ট ঘটিবার কারণ থাকে, তবে গবর্মেণ্ট্ আমাদের দোহাই মানিলেন না বলিয়াই আমরা নিজেরাও যথাসাধ্য প্রতিকারচেষ্টা করিব না, ইহার অর্থ কি? আন্দোলনসভায় আমরা যে পরিমাণে সুর চড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম, রং ফলাইয়া ভাবী সর্ব্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্ত্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেইপরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে! বেদনা যদি অকপট হয়, শঙ্কা যদি ভাণ না হয়, তবে আজ আমরা চুপচাপ করিয়া বসিয়া নিজের দুই গালে চূণকালী লেপিতেছি!

দেশহিতৈষীরা বলেন—আমাদের কি সাধ্য আছে, আমরা কি করিতে পারি!

আমরা যদি কিছুই না করিতে পারি, তবে আমরা যেন কাহারো কাছে কিছুই প্রত্যাশা না করি! এত বড় অক্ষম যাহারা, তাহাদের মুখে কাহারো কাছে কোনো দাবীই শোভা পায় না!

এতকাল ধরিয়া য়ুনিভার্সিটি বিলের বিধিবিধান লইয়া তন্নতন্ন করিয়া অনেক আলো-

চনা হইয়া গেছে, সেগুলির পুনরুক্তি বিরক্তিকর হইবে। মোটামুটি দুইএকটা কথা বলিতে চাই।

টাকা থাকিলে, ক্ষমতা থাকিলে, সমস্ত অবস্থা অনুকূল হইলে বন্দোবস্তর চূড়ান্ত করা যাইতে পারে, সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু অবস্থার প্রতি তাকাইয়া দুরাশাকে খর্ব্ব করিতেই হয়। লর্ড কার্জ্জন্ ঠিক বলিয়াছেন, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ খুব ভাল—কিন্তু ভারতবন্ধু লাট্‌সাহেব ত বিলাতের সব ভাল আমাদিগকে দিবার কোন বন্দোবস্ত করেন নাই, মাঝে হইতে কেবল একটা ভালই মানাইবে কেন?

প্রত্যেকের সাধ্যমত যে ভালো, সে-ই তাহার সর্ব্বোত্তম ভালো,—তাহার চেয়ে ভালো আর হইতেই পারে না—অন্যের ভালোর প্রতি লোভ করা বৃথা।

বিলাতী য়ুনিভার্সিটিগুলাও একেবারেই আকাশ হইতে পড়িয়া অথবা কোনো জবর্দস্ত শাসনকর্ত্তার আইনের জোরে একরাত্রে পূর্ণ-পরিণত হইয়া উঠে নাই। তাহার একটা ইতিহাস আছে। দেশের অবস্থা এবং ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বভাবত বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহার প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে, আমাদের য়ুনিভার্সিটি গোড়াতেই বিদেশের নকল—স্বাভাবিক নিয়মের কথা ইহার সম্বন্ধে খাটিতে পারে না।

সে কথা ঠিক। ভারতবর্ষের য়ুনিভার্সিটি দেশের প্রকৃতির সঙ্গে যে মিশিয়া গেছে, আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাঙ্গ হইয়া গেছে, তাহা বলিতে পারি না—এখনো তাহা, আমাদের বাহিরে রহিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে আমরা ক্রমশ আয়ত্ত করিয়া লইতেছি—আমাদের স্বদেশীদের পরিচালিত কলেজগুলিই তাহার প্রমাণ।

ইংরাজের কাছ হইতে আমরা কি পাইয়াছি, তাহা দেখিতে হইলে কেবল দেশে কি আছে তাহা দেখিলে চলিবে না, দেশের লোকের হাতে কি আছে তাহাই দেখিতে হইবে।

রেলোয়ে, টেলিগ্রাফ অনেক দেখিতেছি, কিন্তু তাহা আমাদের নহে—বাণিজ্য-ব্যবসায়ও কম নহে, কিন্তু তাহারো যৎসামান্য আমাদের! রাজ্যশাসনপ্রণালী জটিল ও বিস্তৃত, কিন্তু তাহার যথার্থ কর্ত্তৃত্বভার আমাদের নাই বলিলেই হয়, তাহার মজুরের কার্য্যই আমরা করিতেছি, তাহাও উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যে জিনিষ যথার্থ আমাদের, তাহা কম ভাল হইলেও, তাহার ত্রুটি থাকিলেও, তাহা ভাণ্ডারকর-মহাশয়ের সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও তাহাকেই আমরা লাভ বলিয়া গণ্য করিব।

যে বিদ্যা পুঁথিগত,—যাহার প্রয়োগ জানা নাই, তাহা যেমন পণ্ড, তেম্নি যে শিক্ষাদান-প্রণালী আমাদের আয়ত্তের অতীত, তাহাও আমাদের পক্ষে প্রায় তেম্নি নিষ্ফল। দেশের বিদ্যাশিক্ষাদান দেশের লোকের হাতে আসিতেছিল, বস্তুত ইহাই বিদ্যাশিক্ষার ফল। সেও যদি সম্পূর্ণ গবর্মেন্টের হাতে গিয়া পড়ে, তবে খুব ভাল য়ুনিভার্সিটিও আমাদের পক্ষে দারিদ্র্যের লক্ষণ।

আমাদের দেশে বিদ্যাকে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য করা কোনমতেই সঙ্গত নহে। আমাদের সমাজ শিক্ষাকে সুলভ করিয়া রাখিয়াছিল—দেশের উচ্চনীচ সকল স্তরেই শিক্ষা নানা সহজ প্রণালীতে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই সমস্ত স্বাভাবিক প্রণালী ইংরাজিশিক্ষার ফলেই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল—এমন কি, দেশে রামায়ণ-মহাভারত-পাঠ, কথকতা-যাত্রাগান প্রতিদিন বিদায়োন্মুখ হইয়া আসিতেছে। এমন সময়ে ইংরাজিশিক্ষাকেও যদি দুর্লভ করিয়া তোলা হয়, তবে গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লওয়া হয়।

বিলাতী সভ্যতার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অনেক টাকার ধন। আমোদ হইতে লড়াই পর্য্যন্ত সমস্তই টাকার ব্যাপার। ইহাতে টাকা একটা প্রকাণ্ড শক্তি হইয়া উঠিয়াছে এবং টাকার পূজা আর সমস্ত পূজাকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে।

এই দুঃসাধ্যতা, দুর্লভতা, জটিলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান দুর্ব্বলতা। সাঁতার দিতে গিয়া অত্যন্ত বেশি হাত-পা-ছোঁড়া অপটুতারই প্রমাণ দেয়, কোনো সভ্যতার মধ্যে যখন সর্ব্ববিষয়েই প্রয়াসের একান্ত আতিশয্য দেখা যায়, তখন ইহা বুঝিতে হইবে, তাহার যতটা শক্তি বাহিরে দেখা যাইতেছে, তাহার অনেকটারই প্রতিমুহূর্ত্তে অপব্যয় হইতেছে। বিপুল মালমস্লা-কাঠখড়ের হিসাব যদি ঠিকমত রাখা যায়, তবে দেখা যাইবে, মজুরি পোষাইতেছে না। প্রকৃতির খাতায় সুদে-আসলে হিসাব বাড়িতেছে, মাঝে মাঝে তাগিদের পেয়াদাও যে আসিতেছে না, তাহাও নহে—কিন্তু সে লইয়া আমাদের চিন্তা করিবার দরকার নাই।

আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশে বিচার দুর্ম্মূল্য, অন্ন দুর্ম্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্ম্মূল্য হয়, তবে ধনি-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে। বিলাতে দারিদ্র্য কেবল ধনের অভাব নহে, তাহা মনুষ্যত্বেরও অভাব—কারণ, সেখানে মনুষ্যত্বের সমস্ত উপকরণই চড়াদরে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে দরিদ্রের মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল, কারণ আমাদের সমাজে সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-আমোদ মোটের উপরে সকলে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে যে পাঠশালা বসিয়াছে, গরিবের ছেলেরা বিনা বেতনে তাহাতে শিক্ষা পাইয়াছে—রাজার সভায় যে উৎসব হইয়াছে, দরিদ্র প্রজা বিনা আহ্বানে তাহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ধনীর বাগানে দরিদ্র প্রত্যহ পূজার ফুল তুলিয়াছে,—কেহ তাহাকে পুলিসে দেয় নাই, সম্পন্নব্যক্তি দীঘি-ঝিল কাটাইয়া তাহার চারিদিকে পাহারা বসাইয়া রাখে নাই। ইহাতে দরিদ্রের আত্মসম্মান ছিল—ধনীর ঐশ্বর্য্যে তাহার স্বাভাবিক দাবী ছিল, এইজন্য, তাহার অবস্থা যেমনই হোক, সে পাশবতা প্রাপ্ত হয় নাই— যাঁহারা জাতিভেদ ও মনুষ্যত্বের উচ্চ অধিকার লইয়া মুখস্থ বুলি আওড়ান্, তাঁহারা এসব কথা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন না।

বিলাতী লাট্ আজকাল বলিতেছেন, যাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত লোভ করিবার দরকার

কি? আমাদের কানে এ কথাটা অত্যন্ত বিদেশী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া ঠেকে।

কিন্তু সমস্ত সহিতে হইবে। তাই বলিয়া বসিয়া-বসিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না।

আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি, তাহারই জন্য আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে সমাজের ব্যবস্থা ছিল রাজার উপরে, বাহিরের সাহায্যের উপরে ইহার নির্ভর ছিল না সমাজ ইহাকে রক্ষা করিয়াছে এবং সমাজকে ইহা রক্ষা করিয়াছে।

এখন বিদ্যাশিক্ষা রাজার কাজ পাইবার সহায়স্বরূপ হইয়াছে, তখন বিদ্যাশিক্ষা সমাজের হিতসাধনের উপযোগী ছিল। এখন সমাজের সহিত বিদ্যার পরস্পর সহায়তার যোগ নাই। ইহাতে এতকাল পরে শিক্ষা-সাধনব্যাপার ভারতবর্ষে রাজার প্রসাদ-অপেক্ষী হইয়াছে।

এ অবস্থায় রাজা যদি মনে করেন, *তাঁহাদের রাজপলিসির অনুকূল করিয়াই* শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, রাজভক্তির ছাঁচে ঢালিয়া ইতিহাস রচিতে হইবে, বিজ্ঞান-শিক্ষাটাকে পাকেপ্রকারে খর্ব্ব করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় ছাত্রের সর্ব্বপ্রকার আত্ম-গৌরববোধকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে, তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না— কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম—আমরা সে কর্ম্মের ফল-ভোগ করিব, কিন্তু সে কর্ম্মের উপরে কর্তৃত্ব করিবার আশা করিব কিসের জোরে?

তা ছাড়া, বিদ্যাজিনিষটা কলকারখানার সামগ্রী নহে। তাহা মনের ভিতর হইতে না দিলে দিবার জো নাই। লাট্‌সাহেব তাঁহার অক্‌সফোর্ড-কেম্ব্রিজের আদর্শ লইয়া কেবলি আস্ফালন করিয়াছেন, এ কথা ভুলিয়াছেন যে, সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে ব্যবধান নাই সুতরাং সেখানে বিদ্যার আদান-প্রদান স্বাভাবিক। শিক্ষক সেখানে বিদ্যা-দানের জন্য উন্মুখ এবং ছাত্রেরাও বিদ্যা-লাভের জন্য প্রস্তুত পরস্পরের মাঝখানে অপরিচয়ের দূরত্ব নাই, অশ্রদ্ধার কণ্টক-প্রাচীর নাই, কাজেই সেখানে মনের জিনিষ মনে গিয়া পৌঁছায়। পেড্‌লারের মত লোক আমাদের দেশের অধ্যাপক, শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ, তিনি আমাদিগকে কি দিতে পারেন, আমরাই বা তাঁহার কাছ হইতে কি লইতে পারি! হৃদয়ে হৃদয়ে যেখানে স্পর্শ নাই, সেখানে সুস্পষ্ট বিরোধ ও বিদ্বেষ আছে; সেখানে দৈববিড়ম্বনায় যদি দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবে সে সম্বন্ধ হইতে শুধু নিষ্ফলতা নহে, কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা এইজন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে—নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেম্ব্রিজ-অক্‌স্‌ফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজসরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও অনেক লক্ষিত হইবে, কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধা-শতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মত করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত পরিবেষণ করি-বেন, ধনমদগর্ব্বিতা বণিক্‌গৃহিণীর মত উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদায় করিবেন না।

পরের কাছ হইতে হৃদ্যতাবিহীন দান লইবার একটা মস্ত লাঞ্ছনা এই যে, গর্ব্বিত দাতা খুব বড় করিয়া খরচের হিসাব রাখে, তাহার পরে দুইবেলা খোঁটা দেয়—'এত দিলাম তত দিলাম, কিন্তু ফলে কি হইল?' মা স্তন্য-দান করেন, খাতায় তাহার কোনো হিসাব রাখেন না, ছেলেও বেশ পুষ্ট হয়—স্নেহ-বিহীনা ধাত্রী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া রোরুদ্যমান মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দেয়, তাহার পরে অহরহ খিট্‌খিট করিতে থাকে—'এত গেলাইতেছি, কিন্তু ছেলেটা দিনদিন কেবল কাঠি হইয়া যাইতেছে।'

আমাদের ইংরাজ কর্তৃপক্ষেরা সেই বুলি ধরিয়াছেন। পেড্‌লার সেদিন বলিয়াছেন, আমরা বিজ্ঞানচর্চ্চার এত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, এত আনুকূল্য করিলাম, বৃত্তির টাকার এত অপব্যয় করিতেছি, কিন্তু ছাত্রেরা স্বাধীনবুদ্ধির কোনো পরিচয় দিতেছে না!

অনুগ্রহজীবীদিগকে এই সব কথাই শুনিতে হয়—অথচ আমাদের বলিবার মুখ নাই। বন্দোবস্ত সমস্ত তোমাদেরই হাতে, এবং সে বন্দোবস্তে যদি যথেষ্ট ফললাভ না হয়, তাহার সমস্ত পাপ আমাদেরই। এদিকে খাতায় টাকার অঙ্কটাও গ্রেট্‌প্রাইমার্ অক্ষরে দেখান হইতেছে—যেন এত বিপুল টাকা এত-বড় প্রকাণ্ড অযোগ্যদের জন্য জগতে আর কোনো দাতাকর্ণ ব্যয় করে না—অতএব ইহার "moral" এই—হে অক্ষম, হে অকর্ম্মণ্য, তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তোমরা রাজভক্ত হও, তোমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চাঁদা দিতে কপোলযুগ পাণ্ডুবর্ণ করিয়ো না!

ইহাতে বিদ্যালাভ কতটুকু হয় জানি না, কিন্তু আত্মসম্মান থাকে না। আত্মসম্মান ব্যতীত কোন জাত কোনো সফলতা লাভ করিতে পারে না—পরের ঘরে জল-তোলা এবং কাঠ কাটার কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু দ্বিজধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের বৃত্তিরক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগকে যে খোঁটা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। এবং যাঁহারা খোঁটা দেন, তাঁহারাও যে মনে মনে তাহা জানেন না, তাহাও আমরা স্বীকার করিব না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, পাছে তাঁহাদের কথা অপ্রমাণ হইয়া যায়, এজন্য তাঁহারা ত্রস্ত আছেন।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, বিলাতী সভ্যতা বস্তুত দুরূহ ও দুর্লভ নয়। স্বাধীন জাপান আজ পঞ্চাশবৎসরে এই সভ্যতা আদায় করিয়া লইয়া গুরুমারা বিদ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ সভ্যতা অনেকটা ইস্কুলের জিনিষ, পরীক্ষা করা, মুখস্থ করা, চর্চ্চা করার উপরেই ইহার নির্ভর। জাপানের মত সম্পূর্ণ সুযোগ ও আনুকূল্য পাইলে এই ইস্কুলপাঠ আমরা পেড্‌লার-সম্প্রদায় আসিবার বহুকাল পূর্ব্বেই শেষ করিতে পারিতাম। প্রাচ্য সভ্যতা ধর্ম্মগত—তাহার পথ নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—তাহা ইস্কুলের পড়া নহে, তাহা জীবনের সাধনা।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, এতকাল অনেক বিদেশী অধ্যাপক আমাদের কালেজের পরীক্ষাশালায় যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বাধীন-বুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই।

বাঙালীর মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া সেই সুযোগের ফল দেখাইয়াছেন। পরের সহিত তর্কের জন্যই এগুলি স্মরণীয়, তাহা নহে, নিজেদের উৎসাহ ও আত্মসম্ভ্রমের জন্য। পরের কথায় নিজেদের প্রতি যেন অবিশ্বাস না জন্মে!

যাহাতে আমাদের যথার্থ আত্মসম্মানবোধের উদ্রেক হয়, বিদেশীরা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিবে না এবং সেজন্য আমরা যেন ক্ষোভ অনুভব না করি। যেখানে যাহা স্বভাবতই আশা করা যাইতে পারে না, সেখানে তাহা আশা করিতে যাওয়া মূঢ়তা—এবং সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া পুনঃপুন সেইখানেই ধাবিত হইতে যাওয়া যে কি, ভাষায় তাহার কোনো শব্দ নাই। এস্থলে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মত যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশের ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া;—অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা-অনাদরের হাত হইতে বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা; জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের জিনিষ করিয়া দাঁড় করানো; আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত, প্রকৃতির সহিত তাহাকে অন্তরঙ্গরূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্বভাবের নিয়মে পালন করিয়া তোলা; বাহিরে আপাতত তাহার দীনবেশ, তাহার কৃশতা দেখিয়া ধৈর্য্যভ্রষ্ট না হইয়া আশার সহিত, আনন্দের সহিত হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি দিয়া, জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে সতেজ ও সফল করা।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাই আমাদের একমাত্র আলোচ্য, একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহাকে যদি দুরাশা বল, তবে কি পরের রুদ্ধদ্বারে জোড়-হস্তে বসিয়া থাকাই আশা পূর্ণ হইবার একমাত্র সহজ প্রণালী? কবে কন্সার্ভেটিব্ গবর্মেণ্ট্ গিয়া লিবারেল্ গবর্মেণ্টের অভ্যুদয় হইবে, ইহারই অপেক্ষা করিয়া শুষ্কচঞ্চু বিস্তারপূর্ব্বক নিদাঘমধ্যাহ্নের আকাশে তাকাইয়া থাকাই কি হতবুদ্ধি হতভাগ্যের একমাত্র সদুপায়?

ইহাই যদি হয়, তবে আমাদের অদৃষ্টে এখনো অনেক দুঃখ, অনেক অপমান আছে—এখনো আমাদের কঠিন শিক্ষা শেষ হয় নাই! তবে আমাদের অবনত পৃষ্ঠের উপর বিধাতার উদ্যত কশা যেন বিশ্রাম না করে!

সাহিত্যপ্রসঙ্গ।

বঙ্গভাষা বনাম আসামীভাষা।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে আসামপ্রবাসী মার্কিন্ পাদ্রী ব্রন্সন্সাহেব ও আসামের তাৎকালিক স্কুল-ইন্স্পেক্টর মিঃ রবিনসন্সাহেবের সঙ্গে আসামের স্কুলসমূহে বাংলা এবং আসামী ভাষা ইহাদের কোন্‌টি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এই লইয়া গুরুতর তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বাদানুবাদের বিবরণ বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বেই আসামের স্কুলসমূহে বাংলাভাষা প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; পাদ্রীদল তদ্বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন না করিলে বাংলাভাষার অধিকার কখনই বিচ্যুত হইত না,—আসামে এতদিন বঙ্গসাহিত্য ঘরে ঘরে পঠিত হইত এবং এই দুই দেশের সহিত পরস্পরের সম্পর্ক ঘনীভূত হইয়া দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইত।

মার্কিন্ পাদ্রীদলের একটা স্বার্থ ছিল। তাঁহারা আসামবাসীদিগের মধ্যে বাইবেল প্রচার করিবার জন্য প্রাদেশিকভাষায় কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়া দুইটি ছাপাখানার ব্যবস্থা করিয়া বসিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাঁহারা আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা আসামীভাষা শিখাইবার জন্য যে কয়েকটি স্কুল খুলিয়াছিলেন, গভর্মেণ্টের স্থাপিত বিদ্যালয়সমূহে ও আফিসে বঙ্গভাষার প্রচলন থাকাতে প্রাদেশিকভাষাচর্চ্চা নিরর্থ বুঝিয়া, আসামবাসিগণ স্বতই সেই সকল বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে পাঠাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আয়োজনপত্র সমস্ত পণ্ড হইয়া পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিপদে পড়িয়া তাঁহারা বঙ্গদেশের তাৎকালিক ছোটলাট হ্যালিডেসাহেবের নিকট আসামে বঙ্গভাষার স্থলে আসামীভাষার প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রার্থনা করিয়া একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।

পাদ্রী ব্রন্সন্ তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ের আনুকূল্যে যতপ্রকার যুক্তি স্বীয় কল্পনায় আসিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; অধিকন্তু, স্বীয় উদ্দেশ্য বিশেষরূপে পুষ্ট করিবার জন্য স্বদলস্থ ৫জন পাদ্রীর মন্তব্য আবেদনপত্রে জুড়িয়া দেন। এই পঞ্চ সহচর তারস্বরে তাঁহারই যুক্তিগুলির প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে ইঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তিগুলির সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

(১) আসামীভাষা ও বাংলাভাষা, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা। বাংলাভাষায় লিখিত পুস্তক আসামের সাধারণ লোকেরা বুঝিতে পারে না, এমন কি, একজন বাঙালী ও একজন আসামবাসীকে পরস্পরের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত করিলে তাহারা একের কথা অপরে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

(২) সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রগণ বাংলায় লিখিত পুস্তক আসামীভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া তৎপরে মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হয়।

(৩) শিক্ষকগণ একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমাদের মার্কিনের খৃষ্টীয় প্রচার-সমিতি হইতে যে সকল আসামীভাষায় রচিত পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা এতদ্দেশের অধিবাসিগণ অতি সহজেই বুঝিতে পারে, কিন্তু দুইতিনবৎসর রীতিমত না পড়িলে তাহারা বাংলাপুস্তক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

(৪) ইংরেজেরা যেরূপ ফরাসা বা ল্যাটিন পড়ে, আসামের ছাত্রগণও ঠিক সেইভাবে বাংলা পড়িয়া থাকে।

(৫) বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাত্রগণ আসামীভাষায় কথোপকথন এবং চিন্তা করে,—তাহারা মোটেই বাংলাভাষার কোন ধার ধারে না। তাহারা গৃহে আসামীভাষায় কথোপকথন করে, ধর্ম্মপুস্তকের ব্যাখ্যা শুনিয়া থাকে। নৌকা বাহিবার সময় মাঝিরা আসামীভাষায় গান গাহিয়া যায় এবং কৃষকেরা ফসল কাটিয়া গৃহে ফিরিবার সময় আনন্দে এই ভাষার গানে সান্ধ্যগগন প্লাবিত করে। মোট কথা, আসামীভাষাই তাহাদের মাতৃভাষা—বঙ্গভাষা নহে।

(৬) পরের ভাষায় তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা হইলে তাহারা কখনই জাতীয়জীবনের উন্নতিসাধন করিবার জন্য সমুচিত অনুপ্রাণনা পাইবে না, কৃত্রিম ভাষার দ্বারা শৃঙ্খলিত করিলে তাহাদের সমস্ত উদ্যম কুণ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

(৭) পাদ্রীগণের মধ্যে সকলেই এবং আনন্দরাম ফোকন প্রভৃতি শিক্ষিত আসামবাসিগণের অধিকাংশ মনে করেন যে, বাংলা এবং আসামী ভাষা এক ভাষা নহে।

(৮) আসামীভাষা কোমল এবং শ্রুতিসুখকর, ইহা উচ্চসাহিত্যগঠনের সম্পূর্ণ উপযোগী।

(৯) আসামের প্রান্তবর্ত্তী যে সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশ আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির ভাষাকে লিখিতভাষার প্রণালীতে প্রবর্ত্তন করা অসম্ভব। ভুটিয়া, মিসমি, মিরি, খম্‌প্তি সিংফো এবং নাগা প্রভৃতি জাতিকে সুসভ্য করিতে হইলে আসামীভাষার সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাহারা আসামের সঙ্গে নানাপ্রকারে সংশ্লিষ্ট, এবং পার্ব্বত্য জাতিগণের মধ্যে অনেক লোকের আসামীভাষা জানা আছে। আসামীভাষা অবলম্বন করিলে এই সকল জাতিগণের সঙ্গে সভ্য জাতিগণের চিন্তার আদানপ্রদানের পন্থা সুগম হইবে।

আসামের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর মিঃ উইলিয়াম্ রবিন্‌সন্‌সাহেব এই সকল যুক্তির অসারতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তিগুলিও আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে সঙ্কলিত করিলাম।

(১) আসামের ভাষা ও বঙ্গদেশের ভাষা, দুই ভিন্ন ভাষা নহে। আসামীভাষা বঙ্গভাষারই একটি প্রাদেশিক অবয়বমাত্র।

(২) উভয় ভাষার প্রায় সমস্ত শব্দগুলি এক প্রকারের—তাহাদের মধ্যে শুধু উচ্চারণগত প্রভেদ বিদ্যমান। এইরূপ প্রভেদ নিজ বাংলার জেলায় জেলায় লক্ষিত হয়,—বিভক্তি এবং ক্রিয়ার প্রভেদের জন্য এক ভাষার শাখাগুলিকে কখনই বিভিন্ন মনে করা উচিত নহে। বাংলার প্রদেশে প্রদেশে

এইরূপ প্রভেদসত্ত্বেও তথাকার সর্ব্বত্র এক বঙ্গভাষাপ্রচলনে কোনপ্রকার উন্নতির ব্যাঘাত হয় নাই, বরং এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের সম্মিলিত চেষ্টার সুবিধা পাইয়া উন্নতির পথ দ্বিগুণিতরূপে সুপ্রসার লাভ করিয়াছে।

(৩) চট্টগ্রামের লোকের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের লোক স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় কথোপকথনের চেষ্টা করিলেও পরস্পরের ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না,—চট্টগ্রামের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের কথার যত প্রভেদ, আসামীভাষার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের কথার তদপেক্ষা বেশী প্রভেদ নাই। প্রাদেশিক চলিতকথার ভাষা (dialect) এবং লিখিতভাষার প্রভেদ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, এইজন্য কথিত প্রয়োগের উপর অতিরিক্তরূপ লক্ষ্য রাখিয়া প্রধানভাষার দাবী অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। লিঙ্কলন্‌শায়ারের কৃষক যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে, তাহার অর্থ ইংরেজী কোন অভিধানে এবং তাহার কোন সূত্র ইংরেজী কোন ব্যাকরণে পাওয়া যাইবে না অথচ লিঙ্কলন্‌শায়ারবাসী বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা পড়িয়া থাকে। তাহাদের কথিতভাষা এইরূপ, যথা—

"Th' ökeawnt uth Egg hee bechün Theyme sum uth granddist karpits has 'avin an clapt mee een on, an ondur heawfoke cud fo inde ethur harto für to 'cet thur shune on üm."

ওয়েল্‌স্‌ এবং স্কট্‌লণ্ডের অনেক স্থলের লোকের কথিতভাষা হঠাৎ শুনিলে ইংরেজীভাষার সঙ্গে যে তাহাদের কোনরূপ সাদৃশ্য আছে, তাহাই বোধ হইবে না,—অথচ ইংরেজীভাষা সেই সেই দেশের বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে।

(৪) বাংলাভাষার সঙ্গে আসামীভাষার যতটা প্রভেদ পাদ্রীগণ কল্পনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ততটা প্রভেদ নাই। বঙ্গীয় লেখকগণ অনেকসময় গৌড়ীয় সাধুভাষায় পুস্তক লিখিয়া থাকেন—তাহা ঠিক সেই দেশের লোকেরাই অনেকস্থলে বুঝিয়া উঠেন না। এতৎসম্বন্ধে ডাক্তার বুকনন্‌ লিখিয়াছেন—"বাংলা-সাধুভাষায় রচিত পুস্তকের ভাষা বাংলার সাধারণ লোকের এক সহস্রের মধ্যে একজন বুঝিতে পারে কি না, সন্দেহ।" এরূপ অবস্থায় সেই ভাষার সঙ্গে কথিত আসামীভাষার তুলনা করিয়া প্রভেদনির্ণয় করা সঙ্গত নহে।

(৫) মার্কিন পাদ্রী ব্রাউন্‌সাহেব উচ্চারণপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসামী-শব্দের যেরূপ বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা কতকপরিমাণে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুযায়ী হইলেও দেশের চিরাগত প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। পাদ্রীদিগের তালিকা হইতে কয়েকটি বাংলাশব্দ ও আসামীশব্দ উদ্ধৃত করিয়া তুলনার জন্য পাশাপাশি রাখিতেছি।

বাংলা।	আসামী।
কিছু ...	... কিস্যু।
ক্ষমা ...	... খেমা।
বুড়া ...	... বুঢ়া।
ধর্ম্ম ...	... ধরম।
পরীক্ষা ...	... পরিখ্যা।
মর্য্যাদা ...	... মর্জ্জদা।
স্থির ...	... থির।

(৬) বাংলাভাষা ক্রমেই ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষিত বহুলোকের প্রযত্নে ইহা ক্রমশ নানাবিষয়ে শ্রীসম্পন্ন হইয়া সভ্যজগতের ভাষাগুলির সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে প্রয়াসী। আসামীভাষায় কোন পুস্তকই নাই, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না ;—সুতরাং এই উন্নতিশীল সুপ্রসর বঙ্গভাষা শিখিবার সুবিধা হইতে আসামবাসীদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহারা অর্দ্ধশতাব্দীর জন্য পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবে, এবং আর কোনকালে তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে কি না, বিশেষ সন্দেহের স্থল।

(৭) বাংলাভাষা বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত আছে। আমি নিজে বহুবার পরিদর্শন করিয়া দেখিয়াছি, আসামবাসী ছাত্রগণ ইহা পাঠ করিতে অণুমাত্রও অসুবিধা বোধ করে না। যে সকল অসুবিধার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাদ্রীমহাশয়গণের কল্পনাতেই বিশেষরূপে বিরাজিত। আফিসে বাংলাভাষা প্রচলিত আছে, সে স্থানেও অতি সহজেই সমস্ত কার্য্য সুনির্ব্বাহ হইয়া থাকে, —এবং এক আনন্দরাম ফোকন ভিন্ন বঙ্গভাষার বিরুদ্ধে কোন শিক্ষিত আসামবাসী অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যেরূপ চলিতকথার প্রভেদসত্ত্বেও বঙ্গভাষাশিক্ষায় স্থানীয় লোক কোনই অসুবিধাবোধ করে না, এখানেও ঠিক তাহাই। কারণ, আসামীভাষা বঙ্গভাষারই একটি প্রাদেশিক শাখামাত্র, এ সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহেও ছাত্রগণ বাংলাপুস্তক পড়িবার সময় স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করে। এখানেও ঠিক্ তাহাই করিয়া থাকে।

(৮) সমগ্র আসামে ১১,২০,০০০ লোকের বাস। নিম্নপ্রদেশের জনসংখ্যা বেশী,—অপরার্দ্ধের (শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর জেলার) লোকসংখ্যা সমগ্রের $\frac{১}{৩}$ অংশের অধিক হইবে না। খুব বেশী ধরিয়া লইলেও ঐ দুই জেলার লোকসংখ্যা ৩,৭০,০০০এর বেশী কোনক্রমেই হইতে পারে না। ইহার মধ্যে অন্যূন ১,৪০,০০০ কাছাড়ী এবং অপরাপর পার্ব্বত্য অধিবাসী আছে। তাহাদিগকে বাদ দিলে মাত্র ২,৩০,০০০ লোক বাকি থাকে। যে ভাষায় মার্কিনের পাদ্রীগণ পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তাহা এই ২,৩০,০০০ লোকের মাতৃভাষা। অবশিষ্ট ৮,৯০,০০০ লোকের ইহা মাতৃভাষা নহে। এই স্বল্পসংখ্যক লোকের মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দিয়া অধিকাংশ আসামবাসীদিগকে উক্তরূপ অধিকার হইতে বঞ্চিত কেন করা হইবে? এই বহুসংখ্যক আসামবাসীদেরও তাহা হইলে স্বদেশীয়-ভাষা-শিক্ষার অভাবে সমস্ত উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।

৯। আসল কথা, আসামীভাষা বঙ্গভাষা হইতে স্বতন্ত্র কল্পনা করা অন্যায়। বাংলাভাষা সংস্কৃতের প্রভাবে নূতনরূপে গঠিত হইতেছে,—ইহাতে উচ্চসাহিত্যের উপযোগী মার্জ্জিত ও ললিত শব্দসমূহ প্রবেশলাভ করিয়া ইহাকে বিচিত্ররূপে শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাষাই আসামবাসিগণের স্বাভাবিকনিয়মানুসারে মাতৃভাষা,—এবং ইহা শিক্ষা করিলে তাহারা সমগ্র জাতীয় উদ্যমের সমবেতচেষ্টার ফল

লাভ করিয়া উন্নত হইয়া উঠিবে অন্যথা হইলে ইহাদের উন্নতির পথ চিররুদ্ধ হইয়া পড়িবে।

পাদ্রীগণের আবেদনপত্র ও রবিন্‌সন্‌-সাহেবের প্রতিবাদ তাৎকালিক আসামের রেভেনিউ কমিশনর মিঃ ফ্রান্সিস্‌ জেঙ্কিন্‌স্‌ সাহেব বঙ্গের ছোটলাট হ্যালিডেসাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। উদারহৃদয় জেঙ্কিন্‌স্‌-সাহেব বিস্তারিতভাবে স্বীয় মন্তব্য লিখিয়া রবিন্‌সন্‌সাহেবের মতের সমর্থন করেন। তিনি প্রতিপন্ন করেন, আসামের শিক্ষাদীক্ষায় এ পর্য্যন্ত বাঙালীরাই নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। আসামের অধিকাংশ হিন্দু অধিবাসী বঙ্গদেশ হইতে সমাগত এবং তাঁহাদের ভাষা বঙ্গভাষা হইতে অভিন্ন,—আদালতে বাংলাভাষায় কাজ চলিতেছে, তাহাতে কোনই অসুবিধা হইতেছে না। তিনি প্রাচীন এবং বর্ত্তমান ইতিহাস আলোচনা করিয়া আসামের সঙ্গে বঙ্গদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাইতে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(১) মোগলেরা যখন আসাম জয় করেন, তখন মোগলবিচারালয় বঙ্গের সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আসামবাসিগণ সর্ব্বদা রাজকার্য্যের জন্য সেখানে যাতায়াত করিয়া বাংলাভাষায় সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ করিত। মোগলদিগের পূর্ব্বে কুচবিহারের কোচগণ আসামে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহারাও রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রচলিত বাংলাই ব্যবহার করিত,—ইহাদের আধিপত্যকালেও বাংলাই আসামে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

(২) আসামের আকোমি রাজাদিগের দ্বারা আনীত বহুসংখ্য কানোজী এবং শান্তিপুরী ব্রাহ্মণের উপর আসামের অধিবাসিগণের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। আসামের ৭০০ সাত শত দেবালয়ের পৌরোহিত্যে তাঁহারাই নিযুক্ত ছিলেন। এই বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বঙ্গভাষা আসামের সর্ব্বত্র প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল।

(৩) ইংরেজগণকর্তৃক আসামবিজয়ের পর তদ্দেশীয় প্রধান প্রধান বংশের সন্তানগণকে রীতিমত বাংলা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। আদালতে বাঙালী কর্ম্মচারিগণের সংখ্যাই অধিক, কারণ আসামী লোক ততদূর শিক্ষিত নহে; এখন কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহারা বাংলা শিখিয়া উন্নতির চেষ্টা পাইতেছে ও বৎসর বৎসর বহুসংখ্যক আসামীলোক রাজকার্য্যে প্রবেশলাভ করিতেছে।

(৪) আসামের পূর্ব্বাংশেরও বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত পরিবার দীর্ঘকাল বাংলাদেশে নির্ব্বাসিত ছিলেন, সুতরাং বাংলা তাঁহাদের পক্ষেও অনায়াসসাধ্য হইয়াছে।

জেঙ্কিন্সসাহেব প্রমাণিত করেন—বাংলা আসামবাসিগণের নিত্যব্যবহৃত ভাষা,—ইহা শিক্ষা করিতে তাহারা কখন কোন অসুবিধাবোধ করে নাই। বাংলাভাষায় বঞ্চিত করিলে তাহাদিগের সমস্ত উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে।

ওয়েল্‌সের বিদ্যালয়সমূহে একবার গভর্মেণ্ট ইংরেজীভাষার পরিবর্ত্তে ওয়েল্‌সের ভাষা প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তদ্দেশবাসীরা স্কুলে স্বীয় শিশুদিগকে পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছিল। কেহ কেহ

অনুমান করেন, এচ্ ভাষাব মধ্যে একরূপ একটি আবেগ ও শক্তি নিহিত আছে, যাহাতে ইহা গ্রীক্‌ভাষার সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারে, তাঁহাদের কবি বাবন্‌স্ সেই ভাষাতেই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন—তথাপি তদ্দেশবাসীরা ইংরেজীভাষাই শিক্ষা করিয়া থাকে।

এই প্রাদেশিক বিভিন্নতা সাধারণ ভাষাটিকে বহু বিচিত্র উপকরণ হইতে বলসঞ্চয় করিতে সুবিধা দেয়—সেই ভাষা ক্রমে সমাজের অধস্তন স্তর পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া কথিতভাষাগুলিকে ধীরে ধীরে মার্জ্জিত করিয়া তোলে এবং বহুসংখ্যক লোকের সমবেতচেষ্টার ফল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশকে প্রদান করিয়া এক বৃহৎ জনপদের চিন্তাশক্তিকে উর্ব্বর করিয়া প্রবাহিত হয়।

জেঙ্কিন্স ও রবার্টসন্ সাহেবের এই সকল অকাট্যযুক্তি সত্ত্বেও আসাম হইতে বঙ্গভাষা বিতাড়িত হইয়াছে। ঐ আবেদনপত্রপ্রেরণের কিছুকাল পরে আসামের চিফ্ কমিশনরের পদ সৃষ্ট হইয়া উক্ত প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং পাদ্রীগণের মনোরথ ও স্বার্থ সিদ্ধ হইবার নানারূপ সুবিধা উপস্থিত হয়। জেঙ্কিন্সসাহেব আসামীভাষায় পুস্তকের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"আসামবাসিগণ যদি বাংলাপুস্তক পড়িতে না পায়, তবে এই পাদ্রীগণপ্রচারিত কয়েকখণ্ড পুস্তিকা তাহাদের সম্বল হইবে—তাহাদের ধর্ম্মকথা লোকেরা অতিশয় তিক্ত বলিয়া মনে করে, এবং ধর্ম্মকথা ছাড়া তাহাদের মুদ্রাযন্ত্র হইতে অপরাপর যে কয়খানি সামান্যসংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিকেও খ্রীষ্টানী মনে করিয়া লোকেরা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে।"

কিন্তু পরিণামে যাহাদের জয়, তাহারাই প্রকৃত জয়ী,—পাদ্রীগণের চেষ্টাই সার্থক হইয়াছে। আসামবাসী ভ্রাতৃমণ্ডলী বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের ততটা পর হইয়া যান নাই,—বাংলাভাষা হইতে বিচ্যুত হইয়া যতটা হইয়াছেন। আসামীভাষা ও বাংলাভাষা এক। যাঁহারা প্রাচীনসাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, আসামের শঙ্কর ও চট্টগ্রামের শ্রীকরনন্দীর কাব্য দুইই আধুনিক বাংলা হইতে তুল্যদূরে অবস্থিত, অথচ শ্রীকরনন্দীকে আমরা বাংলা কবিতার নির্ম্মাণকর্ত্তাদের আসনে বসাইয়াছি, শঙ্করকে পারি নাই। এখনও চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের কথিতভাষার সঙ্গে লিখিত বঙ্গভাষার তুল্যরূপই প্রভেদ, অথচ আসাম আমাদিগের ভাষার গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঢাকানিবাসী শাঁখারীদের কথা বোধ হয় কলিকাতার লোক কোনক্রমেই বুঝিবেন না,—একরূপ প্রাদেশিক শব্দ-উচ্চারণ-প্রভেদ বঙ্গের জেলায় জেলায় বিদ্যমান,—কিন্তু বাংলা লিখিবার সময় সমস্ত প্রভেদ কোথায় চলিয়া যায়—আমাদের প্রতি জেলার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ঘনিষ্ঠরূপে অনুমিত হয়। আমরা চট্টগ্রাম হইতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, ঢাকা হইতে খ্যাতনামা কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং শ্রীহট্ট হইতে বাগ্মিবর বিপিনচন্দ্র পালকে পাইয়াছি। বঙ্গভাষা দূর—সুদূর হইতে ভ্রাতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া এক মুখ

সম্মিলনের সংঘটন করিয়াছে। কিন্তু আসাম হইতে আমরা কোন কবি বা গ্রন্থকারকে পাই নাই। সমগ্র বঙ্গদেশের সমবেত চেষ্টার সঙ্গে আসাম স্বীয় চেষ্টা মিশাইতে পারিলে তাহার উন্নতি যে দ্রুততর হইত, তাহার সন্দেহ নাই। বিশাল জ্যোতিষ্কের এক ভগ্নখণ্ড যেন সুদূরে পড়িয়া আছে,—তাহা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের আঁধার দূর করিতে পারিতেছে না—ইহা কি মুক্তি না অঙ্গহানি ?

ব্যক্তিগত বা জাতিগত অভিমানের উদ্রেক হওয়া সহজ। কিন্তু এই অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্মিলিত না হইতে পারিলে, ঐক্যবল কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। কোন ক্ষুদ্রপ্রদেশের কথিতভাষার স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করিয়া যদি কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে গৌরব প্রদান করিতে যান, তবে তদ্দেশবাসিগণ মনে করিতে পারে, ইহাতে তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হইল। কিন্তু যদি ভ্রাতা রত্ন লইয়া সাধিতে আইসেন, তাহাকে বাহিরে রাখিয়া দ্বাররোধ করায় কি গৌরব আছে ? ইহাতে প্রকৃত পরাজয় কার ?

পৃথিবীতে যে-কোন ভাষা অপূর্ব্বরূপে শ্রীশালিনী হইয়াছে, তাহা বহুপ্রদেশের লিখিতভাষারূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া উন্নত হইতে পারিয়াছে। বহুসংখ্যক প্রতিভান্বিত ব্যক্তির সমবেতচেষ্টার ফল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে বিতরণ করিয়া সেই ভাষা নিজেকে সার্থক করিতে পারিয়াছে। বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা শক্তিশূন্য; যে পর্য্যন্ত আমরা সংযুক্ত, সেই পর্য্যন্ত আমরা বলশালী। বাংলাভাষা এখন চারিদিক্ হইতে শক্তি-সংগ্রহ করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ইহাকে যে শক্তি প্রদান করিতেছে, তাহার ফল ইহা সমস্ত বাংলাদেশের গৃহে গৃহে বাঁটিয়া দিতেছে ইহার নবদৃপ্ত গর্ব্ব পৃথিবীর সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ করিবার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা এখনও বিচ্ছিন্ন হই নাই,—ভাবী বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কায় আমরা প্রীতির বন্ধন দ্বিগুণিতরূপে উপলব্ধি করিতেছি। আমাদের ইতিপূর্ব্বে ভ্রমেও মনে হয় নাই যে, হৃদয়রক্তে যাঁহাদের প্রীতি পুষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া এক ঘরে কোলাহল করিয়াছি, একত্র এক ভাষার আরাধনা করিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিরহ ঘটিবে —আমাদের বহুতপস্যাপ্রসূত বঙ্গভাষার পুনশ্চ খণ্ডবিখণ্ড হইবার আশঙ্কা হইবে। আসাম গিয়াছে,—আসামবাসীর সঙ্গে আমাদের এখন কতটা প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের সঙ্গে তুলনা করিলে সেই অনৈক্য আমরা গাঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হওয়ার সুযোগ পাইয়া সংস্কৃত এরূপ অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছিল, —ইহার সেবক নেপাল ও মহীশূর হইতে, কামরূপ ও পাঞ্জাব হইতে বিশাল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই ভাষার শ্রীসাধনে তৎপর ছিল। ভাষার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ করিলে তাহার সমস্ত ভবিষ্যতের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। আসামের ভাগ্যে যেরূপ পাদ্রী-মহাশয়গণ অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, কালে পূর্ব্ববঙ্গের স্কন্ধে তদ্রূপ কোন হিতৈষী বন্ধু

আরূঢ় না হইলে বাঁচা যায়। পূর্ব্ববঙ্গ যদি সত্যই এদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে আসামের উদাহরণে ভাষাচ্ছেদ না ঘটে—ইহাই বিশেষরূপে প্রার্থনীয় হইবে।

মল্‌ফুজাতি তাইমুরী।

মলফুজাতি তাইমুরী নামক পুস্তকে তাইমুরের আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ১৪০৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে তাইমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন,- সেই সময়ের মুসলমান সম্রাট্‌গণ কিরূপ ধর্ম্মের ভাবে মাতিয়া উঠিতেন, ধনলিপ্সা হইতে ধর্ম্মবিস্তারের প্রয়াসই তাঁহাদিগের সমস্ত উদ্যমকে কিরূপে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিত, তাহা তাইমুরের আত্মবিবরণীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহ তাঁহাদিগকে পররাজ্যবিজয়ে প্রণোদিত করিত। যে সকল স্থানে বিপক্ষগণ মস্তক অবনত করিতেন, সে স্থলে সেই মস্তকের একটি কেশও তাঁহারা স্পর্শ করিতেন না—তাঁহাদের রত্নভাণ্ডারের উদ্‌ঘাটিত দ্বারও মুসলমান জেতাগণের লুব্ধদৃষ্টি আকৃষ্ট করিত না। ধনের লোভে কৌশলে দেশজয় করা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্মব্রতে দীক্ষিত হইয়া নৃশংসের ন্যায় অস্ত্রচালনায়ও একটা পৌরুষ আছে,—কুসংস্কার মার্জ্জনীয়, যদি সেই সংস্কার অকপট হয়, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা কখনই শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারে না।

রুষ ও জাপানের যুদ্ধে রুষের সঙ্গে আমাদের কস্মিন্ কালেও সহানুভূতি থাকিতে পারে না। মুসলমানগণের দেশজয়ের চেষ্টার মূলে ছিল দৃঢ় অকপট ধর্ম্মবিশ্বাস, সেই বিশ্বাস অন্ধ হউক এবং তাঁহাদের সমস্ত অনুষ্ঠান নৃশংস হউক—তথাপি কৌশলে পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার অভিসন্ধিকে ঈশ্বরের বেদীতে স্থাপন করিয়া হস্তপ্রসারণ অতি হেয়। মুসলমানগণের অন্ধতা ও বর্ব্বরতার মধ্যে শ্রদ্ধা করিবার অনেক সামগ্রী পাওয়া যায়—কিন্তু শুধু অর্থান্বেষণবৃত্তির চেষ্টায় যে নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কোন উজ্জ্বল দিক্ নাই।

তাইমুরের আত্মকাহিনীতে হিন্দুগণের প্রতি একটিও প্রিয় কথা নাই,—উহার প্রতিপত্রে হিন্দু পৌত্তলিকের প্রতি গাঢ় অবজ্ঞা ও ঘৃণার কথা দৃষ্ট হয়; তথাপি উহা পড়িয়া মনে হয়, তাইমুর যে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া ছিলেন—সে স্থানে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা অসম্ভব নহে। তিনি হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্মকথাও তাঁহার বিদিত ছিল না, তথাপি দেখা যায়, তিনি প্রবল ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ ছিলেন—বিশ্বাসই তাঁহার তরবারিকে শাণিত করিয়া দিয়াছিল। সেই তরবারির ঘা' খাইয়াও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, তাইমুর সরল অকপট যোদ্ধা—তিনি ভ্রান্ত বা উন্মত্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার একটা উচ্চ তপস্যার ভাব ছিল।

এস্থলে আমরা তাঁহার আত্মবিবরণী হইতে কতকাংশ নিম্নে সঙ্কলন করিলাম।

"এই সময়ে (অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে) কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া 'গাজি' হইবার জন্য আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। আমি জানিলাম, কাফেরদিগকে যে হত্যা করিতে পারে, সেই 'গাজি'নাম পাইতে পারে এবং

যদি এইরূপ যুদ্ধ করিয়া কোন মুসলমান হত হয়, তবে সে বেহস্তে যায়। এই ভাবে উত্তেজিত হইয়া আমি কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা স্থির করিলাম, কিন্তু চীনবাসী কাফেরদিগের বিরুদ্ধে অথবা হিন্দুস্থানবাসী কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিব, অনেকদিন তাহা স্থির করিতে পারি নাই। এই বিষয়টি মীমাংসা করিবার জন্য আমি কোরাণ খুলিয়া খোদাতালার ইচ্ছা জানিতে লক্ষণ খুঁজিলাম। কোরাণের যে বয়েৎটি আমার প্রথম চক্ষে পড়িল, তাহা এই—'হে স্বর্গীয় দূত, তুমি নাস্তিক ও কাফেরদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে দমন কর।'

"আমার সচিবের মধ্যে অনেকে বলিল,—'হিন্দুস্থানের অধিবাসিগণ নাস্তিক ও কাফের।'

"সর্ব্বশক্তিমান্ খোদাতালার আদেশানুসারে আমি কাফেরদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করা স্থির করিলাম। রাজ্যময় আদেশ প্রচার করিয়া দিলাম—যেন প্রধান আমিরবর্গ, জ্ঞানবৃদ্ধগণ এবং সেনাপতিগণ অগোণে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইলেন, তখন আমি বলিলাম, 'খোদাতালা ও মহম্মদের আদেশে আমাদিগের কাফেরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে, এই ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য আমি প্রস্তুত,—এখন চীন কিংবা ভারতবর্ষ, এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন্‌টির বিরুদ্ধে যাত্রা করিব, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে আপনাদের মত কি?'

"তাঁহারা অনেক জ্ঞানগর্ভ ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা বলিলেন এবং শেষে জানাইলেন, 'ভারতবর্ষবিজয়ের চারিপ্রকার অন্তরায় আছে, তাহা আয়ত্ত না করিলে দেশাধিকারের সম্ভাবনা নাই।'

"'প্রথম অন্তরায়—পঞ্চনদ। এই স্বাভাবিক বাধা সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের পথে দাঁড়াইবে—উপযুক্তসংখ্যক নৌকা ও সেতুর ব্যবস্থা না করিতে পারিলে নদী অতিক্রম করিবার উপায় নাই।

"'দ্বিতীয় অন্তরায়—ভারতবর্ষের অভেদ্য ও দুরতিক্রম্য বনরাজি, অনেকস্থলে পাহাড় ভেদ করিয়া যাইতে হইবে—তাহা বড়ই দুরূহ।

"'তৃতীয় অন্তরায় প্রবলপরাক্রান্ত কাফের রাজা ও জমিদারগণ। তাহারা বন্যপশুর ন্যায় ভয়ানক ও অদম্য।

"'চতুর্থ অন্তরায়—অসংখ্য হস্তী। এই হস্তিবলই ভারতবর্ষীয় লোকের প্রধান সহায়। মেঘের ন্যায় বিরাট্ হস্তিযূথকে অগ্রে স্থাপন করিয়া তাহারা যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকে। এই হস্তিগণ এরূপ সুশিক্ষিত যে, অনেকসময় বিপক্ষদলের অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে অশ্বের সহিত শুণ্ডদ্বারা শূন্যমার্গে উত্তোলন করিয়া সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করে,—অশ্ব ও অশ্বারোহী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।'

"কোন কোন সচিব বলিলেন, 'সুলতান মহম্মদ সবক্তগিন ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, আর আমাদের আমির (তাইমুরের উপাধি) কি সবক্তগিন অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন? ইচ্ছা করিবামাত্র একলক্ষ তাতারের অশ্বারোহী সৈন্য এই মুহূর্ত্তে তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে

দাঁড়াইবে। খোদাতালা এই ব্যাপারে অবশ্যই তাঁহাকে বিজয়ী করিবেন এবং তিনি অচিরে গাজি ও মুজাহিদের গৌরব প্রাপ্ত হইবেন।'

"কুমার শা'রুক্ বলিলেন—'ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্য,—সেস্থান অধিকার করিতে পারিলে আমরা পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পাইব। আমি পারস্যদেশীয় সুলতানগণের ইতিহাসে পড়িয়াছি যে, ভারতবর্ষের সম্রাট্গণ গর্ব্বিত 'দারাই'উপাধি গ্রহণ করেন। পারস্যের সুলতানের উপাধি—'কিস্র', তাতারাধিপতিগণের উপাধি—'থাকন', চীনসম্রাটের উপাধি—'ফাগফুর' এবং ইরান ও তুরাণের অধিপতির উপাধি—'শাহানশা'। ভারতবর্ষীয় সম্রাট্গণ সর্ব্বদাই 'শাহানশা'র আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আমরাই খোদাতালার ইচ্ছায় এখন ইরান ও তুরাণের 'শাহানশা'—সুতরাং ভারতবর্ষের রাজগণের উপর আমাদিগের প্রভুত্ব না থাকা বড়ই ক্ষোভের বিষয়।'

"কুমার মহম্মদ সুলতান বলিলেন—'যে দেশের অধিবাসিগণের অধিকাংশই কাফের, পৌত্তলিক এবং সূর্য্যের উপাসক, তাহাদিগের মধ্যে সত্যধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্য। আর শুনা যায় যে, ভারতবর্ষে হীরা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ১২টি খনি আছে, সে দেশের তৃণগুল্ম চিরহরিৎ ও স্নিগ্ধবর্ণ, ফুল না থাকিলেও সেখানকার তরুরাজি সুগন্ধ, সেখানে অপর্য্যাপ্ত ইক্ষু জন্মে। এস্থান অধিকারভুক্ত রাখা প্রয়োজনীয়।'

"কিন্তু কোন কোন সচিব বলিলেন—খোদাতালার প্রসাদে আমরা ভারতবর্ষ জয় করিতে পারি, কিন্তু সেখানে যাইয়া যদি বাসস্থাপন করি, তবে আমাদের সন্তানগণের সকল বিষয়ে অবনতি হইবে এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই আমরা তদ্দেশবাসিগণের ন্যায় বলবীর্য্যশূন্য ও ভীরু হইয়া পড়িব।' এই কথায় আমিরগণ ও সেনাপতিবর্গ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম—'আমার উদ্দেশ্য নয় যে, সেখানে যাইয়া বাস করা হইবে। এই ধর্ম্মযুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি তদ্দেশবাসীদিগকে পবিত্র ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিব—সে দেশের ঘৃণিত পৌত্তলিকতা, বহু ঈশ্বরের উপাসনা এবং নাস্তিকতার ভিত্তি বিচলিত করিব—তাহাদের মন্দির ও বিগ্রহগুলা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং খোদাতালার নিকট গাজি ও মুজাহিদ্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইব।'

"আমার কথায় সকলে যেন একটু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতিপ্রদান করিল, কিন্তু এইসময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'যাঁহারা বিশ্বাস করেন, "খোদাতালা একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং মহম্মদ তাঁহার দূত", তাঁহাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বত্র ইস্লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা এবং যে-কোন স্থানে সত্যধর্ম্মের শত্রু থাকে, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা—ইহা অপেক্ষা উন্নততর ব্রত ইস্লামধর্ম্মাবলম্বীদিগের আর কিছু নাই।' এই উৎসাহপূর্ণ শাস্ত্রব্যাখ্যায় সমবেত সুধীমণ্ডলীর সমস্ত দ্বিধা ঘুচিয়া গেল, তাঁহারা জানু পাতিয়া বসিয়া খোদাতালার স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং হিন্দুস্থানযাত্রার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু হজরত

সেক্ জৈহাদ্দিন সাহেবের নিকট আমি ধর্ম্মার্থ যুদ্ধসঙ্কল্পের কথা লিখিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার পত্রের একপার্শ্বে এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন—'এতদ্দ্বারা আবুল গাজি তাইমুরকে (ঈশ্বর তাহার সহায় হউন) জানান যাইতেছে যে, এই ধর্ম্মকার্য্যের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে ইহকালে ও পরকালে বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিবেন, এবং তিনি নির্ব্বিঘ্নে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।' তিনি আমাকে একখানি বৃহৎ তরবারি পাঠাইলেন, আমি তাহাই আমার রাজদণ্ডস্বরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলাম।"

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায়, তাইমুর রত্নলোভে দিগ্‌দেশ জয় করিয়া বেড়ান নাই,—তিনি প্রচারক ও ধর্ম্মযাজকের বেশে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি গুরুর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ধর্ম্মোদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তিনি ভারতবর্ষের রত্নভাণ্ডারের প্রতি গৃধ্রবৎ লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া এই দেশকে গ্রাস করিতে আইসেন নাই। ধর্ম্মবিশ্বাস উন্মত্তকে শ্রদ্ধাস্পদ করে, বর্ব্বরের মস্তকে সম্ভ্রমের উষ্ণীষ বাঁধিয়া দেয়। আমাদের নিরীহদেশ অন্ধ ধর্ম্মপ্রচারকগণের হস্তে বারংবার বিড়ম্বিত হইয়াছে, তথাপি অকপট বিশ্বাসের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব না হইয়া যায় না।

পরের পরদেশের প্রতি লোলুপদৃষ্টি ঘৃণার উদ্রেক করে। স্বার্থসাধনের চেষ্টায় হৃদয়ের উচ্চ ভাবগুলি শুষ্ক হয়,—কপটতা ন্যায়ের ছদ্মবেশ পরিয়া প্রতারণা করিয়া যায়, এবং কোন উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখা অসম্ভব হয়। ধর্ম্মের অন্ধতা শুধু ফলাফলের হিসাবে তুল্য বা অধিকতর অনিষ্টকর হইলেও, উহাতে মানুষের উন্নত ভাবগুলিকে সতেজ ও পরিপুষ্ট করিয়া আদর্শকে সমুজ্জ্বল করে এবং বর্ব্বরতাকে ত্যাগের ভাবে মহিমান্বিত করিয়া দেখায়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

স্বীকার।

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার
　　　করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে
　　　বরিব হে।
শুধু আপনার মনে নয়,
আপন ঘরের কোণে নয়,
　শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে!
　তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,

সেই-সভা-মাঝে তোমারে স্বীকার
করিব হে!
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে!

সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার
করিব হে।
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে
বরিব হে!
কেবলি তোমার স্তবে নয়
শুধু সঙ্গীতরবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে!
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার
করিব হে।
প্রিয়-অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে।

জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার
করিব হে!
জানি বলে' নাথ তোমারে জীবনে
বরিব হে!
শুধু জীবনের সুখে নয়,
শুধু প্রফুল্লমুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে।
দুখশোক যেথা আঁধার করিয়া রহে
নত হ'য়ে সেথা তোমারে স্বীকার
করিব হে!
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে!

বঙ্গদর্শন।

"গুরুদক্ষিণা।" *

(সমালোচনা।)

সতীশ যখন প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিল, সে অধিকদিনের কথা নহে। তখন সে কিশোরবয়স্ক—কলেজে পড়িতেছে—সঙ্কোচে-সম্ভ্রমে বিনম্র-মুখে অল্পই কথা।

কিছুদিন আলাপ করিয়া দেখিলাম, সাহিত্যের হাওয়াতে পক্ষবিস্তার করিয়া-দিয়া সতীশের মন একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়াছে। এ বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যের মধ্যে ব্রাউনিং তখন সতীশকে বিশেষভাবে মাবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। খেলাচ্ছলে ব্রাউনিং পড়িবার জো নাই। যে লোক ব্রাউনিংকে লইয়া ব্যাপৃত থাকে, সে হয় ফ্যাশানের খাতিরে, নয় সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতই এ কাজ করে। আমাদের দেশে ব্রাউনিঙের ফ্যাশান্ বা ব্রাউনিঙের দল প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সুতরাং ব্রাউনিং পড়িতে যে মনোনিবেশের শক্তি, যে অনুরাগের বল আবশ্যক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুরপরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

যে সময়ে সতীশের সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়ে বোলপুর-ষ্টেশনে আমার পিতৃদেবের স্থাপিত "শান্তিনিকেতন" নামক আশ্রমে আমি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দ্বিজবংশীয় বালকগণ যে ভাবে, যে প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানপ্রচলিত পাঠ্য-বিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরুশিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক শুদ্ধ-

* ৺ সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত। বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য।৵০ ছয় আনা।

শুচি-সংযত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মনুষ্যত্বলাভ করিবে, এই আমার সঙ্কল্প ছিল।

বলা বাহুল্য, এখনকার দিনে এ কল্পনা সম্পূর্ণভাবে কাজে খাটানো সহজ নহে। এমন অধ্যাপক পাওয়াই কঠিন, যাঁহারা অধ্যাপন-কার্য্যকে যথার্থ ধর্ম্মব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। অথচ বিদ্যাকে পণ্যদ্রব্য করিলেই গুরুশিষ্যের সহজ সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়—ও তাহাতে এরূপ বিদ্যালয়ের আদর্শ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম—তখন সতীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে হঠাৎ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীতস্বরে কহিল "আমি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য ?"

তখনো সতীশের কলেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই। সে আর কিছুর জন্যই অপেক্ষা করিল না, বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিল।

ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জ্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়বন্ধুদের কাছ হইতে কিরূপ বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের হৃদয় অনেকদিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সঙ্কল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহারা বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না—প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে সমস্ত ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া, বিরোধ, বিকার, অসামঞ্জস্য অনিবার্য্য, তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্বচ্ছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ করা দূরে থাক্, চক্ষেও দেখিবার আশা করা যায় না, যাহার মানসী মূর্ত্তির সহিত কর্ম্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের স্তূপাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে—যাহারা উৎসাহের জন্য বাহিরের দিকে তাকায়, এ কাজ তাহাদের নহে—কাজও করিতে হইবে নিজের শক্তিতে, তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে—নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভাণ্ডার সকলের নাই।

বিধাতার বরে সতীশ অকৃত্রিম কল্পনা-সম্পদ্ লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের ভিতরে বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরন্তনকে সহজে দেখিতে পাইত। যে ব্যক্তি ভিখারী শিবের কেবল বাঘছাল এবং ভস্মলেপটুকুই দেখিতে পায়, সে তাঁহাকে দীন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া যায়—সংসারে শিব তাঁহার ভক্তদিগকে ঐশ্বর্য্যের ছটা বিস্তার করিয়া আহ্বান করেন না—বাহ্যদৈন্যকে ভেদ করিয়া যে লোক এই ভিক্ষুকের রজতগিরিসন্নিভ নির্ম্মল ঈশ্বরমূর্ত্তি দেখিতে পান, তিনিই শিবকে লাভ করেন—ভুজঙ্গবেষ্টনকে তিনি বিভীষিকা বলিয়া গণ্য করেন না এবং এই পরম কাঙালের রিক্ত ভিক্ষাপাত্রে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করাকেই চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান করেন।

সতীশ প্রতিদিনের ধূলিভস্মের অন্তরালে, কর্ম্মচেষ্টার সহস্র দীনতার মধ্যে শিবের শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, তাঁহার সেই তৃতীয় নেত্র ছিল। সেইজন্য এত অল্প বয়সে, এই শিশু অনুষ্ঠানের সমস্ত দুর্ব্বলতা-অপূর্ণতা—সমস্ত দীনতার মধ্যে তাঁহার উৎসাহ-উদ্যম অক্ষুণ্ণ ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। বোলপুরের এই প্রান্তরের মধ্যে গুটিকয়েক বালককে প্রত্যহ পড়াইয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো উত্তেজনার বিষয় ছিল না, লোকচক্ষুর বাহিরে, সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও আত্মনামঘোষণার মদমত্ততা হইতে বহুদূরে একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রণালীর সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়া আপন তরুণ জীবনতরী যে শক্তিতে সতীশ প্রতিদিন বাহিয়া চলিয়াছিল, তাহা খেয়ালের জোর নয়, প্রবৃত্তির বেগ নয়, ক্ষণিক উৎসাহের উদ্দীপনা নয় তাহা তাহার মহান্ আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মপরিতৃপ্ত শক্তি।

বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্বন্ধেই সতীশকে আমি নিকটে পাইয়াছিলাম, তাহার অন্তরাত্মার সহিত আমার যথার্থ পরিচয় ঘটিতেছিল। এই বিদ্যালয়ের কল্পনা আমার মনের মধ্যে যে কি ভাবের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া না বলিলে এ রচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার কোনো বন্ধুকে আমি এই বিদ্যালয়সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

"মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্ব্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটীর রচনা করিয়া পত্নী, বালকবালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন-আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চায় রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য, অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রকার-বেষ্টনহীন নির্ম্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে,—যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা হউক বা রুশ রাজা হউক্, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত ;—আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি ; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক, কে আমাদের ষ্টেট্‌সেক্রেটারি, কে আমাদের ভাইস্‌রয়—কে কোন্ আইন করিল, এবং কে সে আইন উল্টাইয়া দিল, আমরা সে খবর রাখি না। আকাশ তাহার গ্রহতারকা-মেঘরৌদ্রে এবং প্রান্তর তাহার তৃণে-গুল্মে ও ঋতুপর্য্যায়ে আমাদের প্রাত্যহিক খবরের কাগজ। আমাদের তপোবনবাসীদের জন্মমৃত্যুবিবাহের অনুষ্ঠানপরম্পরা এখানকার নিভৃতশান্তি ও

সরল সৌন্দর্য্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা হোম-ধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে, এবং বালিকারা গোদোহনকার্য্য সারিয়া কুটীর-প্রাঙ্গণে, গৃহকার্য্যে শুচিস্নাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীদের সহিত যোগ দেয়।

"জানি, আলোকের সঙ্গে ছায়া আসে, স্বর্গোদ্যানেও সয়তানের গুপ্তসঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়াই কি আলোককে রোধ করিয়া রাখিব, এবং স্বর্গের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে? যদি বৈদিক-কালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি সয়তানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়া-মে'র দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সঙ্কল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা; ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার অব-মাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। নহিলে আমরা আশ্রয় লইব কোথায়, আমরা বাঁচিব কি করিয়া? আমাদের মাথা তুলিবার স্থান ত নাই-ই, মাথা রাখিবার স্থানও প্রত্যহ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রবল য়ুরোপ বন্যার মত আসিয়া আমাদের সমস্তই পলে পলে তিলে তিলে অধিকার করিয়া লইল। এখন নিরাসক্ত চিত্ত, নিষ্কাম কর্ম্ম, নিঃস্বার্থ জ্ঞান এবং নির্ব্বিকার অধ্যাত্মক্ষেত্রে আমা-দিগকে আশ্রয় লইতে হইবে। সেখানে সৈনিকদের সহিত আমাদের বিরোধ নাই, বণিক্‌দের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা নাই, রাজপুরুষদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ নাই—সেখানে আমরা সকল আক্রমণের বাহিরে, সকল অগৌরবের উচ্চে।"

আমার এই চিঠি পড়িয়া অনেকের মনে অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে, তাহা আমি জানি। তাঁহারা বলিবেন, "বর্ত্তমানকাল যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তবে অতীতকালের মধ্যে পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিব, ইহা কাপুরুষের কথা।"

এ প্রবন্ধে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চলে না। সংক্ষেপে এইটুকু বলিব, ভারতবর্ষের নিত্যপদার্থটি যে কি, বাহির হইতে প্রবল আঘাত খাইয়া তবে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি। এমন অবস্থায় সেই নিত্য আদর্শের দিকে আমাদের অন্তরের একান্ত যে একটা আকর্ষণ জন্মে, তাহাকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য!

আর একটিমাত্র কথা আছে। আমি যে তপোবনের আদর্শকে অতীতকাল হইতে সঞ্চয় করিয়া মনের মধ্যে দাঁড় করাইতেছি, সে তপোবনে সমস্ত ভারতবর্ষ আশ্রয় লইতে পারে না—ত্রিশকোটি তপস্বী কোনো দেশে হওয়া সম্ভবপর নহে, হইলেও বিপদ্ আছে। এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সকল দেশের আদর্শই সে দেশের তপস্বীর দলই রক্ষা করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা যাহাকে স্বাধী-নতা বলিয়া জানেন, তাহার সাধনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কয়েকজনেই করিয়া থাকেন, বাকি অধিকাংশই আপন-আপন কর্ম্মে লিপ্ত। অথচ কয়েকজনের সাধনাই সমস্ত দেশকে সিদ্ধি-দান করে। ভারতবর্ষও আপন শ্রেষ্ঠ সন্তানের

মুক্তিতেই মুক্তিলাভ করিবে—কয়েকটি তপোবন সমস্ত দেশের অন্তরের দাসত্ববন্ধ মোচন করিয়া দিবে।

যাহাই হোক্, আমার সঙ্কল্পটিকে এতক্ষণ কেবলমাত্র কল্পনার দিক্ হইতে দেখা গেল। বলা বাহুল্য, কাজের দিক্ হইতে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এরূপ মনোরম এবং সুষমাবিশিষ্ট নহে। কোথায় তপস্বী, কোথায় তপস্বীর শিষ্যদল,—কোথায় সার্থক ব্রহ্মজ্ঞানের অপরিমেয় শান্তি, কোথায় একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের সৌম্যনির্ম্মল জ্যোতিঃপ্রভা? তবু ভারতবর্ষের আহ্বানকে কেবল বাণীরূপে নহে, কর্ম্ম-আকারে কোথাও বদ্ধ করিতেই হইবে। বোলপুরের প্রান্তরের প্রান্তে সেই চেষ্টাকে আমি স্থান দিয়াছি। এখনো ইহা রূপান্তরিত বাক্যমাত্র, ইহা আহ্বান।

সতীশ, অনাঘ্রাত পুষ্পরাশির ন্যায়, তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা বহন করিয়া এই নিভৃত শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া জীবনযাত্রার আরম্ভকালেই সে যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল, তাহা লইয়া একদিনের জন্যও সে অহঙ্কার অনুভব করে নাই—সে প্রতিদিন নম্রমধুর প্রফুল্লভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইত, সে যে কি করিয়াছিল, তাহা সে জানিত না।

এই শান্তিনিকেতন আশ্রমের চারিদিকে অবারিত তরঙ্গায়িত মাঠ—এ মাঠে লাঙলের আঁচড় পড়ে নাই। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় খর্ব্বায়তন বুনো খেজুর, বুনো জাম, দুইএকটা কাঁটাগুল্ম, এবং উয়ের ঢিবিতে মিলিয়া একএকটা ঝোপ বাঁধিয়াছে। অদূরে ছায়াময় ভুবনডাঙা-গ্রামের প্রান্তে একটি বৃহৎ বাঁধের জলরেখা দূর হইতে ইস্পাতের ছুরির মত ঝলকিয়া উঠিতেছে এবং তাহার দক্ষিণ পাড়ির উপর প্রাচীন তালগাছের সার কোনো ভগ্ন দৈত্যপুরীর স্তম্ভশ্রেণীর মত দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের মাঝে মাঝে বর্ষার জলধারায় বেলেমাটি ক্ষইয়া গিয়া নুড়ি-বিছানো কঙ্করস্তূপের মধ্যে বহুতর গুহা-গহ্বর ও বর্ষাস্রোতের বালুবকীর্ণ জলতলরেখা রচনা করিয়াছে। জনশূন্য মাঠের ভিতর দিয়া একটি রক্তবর্ণ পথ দিগন্তবর্ত্তী গ্রামের দিকে চলিয়া গেছে সেই পথ দিয়া পল্লীর লোকেরা বৃহস্পতিবার-রবিবারে বোলপুর-সহরে হাট করিতে যায়, সাঁওতালনারীরা উলুখড়ের আঁটি বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে চলে এবং ভারমন্থর গোরুর-গাড়ি নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আর্ত্তশব্দে ধূলা উড়াইয়া যাতায়াত করে। এই জনহীন তরুশূন্য মাঠের সর্ব্বোচ্চ ভূখণ্ডে দূর হইতে ঋজুদীর্ঘ একসারি শাল-বৃক্ষের পল্লবজালের অবকাশপথ দিয়া একটি লৌহমন্দিরের চূড়া ও একটি দোতলা কোঠার ছাদের অংশ চোখে পড়ে—এইখানেই আমলকী ও আম্রবনের মধ্যে মধূক ও শালতরুর তলে শান্তিনিকেতন আশ্রম।

এই আশ্রমের এক প্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃণ্ময়কুটীরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শালতরুশ্রেণীর তলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্য্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্দ্ধদেশে

আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার উদ্ঘাটিত উন্মুখ হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পরার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভিঘাতে ও কল্যাণসাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।

এই সময়ে সতীশ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদের জন্য উতঙ্কের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া "গুরুদক্ষিণা"নামক কথাটি রচনা করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কথাগ্রন্থটির মধ্যে সতীশ তাহার ভক্তিনিবেদিত তরুণ হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত আশা ও আনন্দ রাখিয়া গেছে—ইহা শ্রদ্ধার রসে সুপরিণত ও নবজীবনের উৎসাহে সমুজ্জ্বল—ইহার মধ্যে পূজাপুষ্পের সুকুমার শুভ্রতা অতি কোমলভাবে অম্লান রহিয়াছে। এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মত রচনা করে নাই - এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস, ছায়া ও সতীশের সদ্য-উদ্বোধিত প্রফুল্ল নবীনহৃদয়ে মিলিয়া গানের মত করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

গ্রন্থসমালোচনা করিতে বসিয়া গ্রন্থের কথা অতি অল্পই বলিলাম, এমন অনেকে মনে করিতে পারেন। বস্তুত তাহা নহে। সতীশের জীবনের যে অংশটুকু আমি জানি, সেই অংশের পরিচয় এবং এই গ্রন্থের আলোচনা, একই কথা। এই বুঝিয়া পাঠকগণ যখন "গুরুদক্ষিণা" পাঠ করিবেন, তখনই তাঁহারা এই গদ্যকাব্যটির সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারিবেন। গ্রন্থে যাহা আছে, গ্রন্থই তাহার পরিচয় দিবে, গ্রন্থের বাহিরে যাহা ছিল, তাহাই আমি বিবৃত করিলাম।

সার সত্যের আলোচনা।

কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার।

বিগত প্রবন্ধে আমরা কাণ্টীয় দর্শনের অস্থি-সন্ধি-প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বিষম এক সঙ্কটস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। এই প্রদেশটির আশপাশের গলিঘুঁজিতে ভয়ানক ডাইনামাইট্—সর্ব্বসংশয়—নিশ্ছিদ্র যুক্তি-পরিচ্ছদে চাপাচুপি দেওয়া রহিয়াছে, তাহা আমি জানি। জানিয়াও তবু যে তাহাকে আমি ঘাঁটাইতে ভয় পাইতেছি না —সে কেবল দেশীয়শাস্ত্রের মন্থনসম্ভূত মৃত-সঞ্জীবনী সুধার মাহাত্ম্যগুণে। পাশ্চাত্য দর্শনের কিন্তু বড়ই দুর্দ্দশা! কাণ্টের সময়ের অনতিপূর্ব্বে ইউরোপীয় ভট্টাচার্য্য-মহলে নানা শ্রেণীর নানা দর্শনকার নানা মতামতের মনোরাজ্য বাতাসে ফাঁদিয়া সেই সেই মনোরাজ্যের গন্ধর্ব্বনগরগুলাকে স্বাভাবিক-

সত্যের ঢঙে সাজাইয়া আসিতেছিলেন সুনির্ভয়ে। কাণ্ট্ এক কথায় তাঁহাদের সুখস্বপ্ন জন্মের মতো ভাঙিয়া দিলেন। সে কথা এই যে, বাস্তবিক-সত্য মনুষ্যজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত।

গোড়াতেই তো আমি বলিয়াছি, "আগে যুদ্ধ—পরে শান্তি!" হে যাত্রি-ভায়া'রা! শান্তিসদনে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া বাহির হইতেছ বটে, কিন্তু মনে করিও না যে, বিনা যুদ্ধে অভীষ্ট-ফল-লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। ফণীন্দ্র মস্তক হইতে মণি উৎপাটন ক[illegible] সোজা কথা নহে। অতএব যুদ্ধের [illegible] হও! ধৈর্য্যের কবচ প[illegible] শাণিত কর! ফলে, এ[illegible] —যে দিক্ দিয়া দেখিলে মনে হয় যে, কাণ্টের দর্শন আগাগোড়া একটা কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড! এ কুরুক্ষেত্রের কুরু-পাণ্ডব হচ্চেন জ্ঞান এবং বাস্তবিক-সত্তা। যুধিষ্ঠির এবং দুর্য্যোধন দোঁহে দোঁহার ভ্রাতা ছিলেন কেবল জ্ঞাতি-সম্পর্কে; কিন্তু জ্ঞান এবং বাস্তবিক-সত্তা দোঁহে দোঁহার অর্দ্ধাঙ্গ—শিবদুর্গা বলিলেই হয়! স্ত্রীপুরুষের দাম্পত্য-কলহ সবাই জানে খড়ের আগুন; তা বই, তাহা যে এমনতরো একটা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' রকমের প্রলয়-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে—এ কথা পৃথিবীর আদিম-যুগ হইতে এ-কাল পর্য্যন্ত স্বপ্নেও কাহারো জানা ছিল না। বিবাদানল এত-দিন পর্য্যন্ত স্তূপাকার ভস্মরাশিতে আচ্ছাদিত ছিল, তাই লোকের তাহা চক্ষে পড়ে নাই। ভস্মরাশি আর-কিছু না—বাদাবাদের শব্দা-ড়ম্বর। সেই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিটাকে যুক্তি-তর্কের শুষ্ককাষ্ঠ দিয়া বিধিমতে খোঁচাইয়া-তুলিয়া কাণ্ট্-মহাসুধী কাণ্ড-এক বাধাইয়া-ছেন কম না! এখন সে অগ্নিটা'কে সাম্লানো দায়!

কাণ্টের খোঁচাখুঁচি।

কাণ্ট্ আপনার মন'কে সাম্‌নে ডাকিয়া-আনিয়া শুধাইলেন—"বল দেখি বৎস, কে আগে? বাস্তবিক-সত্তা আগে—না জ্ঞান আগে?" মন বলিল—"বাস্তবিক সত্তা।" মনের এ কথায় কাণ্টের বুদ্ধি সায় দিল না। কাণ্ট মুনি ধ্যানে বসিলেন। তাঁহার মনো-মধ্যে ভাবনা ঢেউ খেলিতে লাগিল এইরূপ:—

"মন তো বলিবেই 'আগে সত্তা—পরে জ্ঞান।' এটাও তো সে বলে যে, 'পৃথিবী স্থির—সূর্য্য ঘুরিতেছে।' বিজ্ঞান তো আর তাহা বলে না। জগৎশুদ্ধ লোক যখন ইন্দ্রিয়-মনের কথায় ভুলিয়া একবাক্যে বলিতেছিল—'পৃথিবী স্থির—সূর্য্য ভ্রাম্যমাণ,' তখন বিজ্ঞা-নের অমোঘ আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া কোপর্নিকস্ একাকী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'না, তাহা নহে। সূর্য্য স্থির—পৃথিবী ভ্রাম্যমাণ!'* ইনি আমার গুরু। ইঁহার দৃষ্টান্তের মন্ত্রপূত অঞ্জনে চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া আমি

* We have here the same case as with the first thought of Copernicus, who, not being able to get on in the explanation of the movement of the heavenly bodies, as long as he assumed that all the stars turned round the spectator, tried, whether he could not succeed better by as-

দেখিতেছি এই যে, সংবিৎ স্থির রহিয়াছে ; আর, তাহারই সাক্ষিতাগুণে জ্ঞেয়বস্তু-সকলের সত্তা সংসিদ্ধ হইতেছে ;—আগে জ্ঞান, পরে সত্তা, তাহাতে আর ভুল নাই।" এ তো পঞ্চদশীর কথা ! পঞ্চদশীতে স্পষ্ট লেখা আছে—

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ম্প্রভা॥

মাস, অব্দ, যুগ, কল্প অনেকধা গতায়াত করিতেছে—তার মাঝে উদয়ও হ'ন না, অস্তও যান না, একা কেবল সংবিৎ, যিনি স্বয়ম্প্রভা।" তবে তো কাণ্ট্ প্রতীতিবাদী (Idealist) ! কাণ্টের হস্ত হইতে "বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমালোচনা" প্রথম যখন বাহির হইয়াছিল, তখন তদ্দৃষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ভাবিয়াছিলেনও তাই। দ্বিতীয় সংস্করণে কাণ্ট্ তাঁহাদের ভুল ভাঙিয়া দিলেন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া।

সংশয়বাদের গোড়া'র সূত্র।

"দ্রষ্টার সাক্ষিতাগুণে বাস্তবিক-সত্তা সিদ্ধ হয়"—এই কথাটি কাণ্ট্ ইঙ্গিত-আভাসে জ্ঞাপন করিয়া অতবড় একটা লোকবিরুদ্ধ কথা'র তাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া শেষে তিনি এক-পা এক-পা করিয়া পিছাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অগ্রপশ্চাৎ ঠাহরিয়া দেখিয়া বলিলেন—"কথাটা অযথা নহে —জ্ঞানের সাক্ষিতাগুণেই বাস্তবিক-সত্তা সিদ্ধ হয়, তাহাতে আর ভুল নাই ; কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে, জ্ঞানের সাক্ষিতাগুণে সে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা কেবল ভাব-রাজ্যের বাস্তবিক-সত্তা, তা বই, তাহা সত্য-রাজ্যের বাস্তবিক-সত্তা নহে—প্রকৃত বাস্তবিক-সত্তা নহে।" কাণ্টের এ কথা'র ভাব-টা বুঝিতে পারা গিয়াছে ; তাহা এই ;—

ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি (viceroy) সত্যসত্যই কিছু আর ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ নহেন ; সত্যসত্যই তাহা তিনি না হউন্, কিন্তু তথাপি ভারতবাসীর নিকটে তিনি ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ-মহারাজেরই সামিল। তেম্নি [illegible] রাজ্যের মনোময়ী বাস্তবিক-স[illegible] বাস্তবিক-সত্তা না [illegible] নিকটে তাহা বাস্তবিক সত্তারই সামিল।

কাণ্টের এইপ্রকার দ্বৈধসূচক কথা শুনিয়া লোকের মনে সহজেই এইরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জ্ঞানের বলে সিদ্ধ-হয়-বলিতেছ সেই যে ভাবরূপী বাস্তবিক-সত্তা, তাহা যদি প্রকৃত বাস্তবিক-সত্তা নহে, তবে তাহা পদার্থটা কি ? কাণ্ট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন এই যে, তাহা আর-কিছু না—সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য synthetic unity of consciousness। তিনি বলেন—

It is clear also that as we can only deal with the manifold in our representations, and as the *x* cor

---

suming the spectator to be turning round and the stars to be at rest. A similar experiment may be tried in metaphysic, so far as the intuition of objects is concerned. ইতি কাণ্ট ·

responding to them (অর্থাৎ বাস্তবিক-সত্তা) is really nothing to us, it is clear, I say, that the unity necessitated by the object cannot be anything but the formal unity of our consciousness in the synthesis of the manifold in our representations.

ইহার বাংলা—

এটা যখন স্পষ্ট যে, আমরা কেবল আমাদের বহুধা-বিচিত্র প্রতীতিসমূহের সঙ্গেই কারবার করি, * আর সেই সঙ্গে এটাও যখন স্পষ্ট যে, সেই প্রতীতি-সমূহের পৃষ্ঠের আড়ালে বস্তু যাহা সংগোপিত আছে, তাহার সহিত আমাদের কোনো কারবার চলিতে পারে না তখন কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, যাহাকে আমরা বলি বস্তুর একত্ব (বা বস্তুগত একত্ব objective unity), তাহা প্রকৃতপক্ষে বস্তুর একত্ব নহে; তবে কি? না, সংবিতের যে একপ্রকার ঔপাধিক (অর্থাৎ formal কিনা উপাধিগত) একত্ব আমাদের প্রতীতি-বৈচিত্র্যের সংযোজনা-ব্যাপারে অধ্যারোপিত হয় (অর্থাৎ চাপানো হয়)—সে একত্ব সেই একত্ব। এ যে একটি কথা কাণ্ট্ বলিতেছেন—কি বলিতেছেন, তাহা কি পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন? তাহার প্রকৃত বৃত্তান্তটা হ'চ্চে এই :—

সংশয়বাদের নিজমূর্ত্তিধারণ।

মনুষ্যের জ্ঞান একপ্রকার জেলখানার কয়েদী। বাহিরে যে-দিকে সে চক্ষু ফিরায়, সেই-দিকেই দেখে—সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর—আকাশ; আপনার দিকে যখন চক্ষু ফিরায়, তখন-আবার দেখে হস্তপদ তাহার বাঁধা রহিয়াছে কালের অবিমোচ্য বন্ধন-রজ্জুতে। আকাশ-প্রাচীরের ও-পৃষ্ঠে রহিয়াছে জ্ঞেয়বস্তু-সকলের বাস্তবিক-সত্তা; কালরজ্জুর গোড়া বাঁধা

* প্রতীতি-শব্দের মুখ্য অর্থ representation। তার সাক্ষী—

(১) প্রতি = re।
(২) ইতি = presentation।
(৩) প্রতীতি = representation।

ইতি-শব্দের ধাত্বর্থ গতি। যাহা গতিসূত্রে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাকেই আমরা 'ইতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করি, আবার, তাহাই যখন আমাদের মনে প্রত্যুপস্থিত হয়, তখন তাহাকে বলি—প্রতীতি। বেদান্তদর্শনে তিন-প্রকার সত্তা'র উল্লেখ আছে—

(১) পারমার্থিক।
(২) ব্যাবহারিক।
(৩) প্রাতীতিক।

প্রাতীতিক সত্তা কি? না, প্রতীতিই (representationই) যাহার সর্ব্বস্ব, তা বই, বাস্তবিক-সত্তা'র সহিত যাহার দেখা-সাক্ষাৎ নাই—যেমন স্বপ্নের সত্তা। লোকমধ্যে প্রতীতি-(বা প্রত্যয়)-শব্দ সচরাচর বিশ্বাস-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহা তো হইবারই কথা :—মনে যাহা প্রতীয়মান হয় (comes to be represented), তাহার ইতিত্বে (সাক্ষাৎ objective presenceএ) বিশ্বাস সহজ-জ্ঞানের পক্ষে অনিবার্য্য। এইজন্য সহজ-জ্ঞানের শাস্ত্রে অর্থাৎ লোকের শাস্ত্রে প্রতীতি-(বা প্রত্যয়)-শব্দের অর্থ শুধুই-কেবল বিশ্বাস। পক্ষান্তরে, দার্শনিক পণ্ডিতগণের শাস্ত্রে ঘটপ্রত্যয়-শব্দে বুঝায়—ঘটের জ্ঞানগত ভাব বা representation বা Idea।

রহিয়াছে জ্ঞাতা'র বাস্তবিক-সত্তায়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বহিরিন্দ্রিয় আকাশ ভেদ করিয়া—আকাশের ও-পৃষ্ঠে যেখানে রহিয়াছে জ্ঞেয়বস্তু-সকলের বাস্তবিক-সত্তা—সেখানে পৌঁছিতে পারে না; তথৈব অন্তরিন্দ্রিয় (বা অন্তঃকরণ) কালের গঙ্গাস্রোতের উজানে চলিয়া—গোমুখী ছাড়াইয়া মহোচ্চ কৈলাসধামে যেখানে রহিয়াছে জ্ঞাতার বাস্তবিক-সত্তা—সেখানে পৌঁছিতে পারে না।

কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্র।

কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্রে গন্তব্য-পথের ঠিকানা যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে যাত্রিগণের উদ্যমভঙ্গ হইবারই কথা; কিন্তু তথাপি তাহা উপেক্ষণীয় নহে; যেহেতু কাণ্ট্ পাশ্চাত্য-দর্শনের পথপর্য্যটকদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্রে মাঝপথের প্রধান-প্রধান কতিপয় প্রদেশ-খণ্ড পরিচিহ্নিত হইয়াছে এইরূপেঃ—

এপারে রহিয়াছে জ্ঞাতা'র বাস্তবিক-সত্তা। ওপারে রহিয়াছে জ্ঞেয়বস্তু-সকলের বাস্তবিক-সত্তা। দুই পারের মাঝখানে রহিয়াছে—

(১) সংবিতের একত্ব এপার ঘেঁষিয়া, (২) বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য ওপার ঘেঁষিয়া, (৩) অন্তরিন্দ্রিয়ের (বা অন্তঃকরণের) সংযোজনারূপী আবর্ত্তের টান দুয়ের মধ্যস্থলে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বাস্তবিক-সত্তার ঐ যে দুই-দিকের দুই অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—এপার এবং ওপার, দুই পারই মনুষ্য-জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত অজ্ঞেয়-প্রদেশ। মানচিত্র-এ-যাহা আলেখ্যপটে লেখনী টানিয়া আঁকিয়া দেখানো হইয়াছে, ইহার যাথার্থ্য ফলে কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা একবার পদব্রজে পরীক্ষা করিয়া দেখা যা'ক্।

মানচিত্রের ফলপরীক্ষা।

গুরু বলিলেন—"করতলন্যস্ত-আমলকবৎ।" গুরুর মুখবিনির্গত ঐ তেজোময় বাক্যটি শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শিষ্যের কর্ণকুহরে তাহা প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তথাচ শিষ্য তাহার একটি অক্ষরও শুনিতে পাইলেন না। শিষ্যের কর্ণকুহরে যে তাহা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই; কেন না, একটু পূর্ব্বে ক্লান্তির প্রাদুর্ভাবে শিষ্যের চক্ষুদুটি বুজিয়া আসিতেছিল ক্রমশই অধিকাধিক মাত্রা, ইতিমধ্যে "করতলন্যস্ত-আমলকবৎ" এই শব্দের ধমকে তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তবেই হইতেছে যে, গুরুমুখোচ্চারিত ঐ শব্দটি শিষ্যের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিয়াছে;—না যদি প্রবেশ করিবে, তবে শিষ্যকে জাগাইয়া দিল কে? অত-বড় একটা জোরালো শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, অথচ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে আসিল না—এটা হইল শুদ্ধকেবল মনো-যোগের অভাবে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় উপস্থিত হওয়া চাই বিশেষ-একটি দেশে (যেমন কর্ণকুহরে), আর, সেই সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ মনের) সংযোজনা-ক্রিয়া'র উদ্রেক হওয়া চাই বিশেষ-একটি কালে (যেমন জাগরণ-মুহূর্ত্তে); এই দুই ব্যাপারের সমবেত কার্য্য-কারিতা ব্যতিরেকে বিষয়ের উপলব্ধি সম্ভবে না। দুইটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গেল; একটি হচ্চে বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য (যেমন ক, র, ত, ল ন্য, স্ত, আ, ম, ল, ক,

ব, ৎ—এতগুলি পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি); আর-একটি হ'চ্চে অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযোজনা ক্রিয়া (যেমন, ঐ পৃথক পৃথক্ ধ্বনিগুলি একত্র সংযোজনা করিয়া "করতলন্যস্ত-আমলকবৎ" এই একটি সমগ্র শব্দ গড়িয়া তোলা)। পরে-পরে ঘটিল যাহা, তাহা এই :—

গুরু বলিলেন—"শুনিতেছ? না, শুনিতেছ না?" শিষ্য বলিলেন "শুনিতেছি! আজ্ঞা করুন্!" গুরু বলিলেন—"করতলন্যস্ত-আমলকবৎ।" শিষ্য এবারে দিব্য সজাগ! কএব পরে যেম্নি শুনিলেন র, অম্নি তিনি পলায়নোদ্যত ক-কে স্মরণে ধরিয়া-রাখিয়া তাহার সঙ্গে র জুড়িয়া দিলেন; তাহার পরে যেম্নি শুনিলেন ত, অম্নি তিনি পলায়নোদ্যত কর-কে স্মরণে ধরিয়া-রাখিয়া তাহার সঙ্গে ত জুড়িয়া দিলেন; তাহার পরে যেম্নি শুনিলেন ল, অম্নি তিনি পলায়নোদ্যত করত-কে স্মরণে ধরিয়া রাখিয়া তাহার সঙ্গে ল জুড়িয়া দিলেন; ল জুড়িয়া-দিয়া পাইলেন করতল। ইহার নাম সংযোজনা। এইরূপ করিয়া শিষ্যটি ক, র, ত, ল, ন্য, স্ত, আ, ম, ল, ক, ব, ৎ—এতগুলি মুহূর্ত্তপরম্পরাগত ধ্বনির মোট বাঁধিয়া একটা বিরেশীসিক্কে ওজনের শব্দ অন্তঃকরণের মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া পাইলেন—কি? না, করতলন্যস্ত-আমলকবৎ। এ শব্দটি অনেকের যোগে এক, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ইহারি নাম যোগাত্মক ঐক্য (synthetic unity)। মোট ঘটনাটি এই :—

শিষ্যের কর্ণ যেমন রহিয়াছে অভ্যাগত ধ্বনিপরম্পরা'র প্রতি দ্বার খুলিয়া, তাঁহার চক্ষু তেম্নি রহিয়াছে গুরুমুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া। শিষ্যের কর্ণকুহরে ধ্বনিপরম্পরা যাহা প্রবেশ করিতেছে, তাহা গুরুমুখের সহিত কার্য্যকারণসূত্রে সম্বদ্ধ। শিষ্য দুই ভাবের দুইতরো সংযোজনা এক সঙ্গে চালাইতেছেন :—একদিকে তিনি সমষ্টি-ভাবের ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া অনেক ধ্বনিকে এক করিয়া ফেলিতেছেন; আর-এক দিকে তিনি কার্য্যকারণ-ভাবের ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া উচ্চরিত ধ্বনিপরম্পরাকে গুরুমুখের ওষ্ঠকম্পনের সহিত এক করিয়া ফেলিতেছেন। গুরুমুখের ওষ্ঠকম্পন হ'চ্চে প্রবর্ত্তক (active), বায়ুর শাব্দিক কম্পন হ'চ্চে অনুপ্রবৃত্ত (passive)। শিষ্যের কর্ণকুহর হইতে গুরুমুখের ওষ্ঠকম্পন পর্য্যন্ত ঐ-যে এক-প্রকার প্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তকের তরঙ্গমালা নাচিয়া চলিতেছে—শিষ্য ঐ অনেকাত্মক ব্যাপারটিকে কার্য্যকারণসূত্রে গাঁথিয়া অন্তঃকরণমধ্যে এক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এই যে দুই ভাবের দুইতরো ঐক্যসূত্র দেখিতে পাওয়া গেল—(১) সমষ্টিভাবের ঐক্যসূত্র এবং (২) কার্য্যকারণ-ভাবের ঐক্যসূত্র, এ দুই ঐক্যসূত্র একই মৌলিক ঐক্যসূত্রের দুইটি শাখা বই নয়। সে যে মৌলিক ঐক্য-সূত্র, তাহা আর-কিছু না—ক্যাণ্ট্ যাহাকে বলেন, সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য। একই সংবিৎ-সেনাপতি পিছনে দাঁড়াইয়া-থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেক সৈন্যবিভাগের মধ্যে, তথৈব, সমগ্র সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে, একত্বের বন্ধনসূত্র সঞ্চারিত করিতেছেন।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, ধ্বনি-পংক্তির পরস্পরের সহিত এবং গুরুমুখের সহিত সেই যে যোগাত্মক ঐক্য—সে ঐক্য ভাসিতেছে শিষ্যের মানস-সরোবরে (অর্থাৎ অন্তঃকরণে); আর, সেই মানস-সরোবরের কূলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন শিষ্য স্বয়ং। স্বয়ং সেই যে শিষ্য, তিনিই সংযোজনা-কার্য্যের মূলাধার। কূলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন তিনি আপনাকে—আপনারই সেই সংযোজনা-কার্য্যের ফলরূপে জলে প্রতিবিম্বিত; দেখিতেছেন আপনাকে—ধ্বনি-পংক্তির যোগাত্মক ঐক্যে সমষ্টিরূপে প্রতিবিম্বিত; আর-দেখিতেছেন আপনাকে—শ্রূয়মাণ শব্দের সহিত গুরুমুখের যোগাত্মক ঐক্যে কার্য্যকারণের বন্ধনগ্রন্থিরূপে প্রতিবিম্বিত। গুরুর মুখমণ্ডলও শিষ্যের মানস-সরোবরে ভাসিতেছে। শিষ্যের মানস-সরোবরের এপারে যেমন রহিয়াছেন শিষ্য স্বয়ং; তেম্নি, সেই মানস-সরোবরের যে-স্থানটিতে ভাসিতেছে গুরুর মুখমণ্ডল, সেই-স্থানটির ওপারে রহিয়াছেন গুরু স্বয়ং। মনে কর, মানস-সরোবর বাঁধ ভাঙিয়া সুপ্তি-গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় এপার হইতে ওপারে অনায়াসে হাঁটিয়া যাওয়া যাইতে পারে—যেহেতু মাঝখানে জলের ব্যবধান নাই। তবেই হইতেছে যে, এপার এবং ওপার, একই ডাঙাভূমির দুই শৃঙ্গ—এক শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া আছেন শিষ্য স্বয়ং, আর-এক শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া আছেন গুরু স্বয়ং। অতএব এটা স্থির যে, এপার এবং ওপার তলে-তলে একই ডাঙাভূমি। সেই যে একই ডাঙাভূমি, তাহাই বাস্তবিক-সত্তা। শিষ্য স্বয়ং এবং গুরু স্বয়ং উভয়েই একই ডাঙাভূমিতে—বাস্তবিক-সত্তাতে—ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এ বাস্তবিক-সত্তাকে "জানি না" বলিয়া জ্ঞান হইতে উচ্ছেদ করিলে যে ডালে আমরা বসিয়া আছি, সেই ডালকে উচ্ছেদ করা হয়। কাণ্ট্ প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছেন। লোকে দেখিয়া অবাক্ যে, কাণ্টের দার্শনিক দক্ষযজ্ঞে বাস্তবিক-সত্তা-রূপিণী সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই। এ যজ্ঞে শিব নাই—মঙ্গল নাই।

সংশয়বাদে জ্ঞানের অসম্মতি।

কাণ্টের কথাটা কি বাস্তবিক সত্য? আকাশ কি বাস্তবিকই জ্ঞানের পথাবরোধক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর? কাল কি বাস্তবিকই জ্ঞানের অবিমোচ্য বন্ধনরজ্জু? বাস্তবিক-সত্য কি বাস্তবিকই মনুষ্যজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত? তবে কি এ যাবৎকাল মহা-মহা ঋষিতপস্বীরা বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইয়া আসিতেছেন? এ বৃথা পণ্ডশ্রম না করিলেই কি নয়? প্রকৃত কথা এই যে, বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়া'না ইহাকে বলে না—ইহাকে বলে আর-এক পদার্থ; ইহাকে বলে—ক্ষুদ্র শিশু হইয়া মাতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত বাড়ানো। মাতাকে দেখিলে ক্ষুদ্রশিশুটিও হাত না বাড়াইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; শিশুটি হাত বাড়াইলে মাতাও তাহাকে ক্রোড়ে না লইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না;—উভয়ত এইরূপ। বাস্তবিক-সত্যের প্রতি মনুষ্যজ্ঞানের যেমন প্রাণের টান—মনুষ্যজ্ঞানের প্রতিও বাস্তবিক-সত্যের তেম্নি প্রাণের টান। ইহাতেই বুঝিতে

পারা যাইতেছে যে, শুভ অবসরে দোঁহার সম্মিলন ঘটিতে পারা কিছুই বিচিত্র নহে বরং তাহা না ঘটিতে পারাই বিচিত্র। কাণ্ট্ কোথা হইতে পাইলেন যে, আকাশ অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর—কাল অবিমোচ্য বন্ধনরজ্জু? দুইই শূন্যবৎ অবস্তু, তাহা কি তিনি জানেন না? আমাদের দেশের শাস্ত্রে লেখে আর-এক কথা। আমাদের দেশের শাস্ত্রে লেখে এই যে, আকাশও প্রাচীর নহে—কালও বন্ধন নহে। প্রাচীর হ'চ্চেন অবিদ্যা (অর্থাৎ জ্ঞানাভিমানিনী অজ্ঞতা); বন্ধনও তিনিই। প্রাচীর ভাঙিবার এবং বন্ধন খুলিবার কর্ত্রী উপরে পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিমতী মঙ্গলেচ্ছা, নীচে জীবের প্রাণের ব্যাকুলতা এবং মনের একাগ্রতা, মাঝে তত্ত্বজ্ঞানের সুনির্ম্মল আলোকের অভিব্যক্তি। কাণ্টীয় দর্শনের আলোচনা হইতে আমরা বহুমূল্য সত্য একটি পাইয়াছি—কিন্তু সে সত্য সংশয়বাদ নহে; তাহা যে কি, তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নৌকাডুবি।

৪১

হঠাৎ বিবাহ ভাঙিয়া যাওয়াতে হেমনলিনী তাহাদের সমাজের লোকের কাছে অকস্মাৎ অত্যন্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সে তাহার বন্ধু-অবন্ধু, আত্মীয়-পর সকলেরই প্রশ্নের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। প্রকাশ্যতা অনেকে ভালও বাসে—এমন কি, গুরুতর শোক-দুঃখের উপলক্ষ্যেও নিজেকে দশজনের কাছে ফেরি করিয়া বেড়াইতে অনেকে কুণ্ঠিত হয় না—কিন্তু আত্মপ্রচারের স্বভাব হেমনলিনীর নহে। বাণ তাহার বুকের মধ্যে কিরূপ বাজিয়াছে, তাহা অন্তর্যামীই জানেন—কিন্তু তাহার পরে যখন ক্ষতপরীক্ষার জন্য চারিদিক্ হইতে কৌতূহলী সম্প্রদায়ের সমাগম হইতে লাগিল, তখন সে কোথায় মুখ লুকাইবে, তাহার স্থান খুঁজিয়া পাইল না। বেচারা স্বভাবত নিতান্তই ঘরের মেয়ে ছিল, বিধাতা যে বাছিয়া বাছিয়া অকস্মাৎ তাহাকে উপন্যাসের নায়িকা করিয়া তুলিবেন, এজন্য সে কোনোদিন প্রস্তুত ছিল না।

হেমনলিনী বন্ধুত্বের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য একেবারে ছাদে উঠিয়া চিলের কোঠার দ্বার বন্ধ করিয়া দিত। সে নিশ্চয় জানিত, রমেশের ব্যবহার লইয়া তাহার সম্মুখে তীব্র সমালোচনা করিয়া যাইবার জন্য সুহৃদরা, বিশেষত স্ত্রীবন্ধুরা, অত্যন্ত

ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে—এমন স্থলে পলায়ন ছাড়া সে কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইল না।

ছাদের উপরে উঠিলে রমেশের রুদ্ধদ্বার পরিত্যক্ত বাসা, নূতন অন্ধ যেমন করিয়া আকাশের আলোর দিকে তাকায়, তেম্‌নি করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে হেমনলিনীর দিকে যেন তাকাইয়া থাকিত—অমনি সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে সমস্ত আকাশ, সমস্ত আলোক বিবর্ণ হইয়া যাইত—মুখের উপরে অঞ্চল ঢাকিয়া সে বসিয়া পড়িত—বলিত, "হে ঈশ্বর, আমি আর পারিতেছি না।"

দুঃখের কারণ ও ইতিবৃত্ত যদি অস্পষ্ট থাকে, তবে দুঃখের ভিতরেও যেটুকু আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে, মানুষ তাহা হইতেও বঞ্চিত হয়। হেমনলিনী আপন আকস্মিক দুঃখঘটনার আগাগোড়া কিছুই জানে না—মন নানারকম কল্পনা করিতে যায়, মনকে সে জোর করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করে,—রমেশকে অপরাধী করিবার জন্য তর্ক মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়—বারংবার সেই উদ্যত তর্ককে সে দলন করিয়া ফেলে। এইরূপে, নিজের দুঃখের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবার অবকাশ সে পাইতেছে না। বাহিরে অদৃষ্টের কাছ হইতে এবং অন্তরে আপন চিন্তার কাছ হইতে কেবলি তাহাকে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে হইতেছে।

এইরূপে ত্রস্ত হরিণীর মত হেমনলিনী যখন পলায়নপরা হইয়া ছিল, তখন অন্নদাবাবুও তাহার নাগাল পাইতেছিলেন না। হেমনলিনীর সঙ্কোচশীল প্রকৃতি তাঁহার জানা ছিল—এইজন্য বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতির মুষলধারাবর্ষণ ঠেকাইবার ভার তিনিই লইয়াছিলেন। এদিকে তাঁহার মন কন্যার ক্ষতবেদনার উপর স্নেহসুধা ঢালিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছে, কিন্তু নিরালায় তাহাকে কাছে পাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন না। আত্মীয়তাভিমানীরা একেবারে হেমনলিনীর কাছে গিয়া পড়িতে চায়, অন্নদা তাহাদিগকে নানা উপায়ে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছেন। অন্নদা স্বভাবত কৌশলী মানুষ নহেন - তিনি যেটাকে সুচতুর কায়দা বলিয়া নিজের মনে বাহাদুরী লইতেন, অন্যের কাছে তাহার কিছুই অস্পষ্ট থাকিত না। সকলেই বুঝিতে পারিল, হেমনলিনীর সহিত সাক্ষাৎকারে অন্নদা বাধা দিতেছেন—ইহাতে লোকে রাগ করিতে লাগিল এবং রহস্য বাড়িয়া-উঠিয়া নানাবিধ নিষ্ঠুর অমূলক অপবাদে পল্লবিত হইতে থাকিল।

এইরূপে গোলেমালে কিছুকাল কাটিয়া গেল। যখন হেমনলিনীর দিকে একটুখানি মনোযোগ দিবার অবকাশ ঘটিল, তখন একদিন অপরাহ্নে, অনেককাল পরে হেমনলিনীর সহিত একত্রে নিভৃতে চা খাইবার প্রত্যাশায় অন্নদাবাবু তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য দোতলায় আসিলেন—দোতলায় বসিবার ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, শুইবার ঘরেও সে নাই। বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, হেমনলিনী বাহিরে কোথাও যায় নাই। তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্নদা ছাদের উপরে উঠিলেন।

তখন কলিকাতা-সহরের নানা আকার

ও আয়তনের বহুদূরবিস্তৃত ছাদগুলির উপরে হেমন্তের অবসন্ন রৌদ্র ম্লান হইয়া আসিয়াছে,—দিনান্তের লঘু হাওয়াটি থাকিয়া-থাকিয়া যেমন ইচ্ছা ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। হেমনলিনী চিলের ছাদের প্রাচীরের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। পাঠশালায় অকস্মাৎ ছুটি পাইলে ছেলের দল যেমন হো-হা করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, আজ হেমনলিনীর বুকের ভিতরে তাহার ভালবাসার দিনগুলির স্মৃতি তেম্নি করিয়া ছাড়া পাইয়াছে— কে যে কোথা হইতে কি লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই—তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চল পদক্ষেপে তাহার বক্ষতল আজ কম্পমান। কঠিন মীড়ের টানে সেতারের তার ছেঁড়ে-ছেঁড়ে করিয়াও তীব্রমধুর স্বরে কাঁদিয়া বাজিয়া উঠে—হেমনলিনীর প্রাণের ভিতরে আজ তেম্নি প্রবল পীড়নে সব তারগুলা ক্রন্দনের চূড়ান্ত সীমায় গিয়াও মধুর হইয়া বাজিয়া উঠিতেছে। রমেশের স্মৃতি তাহাকে ঘিরিয়া-ঘিরিয়া তাহার মনের ভিতরকার সমস্ত-কিছু একেবারে এলোমেলো উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে—তাহার হৃদয়কে উদাস এবং সমস্ত জগৎসংসারকে ঝাপ্‌সা করিয়া দিতেছে। আকাশে কাক ডাকিয়া চলিয়াছে, গলির প্রান্তে বড়রাস্তা হইতে নানাশব্দমিশ্র কলধ্বনি অপরাহ্ণের ছুটির বেলাকে মুখরিত করিতেছে, রাস্তার ধারে ব্যাণ্ডের দলের এক মুসলমান-যুবক কর্ণেট্‌যন্ত্রে সুর-অভ্যাসের উপলক্ষ্যে একটা করুণস্বরের স্বচ্‌গান বাজাইতেছে; এই সমস্ত শব্দ, সুর ও স্মৃতির মাঝখানে নিভৃত ছাদের এক কোণে কার্ত্তিক-অপরাহ্ণের ঝিকিমিকি আলোতে হেমনলিনী আপনার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া আছে।

অন্নদাবাবু কখন্ তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা সে টেরও পাইল না। অবশেষে অন্নদাবাবু যখন আস্তে আস্তে তাহার পাশে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিলেন, তখন সে চম্‌কিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই অন্নদাবাবু তাহার পাশে বসিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হেম, এই সময়ে তোর মা যদি থাকিতেন! আমি তোর কোনো কাজেই লাগিলাম না!"

বৃদ্ধের মুখে এই করুণ উক্তি শুনিবামাত্র হেমনলিনী যেন একটি সুগভীর মূর্চ্ছার ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিল। তাহার বাপের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। সে মুখের উপরে কি স্নেহ, কি করুণা, কি বেদনা! এই কয়দিনের মধ্যে সে মুখের কি পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! সংসারে হেমনলিনীকে লইয়া যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহার সমস্ত বেগ নিজের উপর লইয়া বৃদ্ধ একলা যুঝিতেছেন—কন্যার আহত হৃদয়ের কাছে বারবার ফিরিয়া-ফিরিয়া আসিতেছেন—সান্ত্বনা দিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া আজ হেমনলিনীর মাকে তাঁহার মনে পড়িতেছে এবং আপন অক্ষম স্নেহের অন্তঃস্তর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—হঠাৎ হেমনলিনীর কাছে আজ এ সমস্তই যেন বজ্রের আলোকে প্রকাশ পাইল। ধিক্কারের আঘাতে তাহাকে আপন

শোকের পরিবেষ্টন হইতে একমুহূর্ত্তে বাহির করিয়া আনিল। যে পৃথিবী তাহার কাছে ছায়ার মত বিলীন হইয়া আসিয়াছিল, তাহা এখনি সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিল। "লজ্জা, লজ্জা, ছিছি, কি লজ্জা! আমি একজন যুবককে ভালবাসিয়াছি, আমার আজকালকার সমস্ত দিনরাত্রির ব্যবহারে এই কথাই আমি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করিয়াছি! বাপ, ভাই, চাকরবাকর, যে আমাকে দেখিতেছে, সে এই কথাই ভাবিয়া যাইতেছে যে, হেমনলিনীকে এখন কোনো কথা বলা বৃথা, উহার কাছে কোনো কাজ প্রত্যাশা করা মিথ্যা, ও একজন যুবাপুরুষকে ভালবাসে, তাহার কথা লইয়াই আছে, সংসারে এখন আর-কেহ উহার কেহই নহে!" -হঠাৎ এই মুহূর্ত্তে হেমনলিনীর মনে অত্যন্ত লজ্জার উদয় হইল! যে সকল স্মৃতির মধ্যে সে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া ছিল, সে সমস্ত বলপূর্ব্বক আপনার চারিদিক্ হইতে ঝাড়িয়া-ফেলিয়া সে আপনাকে মুক্তি দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তোমার শরীর এখন কেমন আছে?"

শরীর! শরীরটা যে আলোচ্যবিষয়, তাহা অন্নদা এ কয়দিন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন -"আমার শরীর। আমার শরীর ত বেশ আছে মা। তোমার যে-রকম চেহারা হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার শরীরের জন্যই আমার ভাবনা। আমাদের শরীর এতবৎসর পর্য্যন্ত টিঁকিয়া আছে, আমাদের সহজে কিছু হয় না— তোদের এই দেহটুকু যে সেদিনকার, ভয় হয় পাছে ঘা সহিতে না পারে।" এই বলিয়া আস্তে আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা বাবা, মা যখন মারা যান, তখন আমি কতবড় ছিলাম?"

অন্নদা। তুই তখন তিন বছরের মেয়ে ছিলি, তখন তোর কথা ফুটিয়াছে। আমার বেশ মনে আছে তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলি, 'মা কোথা?' আমি বলিলাম, 'মা তাঁর বাবার কাছে গেছেন।' তোর জন্মাবার পূর্ব্বেই তোর মার বাবার মৃত্যু হইয়াছিল, তুই তাঁকে জানিতিস্ না। আমার কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে গম্ভীর হইয়া চাহিয়া রহিলি। খানিকক্ষণ বাদে আমার হাত ধরিয়া তোর মার শূন্য শয়নঘরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য টানিতে লাগিলি। তোর বিশ্বাস ছিল, আমি তোকে সেখানকার শূন্যতার ভিতর হইতে একটা সন্ধান বলিয়া দিতে পারিব। তুই জানিতিস্ তোর বাবা মস্ত লোক, এ কথা তোর মনেও হয় নাই যে, যেগুলো আসল কথা, সেগুলোর সম্বন্ধে তোর মস্ত বাবা শিশুরই মত অজ্ঞ ও অক্ষম। আজও সেই কথা মনে হয় যে, আমরা কত অক্ষম—ঈশ্বর বাপের মনে স্নেহ দিয়াছেন, কিন্তু কত অল্পই ক্ষমতা দিয়াছেন!

এই বলিয়া তিনি হেমনলিনীর মাথার উপরে একবার তাঁহার ডান হাত স্পর্শ করিলেন।

হেমনলিনী পিতার সেই কল্যাণবর্ষী কম্পিতহস্ত নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া-লইয়া তাহার উপরে অন্য হাত

বুলাইতে লাগিল। কহিল, "মাকে আমার খুব অল্প একটুখানি মনে পড়ে। আমার মনে পড়ে—দুপুরবেলায় তিনি বিছানায় শুইয়া বই লইয়া পড়িতেন, আমার তাহা কিছুতেই ভাল লাগিত না, আমি বই কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতাম।"

ইহা হইতে আবার সেকালের কথা উঠিল। মা কেমন ছিলেন, কি করিতেন, তখন কি হইত, এই আলোচনা হইতে হইতে সূর্য্য অস্তমিত এবং আকাশ মলিন তাম্রবর্ণ হইয়া আসিল। চারিদিকে কলিকাতার কর্ম্ম ও কোলাহল, তাহারি মাঝখানে একটি গলির বাড়ীর ছাদের কোণে এই বৃদ্ধ ও নবীনা, দুটিতে মিলিয়া, পিতা ও কন্যার চিরন্তন স্নিগ্ধ সম্বন্ধটিকে সন্ধ্যাকাশের ম্রিয়মাণ-চ্ছায়ায় অশ্রুসিক্ত মাধুরীতে ফুটাইয়া তুলিল।

এমন-সময় সিঁড়িতে যোগেন্দ্রের পায়ের শব্দ শুনিয়া দুইজনের গুঞ্জনালাপ তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল এবং চকিত হইয়া দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া উভয়ের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল এবং কহিল, "হেমের সভা বুঝি আজকাল এই ছাদেই?"

যোগেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরের মধ্যে দিনরাত্রি এই যে একটা শোকের কালিমা লাগিয়াই আছে, ইহাতে তাহাকে প্রায় বাড়ীছাড়া করিয়াছে। অথচ বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে গেলে হেমনলিনীর বিবাহ লইয়া নানা জবাবদিহির মধ্যে পড়িতে হয় বলিয়া কোথাও যাওয়াও মুস্কিল। সে কেবলি বলিতেছে—"হেমনলিনী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের ইংরাজি গল্পের বই পড়িতে দিলে এইরূপ দুর্গতি ঘটে। হেম ভাবিতেছে, 'রমেশ যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন আমার হৃদয় ভাঙিয়া যাওয়া উচিত',—তাই সে আজ খুব সমারোহ করিয়া হৃদয় ভাঙিতে বসিয়াছে। নভেল-পড়া কয়জন মেয়ের ভাগ্যে ভালবাসার নৈরাশ্য সহিবার এমন চমৎকার সুযোগ ঘটে!"

যোগেন্দ্রের কঠিন বিদ্রূপ হইতে কন্যাকে বাঁচাইবার জন্য অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—"আমি হেমকে লইয়া একটুখানি গল্প করিতেছি।"—যেন তিনিই গল্প করিবার জন্য হেমকে ছাদে টানিয়া আনিয়াছেন।

যোগেন্দ্র কহিল, "কেন, চায়ের টেবিলে কি আর গল্প হয় না? বাবা, তুমিসুদ্ধ হেমকে ক্ষ্যাপাইবার চেষ্টায় আছ! এমন করিলে ত বাড়ীতে টেঁকা দায় হয়!"

হেমনলিনী চকিত হইয়া কহিল, "বাবা, এখনো কি তোমার চা খাওয়া হয় নাই?"

যোগেন্দ্র—"চা ত কবিকল্পনা নয় যে, সন্ধ্যাবেলাকার আকাশের সূর্য্যাস্ত-আভা হইতে আপনি ঝরিয়া পড়িবে। ছাদের কোণে বসিয়া থাকিলে চায়ের পেয়ালা ভরিয়া উঠে না, এ কথাও কি নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে?"

অন্নদা হেমনলিনীর লজ্জানিবারণের জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"আমি যে আজ চা খাইব না বলিয়া ঠিক করিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। কেন বাবা, তোমরা সকলেই তপস্বী হইয়া উঠিবে নাকি? তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে? বায়ু-আহারটা আমার সহ্য হয় না।

অন্নদা। না না, তপস্যার কথা হইতেছে না. কাল রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় নাই, তাই ভাবিতেছিলাম আজ চা না খাইয়া দেখা যাক্ কেমন থাকি!

বস্তুত হেমনলিনীর সঙ্গে কথা কহিবার সময় পরিপূর্ণ চায়ের পেয়ালার ধ্যানমূর্ত্তি অনেকবার অন্নদাবাবুকে প্রলুব্ধ করিয়া গেছে, কিন্তু আজ উঠিতে পারেন নাই। অনেকদিন পরে আজ হেম তাঁহার সঙ্গে সুস্থভাবে কথা কহিতেছে, এই নিভৃত ছাদে দুটিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আলাপ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন গভীর-নিবিড়-ভাবে আলাপ পূর্ব্বে ত তাঁহার কখনো মনে পড়ে না। এ আলাপ এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় তুলিয়া লইয়া যাওয়া সহিবে না—নড়িবার চেষ্টা করিলেই ভীরু হরিণের মত সমস্ত জিনিষ ছুটিয়া পালাইবে। সেই-জন্যই অন্নদাবাবু আজ চা-পাত্রের মুহুর্মুহু আহ্বান উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

অন্নদাবাবু যে চা-পান রহিত করিয়া অনিদ্রার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা হেমনলিনী বিশ্বাস করিল না সে কহিল, "চল বাবা, চা খাইবে চল!" অন্নদাবাবু সেই মুহূর্ত্তেই অনিদ্রার আশঙ্কাটা বিস্মৃত হইয়া ব্যগ্রপদেই টেবিলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

চা খাইবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই অন্নদা-বাবু দেখিলেন, অক্ষয় সেখানে বসিয়া আছে। তাঁহার মনটা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, হেমের মন আজ একটুখানি সুস্থ হইয়াছে, অক্ষয়কে দেখিলেই আবার বিকল হইয়া উঠিবে,—কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নাই। মুহূর্ত্তপরেই হেমনলিনী ঘরে প্রবেশ করিল। অক্ষয় তাহাকে দেখিয়াই উঠিয়া পড়িল, কহিল, "যোগেন্, আমি আজ তবে আসি!"

হেমনলিনী কহিল, "কেন অক্ষয়বাবু, আপনার কি কোনো কাজ আছে? এক-পেয়ালা চা খাইয়া যান্।"

হেমনলিনার এই অভ্যর্থনায় ঘরের সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অক্ষয় পুনর্ব্বার আসনগ্রহণ করিয়া কহিল, "আপনাদের অবর্ত্তমানেই আমি দু পেয়ালা চা খাইয়াছি—পীড়াপীড়ি করিলে আরো দুপেয়ালা যে চলে না, তাহা বলিতে পারি না!"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "চায়ের পেয়ালা লইয়া আপনাকে কোনোদিন ত পীড়াপীড়ি করিতে হয় নাই।"

অক্ষয় কহিল—"না, ভাল জিনিষকে আমি কখনো প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরিতে দিই না, বিধাতা আমাকে ঐটুকু বুদ্ধি দিয়াছেন।"

যোগেন্দ্র কহিল—"সেই কথা স্মরণ করিয়া ভাল জিনিষও যেন তোমাকে কোনোদিন প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরাইয়া না দেয়, আমি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি!"

অনেকদিন পরে অন্নদার চায়ের টেবিলে কথাবার্ত্তা বেশ সহজভাবে জমিয়া উঠিল। সচরাচর হেমনলিনী শান্তভাবে হাসিয়া থাকে, আজ তাহার হাসির ধ্বনি মাঝেমাঝে কথোপকথনের উপরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অন্নদাবাবুকে সে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "বাবা, অক্ষয়বাবুর অন্যায় দেখ—কয়দিন তোমার পিল্ না খাইয়াও উনি দিব্যি ভাল

আছেন! যদি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা থাকিত, তবে অন্তত মাথাও ধরিত।"

যোগেন্দ্র। ইহাকেই বলে পিল্-হারামী!

অন্নদাবাবু অত্যন্ত খুসি হইয়া হাসিতে লাগিলেন। অনেকদিন পরে আবার যে তাঁহার পিল্‌বাক্সের উপরে আত্মীয়স্বজনের কটাক্ষপাত আরম্ভ হইয়াছে, ইহা তিনি পারিবারিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিলেন —তাঁহার মন হইতে একটা ভার নামিয়া গেল!

তিনি কহিলেন, "এই বুঝি! লোকের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ! আমার পিলাহারী দলের মধ্যে ঐ একটিমাত্র অক্ষয় আছে—তাহাকেও ভাঙাইয়া লইবার চেষ্টা!"

অক্ষয় কহিল, "সে ভয় করিবেন না অন্নদাবাবু! অক্ষয়কে ভাঙাইয়া লওয়া শক্ত!"

যোগেন্দ্র। মেকিটাকার মত—ভাঙাইতে গেলে পুলিস্‌কেস্ হইবার সম্ভাবনা!

এইরূপে হাস্যালাপে অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলের উপর হইতে যেন অনেকদিনের এক ভূত ছাড়িয়া গেল।

আজিকার এই চায়ের সভা শীঘ্র ভাঙিত না—কিন্তু আজ যথাসময়ে হেমনলিনীর চুলবাঁধা হয় নাই বলিয়া তাহাকে উঠিয়া যাইতে হইল—তখন অক্ষয়েরও একটা বিশেষ কাজের কথা মনে পড়িল—সেও চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র কহিল—"বাবা. আর বিলম্ব নয়—এইবেলা হেমের বিবাহের জোগাড় কর!"

অন্নদাবাবু অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। যোগেন্দ্র কহিল—"রমেশের সহিত বিবাহ ভাঙিয়া-যাওয়া লইয়া সমাজে অত্যন্ত কানাকানি চলিতেছে ইহা লইয়া কাঁহাতক সকল লোকের সঙ্গে আমি একলা ঝগড়া করিয়া বেড়াইব। সকল কথা যদি খোলসা করিয়া বলিবার জো থাকিত, তাহা হইলে ঝগড়া করিতে আপত্তি করিতাম না। কিন্তু হেমের জন্য যে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারি না—কাজেই হাতাহাতি করিতে হয়। সেদিন অখিলকে চাব্‌কাইয়া আসিতে হইয়াছিল শুনিলাম, সে লোকটা যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়াছিল। শীঘ্র যদি হেমের বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত কথা চুকিয়া যায় এবং আমাকেও পৃথিবীসুদ্ধ লোককে দিনরাত্রি আস্তিন তুলিয়া শাসাইয়া বেড়াইতে হয় না! আমার কথা শোন, আর দেরি করিয়ো না।"

অন্নদা। বিবাহ কাহার সঙ্গে হইবে যোগেন্?

যোগেন্দ্র। একটিমাত্র লোক আছে। যে কাণ্ড হইয়া গেল এবং যে সমস্ত কথাবার্ত্তা উঠিয়াছে, তাহাতে পাত্র পাওয়া অসম্ভব। কেবল বেচারা অক্ষয় রহিয়াছে—তাহাকে কিছুতেই দমাইতে পারে না! তাহাকে পিল্ খাইতে বল পিল্ খাইবে, বিবাহ করিতে বল বিবাহ করিবে!

অন্নদা। পাগল হইয়াছ যোগেন্? অক্ষয়কে হেম বিবাহ করিবে!

যোগেন্দ্র। তুমি যদি গোল না কর ত আমি তাহাকে রাজি করিতে পারি।

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—"না যোগেন না, তুমি হেমকে কিছুই বোঝ না। তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কষ্ট দিয়া অস্থির

করিয়া তুলিবে। এখন তাহাকে কিছুদিন সুস্থ থাকিতে দাও—সে বেচারা অনেক কষ্ট পাইয়াছে। বিবাহের ঢের সময় আছে!"

যোগেন্দ্র কহিল, "আমি তাহাকে কিছুমাত্র পীড়ন করিব না, যতদূর সাবধানে ও মৃদুভাবে কাজ উদ্ধার করিতে হয়, তাহার ত্রুটি হইবে না। তোমরা কি মনে কর, আমি ঝগড়া না করিয়া কথা কহিতে পারি না?"

যোগেন্দ্র অধীরপ্রকৃতির লোক। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় চুলবাঁধা সারিয়া হেমনলিনী বাহির হইবামাত্র যোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "হেম, একটা কথা আছে।"

কথা আছে শুনিয়া হেমের হৃৎকম্প হইল। যোগেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়া আস্তে আস্তে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। যোগেন্দ্র কহিল, "হেম, বাবার শরীরটা কি-রকম খারাপ হইয়াছে দেখিয়াছ!"

হেমনলিনীর মুখে একটা উদ্বেগ প্রকাশ পাইল; সে কোনো কথা কহিল না।

যোগেন্দ্র। আমি বলিতেছি, ইহার একটা প্রতিকার না করিলে উনি একটা শক্ত ব্যামোয় পড়িবেন।

হেমনলিনী বুঝিল, পিতার এই অস্বাস্থ্যের জন্য অপরাধ তাহারই উপরে পড়িতেছে। সে মাথা নীচু করিয়া ম্লানমুখে কাপড়ের পাড় লইয়া টানিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র কহিল, "যা হইয়া গেছে, সে ত হইয়াই গেছে, তাহা লইয়া যতই আক্ষেপ করিতে থাকিব, ততই আমাদের লজ্জার কথা। এখন বাবার মনকে যদি সম্পূর্ণ সুস্থ করিতে চাও, তবে যত শীঘ্র পার, এই সমস্ত অপ্রিয় ব্যাপারের একেবারে গোড়া মারিয়া ফেলিতে হইবে!"

এই বলিয়া উত্তর প্রত্যাশা করিয়া যোগেন্দ্র হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হেম সলজ্জমুখে কহিল, "এ সমস্ত কথা লইয়া আমি যে কোনোদিন বাবাকে বিরক্ত করিব, এমন সম্ভাবনা নাই।"

যোগেন্দ্র। তুমি ত করিবে না জানি, কিন্তু তাহাতে ত অন্য লোকের মুখ বন্ধ হইবে না।

হেম কহিল, "তা আমি কি করিতে পারি বল।"

যোগেন্দ্র। চারিদিকে এই যে সব নানা কথা উঠিয়াছে, তাহা বন্ধ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে।

যোগেন্দ্র যে উপায় মনে মনে ঠাওরাইয়াছে, হেমনলিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "এখনকার মত কিছুদিন বাবাকে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গেলে ভাল হয় না? দুচার মাস কাটাইয়া আসিলে ততদিনে সমস্ত গোল থামিয়া যাইবে।"

যোগেন্দ্র কহিল, "তাহাতেও সম্পূর্ণ ফল হইবে না। তোমার মনে কোনো ক্ষোভ নাই, যতদিন বাবা এ কথা নিশ্চয় না বুঝিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহার মনে শেল বিঁধিয়া থাকিবে—ততদিন তাঁহাকে কিছুতেই সুস্থ হইতে দিবে না।"

দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর দুই চোখ জলে ভাসিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া ফেলিল—কহিল, "আমাকে কি করিতে বল?"

যোগেন্দ্র কহিল, "তোমার কানে কঠোর শুনাইবে আমি জানি, কিন্তু সকল দিকের মঙ্গল যদি চাও, তোমাকে কালবিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।"

হেমনলিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যোগেন্দ্র অধৈর্য্য সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "হেম, তোমরা কল্পনাদ্বারা ছোট কথাকে বড় করিয়া তুলিতে ভালবাস। তোমার বিবাহসম্বন্ধে যেমন গোলমাল ঘটিয়াছে, এমন কত মেয়ের ঘটিয়া থাকে —আবার চুকিয়া-বুকিয়া পরিষ্কার হইয়া যায় —নহিলে, ঘরের মধ্যে কথায় কথায় নভেল তৈরি হইতে থাকিলে ত লোকের প্রাণ বাঁচে না। 'চিরজীবন সন্ন্যাসিনী হইয়া ছাদে বসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিব, সেই অপদার্থ মিথ্যাচারীটার স্মৃতি হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া পূজা করিব'—পৃথিবীর লোকের সাম্‌নে এই সমস্ত কাব্য করিতে তোমার লজ্জা করিবে না,—কিন্তু আমরা যে লজ্জায় মরিয়া যাই! ভদ্র গৃহস্থঘরে বিবাহ করিয়া এই সমস্ত লক্ষ্মীছাড়া কাব্য, যত শীঘ্র পার, চুকাইয়া ফেল।"

লোকের চোখের সাম্‌নে কাব্য হইয়া উঠিবার লজ্জা যে কতখানি, তাহা হেমনলিনী বিলক্ষণ জানে, এইজন্য যোগেন্দ্রের বিদ্রূপ-বাক্য তাহাকে ছুরির মত বিঁধিল। সে কহিল, "দাদা, আমি কি বলিতেছি সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকিব, বিবাহ করিব না!"

যোগেন্দ্র কহিল, "তাহা যদি না বলিতে চাও ত বিবাহ কর। অবশ্য, তুমি যদি বল, স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রদেবকে না হইলে তোমার পছন্দ হইবে না, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসিনী-ব্রতই গ্রহণ করিতে হয়। পৃথিবীতে মনের মত কটা জিনিষই বা মেলে—যাহা পাওয়া যায়, মনকে তাহারই মত করিয়া লইতে হয়। আমি ত বলি, ইহাতেই মানুষের যথার্থ মহত্ত্ব।"

হেমনলিনী মর্ম্মাহত হইয়া কহিল, "দাদা, তুমি আমাকে এমন করিয়া খোঁটা দিয়া কথা বলিতেছ কেন? আমি কি তোমাকে পছন্দ লইয়া কোনো কথা বলিয়াছি?"

যোগেন্দ্র। বল নাই বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি—অকারণে এবং অন্যায় কারণে তোমার কোনো কোনো হিতৈষী বন্ধুর উপরে তুমি স্পষ্ট বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হও না। কিন্তু এ কথা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, এ জীবনে যত লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন লোককে দেখা গেছে, যে ব্যক্তি সুখে-দুঃখে মানে-অপমানে তোমার প্রতি হৃদয় স্থির রাখিয়াছে, তোমার সমস্ত দুর্ব্ব্যবহার নতশিরে গ্রহণ করিয়াছে এবং যে তোমার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে। এই কারণে আমি তাহাকে মনে মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তোমাকে সুখী করিবার জন্য জীবন দিতে পারে, এমন স্বামী যদি চাও, তবে সে লোককে খুঁজিতে হইবে না। আর যদি কাব্য করিতে চাও, তবে—

হেমনলিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এমন করিয়া তুমি আমাকে বলিয়ো না! বাবা আমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন, যাহাকে বিবাহ করিতে বলিবেন, আমি পালন করিব। যদি না করি, তখন তোমার কাব্যের কথা তুলিয়ো।"

যোগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নরম হইয়া কহিল, "হেম, রাগ করিয়ো না বোন্। আমার মন খারাপ হইয়া গেলে মাথার ঠিক থাকে না জান ত তখন যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়া বসি। আমি কি ছেলেবেলা হইতে তোমাকে দেখি নাই—আমি কি জানি না, লজ্জা তোমার পক্ষে কত স্বাভাবিক এবং বাবাকে তুমি কত ভালবাস।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র অন্নদাবাবুর ঘরে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্র তাহার বোনের উপর না জানি কিরূপ উৎপীড়ন করিতেছে, তাহাই কল্পনা করিয়া অন্নদা তাঁহার ঘরে উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া ছিলেন—ভাই-বোনের কথোপকথনের মাঝখানে গিয়া পড়িবার জন্য উঠি-উঠি করিতেছিলেন, এমন-সময় যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল—অন্নদা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, হেম বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। তুমি মনে করিতেছ, আমি বুঝি খুব বেশি জেদ করিয়া তাহাকে রাজি করাইয়াছি—তাহা মোটেই নয়। এখন, তুমি তাহাকে একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেই সে অক্ষয়কে বিবাহ করিতে আপত্তি করিবে না।"

অন্নদা কহিলেন—"আমাকে বলিতে হইবে?"

যোগেন্দ্র। তুমি না বলিলে সে কি নিজে আসিয়া বলিবে 'আমি অক্ষয়কে বিবাহ করিব?' আচ্ছা, নিজের মুখে তোমার বলিতে যদি সঙ্কোচ হয়, তবে আমাকে অনুমতি কর, আমি তোমার আদেশ তাহাকে জানাই-গে।

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না, আমার যাহা বলিবার, আমি নিজেই বলিব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন কি? আমার মতে আর কিছুদিন যাইতে দেওয়া উচিত।"

যোগেন্দ্র কহিল, "না বাবা, বিলম্বে নানা বিঘ্ন হইতে পারে—এরকম ভাবে বেশিদিন থাকা কিছু নয়।"

যোগেন্দ্রের জেদের কাছে বাড়ীর কাহারো পারিবার জো নাই—সে যাহা ধরিয়া বসে, তাহা সাধন না করিয়া ছাড়ে না। অন্নদা তাহাকে মনে মনে ভয় করেন। তিনি আপাতত কথাটাকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা আমি বলিব।"

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, আজই বলিবার উপযুক্ত সময়। সে তোমার আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। আজই যা হয় একটা শেষ করিয়া ফেল!"

অন্নদা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, তুমি ভাবিলে চলিবে না—হেমের কাছে একবার চল।"

অন্নদা কহিলেন, "যোগেন্, তুমি থাক, আমি একলা তাহার কাছে যাইব।"

যোগেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, আমি এইখানেই বসিয়া রহিলাম।"

অন্নদা বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার। তাড়াতাড়ি একটা কৌচের উপর হইতে কে একজন ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এবং পরক্ষণেই একটি অশ্রু আর্দ্র কণ্ঠ কহিল, "বাবা, আলো নিবিয়া গেছে--বেহারাকে জ্বালিতে বলি।"

আলো নিবিবার কারণ অন্নদা ঠিক বুঝিতে পারিলেন—তিনি বলিলেন, "থাক্ না

মা, আলোর দরকার কি।"—বলিয়া হাতড়াইয়া হেমনলিনীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

হেম কহিল, "বাবা, তোমার শরীরের তুমি যত্ন করিতেছ না।"

অন্নদা কহিলেন, "তাহার বিশেষ কারণ আছে মা - শরীরটা বেশ ভাল আছে বলিয়াই যত্ন করি না। তোমার শরীরটার দিকে তুমি একটু তাকাইয়ো হেম!"

হেমনলিনী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা সকলেই ঐ একই কথা বলিতেছ—ভারি অন্যায় বাবা! আমি ত বেশ সহজ মানুষেরই মত আছি—শরীরের অযত্ন করিতে আমাকে কি দেখিলে বল ত! যদি তোমাদের মনে হয়, শরীরের জন্য আমার কিছু করা আবশ্যক, আমাকে বল না কেন? আমি কি কখনো তোমার কোনো কথায় 'না' বলিয়াছি বাবা?"—শেষের দিকে কণ্ঠস্বরটা দ্বিগুণ আর্দ্র শুনাইল।

অন্নদা ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া কহিলেন—"কখনো না মা! তোমাকে কখনো কিছু বলিতেও হয় নাই—তুমি আমার মা কি না, তাই তুমি আমার অন্তরের কথা জান—তুমি আমার ইচ্ছা বুঝিয়া কাজ করিয়াছ। আমার একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ যদি ব্যর্থ না হয়, তবে ঈশ্বর তোমাকে চিরসুখিনী করিবেন।"

হেম কহিল, "বাবা, আমাকে কি তোমার কাছে রাখিবে না?"

অন্নদা। কেন রাখিব না?

হেম। যতদিন না দাদার বৌ আসে, অন্তত ততদিন ত থাকিতে পারি! আমি না থাকিলে তোমাকে কে দেখিবে?

অন্নদা। আমাকে দেখা! ও কথা বলিস্‌নে মা! আমাকে দেখিবার জন্য তোদের লাগিয়া থাকিতে হইবে, আমার সে মূল্য নাই।

হেম কহিল, "বাবা, ঘর বড় অন্ধকার—আলো আনি।"—বলিয়া পাশের ঘর হইতে একটা হাতলণ্ঠন আনিয়া ঘরে রাখিল। কহিল, "কয়দিন গোলেমালে সন্ধ্যাবেলায় তোমাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শোনানো হয় নাই। আজকে শোনাইব।"

অন্নদা উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, একটু বোস্ মা, আমি আসিয়া শুনিতেছি।" -বলিয়া, যোগেন্দ্রের কাছে গেলেন। মনে করিয়াছিলেন বলিবেন, "আজ কথা হইতে পারিল না, আর একদিন হইবে।" কিন্তু যেই যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইল বাবা? বিবাহের কথা বলিলে?"—অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন—"হাঁ বলিয়াছি।"—তাঁহার ভয় ছিল, পাছে যোগেন্দ্র নিজে গিয়া হেমনলিনীকে ব্যথিত করিয়া তোলে।

যোগেন্দ্র কহিল "সে অবশ্য রাজি হইয়াছে?"

অন্নদা। হাঁ, একরকম রাজি বই কি?

যোগেন্দ্র কহিল "তবে আমি অক্ষয়কে বলিয়া আসি-গে!"

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না না, অক্ষয়কে এখন কিছু বলিয়ো না। বুঝিয়াছ যোগেন, অত বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইবে। এখন কাহাকেও কিছু বলিবার দরকার নাই—আমরা বরঞ্চ একবার পশ্চিমে বেড়াইয়া আসি-গে, তার পরে সমস্ত ঠিক হইবে।"

যোগেন্দ্র সে কথায় কোনো উত্তর না

করিয়া চলিয়া গেল। কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া একেবারে অক্ষয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। অক্ষয় তখন একখানা ইংবাজি মহাজনী হিসাবের বই লইয়া 'বুক্‌কীপিঙ্' শিখিতেছিল। যোগেন্দ্র তাহার খাতাপত্র টান দিয়া ফেলিয়া কহিল—"ও সব পরে হইবে, এখন তোমার বিবাহের দিন ঠিক কর।"

অক্ষয় কহিল—"বল কি!"

ক্রমশ।

ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য।

যাপান।

[শেষ প্রস্তাব।]

যাপান উত্তরোত্তর অধিক ঘনিষ্ঠভাবে ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। একদা ইয়ুরোপ এইরূপে পুরাতন গ্রীস ও রোমের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া সভ্যসমাজ যে সকল তথ্যাবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইতেছে, তাহাও যাপানকে ভারতবর্ষের দিকে আকর্ষণ কবিবার কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। আমাদের সাহিত্যে তাহার আলোচনার সূত্রপাত হইলে, তাহা আমাদিগকেও এশিয়াখণ্ডের নানাদেশের দিকে পুনরায় ঘনিষ্ঠভাবে আকর্ষণ করিবার কারণ হইয়া উঠিবে।

সমুদ্রযাত্রা পরিত্যাগ করিবার পর, গৃহকোটরনিবদ্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল কেবল ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতার আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া, দিনদিন মলিন ও আশাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে 'বর্ত্তমান' অন্ধতমসাচ্ছন্ন দীর্ঘরজনীর ন্যায় নিরতিশয় অপ্রীতিকর, 'ভবিষ্যৎ' কতদূরে,—কোন্ কুটিল কুজ্ঝটিকার সূচীভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে! এরূপ অবস্থায় 'অতীতের' আলোচনা নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়াই প্রতিভাত হইবার কথা!

তথাপি অতীতের আলোচনাকে একেবারে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করা যায় না। অতীত বর্ত্তমানকে গঠন করিয়া তুলিয়াছে; বর্ত্তমান আবার ভবিষ্যৎকে গঠন করিয়া তুলিবে। ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান নিয়ত একসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। অতীতের আলোচনায় বর্ত্তমানের দুঃখদুর্গতির কারণ আবিষ্কার করিয়া, মানবসমাজ ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে শিক্ষালাভ করে। অতীতের আলোচনা অতীত-গৌরবের আত্মশ্লাঘায় মানবসমাজকে কিয়ৎপরিমাণে স্ফীত করিবে, এ আশঙ্কা থাকিলেও, সেই আত্মশ্লাঘার ভিতর দিয়াই নানা সুশিক্ষার বীজ বিতরণ

করিতে ।রে। অতীতের আলোচনা বর্ত্তমা তবর্ষকে সেই সুশিক্ষার বীজ বিতর লে, প্রত্নতত্ত্বালোচনা অবশ্যই সফল । সেদিন এখনও বহুদূরে পড়ি ছ; এখনও তাহার শুভাগমন-জনি । অনুভূত হয় নাই। আত্ম-বোধ হইলে, সে উত্তেজনা কদাপি অনুভূ না। আমাদের আত্মবোধ এখনও নিদ্রানিমগ্ন, অচেতন, অথবা মৃত-কল্প! তজ্জন্যই আমাদের সাহিত্যে 'প্রত্নতত্ত্ব' পাঠকসমাজের নিকট বিভীষিকা বলিয়া পরিচিত; কেবল বিস্ময়াস্পদ কবিতা বা উপন্যাসই কর্ম্মক্লান্ত নিদ্রাতুর জনসমাজকে সুধীর-ব্যজনে নিয়ত নিদ্রানিমগ্ন করিতেছে!

সেদিন কত দূরে? সে সাহিত্য কোন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের লেখনীধারণের প্র ক্ষায় চিরায়মাণ? যে সাহিত্য এই বি পুরাতন সভ্যসমাজকে পুনরা সমুন্নত করিয়া সাধনায় সিদ্ধিল। তাহা এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে! তাহার প্রয়োজন অনুভূত না হইলে, সে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিবে না। তাহার অভাবে আমরা ক্রমশ অতীতবিচ্যুত লক্ষ্য-ভ্রষ্ট কৃপাপাত্র জঘন্য জীবের ন্যায় কালস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি!

যাপানের সাহিত্যই যাপানকে নবজীবন দান করিয়া অল্পকালের মধ্যে সভ্যসমাজে যাপানের গৌরবঘোষণায় কৃতকার্য্য হইয়াছে। সে সাহিত্য যাপানকে আত্মবোধ প্রদান করিয়া, আত্মনির্ভরের মূলমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। যাপান বুঝিয়াছে,—যাপানের ইতিহাসের মধ্যেই যাপানের অভ্যুদয়ের আশা! অভ্যুদয়ের আশা সকল জাতির পক্ষেই তাহাদের ইতিহাসের মধ্যে লুক্কায়িত। যে পারিয়াছে, সে আবার পারিবে;—ইতিহাস নিয়ত এই মহামন্ত্র ধ্বনিত করিয়া, পতিতজাতির উদ্ধারসাধনের পথ প্রদর্শন করে। কি কারণে পারিয়াছিল, কি কারণে একদিন পারিয়া, অন্যদিন অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল;—ইতিহাস ভিন্ন কে তাহার রহস্যভেদ করিবে? যাপানের ইতিহাস যাপানের অভ্যুদয়সাধনের জন্য এই অভ্যুদয়-সাধক ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রচার করিয়াই নূতন আশায়, নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। যাপানের কাব্যের ভিতর দিয়া, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া, উপন্যাসের ভিতর দিয়া সেই এক স্বর মধুরনিক্কণে বাজিয়া ' তাহাতে প্রবুদ্ধ হইয়া যাপান চাহিয়া ছে,—তাহার পুরাতন অভ্যুদয়ের কারণ ভারতবর্ষ। তাই ভারতবর্ষকে বের মাতৃভূমি" বলিয়া যাপানের অভিনব সাহিত্য তাহার প্রতি ক্রমে অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে!

যাপান ইতিহাস খুলিয়া দেখিয়াছে,—স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে নানা দেশের লোকে নানা সময়ে যাপানদ্বীপপুঞ্জে পদার্পণ করিয়া আসিতেছে। যে যখন যাপানে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই বস্ত্রাভ্যন্তরে বর্ম্মাচ্ছাদিত শাণিত অস্ত্র, মুখে শান্তি, প্রীতি ও সদ্ভাবকাহিনী! মুসলমান ও খৃষ্টানকে এই কারণে যাপানের ইতিহাস কেবল আক্রমণ-কারিদস্যুরূপে প্রতিভাত করিয়াছে। যে যাপান এইরূপে বিদেশের লোকের প্রত্যেক চরণবিক্ষেপে কোন-না-কোন সন্দেহ পোষণ

করিয়া, বিদেশের ধর্ম্মপ্রচারকগণকে নির্দ্দয়রূপে নিহত করিয়া, বিদেশের লোকের পক্ষে যাপানের অভ্যন্তরে বিচরণ করিবার স্বাধীন চেষ্টায় বাধাপ্রদান করিয়াছে, সেই যাপান তাহার ইতিহাসের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে,—সমগ্র বিদেশের লোকের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষের লোকেই সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে যাপানে পদার্পণ করিয়াছিল। সেকালের বৌদ্ধসন্ন্যাসীর পবিত্র পীতবস্ত্রের অভ্যন্তরে নিঃস্বার্থ সদ্ভাবপূর্ণ সরলপ্রাণ স্পন্দিত হইয়া, যাপানের অভ্যুদয়সাধনের জন্যই নিয়ত নিযুক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ দান করিবার জন্য মুক্তহস্তে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া, যাপানের শিল্প, সাহিত্য ও সামাজিক জীবনের উপর জ্ঞানসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াই কৃতকার্য্য হইয়াছিল; দানের ছলনা করিয়' করিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকা নাই। প্রবুদ্ধ যাপান চাহিয়া দেখিয়া ভারতবর্ষই তাহাদের "ভাবের মাতৃভূমি মাতার ন্যায় স্তন্যদান করিয়া যাপানকে ইহ পরকালের পুণ্যপথে বিচরণ করিবার জন্য শক্তিদান করিয়াছে; ডাকিনীর ন্যায় স্নেহের ছলনায় রক্তশোষণ করে নাই! যাপান এই "ভাবের মাতৃভূমি"র প্রতি আকৃষ্ট না হইবে কেন?

মানবসমাজের ইতিহাসে প্রত্যেক দেশেরই কিছু-না-কিছু প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন্ দেশের ইতিহাস স্বজাতির সমুন্নতিসাধনের কিরূপ চে পরিচয় প্রদান করে, সভ্যসমাজ সে তাহার আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিবে, ভারত-ব র পূর্ব্বগৌরব পুনরায় মু কৃত হইবার সময় উপস্থিত হইবে হাসের এই বিজয়বার্ত্তা অদ্যাপি স রিচিত হয় নাই। তজ্জন্য ভারতব হাসের প্রকৃত মর্য্যাদা অনুভূত হইতেছে না। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ যেন অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, তর্জ্জনীহেলনে তারাস্বরে চীৎকার করিয়া কহিতেছেন,—"ভারতবর্ষের ইতিহাসের আবার গৌরব কি? ভারতবর্ষ তাহার ক্ষুদ্রসীমার বাহিরে একপাদ ভূমিও অপহরণ করিতে পারে নাই! যাহা পাইয়া- ল, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিয়া ধীরে অযোগ্যের ন্যায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া যা পড়িয়াছে। এ দেশের ইতি- ই ইহার অসারতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ!" দস্যুদলের বিচারে দস্যু ভিন্ন ধর্ম্মভীরু গৃহস্থের প্রশংসালাভের সম্ভাবনা নাই। তাই ভারতবর্ষ ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া কলঙ্কিত। এই কলঙ্কই ভারতবর্ষের শুভ্রললাটের সমুজ্জ্বল রত্নতিলক!

সেদিন ভারতবর্ষের বাহিরে, জলে-স্থলে, ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্যশক্তিশালী মানবসমাজ বর্ত্তমান থাকিলে, তাহার

* It might therefore be justly said that India has no place in the political history of the world. * * * * * * An expedition like that of Alexander could never have been conceived by an Indian king, and the ambition of native conquerors, in those few cases where it existed, never went beyond the limits of India itself—Max Muller's *History of Ancient Sanskrita Literature*, p. 31.

ভয়ে ভার নরস্ত থাকিতে পারিত।৯৫ ়তবর্ষের আক্র-মণের পারিত? আজ অসভ্য ঙর আক্রমণবেগ সহ্য কি : সেদিনও অসভ্য-সমাজের ভারতবর্ষের আক্রমণ-বেগ সহ্য ়বনা ছিল না। তথাপি ভারতবর্ষ প্রতিবেশীর রাজ্যহরণের চেষ্টা করে তস্করবৃত্তি ভারতবর্ষের সমুন্নত রাজনীতিকে কলঙ্কিত করে নাই বলিয়াই ভারতবর্ষের কলঙ্ক হইতে পারে না। ভারতবর্ষ জ্ঞানসাম্রাজ্যসংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল; সে চেষ্টা অতীতে সফল হইয়াছিল; বর্ত্তমানে আবার নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে। সভ্যসমাজ ক্রমে সংযত না হইয়া অসংযত হইয়া উঠিতেছে। মানব আবার পীড়িতকণ্ঠে শান্তিলাভের জন্য ব্যাকুলভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের জ্ঞানসাম্রাজ্য পুনরায় বিস্তৃত না হইলে, সে আকুল আর্ত্তনাদ তিরোহিত হইবার আশা নাই!

এশিয়া এক। এশিয়া অখণ্ড মহাদেশ। এশিয়া ধর্ম্মে, ভাষায়, আচারব্যবহারে বহুধা বিভক্ত হইলেও, তাহার বিভিন্নতার মধ্যেই একতার গুপ্তস্রোত প্রবাহিত। সে স্রোত একদা ভারতবর্ষ হইতে প্রবাহিত হইয়া, সমগ্র এশিয়াখণ্ডকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। যাপান সেই পুরাতন স্রোতের সন্ধানলাভ করিয়া, অধঃপতিত এশিয়াখণ্ডের হৃৎপিণ্ডের ন্যায় নবস্পন্দনে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র এশিয়াখণ্ড যেন যাপানের প্রাণের স্পন্দনে মৃতকল্পশরীরে পুনরায় ৮৮ . করিতেছে।

এশিয়ার ধর্ম্ম মানব-ধর্ম্ম! এশিয়ার শাক্য, খৃষ্ট, মহম্মদ, তাহাই পুনঃপুন প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপ তাহার বহিরঙ্গের অনুষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিয়া, মূলসত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে! ইউরোপ বাহুবলোন্মত্ত-পশুধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত হইয়া, এশিয়ার শ্রদ্ধা-আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াও, অশ্রদ্ধা লাভ করিয়া তিরস্কৃত হইতেছে। জ্ঞানসাম্রাজ্যের তুলনায় শক্তিসাম্রাজ্যের এইরূপ পরাভব অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপ বিজয়লাভ করিয়াও পরাভূত; এশিয়া বিজিত হইয়াও, অপরাজিত পূর্ব্বগৌরবে মানবসমাজের অকপট ইতিহাসলেখকের প্রতীক্ষায় নীরবে দিনগণনা করিতেছে!

ভারতবর্ষের জ্ঞানসাম্রাজ্য সুদূর যাপান-দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হইবার সময়ে, চীন ও কোরিয়া দেশের নানা কুসংস্কারের প্রভাবে যাপানে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশের ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধশ্রমণগণ তাহার পরিচয় পাইবামাত্র, ভারতবর্ষে আসিয়া প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে যাপানও সে সুসংস্কৃত ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। প্রথমে কেবল শাক্যসিংহের জীবনকাহিনী ও উপদেশ, নানাভাবে বিকৃত হইয়া, যাপানে শাক্যপূজার প্রচলন করিয়াছিল। পরে শাক্যসিংহের ধর্ম্মমতের মূলতত্ত্ব শনৈঃশনৈ প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যেই যাপান "ভাবের মাতৃভূমি"র প্রকৃত

... যাপানকে ...ড়ম্বরে বীতশ্রদ্ধ করিয়া, মর্ম্মাস্বাদে মধুকরের ন্যায় উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। বসুবন্ধুর দার্শনিক শিক্ষাই তাহার মূল বলিয়া যাপানবাসীর নিকট সুপরিচিত।

আর্য্যসমাজের নবজীবনলাভের প্রথম প্রভাতে ভারতবর্ষের পুণ্যারণ্যে যে বেদমন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই মানবজ্ঞানশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত "সূত্র"। অন্যান্য যুগের সমুন্নত সাহিত্য সেই সংক্ষিপ্ত সূত্রের বিস্তৃত "ভাষ্য" ভিন্ন আর-কিছু বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। বেদমন্ত্র ভারতবর্ষকে যে সরল সত্যের শিক্ষাদান করিয়া মানবধর্ম্মে সমুন্নত করিবার সূত্রপাত করিয়াছিল, পরবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাহাই নানাভাবে লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। স্থানকালপাত্রভেদে নানাভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইলেও, এশিয়াখণ্ডের সকল ধর্ম্মই আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে এশিয়ার গৌরব ঘোষণা করিয়াছে। সম্ভোগ পশুধর্ম্ম; ত্যাগ ভিন্ন মানবধর্ম্মের অন্য কোন মূলমন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মত্যাগেই মানব সমাজ সমুন্নতিলাভ করিয়াছে;—আত্মত্যাগেই মানবসমাজ ক্রমোন্নতি লাভ করিবে। ত্যাগের মূলে সংযম বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। মানবসমাজ সুসংযত না হইলে আত্মত্যাগের সরলধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। সংযম মানবসমাজকে বিচারপরায়ণ করে। না বুঝিলে, মানবসমাজ সংযত হইতে পারে না। বুঝিতে বসিলেই, ইহকালের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হয়। সে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সকল আকা-লন নিরস্ত হই ... তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয় ... 'আত্মত্যাগে সমগ্র মানবসম ... র জন্য জীবন উৎসর্গ করি ... য়াছিল। ইহাই ভারতীয়-জ্ঞান ... র প্রধান সহায়। ইহার নিকট ... ণ পরাভূত হইয়া যায়। শ ... উপদেশ এই মূলমন্ত্র প্রচার ক ... অভিনব কৌশলের উদ্ভাবনা করিয়া ..., তাহারই নাম বৌদ্ধধর্ম্ম। তাহা নূতন নহে, চিরপুরাতন। কালে তাহা নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া, পুনরায় বসুবন্ধু তাহার মূলতত্ত্বব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহা কিছু বৃহৎ, তাহাই ভারতবর্ষের পুরাতন আদর্শ। বৃহৎ হিমালয় ভারতবর্ষের জনসমাজকে নিয়ত বৃহতের দিকেই আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। নদনদী সেই দিকেই লোকচিত্ত পরিচালিত করিয়া সকল ক্ষুদ্রতা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। পুরাতন ভারতবর্ষ বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া কহিয়াছে—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

এই শিক্ষা ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, সসীম হইতে অসীমে বহন করিয়া লইয়া, ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাসের ভিতর দিয়া নিয়ত সেই মহাবস্তুলাভের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাহার তুলনায় 'বর্ত্তমান' ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া 'ভবিষ্যতের' অনাগত বৃহৎ কলেবরে লুপ্ত হইয়া যায়; তাহার তুলনায় সংকীর্ণরেখানিবদ্ধ সসীম স্বরূপচিত্র তুচ্ছ হইয়া, ভাবব্যঞ্জক অনন্তসৌন্দর্য্যবিজ্ঞাপক কাল্পনিক চিত্রের অস্পষ্ট বর্ণসমাবেশ

কৌশল প্রাধান্যলাভ করে; তাহার তুলনায় লোকচিত্ত ধূলি ঝাড়িয়া, ধরা ছাড়িয়া, নির্ম্মল নীলগগনের প্রশান্তসৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের জ্ঞানসাম্রাজ্য যে দেশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, সে দেশেই ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাপানে সে পরিচয় অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। যাপানের অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা, যাপানের ধারাবাহিক রাজবংশের যত্নসঞ্চিত দ্রব্যসম্ভার, যাপানের সাগরসুরক্ষিত স্বচ্ছন্দ সরলস্বভাব অতীতের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সে দেশে গৃহসজ্জার অনাবশ্যক আড়ম্বর গৃহস্থকে অনর্থক ঋণগ্রস্ত করে না, আহারবিহারের ঘটা-বৈচিত্র্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য মেঘাচ্ছন্ন করিয়া জনসমাজকে ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত করে না;—তাহারা ক্ষুদ্রতার সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া, ক্রমে বৃহতের বিস্তৃতরাজ্যে বিচরণ করিয়া, মানবজীবনের প্রকৃত রসাস্বাদের জন্যই আগ্রহপ্রকাশ করিয়া থাকে। কখন-কখন আধুনিক কুসংসর্গ যাপানকে অতিমাত্রায় ইউরোপভক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; সে চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। যাপান ক্রমেই "ভাবের মাতৃভূমি"র দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

অন্ধ অনুকরণ দুর্ব্বলজাতিকে বলদান করিতে পারে না। ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল বৌদ্ধধর্ম্মের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হইয়া, ক্রমে নানা বাহ্যাড়ম্বরে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। দীক্ষাগ্রহণের আড়ম্বর আছে, শ্রমণগণের পবিত্র পীতবস্ত্র ধারণ করিবার আড়ম্বর আছে; তাহাদের সমুন্নত সাধুজীবন ও সর্ব্বস্বত্যাগের সমুচ্চগৌরবের অনুকরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। যাপানে তাহাই প্রবল; বাহ্যাড়ম্বর ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহামন্ত্র সে দেশের গৃহে গৃহে অদ্যাপি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আত্মসম্মানবোধ যাপানকে তাহার পূর্ব্বগৌরবরক্ষার্থ অমিতবলে বলশালী করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত দেশ যেন এক হইয়া, এক চিন্তায় ও এক কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে!

ইউরোপের ধারণা এইরূপ,—ইউরোপের শিক্ষাই যাপানকে নবজীবন দান করিয়া, এরূপ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। যাপানের বিশ্বাস অন্যরূপ। কাকাসু ওকাকুরার গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ঐতিহাসিকের ন্যায় বিচারনিপুণ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া, প্রমাণপ্রয়োগে ইহার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। যাপানের পুরাতন ইতিহাসই যাপানকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে; ইউরোপীয় সংসর্গ তাহাকে কেবল আত্মরক্ষার্থ সতর্ক করিয়া দিয়াছে! তাহা প্রথম কারণ নহে; তাহা দ্বিতীয় কারণ।*

যাপানের নবজীবনলাভের প্রথম কারণ যাপানের ইতিহাস। তাহা প্রথমে অলিখিত অবস্থায় জনশ্রুতিমাত্রে পরিণত হইবার উপ-

* The second cause of the national reawakening was undoubtedly that portentious danger with which Western encroachments on Asiatic soil threatened our national independence.—*Ideals of the East, p. 211.*

ক্রম হইয়াছিল। দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে ইতিহাসসঙ্কলনের প্রথম চেষ্টার সূত্রপাত হয়। রাজকুমার মিটো তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে যে ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা যাপানের কাব্য, উপন্যাস ও সঙ্গীতের মধ্যেও পূর্ব্বগৌরবের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যাপানবাসী তাহাদের পুরাতত্ত্বের মধ্যে আত্মত্যাগের পুণ্য-কাহিনী প্রাপ্ত হইয়া, আত্মবিসর্জ্জনকে পরম পুণ্যব্রত বলিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে। সে শিক্ষা যাপানের আবালবৃদ্ধবনিতাকে স্বদেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া আসিতেছে।

পুরাতন ইতিহাসের মধ্যে যাপানের দ্বিবিধ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যাপানের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার সহিত পরবর্ত্তী কালের সমালোচনা করিবামাত্র, যাপানকে "ভাবের মাতৃভূমি"র উদ্দেশে ভক্তিবিস্ময়ে প্রণিপাত করিতে হয়। এশিয়া এক এবং অখণ্ড মহাদেশ। এশিয়ার ধর্ম্ম মানব-ধর্ম্ম। এশিয়ার জ্ঞান ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে মানবপ্রাণকে আকর্ষণ করে। এশিয়া সম্ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সকল শিক্ষা পুরাতন ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই শিক্ষার প্রাধান্য লোকচিত্তে দৃঢ়মুদ্রিত হইবামাত্র, লোকে ইউরোপীয় শক্তিসাম্রাজ্যের অন্তঃসারশূন্য উচ্ছৃঙ্খল বর্ব্বরতার প্রকৃত মূল্যনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছে। এশিয়া গঠনশীল প্রতিভা লইয়া মানবসমাজে শান্তির পুণ্যসাম্রাজ্য গঠিত করিবার আয়োজন করিয়াছিল। ইউরোপ ধ্বংসশীল প্রতিভা লইয়া বর্ব্বরের ন্যায় মানবসমাজের শান্তি-সৌধশিখরে নিরন্তর লৌহদণ্ডের আঘাত করিয়া আসিতেছে। একদা অসভ্য বর্ব্বর, পুরাতন সভ্যতার কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ সমুন্নত সৌধাবলী ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া বসুন্ধরা অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল। আবার সুসভ্য বর্ব্বরগণ বর্ত্তমান সভ্যতার অতৃপ্ত দিগ্বিজয়লালসায় বসুন্ধরার শান্তিসাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যাপান তাহার যে তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা ইতিহাসের প্রতিবাদ। তাহার প্রকৃত অর্থ—শান্ত হও; যথেষ্ট হইয়াছে! ভারতবর্ষ তর্ক-বলে যে শিক্ষার বিস্তার সাধন করিয়া পৃথিবীকে প্রেমপুণ্যে সমুন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া, যাপান বাহুবলে সেই পুরাতন শিক্ষাই অভিনব উপায়ে প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এই জ্ঞানবিস্তারে অকুতোভয় যাপান সন্ন্যাসীর ন্যায় সহাস্যমুখে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া এশিয়ার বিজয়ঘোষণা করিতেছে। ইহার সহিত সামরিক জয়পরাজয়ের সংস্রব নাই। সমরক্ষেত্রে পরাজিত হইলেও মানবসমাজের ইতিহাস যাপানের বিজয়-ঘোষণা করিতে বাধ্য হইবে। সে বিজয়ের মূলমন্ত্র ভারতবর্ষ হইতেই দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের পুরাকালের জ্ঞানগৌরব যে যাপানকে সমুন্নত করিয়াছে, এ কথা ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গও অস্বীকার করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের আধুনিক দুঃখদুর্দ্দশা যাপানের

নবজীবনসঞ্চারের পক্ষে কতদূর উত্তেজক হইয়াছে, তাহা কিন্তু সভ্যসমাজে অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত। ওকাকুরা তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—যাপানের নবজীবনলাভের প্রবলচেষ্টা প্রবর্তিত করিবার পক্ষে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার অবস্থাকেও একটি প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।* যাপান ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া এবং ইউরোপের দিকে চাহিয়া, আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাপান বুঝিয়াছে,—শান্তি ভিন্ন মানবসমাজের উন্নতিলাভের আশা নাই, তাই সে শান্তিরক্ষার্থ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হইয়াছে! †

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

* We saw India, the holy land of our most sacred memories, losing her independence through her political apathy, lack of organisation, and the petty jealousies of rival interests,—a sad lesson, which made us keenly alive to the necessity of unity at any cost —*Ideals of the East, p.* 212.

† We await the flashing sword of the lightening which shall cleave the darkness For the terrible husk must be broken, and the rain-drops of a new vigour must refresh the earth before new flowers can spring up to cover it with their bloom. But it must be from Asia herself, along the ancient roadways of the race, that the Great voice shall be heard,—"victory from within, or a mighty death without."—*Ideals of the East, p.* 244.

গৌতমমুনি ও ন্যায়দর্শন। *

কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক বিজ্ঞ বিষয়ী লোকের সঙ্গে আমার ন্যায়সংক্রান্ত কতিপয় কথার আলোচনা হয়। সেই আলোচনা লিপিবদ্ধ করায় এই প্রবন্ধ জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাই পাঠ করিতে আমি অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে ইহার দ্বারা শ্রোতৃবর্গের যৎকিঞ্চিৎ পরিতোষ জন্মিলেই আমি সমস্ত শ্রম সফল বোধ করিব।

প্রথম কথা, এতদ্দেশীয় ষড়্দর্শন। তন্মধ্যে যে মুনির যে দর্শন, তাহা একটি শ্লোকে গাঁথা আছে। যথা :—

"কপিলস্য কণাদস্য গৌতমস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষডেব হি॥"

কপিলের দর্শন, কণাদের দর্শন, গৌতমের দর্শন, পতঞ্জলির দর্শন, ব্যাসের দর্শন, ও জৈমিনির দর্শন, এই ষড়্দর্শন। তন্মধ্যে গৌতমের দর্শন—ন্যায়। ন্যায় বলিলে আমরা গৌতমের দর্শনই বুঝি সত্য, পরন্তু গৌতমের দর্শন ব্যতীত আরও অনেক ন্যায়নামের নামী আছে;—যেমন কাকতালীয়ন্যায়, সামান্য-বিশেষন্যায়, বীজাঙ্কুরন্যায়, অন্ধপঙ্গুন্যায়, স্থালীপুলাকন্যায়, বীচিতরঙ্গন্যায় ও কৈমুতিকন্যায় প্রভৃতি। এই সকল ন্যায়ের উল্লেখ ও প্রচার কাব্য-অলঙ্কার, স্মৃতি-পুরাণ ও সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি দর্শন, সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এমন কি, লৌকিক আচারব্যবহারাদির মধ্যেও ন্যায়-অন্যায়-শব্দের সম্যগ্‌ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, কেবল গৌতমের দর্শনই যে ন্যায়পদবাচ্য, তাহা নহে। আরও অনেক ন্যায়পদবাচ্য আছে।

যে সকল ন্যায়ের উল্লেখ করা হইল, ঐ সকলের কতক স্বতঃসিদ্ধ লৌকিক ঘটনার উদাহরণমাত্র। কতক পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণকর্ত্তাদিগের প্রচারিত পরিভাষা, কতক বা ব্যাসজৈমিন্যাদি ঋষিদিগের অভিহিত সিদ্ধান্তকথা। অতএব ন্যায় বলিলেই যে কেবল গৌতমের ন্যায় বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। তবে যদি ন্যায়শাস্ত্র, ন্যায়-বিদ্যা বা ন্যায়দর্শন বলা যায়, তাহা হইলে গৌতমের ন্যায় ব্যতীত অন্য কোন ন্যায় বুদ্ধ্যারূঢ় হইবে না। কারণ এই যে, লৌকিক ন্যায়ের কোন শাস্ত্র নাই,—তাহা কোন বিদ্যা নহে, এবং ব্যাসজৈমিন্যাদির অভিহিত ন্যায়ও অধিকরণ ও মীমাংসা নামে সুপ্রসিদ্ধ। লৌকিক ন্যায়ের অনেকগুলি পুস্তক আছে বটে; পরন্তু সে সকল পুস্তক শাস্ত্রলক্ষণবর্জ্জিত। সে সকল কেবল দৃষ্ট-শ্রুতানুযায়ী সংগ্রহমাত্র। জৈমিনি ও ব্যাসের এক একটি বিচার ন্যায়নামের নামী হইলেও, সমগ্র শাস্ত্র ন্যায়নামের নামী নহে। কাজেই

* গত ৫ই আষাঢ় রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

আমরা ন্যায়শাস্ত্র বলিলে, গৌতমের দর্শন বুঝি, অন্য কিছু বুঝি না।

ন্যায়শাস্ত্র বা ন্যায়দর্শন গৌতমপ্রণীত, এইটুকুমাত্র সর্ব্ববিদিত; কিন্তু তাহার বিষয় বহুলোকের অবিদিত। আজকাল বাঙ্‌লাভাষার এত উন্নতি যে, যে স্থানেই যাই, সেই স্থানেই সাংখ্যপাতঞ্জলাদি দর্শনের আন্দোলন শুনিতে পাই, কিন্তু কুত্রাপি ন্যায়-দর্শনের প্রসঙ্গ পর্য্যন্তও শুনিতে পাই না। তাহাতেই বোধ হয়, ন্যায়দর্শনের বিষয়-সকল এখনও সাধারণসমাজে অন্ধকারসমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সাঙ্খ্যপাতঞ্জলাদিও এই-রূপ অন্ধকারমগ্ন ছিল; অল্পদিন হইল, চলিত-ভাষায় তৎসংক্রান্ত পুস্তকপ্রবন্ধাদি প্রচারিত হওয়ায় আজকাল কিছু প্রকাশপ্রাপ্ত হই-য়াছে। সাঙ্খ্যপাতঞ্জলাদিতে যাহা আছে, তাহা আজকাল অনেকে জানিতে পারিয়া-ছেন, কিন্তু ন্যায়ে কি আছে, তাহা কোনও বিষয়ী লোক অদ্যাপি বিদিত হইতে পারেন নাই। কেবল শ্রাদ্ধসভার বিচার শুনিয়া তাঁহারা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, ন্যায়-শাস্ত্রে কেবল কতকগুলি ফক্কিকা আছে, আর ধূমবহ্নির কথা আছে, আর কিছুই নাই। তবে কোন কোন বিজ্ঞ বিষয়ী লোক আছেন,—পণ্ডিতমণ্ডলী যাঁহাদের নিকট সর্ব্বদা গতিবিধি করেন,—যদিও তাঁহারা জানেন যে, ন্যায়শাস্ত্র ঈশ্বরানুমানের শাস্ত্র, তথাপি সে জানা ঠিক জানা নহে। তাঁহারা নব্য-নৈয়ায়িকদিগের মুখে-মাত্র শুনিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন। ফলত গৌতমের গ্রন্থে ঈশ্বরপ্রতিপাদক কোন সূত্র নাই। ঈশ্বর উপাস্য কি বিজ্ঞেয়, তাহা গৌতমের দর্শনেও বিচারিত হয় নাই। এতদীয় দর্শনের প্রথমেই প্রতিজ্ঞাসূত্র, তন্মধ্যে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোল পদার্থের উল্লেখ; ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। প্রমেয়বিভাগে যে আত্মার উল্লেখ আছে, লক্ষণ ও পরীক্ষাসূত্র দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয়, সে কথা জীবাত্মপর। গৌতমের মতে জীবাত্ম-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষপ্রদ; ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান মোক্ষপ্রদ কি না, তাহা গৌতমের গ্রন্থ-দ্বারা জানা যায় না। তবে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় বটে, পরন্তু সে উল্লেখ উল্লেখমাত্র। তাই আমার বক্তব্য, নব্যনৈয়ায়িকগণ যে কিসে ন্যায়-দর্শনকে ঈশ্বরানুমানের শাস্ত্র বলেন, তাহা আমি বিদিত নহি। যাহাই হউক, ন্যায়শাস্ত্র ঈশ্বরানুমানের শাস্ত্র, এ কথাও বহুলোকে অবিদিত। সেই কারণে তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে ফক্কিকার শাস্ত্র বলিয়া জানেন। অনেক বিষয়ী লোকের মনে ঐরূপ একটা কুসং-স্কার থাকায়, তাঁহাদিগকে আমি অনেকবার 'ন্যায়রত্ন' 'ন্যায়বাগীশ' প্রভৃতি ন্যায়শব্দঘটিত উপাধির অতি অদ্ভুত সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি।

একজন ব্যাকরণের পণ্ডিত, তাঁহার উপাধি ন্যায়বাগীশ, আর একজন স্মৃতির পণ্ডিত, তাঁহার উপাধি ন্যায়রত্ন। যিনি ব্যাকরণের পণ্ডিত, তিনি যে ব্যাকরণোক্ত অন্তরঙ্গ-বহি-রঙ্গাদি ন্যায় পড়িয়া ন্যায়বাগীশ, এবং যিনি স্মার্ত্তপণ্ডিত, তিনি জৈমিন্যুক্ত সংযোগপৃথক্-ত্বাদি ন্যায় পড়িয়া ন্যায়রত্ন, এ রহস্য বিষয়ী লোকে বিদিত নহে। প্রসিদ্ধি অনুসারে, বিষয়ী লোকে মনে করে, ইনি যখন ন্যায়-রত্ন, তখন ইনি অবশ্যই ন্যায় জানেন, অর্থাৎ

ন্যায়শাস্ত্র জানেন। অতএব, যাবৎ না ন্যায়-দর্শনের মর্ম্ম চলিতভাষার পুস্তকপ্রবন্ধাদিতে প্রচারপ্রাপ্ত হইবে, তাবৎ বিষয়ী লোকের ঐ কুসংস্কার অপগত হইবে বলিয়া বিবেচিত হয় না। কখন-কখন এরূপ কথা উত্থাপিত হয় যে, সাংখ্যপাতঞ্জলাদিই বা চলিত-ভাষায় প্রচারপ্রাপ্ত হয় কেন? আর ন্যায়দর্শনই বা না হয় কেন? এ বিষয়েও আমি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত বিদিত হইয়াছি। কেহ বলেন, ন্যায় বড় কঠিন, অতি দুর্ব্বোধ্য, সেই কারণে তাহার, পণ্ডিতসমাজ ব্যতীত সাধারণ সমাজে, প্রচার তদ্রূপ হয় নাই, এবং হইবার অবসরও নাই। অন্যে বলেন, ন্যায়ের বিষয় বা উপদেশ্য পদার্থ তত কঠিন বা দুর্ব্বোধ্য নহে, তাহার ভাষাই নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। ন্যায়দর্শনের ভাষা এত দুষ্প্রতর্ক্য যে, বাঙ্‌লাভাষায় তদর্থপ্রকাশের উপযুক্ত শব্দ নাই বলিলেও বলা যায়। বোধ হয়, তাহাতেই বাঙ্‌লাভাষায় ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক পুস্তক-প্রবন্ধাদি লিখিত-পঠিত হয় না। এ বিষয়ে আমার মনে হয় শেষোক্ত কথাই ঠিক। সত্য-সত্যই ন্যায়শাস্ত্রের ভাষা যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বোধ্য ও দুরম্ববায্য। তদ্ভিন্ন, ন্যায়ের উপদেশ্য পদার্থ যে বেদান্তাদিশাস্ত্রের উপদেশ্য পদার্থ হইতে অধিক দুর্ব্বোধ্য, তাহা নহে। ভাবিয়া দেখুন, জগৎ পরমাণুসমূহের ক্রম-পুঞ্জনে সমুৎপন্ন, ইহা বুদ্ধ্যারূঢ় করা কঠিন; কি জগৎ একটা মিথ্যাপদার্থ, মায়িক প্রতিভাসমাত্র, ইহা বুদ্ধ্যারূঢ় করা কঠিন?

ন্যায়ের উপদেশ—আকাশ অজ পদার্থ; কিন্তু বেদান্ত বলেন—আকাশ জন্মবান্ পদার্থ। ন্যায় বলেন—যত শরীর, তত আত্মা, কিন্তু বেদান্ত বলেন—শরীর অসংখ্য, পরন্তু আত্মা এক। আমার মনে হয়, উক্ত দ্বিবিধ উপ-দেশের মধ্যে, বেদান্তের উপদেশই অধিক দুর্ব্বোধ্য। কাজেই আমি বাধ্য হইয়া বলি, ন্যায়ের উপদেশ্য বিষয় একটিও কঠিন নহে, উহার ভাষাই কঠিন, যৎপরোনাস্তি কঠিন।

নৈয়ায়িকদিগের ভাষা 'ত্ব' ও 'তা' প্রভৃতি তদ্ধিতপ্রত্যয়ে পরিপূর্ণ। তাঁহারা যখন ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি, অবচ্ছেদকতা-প্রতিযো-গিতা প্রভৃতি শব্দরাশি দ্রুতপ্রযত্নে উচ্চারণ করিতে থাকেন, তখন তাহা বুঝে কাহার সাধ্য! সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃতজ্ঞ কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রানভিজ্ঞ, এরূপ লোকেও তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারেন না।

'জনো ঘটমানয়তি' এই একটি সরল সংস্কৃতবাক্য। নৈয়ায়িক ঐ বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের পর যে অর্থ স্থির করেন, তাহা বলি, দেখুন বুঝিতে পারেন কি না—

"জনত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূপিতসমবায়ত্বা-বচ্ছিন্নসাংসর্গিকবিষয়তানিরূপিতকৃতিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রকারত্বাভিন্নকৃতিত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূ-পিতানুকূলতাত্বাবচ্ছিন্নসাংসর্গিকবিষয়তানিরূ-পিতানয়নতাত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারত্বাভিন্নানয়নতা-ত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূপিতনিরূপকত্বত্বাব-চ্ছিন্নসাংসর্গিকবিষয়তানিরূপিতকর্ম্মত্বত্বাবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যতানিরূপিতাধেয়তাত্বাবচ্ছিন্নসাংসর্গিক-বিষয়তানিরূপিতঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারতাশালী বোধঃ।" *

* সারমঞ্জরী নামে একখানি ব্যুৎপাদক গ্রন্থ আছে, তাহারই একজন নব্য টীকাকার উক্তরূপ ব্যাখ্যা বিন্যাস করিয়াছেন।

কী বুঝিলেন? 'জনো ঘটমানয়তি' এই কথার নৈয়ায়িককৃত অর্থ বুঝিলেন কি? ইহারই দ্বারা বুঝিবেন, নব্যনৈয়ায়িকদিগের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি, বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

কোন এক ধনী লোকের ভবনে একদা এক হরবোলার ভাঁড়ামি হইতেছিল। হরবোলা পাদরিসাহেবের বাঙ্লা বক্তৃতা, ব্রাহ্মপুরোহিতের উপদেশ, শ্রাদ্ধসভায় আহূত পণ্ডিতগণের বিচার, সমস্তই একে একে নকল করিল। ব্যাকরণের বিচার ও স্মৃতির বিচার নকল করিয়া, ন্যায়শাস্ত্রের বিচার নকল করিবার সময়, কতকগুলা কড়ি একটা ঘটের ভিতর পুরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিল এবং বলিল, "শুনুন, ন্যায়ের বিচার শুনুন।" ন্যায়ের বিচারের সহিত বরাটকপূর্ণ ঘটের আন্দোলনের যে কি সৌসাদৃশ্য, তা শ্রোতৃবর্গ একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

ন্যায়শাস্ত্রের ভাষা অত কূট হইল কেন? এই প্রশ্নেরও দুইপ্রকার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়। কেহ বলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের অনুরোধে বাধ্য হইয়া ঐরূপ কূটভাষা সৃজন করিতে হইয়াছে। অন্যে বলেন, কেবল বিচারের অনুরোধে নহে, ঐ বিষয়ে তাঁহাদের অনেকটা ইচ্ছার অনুরোধও আছে; অর্থাৎ বিচারের অনুরোধেও বটে, ইচ্ছা করিয়াও বটে। ইচ্ছা করিয়া কূটভাষা সৃজন করিবার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। ইদানীন্তন কালেরও অনেক পণ্ডিতের এরূপ স্বভাব দেখা যায় যে, তাঁহারা অন্যকে বিদ্যাবুদ্ধি-বিষয়ে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা ও যত্ন করিয়া অতি দুর্ব্বোধ্য কূটশ্লোকাদি রচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন, সরল ভাষায় কোন-কিছু লিখিলে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের হানি হইবে। শ্রীহর্ষনামক জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত, যিনি 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'নামক গ্রন্থের প্রণেতা, তিনিও ঐপ্রকার দুরভিসন্ধিদোষে লিপ্ত ছিলেন। তবে তাঁহার গুণ এই যে, তিনি নিজের মনোভাব গোপন না করিয়া উক্ত গ্রন্থের শেষে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিয়া এই গ্রন্থকে দুর্ব্বোধ্য ও দুষ্পাঠ্য করিলাম। যথা—

> "গ্রন্থগ্রন্থিরিহ ক্বচিৎ ক্বচিদপি ন্যাসি প্রযত্নান্ময়া
> প্রাজ্ঞম্মন্যমনা হঠেন পঠিতী মাস্মিন্ খলঃ খেলতু।
> শ্রদ্ধারাদ্ধগুরুঃ শ্লথীকৃতদৃঢগ্রন্থিঃ সমাসাদয়
> ত্বেতত্তর্করসোর্ম্মিমজ্জনসুখেষ্বাসঞ্জনং সজ্জনঃ॥"

আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই গ্রন্থের অনেকস্থান গ্রন্থিবদ্ধ করিলাম। যাহারা খলস্বভাব, প্রজ্ঞাভিমানী, কাহাকেও গুরু বলিতে চাহে না, আপনা-আপনি পড়িয়া লইবার চেষ্টা করে, তাহারা এই গ্রন্থে ক্রীড়া করিতে পারিবে না। যাহারা সজ্জন, শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে গুরুসেবা করে, তাহারাই গুরুদ্বারা এই গ্রন্থের গ্রন্থিসকল খুলিয়া লইয়া, অত্রস্থ তর্করসের তরঙ্গে, মজ্জনের সুখ প্রাপ্ত হইবে। এ সকল কথা শুনিলে, কে না বলিবে যে, ন্যায়াচার্য্যগণ ইচ্ছা করিয়া কূটভাষা সৃজন করিয়াছেন। যাহাই হউক, ন্যায়ের পদার্থগণ দুরূহ বা দুষ্প্রতর্ক্য হউক বা না হউক, তাহার ভাষা যে নিতান্ত দুরূহ, সে পক্ষে সংশয় নাই।

ন্যায়ের ভাষাকার্কশ্য প্রথমাবধি নহে। যেরূপ ভাষায় ন্যায়দর্শনের আবির্ভাব, সেই-

রূপ ভাষায় অন্যান্য দর্শনেরও আবির্ভাব। ন্যায়ের সূত্রসকল যেরূপ-পদ্ধতি-যুক্ত, অন্যান্য দর্শনের সূত্রগুলিও তদ্রূপ-পদ্ধতি-যুক্ত। ন্যায়ের ভাষ্যপ্রভৃতি ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভাষা যেরূপ, অন্যান্য দর্শনের ভাষ্যপ্রভৃতি ব্যাখ্যা-গ্রন্থের ভাষাও সেইরূপ। বলিতে কি, ন্যায় বঙ্গদেশে আসিয়াই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, নচেৎ পূর্ব্বে সর্ব্বদেশে একই রূপে অবস্থিত ছিল।

ন্যায় কি? এ কথার প্রত্যুত্তর দিতে হইলে, বোধ হয় আপাতত এইরূপ বলিলে যথেষ্ট হইতে পারে যে, অনুমানপ্রণালীর নাম ন্যায়, ও তদ্বোধক শাস্ত্রের নাম ন্যায়শাস্ত্র। 'অনু'শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, আর 'মান'শব্দের অর্থ জ্ঞানা। যে স্থলে কোন এক জ্ঞানের দ্বারা তৎসংসৃষ্ট অন্য এক পদার্থ জানা যায়, সে স্থলের সেই প্রথম জ্ঞান অনুমান ও দ্বিতীয় জ্ঞান অনুমিতি। যেমন ধূমজ্ঞানের পর বহ্নির জ্ঞান। প্রাচীন ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরাও অনুমানের লক্ষণপ্রসঙ্গে সরল সংস্কৃতভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে, "জ্ঞানকরণকং জ্ঞান-মনুমানম্।" আমি অনুমানের নাম ন্যায়, এ কথা না বলিয়া, অনুমানপ্রণালীর নাম ন্যায়, এ কথা বলিলাম কেন, তাহা বলিতেছি। অনুমান স্বার্থ-পরার্থ-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যাহা স্বার্থ, তাহা ন্যায়সংজ্ঞার সংজ্ঞী নহে; যাহা পরার্থ, তাহাই ন্যায়সংজ্ঞার সংজ্ঞী। স্বার্থানুমান জীবহৃদয়ের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, সেজন্য তাহা পরাপেক্ষী নহে। পরাপেক্ষী অর্থাৎ শাস্ত্রমুখাপেক্ষী। পরাপেক্ষী নহে, অর্থাৎ আপনা-আপনি জন্মে। আপনা-আপনি জন্মে বলিয়াই তাদৃশ অনুমানের নাম স্বার্থানুমান। যে একবার ধূমমূলে বহ্নি দেখিয়াছে, সে সময়ান্তরে ধূম দেখিলেই তন্মূলে বহ্নি থাকা অবধারণ করিবে। তাহার সেই ধূমজ্ঞানজন্য বহ্নি-জ্ঞান আপনা-আপনি জন্মে, কাহাকেও জন্মাইয়া দিতে হয় না, সেইজন্য তাহা স্বার্থসংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট। তাদৃশ স্বার্থানুমান শক্তিরূপে প্রত্যেক জীবের অন্তরে স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে বিদ্যমান থাকে। তাহারই প্রভাবে জীবগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান পদার্থে, দূর ও ব্যবহিত পদার্থে, জ্ঞানলাভ করিয়া নির্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাই বলা হইয়াছে, স্বার্থানুমান শাস্ত্রশিক্ষার অধীন নহে। এবংবিধ স্বার্থানুমানের আদর্শে পরার্থানুমান-নামক ন্যায় রচিত হইয়া থাকে; সেজন্য উক্ত স্বার্থানুমানকে পরা-র্থানুমানের মূল, বীজ, আদর্শ বা অনুবাদ বলা যায়। যে স্থলে কোন কারণবশত স্বতঃসিদ্ধ স্বার্থানুমানশক্তি সুপ্তকল্প হয়, সেই স্থলে পরার্থানুমানের উদয় বা অবির্ভাব হইয়া থাকে। মনে করুন, আমি ও আমার ভৃত্য, আমরা উভয়েই দূর হইতে পর্ব্বতোপরি ধূমোদ্গমন হইতে দেখিলাম। দেখিয়া আমি বুঝিলাম, পর্ব্বতোপরি বহ্নি আছে। কিন্তু আমার ভৃত্য তাহা বুঝিল না, অথবা বহ্নিসদ্ভাবে অবিশ্বস্ত বা সন্দিহান হইল। কাজেই আমাকে তখন পরার্থা-নুমানপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইল। তাহা অন্য কিছু নহে, তাহা একপ্রকার বাক্-প্রপঞ্চ। সেই বাক্প্রপঞ্চ=একটি পাঁচ-বিভাগে বিভক্ত মহাবাক্য। প্রথম বিভাগের নাম প্রতিজ্ঞা, দ্বিতীয় বিভাগের নাম হেতু,

তৃতীয় বিভাগের নাম উদাহরণ, চতুর্থ বিভাগের নাম উপনয় ও পঞ্চম বিভাগের নাম নিগমন। এই সকল বিভাগের অপর নাম অবয়ব। অবয়বপঞ্চকের ক্রমিক উল্লেখ এইরূপ

১। নিশ্চয়ই পর্ব্বতোপরি বহ্নি আছে।

২। কেন না, ধূম দেখা যাইতেছে।

৩। ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি থাকে, ইহা পাকশালা প্রভৃতি স্থলে দেখিয়াছি।

৪। পর্ব্বতেও ধূম দেখা যাইতেছে।

৫। যেহেতু ধূম দেখা যাইতেছে, সেই-হেতু ঐ স্থানে বহ্নিও আছে।

ইহারই নাম পরার্থানুমানপ্রণালী। ইহারই নাম পঞ্চাবয়ব ন্যায়, এবং ইহারই প্রপঞ্চ গৌতমের দর্শন।

পঞ্চাবয়ব ন্যায়, এই কথায় আর একটি ভাষ্যকারীয় কথা মনে পড়িল। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, গৌতমের পূর্ব্বে ন্যায়ের দশ অবয়ব প্রচলিত ছিল। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পাঁচ অবয়বের অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্যপ্রাপ্তি, প্রয়োজন ও সংশয়-নিরাস, এই পাঁচ নামের আর পাঁচটি অবয়ব ব্যবহার করিতেন। এই সংবাদ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন যে, গৌতমের পূর্ব্বেও ন্যায়শাস্ত্র ছিল। কাজেই বলিতে হয়, ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে গৌতমকে আদি-সীমায় স্থাপন করিলে অবশ্যই তাহা ভ্রম-কলুষিত হইবে। অপর কথা এই যে, গৌতম যেমন দশাবয়ববাদীর মত মনোনীত করেন নাই, সেইরূপ বেদান্তিগণও, পঞ্চাবয়ববাদী গৌতমের মতও মনোনীত করেন নাই। বেদান্তীরা বলেন, তিন অবয়বেই অনুমান-প্রক্রিয়া পরিসমাপ্ত হয়, সুতরাং আর দুই অবয়বের অঙ্গীকার বৃথা। যদি প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, এই তিন, অথবা উদাহরণ, উপনয়, নিগমন, এই তিন অবয়বদ্বারা অনুমিতিকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহা হইলে অধিক অবয়বের কল্পনা অবশ্যই বৃথা হইবে। যাহাই হউক, কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, আমরা গৌতমের শাস্ত্র পড়ি নাই বলিয়া, ন্যায়বিজ্ঞানে বঞ্চিত আছি। গৌতমের শাস্ত্র না পড়ায় আমরা তৎপ্রকাশক বাক্-কৌশলে মাত্র বঞ্চিত আছি, ফলাংশে বঞ্চিত নহি। আমরা আবালবৃদ্ধযুবা সকলেই, অধিক কি, পশুপক্ষীরাও স্বতঃসিদ্ধ নৈয়ায়িক।

প্রতিদিনই আমরা নানাপ্রকার ন্যায়ের অবতারণা করিয়া থাকি, অথচ জিজ্ঞাসিত হইলে বলি, "আমরা ন্যায় পড়ি নাই, ন্যায় কি, তাহা আমরা জানি না।" এইমাত্র আমি এখানে আসিবার সময় পথিমধ্যে ক্রীড়মান বালকদিগের মুখ হইতে—"ঝড় উঠিবে; কেন না, ঝোড়োকোণে মেঘ হইয়াছে; ঝোড়ো-কোণে মেঘ হইলেই ঝড় হয়;"—এইরূপ এই-রূপ ন্যায়বাক্য কহিতে শুনিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বলিতে হয়, মনুষ্য ন্যায় না পড়িলেও নৈয়ায়িক—স্বতঃসিদ্ধ নৈয়ায়িক। বলিতে পারেন যে, তবে তাহার শাস্ত্র কেন? সে কথার প্রত্যুত্তর এই যে, বুদ্ধিপরিমার্জ্জন, উহশক্তির উদ্দীপন, ন্যায়াঙ্গের বিস্তৃতি, তাহার ব্যবহার অর্থাৎ শিখিবার ও শিখাইবার পদ্ধতিপ্রচার, এইরূপ এইরূপ প্রয়োজনসাধনের জন্যই শাস্ত্র, ন্যায়শক্তি সৃজন করিবার

জন্য নহে। ন্যায়শক্তি মনুষ্যসৃষ্ট নহে, তাহা প্রকৃতির সৃষ্ট। এইজন্যই বলিতে হয়, শাস্ত্র কেবল সংজ্ঞা, পরিভাষা ও তাহার প্রয়োগকৌশলাদি উপদেশ করে, অন্য কিছু করে না। আমরা এমন অনেক জিনিষ জানি, যাহার জ্ঞান থাকিতেও, আমরা নাম জানা না থাকায় লোককে বলিতে বা পরিচয় দিতে পারি না, এবং বুঝাইবার উপযুক্ত শব্দাদি জানা না থাকায় তাহার বর্ণনা করিতে পারি না। যিনি জিনিষ চেনেন, অথচ নামাদি জানেন না, তিনি তাহা বুঝাইতে বা উপদেশ করিতে অশক্ত। যিনি সংজ্ঞা-পরিভাষাদি-ঘটিত শাস্ত্র জানেন, অথচ জিনিষ চেনেন না, তিনিও বস্তুতত্ত্ব-উপদেশের অযোগ্য। কেন না, তাদৃশ ব্যক্তির উপদেশ অনেক সময়ে বিপরীতই হইয়া থাকে।

একদা এক বেদান্তের ছাত্র "স গুরুম্ অভিসরেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" এই শ্রুত্যংশ পড়িবার সময় প্রশ্ন করিল—"গুরুর বিশেষণে ব্রহ্মজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ এই দুই কথা কেন? কেবল ব্রহ্মজ্ঞের অথবা কেবল শাস্ত্রজ্ঞের নিকট গেলেই ত শিষ্যের অভীষ্টলাভ হইতে পারে।" গুরু বলিলেন—"তাহা পারে না। কারণ এই যে, বুঝাইবার উপযুক্ত বাক্প্রপঞ্চ জানা না থাকিলে গুরু আপনার ব্রহ্মজ্ঞান শিষ্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন না এবং বাক্প্রপঞ্চ জানা থাকিলেও ব্রহ্মসম্প্রত্যয়ের অভাবে তিনি হয় ত শিষ্যকে ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে অব্রহ্মই বুঝাইবেন।"

কেবল-শাস্ত্রজ্ঞের উপদেশ অনেক সময়ে মরুবাসী অধ্যাপকের উপদেশের অনুরূপ হইয়া থাকে। জনৈক মরুবাসী অধ্যাপক কোষগ্রন্থ পড়াইতেছিলেন। যে অংশে নারিকেলবৃক্ষের নাম-লিঙ্গাদি বর্ণিত আছে, সেই অংশ পড়াইবার সময় ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "নারিকেলগাছ কিরূপ?" অধ্যাপক শাস্ত্র ব্যতীত চক্ষে নারিকেলগাছ দেখেন নাই; কোন লোকের মুখে শুনিয়াছেন, নারিকেলগাছ পূর্ব্ববাঙ্গলায় জন্মে। তিনি বলিলেন— "স তু প্রাগ্দেশীয়লতাবিশেষঃ।" অতএব যে গুরু, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশাস্ত্র, উভয়ই বিদিত থাকেন, সেই গুরুই ব্রহ্ম-উপদেশের যোগ্যপাত্র। তাই আমার বক্তব্য, কেবল জ্ঞান স্বব্যবহার ব্যতীত পরকীয় ব্যবহারের অনুপযোগী। কাজেই বুঝিতে হইতেছে, আমরা স্বতঃসিদ্ধ নৈয়ায়িক হইলেও শাস্ত্রশিক্ষিত নৈয়ায়িক নহি। তাহা নহি বলিয়াই আমরা জিজ্ঞাসিত হইলে বলি- "আমরা নৈয়ায়িক নহি, ন্যায় কি, তাহা জানি না।" আমাদের ন্যায় জানি না বলা, আর কোন এক বিদেশবাসী অভিনেতার গদ্য জানি না বলা প্রায় সমান। জনৈক বিদেশবাসী অভিনেতা রঙ্গস্থলে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি বিশবৎসর পর্য্যন্ত গদ্যে কথা কহিয়া আসিয়াছি, অথচ গদ্য কি, তাহা জানিতাম না।" এই ব্যক্তি যেমন গদ্যপদ্যবিভাগের নামলক্ষণাদিশিক্ষার পর আশ্চর্য্য হইয়াছিল, সেইরূপ আমরাও ন্যায়শাস্ত্র পড়ার পর আশ্চর্য্য হইতে পারি।

এ বিষয়ে আর অধিক প্রসক্তানুপ্রসক্ত কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের পুনরালোচনা করা যাউক।

পরার্থানুমানপ্রণালীর নাম ন্যায়। এ কথা আমার কল্পিত কথা নহে; ইহা ভাষ্য-

কারীয় কথার অনুবাদ। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ। প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানম্। সা অন্বীক্ষা; তয়া প্রবর্ত্তত ইতি আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্।" কতকগুলি প্রমাণদ্বারা, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পাঁচ প্রমাণতুল্য প্রয়োগের দ্বারা পদার্থনির্ণয় করার নাম ন্যায়; তাহাই অনুমান ও অন্বীক্ষা নামে প্রসিদ্ধ।

বলা বাহুল্য যে, অবিরুদ্ধ অনুমানই ন্যায়. অন্যথা তাহা ন্যায়াভাস। বার্ত্তিককার উদ্যোতকর "প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ" এই ভাষ্যোক্ত কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—প্রতিজ্ঞা =শব্দপ্রমাণতুল্য, হেতু=অনুমানপ্রমাণতুল্য, উদাহরণ=প্রত্যক্ষতুল্য এবং উপনয়= উপমানপ্রমাণের সদৃশ। অবশেষে বলিয়াছেন, নিগমননামক পঞ্চম অবয়বে ঐ সকলের একত্র সমাহার বা সমাবেশ দেখান হয়। এবংবিধ ন্যায় যথাযথরূপে প্রযুক্ত হইলে জ্ঞাতব্য-পদার্থের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে নির্ণীত ও তদ্বিষয়ক ভ্রমপ্রমাদসংশয়াদি নিবারিত হয়। কি ঐহিক কৃষিবাণিজ্যাদি, কি পারলৌকিক স্বর্গ, অপূর্ব্ব ও দেবতাদি, কি অপবর্গপ্রদ আত্মা পরমাত্মা প্রভৃতি, সমস্ত তত্ত্বই এই ন্যায়বিদ্যার বিষয়। অতএব ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়ের শাস্ত্র যে কেবল ফক্কিকার শাস্ত্র, তাহা নহে। যে মহামুনি তাদৃশ মহোপকারী শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ইহলোকে কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, সেই মহামুনি যে এই বিস্তৃত ভারতবর্ষের কোন্ অংশের লোক, তাহা ঠিক বিদিত হইবার উপায় নাই। অনুসন্ধান আরম্ভ করিলে দেখা যায় বা পাওয়া যায়, গৌতমের নামে গোত্র, স্মৃতিসংহিতা ও ন্যায়দর্শন প্রভৃতি প্রচারিত আছে। রামায়ণাদি-গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, অহল্যাপতি গৌতম। আবার আধুনিক-বহুগ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, বুদ্ধ গৌতম ছিলেন। এই সকল গৌতম এক ব্যক্তি কি বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহা যথাযথ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেবল বৌদ্ধ-গৌতমকেই পৃথক্ বলিয়া স্থির করা যায়, অবশিষ্ট গৌতম সন্দেহদোলায় দোলায়িত হইতে থাকেন। যাহাই হউক, ন্যায়দর্শনলেখক গৌতমের বিষয় অনুসন্ধানে যাহা পাওয়া যায়, তাহা এতৎস্থলে কথিত হইতেছে।

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও তদ্বার্ত্তিককার উদ্যোতকরমিশ্র ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতমকে অক্ষপাদ ও ঋষি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"যোঽক্ষপাদমৃষিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাৎ বদতাং বরম্।
তস্য বাৎস্যায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্ত্তয়ৎ॥"

বাৎস্যায়ন।

"যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং
শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ।
কুতার্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তিহেতোঃ
করিষ্যতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ॥"

কোন কোন পুরাণেও ন্যায়দর্শনকার গৌতমকে অক্ষপাদ বলিতে দেখা যায়। যথা—

"অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ॥" ইত্যাদি।

এখন বিবেচনা করুন, যেমন দর্শনকার গৌতম অক্ষপাদসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, এরূপ, গোত্রকার ও স্মৃতিকার গৌতম কুত্রাপি অক্ষপাদবিশেষণে বিশেষিত হন নাই। তাহা না হওয়ায়, নিষ্প্রতিবন্ধকে এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে, স্মৃতিকার ও গোত্রকার

গৌতম হইতে দর্শনকার গৌতম ভিন্ন ব্যক্তি।

গৌতমের অক্ষপাদ নাম কেন? এ সম্বন্ধে জনবাদ এই যে, ইনি কোন এক শিষ্যের প্রতি কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ—এ চক্ষে আর তোকে দেখিব না।" শিষ্য গুরুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া গুরুতর মনস্তাপে কষ্ট পাইতে লাগিল। পরে বহু আরাধনার পর তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না; পরন্তু আজ হইতে তোকে আমি পদদ্বারা দর্শন করিব।" এতদুপলক্ষ্যেই তাঁহার পাদপ্রদেশে অক্ষি অর্থাৎ চক্ষু আবির্ভূত হইয়াছিল এবং তাহাতেই তিনি তদবধি অক্ষপাদ আখ্যায় অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এ জনবাদের কোন মূল আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। আমাদের বোধ হয়, আমরা এখন যেমন কোন অতিসতর্ক লোক দেখিলে বলি, লোকটার পিছুদিকেও সাতটা চোখ; বোধ হয়, পূর্ব্বকালের মুনিঋষিরা ইঁহাকে যৎপরোনাস্তি বুদ্ধিমান্ দেখিয়া 'পায়েও চক্ষু অর্থাৎ দর্শনসাধন ইন্দ্রিয়', এতদর্থে অক্ষপাদনাম প্রচার করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, গোত্রকার, স্মৃতিকার ও দর্শনকার গৌতম যে একই ব্যক্তি, তাহা নহে।

এই অক্ষপাদ যে দেশে বাস করিতেন, সে দেশ নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হয় না। বর্ত্তমান ছাপরাজেলার মধ্যে গৌতমাশ্রম নামে এক অরণ্যকল্প স্থান আছে। সে দেশের প্রবাদ এই যে, মহর্ষি গৌতম উক্ত স্থানে থাকিয়া ন্যায়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে বৎসর বৎসর গৌতমের নামে একটি মেলা হইয়া থাকে। অনধিক ৪০ বৎসর হইল, অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়া উক্ত স্থানে একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে জনৈক নৈয়ায়িক ও কতিপয় ছাত্র বৃত্তিপ্রাপ্তে বাস করিতেছেন। ঐ স্থান যদি সত্যসত্যই অক্ষপাদ-গৌতমের জন্মস্থান বা বাসস্থান হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি, অহল্যাপতি গৌতমই অক্ষপাদ। কেন না, রামায়ণের ও মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে ঐ স্থান অহল্যাপতি গৌতমের বাসস্থান বলিয়া অনুভূত হয়।

গৌতম ও তৎপ্রণীত ন্যায়দর্শন কত পুরাতন, তাহা অস্মদাদির দুর্জ্ঞেয়। ইঁহার আবির্ভাবকালসম্বন্ধে যিনি যেপ্রকার অনুমান করেন করুন, অব্যভিচরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। একদিকে দেখা যায়, মনু যে অত পুরাতন, তাঁহার গ্রন্থেও আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ আছে। আবার অপরদিকে দেখুন, ক্ষণভঙ্গবাদ প্রভৃতি অধস্তন অনার্ষমতেরও আভাস গৌতমের গ্রন্থে রহিয়াছে। অতএব গৌতমের কালনির্ণয়ের জন্য প্রয়াসবাহুল্য স্বীকার করা বৃথা। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, কপিলের ও কণাদের দর্শনের পর গৌতমের দর্শন। বোধ হয়, দর্শনগুলির পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমনিয়মে প্রাগুক্ত "কপিলস্য কণাদস্য গৌতমস্য পতঞ্জলেঃ" শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। অবশেষে বক্তব্য এই যে, কপিলের পর গৌতম, এ কথা অসন্দিগ্ধ, পরন্তু কণাদের পর গৌতম, এ কথা সন্দিগ্ধ।

গৌতমদর্শনের ভাষ্যলেখক বাৎস্যায়ন। বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে আর কেহ ন্যায়ভাষ্য লিখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা বিদিত নহি। যে মহাপুরুষ এতদ্দেশে চাণক্য-পণ্ডিত নামে পরিচিত, সেই মহাপুরুষেরই অন্য নাম বাৎস্যায়ন। ইঁহার আরও সাতটি নাম আছে ; যথা—

"বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্যচণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥

অতএব এই চাণক্যপণ্ডিতই নীতিশাস্ত্রের বিষ্ণুগুপ্ত বা বিষ্ণুশর্ম্মা, শব্দশাস্ত্রের কৌটিল্য এবং ন্যায়ভাষ্যের বাৎস্যায়ন। প্রাচীন মুদ্রারাক্ষস নাটকে চাণক্যের প্রায় সংক্ষ্ণা নামই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পক্ষিলস্বামী নামটি নানাশাস্ত্রলেখক বাচস্পতিমিশ্রই ব্যবহার করিয়াছেন। চাণক্যাপরনামা বাৎস্যায়ন অন্যূন ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মগধ-দেশ অলঙ্কৃত করিয়া জীবিত ছিলেন।

ইনিই প্রাচীন নন্দবংশের ধ্বংসকর্ত্তা ও মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই চন্দ্রগুপ্ত-নামক মৌর্য্যপুত্রকে নন্দবংশীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় করান। ইঁহার কালনির্ণয়সম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যাহা বলেন বলুন, এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে ইনি অন্যূন ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইহার কৃত ন্যায়ভাষ্যের বার্ত্তিকলেখক উদ্দ্যোতকর-মিশ্র। উদ্দ্যোতকর মিথিলাবাসী ছিলেন। ইঁহার বার্ত্তিকপাঠে জানা যায়, তৎপূর্ব্বে ন্যায়ভাষ্যের উপর অনেকগুলি ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিক-আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল ভাষ্যব্যাখ্যাকার বিদ্যমান ছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম ব্যাখ্যা-কার দিঙ্নাগাচার্য্য। মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন যে, দিঙ্নাগের দুষ্টব্যাখ্যা প্রচারিত দেখিয়াই উদ্দ্যোতকর তৎশোধনার্থ বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন। কালি-দাসের মেঘদূতকাব্যের টীকায় এক দিঙ্-নাগের উল্লেখ দেখা যায়, সে দিঙ্নাগ ন্যায়ভাষ্যব্যাখ্যাকার কি না, আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, দিঙ্নাগ এক বৌদ্ধপণ্ডিত। তিনি বিক্রমাদিত্যের সম-কালিক। অন্যে বলেন, তিনি ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন এবং তিনিই ন্যায়-ভাষ্যের ব্যাখ্যালেখক। এই শেষোক্ত মত সত্য হইলে বলিতে পারা যায়, মৈথিল উদ্দ্যোতকর ১৭০০ বৎসরের কিছুকাল পরে মিথিলাজনপদে প্রাদুর্ভূত হন। দিঙ্নাগ বৌদ্ধ ছিলেন, সেজন্য তাঁহার ব্যাখ্যা বৌদ্ধমতানুযায়ী হইয়াছিল, কাজেই উদ্দ্যোত-করের নিকট তিনি কুতার্কিক ও তাঁহার ব্যাখ্যাও কুব্যাখ্যা। তাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

"কুতার্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তিহেতোঃ
করিষ্যতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ।"

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র উদ্দ্যোত-করকৃত বার্ত্তিকের উপর তাৎপর্য্যনাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন। ইনিও মৈথিল এবং ইঁহার স্থিতিকাল আনুমানিক ৮০০ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার পরে ইঁহারই কৃত ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকার উপর তাৎপর্য্যনাম্নী টীকা মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্যকর্ত্তৃক লিখিত হয়। ইহার পরে আর কেহ সমগ্র ন্যায়দর্শনের বিস্তৃতিচেষ্টা করেন নাই। মিথিলাবাসী গঙ্গেশ এবং পক্ষধর-

মিশ্র প্রভৃতি এবং বঙ্গবাসী রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশ ও মথুরেশ প্রভৃতি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বৈশেষিকদর্শনের সমধিক উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে। গৌতম-দর্শনের উন্নতি হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না, তবে প্রসঙ্গসিদ্ধিন্যায়ে গৌতম-দর্শনেরও কোন কোন অংশ উন্নত ও বিস্তৃত হইয়াছে। বৈশেষিকশাস্ত্রের সহিত গৌত-মোক্ত শাস্ত্রের বহু অংশে মিল বা ঐক্য থাকায় বৈশেষিকের বিস্তারে গৌতমোক্ত শাস্ত্রের বিস্তার প্রসঙ্গসিদ্ধ।

গৌতমদর্শন ষোলপ্রকার পদার্থের উপর অবতরিত। সে সকলের নাম এই—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান। এই সকল পদার্থের আবার অবান্তর বিভাগ আছে। উপরোক্ত মহামহোপাধ্যায়দিগের দ্বারা প্রায় সকল বিভাগই উন্নত হইয়াছে।

কেবল বাদ, জল্প, জাতি, শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রেত্যভাব অর্থাৎ জন্মান্তর, এই কয় বিভাগ কিছু অবিস্তৃত রহিয়াছে। বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, এই তিন বিভাগের মধ্যে বিতণ্ডা-বিভাগ এত বিবৃদ্ধ হইয়াছে যে, সে বৃদ্ধি বোধ হয় চূড়ান্তসীমা অতিক্রম করিয়াছে।

গৌতমের দর্শন অতি গম্ভীর ও সর্ব্বব্যাপী হইলেও সূত্রের দ্বারা প্রণীত হওয়ায়, প্রথমত বোধ হয় গৌতমের দর্শন অতি সংক্ষিপ্ত। পরন্তু সে সকল সূত্র সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে গেলে তখন আর সংক্ষিপ্ততা থাকে না। যতই চিন্তা করা যায়, ততই তাহা বিস্তৃত হইতে থাকে। তাদৃশ ৫২১ সূত্রের দ্বারা বিশাল ন্যায়দর্শন প্রস্তুত করিয়া মহর্ষি অক্ষপাদ যার পর নাই ক্ষমতাধিক্য দেখাইয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভাবধি কোথাও তিনচার সূত্রে, কোথাও বা তদধিক সূত্রে এক এক প্রস্তাব সমাপ্ত করিতে দেখা যায়। প্রস্তাবগুলির অপর নাম প্রকরণ। তাদৃশ প্রকরণের কতিপয় কতিপয় প্রকরণে এক এক আহ্নিক। তাদৃশ আহ্নিকের দুই দুই আহ্নিকে এক এক অধ্যায় এবং তাদৃশ অধ্যায়ের পাঁচ অধ্যায়ে গৌতমের দর্শন সমাপ্ত।

উক্ত পাঁচ অধ্যায়ে অন্যূন অশীতিসংখ্যক প্রকরণ বা প্রস্তাব আছে। সেগুলি এই—শাস্ত্রের প্রয়োজন ও প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রমাণলক্ষণ, প্রমেয়তত্ত্ব, ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ, ন্যায়াশ্রিত সিদ্ধান্তের আকার, ন্যায়ের লক্ষণ, ন্যায়ের উত্তরাঙ্গ, ন্যায়ানুগত কথা, যেপ্রকার হেতুতে সাধনীয় বিষয় সিদ্ধ হয় না সেই সকল হেতুর বিবরণ (ইহারই শাস্ত্রীয়নাম হেত্বাভাস), ছল, অশক্তিমূলক দোষ অর্থাৎ আপত্তিনিরাস ও অন্যের উদ্ভাবিত তর্কের দোষ দেখাইতে না পারা, সংশয়, প্রমাণ-সামান্য, প্রত্যক্ষপ্রমাণ, অবয়বী, অনুমান-প্রমাণ, বর্ত্তমানভাব, উপমানপ্রামাণ্য, শব্দসামান্যপরীক্ষা, চক্ষুরিন্দ্রিয় এক, মন ও আত্মা বিভিন্ন, আত্মা অনাদিনিধন, শরীরোৎপত্তি ও ইন্দ্রিয়পরীক্ষা, ইন্দ্রিয় অনেক, ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা প্রচারস্থান, বুদ্ধি বা জ্ঞান নিত্যপদার্থ নহে পরন্তু অনিত্য-পদার্থ, ক্ষণভঙ্গবাদ, বুদ্ধি ও আত্মার গুণ, বুদ্ধি উৎপন্নপ্রধ্বংসিনী, বুদ্ধি শরীরের ধর্ম্ম নহে, মনঃপরীক্ষা, শরীর অদৃষ্টানুসারে

উৎপন্ন হয়, প্রবৃত্তি ও দোষসামান্য, দোষপরীক্ষা, জন্মান্তর, শূন্যবাদনিরাস, ঈশ্বর জগতের অনুপাদান, জগৎ আকস্মিক নহে, সমস্ত বস্তু অনিত্য নহে, সমস্ত বস্তু নানাত্মক নহে, সর্ব্বশূন্যবাদনিরাস, ফলপরীক্ষা, দুঃখবৃত্তান্ত, মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি, অবয়ব ও অবয়বী, নিরবয়ব বস্তু, বাহ্যবস্তু, তত্ত্বজ্ঞানবৃদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানপালন, কেহ কোন হেতু প্রদর্শন করিলে তদ্বিরুদ্ধে হেত্বন্তর উদ্ভাবন করা (ইহার শাস্ত্রীয় নাম সৎপ্রতিপক্ষ), ২৪প্রকার জাতি অর্থাৎ বাদীর উক্তিতে যে দোষ থাকে সেই দোষ বাদীকে দেখান, অভিমত বাক্যার্থের অপ্রতিপাদক পদার্থ, এবং ২২প্রকার নিগ্রহস্থান অর্থাৎ পরাজয়ের স্থান। গৌতমের গ্রন্থে এই সকল প্রস্তাব আছে এবং প্রস্তাবসকল অতি সুপ্রণালীতে নিবদ্ধ হইতে দেখা যায়।

এই সকল প্রকরণে যে যে বিষয় গৌতমকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে, সে সকল এরূপ স্বল্পকায় প্রবন্ধে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। সেইজন্য আমি এইস্থানেই অদ্যকার পাঠ সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

পাগল।

পশ্চিমের একটি ছোট সহর। সম্মুখে বড়রাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগুলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মত আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ীর ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার, সবুজ মেঘের মত, স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগলছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।

আজ এই ছোট সহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবগুণ্ঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমার অনেক জরুরী লেখা পড়িয়া আছে—তাহারা পড়িয়াই রহিল। জানি, তাহা ভবিষ্যতে পরিতাপের কারণ হইবে; তা হউক্, সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পূর্ণতা কোন্ মূর্ত্তি ধরিয়া হঠাৎ কখন্ আপনার আভাস দিয়া যায়, তাহা ত আগে হইতে কেহ জানিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু যখন সে দেখা দিল, তখন তাহাকে শুধুহাতে অভ্যর্থনা করা যায় না। তখন লাভক্ষতির আলোচনা যে করিতে পারে, সে খুব হিসাবী লোক—সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে—কিন্তু হে নিবিড় আষাঢ়ের মাঝখানে একদিনের জ্যোতির্ম্ময় অবকাশ, তোমার শুভ্রমেঘমাল্যখচিত ক্ষণিক অভ্যুদয়ের কাছে আমার সমস্ত জরুরী কাজ আমি মাটি করিলাম—আজ আমি ভবিষ্যতের হিসাব করি-

লাম না—আজ আমি বর্ত্তমানের কাছে বিকাইলাম!

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা কিছুই দাবী করে না;—তখন হিসাবের অঙ্কে ভুল হয় না, তখন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন একদিনের সঙ্গে আর-একদিন, এক কাজের সঙ্গে আর-এক কাজ দিবা গাঁথিয়া-গাঁথিয়া অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ সমানভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো খবর না দিয়া একটা বিশেষ দিন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের সঙ্গে তাহার কোনো মিল হয় না—তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত 'খেই' হারাইয়া যায়—তখন বাঁধা-নিয়ম এবং বাঁধা-কাজের পক্ষে বড়ই মুস্কিল ঘটে।

কিন্তু এই দিনই আমাদের বড়দিন — এই অনিয়মের দিন, এই ভুলের দিন, এই কাজ নষ্ট করিবার দিন। যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয় —সেই দিন আমাদের আনন্দ। অন্যদিনগুলো বুদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন,—আর, একএকটা দিন পুরা পাগ্‌লামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।

পাগলশব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। ক্ষ্যাপা নিমাইকে আমরা ক্ষ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি—আমাদের ক্ষ্যাপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা ক্ষ্যাপামির এক-প্রকার বিকাশ কি না, এ কথা লইয়া য়ুরোপে বাদানুবাদ চলিতেছে—কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতিভা ক্ষ্যাপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট্‌পালট্ করিতেই আসে—তাহা আজিকার এই খাপ্‌ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া দিনের মত হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়—কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে—কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে!

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপ্‌ছাড়া! সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্রপ্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাঁহার ডিমিডিমি ডমরু বাজিতেছে। আজ মৃত্যুর উলঙ্গ শুভ্রমূর্ত্তি এই কর্ম্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!—সুন্দর শান্তচ্ছবি।

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অদ্ভুত! জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অতি অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছ! একেবারে হিসাবকিতাব নাস্তানাবুদ্ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দিভৃঙ্গির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিদ্ধির প্রসাদ যে একফোঁটা আমাকে দেয় নাই, তাহা বলিতে পারি না—ইহাতেই আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া গেছে—আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

'আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া

দেয়—এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ, যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য! সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্য্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আনন্দ, দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে,—এইজন্য, কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর, আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুইই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, "সেণ্ট্রিফ্যুগল্"—তিনি কেবলি নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া উত্তরোত্তর বৃহদায়মান পাকওয়ালা কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই, তাহারি জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশী নাই, সামঞ্জস্যের সুর ইঁহার নহে, পিনাক বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্ব্বতা উড়িয়া-আসিয়া জুড়িয়া বসে। পাগলও ইঁহারি কীর্ত্তি এবং প্রতিভাও ইঁহারি কীর্ত্তি। ইঁহার টানে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায়, সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব্ব সুরে বাজিয়া উঠে, সে হইল প্রতিভাবান্। পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাবান্ও তাই—কিন্তু পাগল বাহিরেই থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান্ দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া-আনিয়া দশের অধিকার বাড়াইয়া দেন।

শুধু পাগল নয়, শুধু প্রতিভাবান্ নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর, তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া, দেখা দেয়। সেই ভয়ঙ্কর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়! হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে—সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালমন্দ

দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়! সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয়নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে! নৃত্য কর, হে উন্মাদ, নৃত্য কর! তাহারই ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়! হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক্!

আমাদের এই ক্ষ্যাপাদেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগ্‌লামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান্ করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

আজিকার এই মেঘোন্মুক্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপরূপের মূর্ত্তি জাগিয়াছে। সম্মুখের ঐ রাস্তা, ঐ খোড়ো-চাল-দেওয়া মুদীর দোকান, ঐ ভাঙা ভিটা, ঐ সরু গলি, ঐ গাছপালাগুলিকে প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এইজন্য উহারা আমাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—রোজ এই কটা জিনিষের মধ্যেই নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হঠাৎ তুচ্ছতা একেবারে চলিয়া গেছে। আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এতদিন পরিচিত বলিয়া দেখিতেছিলাম, ভাল করিয়া দেখিতেছিলামই না। আজ এই যাহা-কিছু, সমস্তকেই দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। আজ সেই সমস্তই আমার চারিদিকে আছে, অথচ তাহারা আমাকে আটক করিয়া রাখে নাই—তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার পাগল এইখানেই ছিলেন,—সেই অপূর্ব্ব, অপরিচিত অপরূপ, এই মুদির দোকানের খোড়ো চালের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করেন নাই—কেবল, যে আলোকে তাঁহাকে দেখা যায় সে আলোক আমার চোখের উপরে ছিল না। আজ আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সম্মুখের দৃশ্য, ঐ কাছের জিনিষ আমার কাছে একটি বহু-সুদূরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার সঙ্গে গৌরীশঙ্করের তুষারবেষ্টিত দুর্গমতা, মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এম্‌নি করিয়া হঠাৎ একদিন জানিতে পারা যায়, যাহার সঙ্গে অত্যন্ত ঘরকন্না পাতাইয়া বসিয়াছিলাম, সে আমার ঘরকন্নার বাহিরে। আমি যাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তের বাঁধা-বরাদ্দ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, তাহার মত দুর্লভ দুরায়ত্ত জিনিষ কিছুই নাই। আমি যাহাকে ভালরূপ জানি

মনে করি তাহার চারিদিকে সীমানা আঁকিয়া-দিয়া খাতিরজমা হইয়া বসিয়া ছিলাম, সে দেখি, কখন্ একমুহূর্ত্তে সমস্ত সীমানা পার হইয়া অপূর্ব্বরহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে নিয়মের দিক্ দিয়া, স্থিতির দিক্ দিয়া বেশ ছোটোখাটো, বেশ দস্তুরমত, বেশ আপনার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহাকে ভাঙনের দিক্ হইতে, ঐ শ্মশানচারী পাগলের তরফ হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলে মুখে আর বাক্য সরে না— আশ্চর্য্য! ও কে! যাহাকে চিরদিন জানিয়াছি, সেই এ কে! যে একদিকে ঘরের, সে আর-একদিকে অনন্তের, যে একদিকে কাজের, সে আর একদিকে সমস্ত আবশ্যকের বাহিরে, যাহাকে একদিকে স্পর্শ করিতেছি, সে আর-একদিকে সমস্ত আয়ত্তের অতীত— যে একদিকে সকলের সঙ্গে বেশ খাপ্ খাইয়া গিয়াছে, সে আর-একদিকে ভয়ঙ্কর খাপ্‌ছাড়া, আপনাতে আপনি!

প্রতিদিন যাঁহাকে দেখি নাই, আজ তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারিদিকে অতিপরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা —আজ দেখিতেছি, মহা অপূর্ব্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপিসের বড়সাহেবের মত অত্যন্ত একজন সুগম্ভীর হিসাবী লোকের হাতে পড়িয়া সংসারে প্রত্যহ আঁক পাড়িয়া যাইতেছি—আজ সেই বড়সাহেবের চেয়ে যিনি বড়, সেই মস্ত বেহিসাবী পাগলের বিপুল উদার অট্টহাস্য জলে-স্থলে-আকাশে সপ্তলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার খাতাপত্র সমস্ত রহিল! আমার জরুরি-কাজের বোঝা ঐ সৃষ্টিছাড়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম— তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যের আঘাতে তাহা চূর্ণচূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া উড়িয়া যাক্!

নমস্কার।

যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ,
দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে কেহ মোরে দিয়েছে দুখ
দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।

যে কেহ মোরে বেসেছে ভালো,
জ্বেলেছে ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি
পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যা কিছু কাছে এসেছে, আছে,
এনেছে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি।
যা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে
টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি।
জানি বা আমি নাহি বা জানি,
মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি নিখিলে আমি
পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি!

সাময়িকপ্রসঙ্গ।

দেশের কথা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউস্কর মহাশয়ের রচিত "দেশের কথা" নামক পুস্তকের সমালোচনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার আরম্ভে তিনি লিখিতেছেন:—

"এই পুস্তকের বিষয়গুলি মৌলিক নহে। ভারতহিতৈষী ডিগ্বি প্রভৃতি ইংরেজগণ এবং দাদাভাই নরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতের সুসন্তানগণ যে সকল বিষয় লইয়া বহুবৎসর যাবৎ আলোচনা করিতেছেন, তাহাই মূলত অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে আমাদের ধারণায় ছিল, এই পুস্তকখানি পড়িয়া তাহা সুস্পষ্ট, জীবন্ত এবং আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"কোন সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোন সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, বর্ত্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয়

শিল্পবাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ দেউস্কর-মহাশয় কোন উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই,—কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস্ ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্ হইতে সমুদ্ধৃত কথা নিঃশব্দে একটি মর্ম্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইবে। এই দৃশ্য একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায়,—প্রভেদ এই যে, ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দুঃখদারিদ্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। গ্রন্থকার ভিষকের ন্যায় আমাদের ক্ষতস্থানটি জাগাইয়া-তুলিয়া বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন।"

ইহার অনতিদূর পরেই তিনি লিখিতেছেন :—

"দেউস্করমহাশয় বলেন, পুনঃপুন আন্দোলন করিলে গভর্মেণ্ট অবশ্যই আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন।"

শিক্ষাটা কি এই হইল? ইতিহাসে প্রমাণ হইতেছে, প্রবল জাতি ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া দুর্ব্বলজাতির স্বত্ব নষ্ট করিতেছে; ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সেই প্রবল জাতির নিকট পুনঃপুন আন্দোলন করিলেই লোপ্‌ত্রদ্রব্য ফিরিয়া পাওয়া যায়? ব্যাপারটা এতই সহজ?

ইহার উত্তরে আন্দোলনের দল বলিবেন —তা ছাড়া আর কি করিব? একটা ত কিছু করা চাই।

আমরা বলি, [illegible] করিতেই হয় ত ঐ অরণ্যে রোদনটা নয়। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই ইতিহাস হইতে লাভ করিবার বিষয় কি দেখিলে? আমরা বলিব, লাভের বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা দরখাস্তপত্রিকা নহে। আমাদের লাভ এই যে, ইংরাজের আদর্শ আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল—স্বদেশের সকল দিক্ হইতে আমাদের হৃদয় বিমুখ হইতেছিল। মুখে আস্ফালন করিয়া যাহাই বলি, আমাদের অন্তঃকরণ বলিতেছিল—বিলাতী সভ্যতার মত সভ্যতা আর নাই। এই কারণে আমাদের দেশের আদর্শ কি, শক্তি কোথায়, তাহা যথার্থভাবে বিচার করিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্-মূলক সভ্যতার চেহারা ইতিহাসে উত্তরোত্তর যতই উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, ততই আমাদের হৃদয়ের উদ্ধার হইতেছে। ক্রমশই আমাদের দেশ যথার্থভাবে আমাদের হৃদয়কে পাইতেছে। ইহাই পরম লাভ। ধনলাভের চেয়ে ইহা অল্প লাভ নহে।

অন্যপক্ষ বলিবেন, তবে দেশহিতৈষিতা-টাকে তোমরা ভালই বল না। আমরা বলি, দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে, তাহা লইয়া এত তর্কের বিষয় আছে যে, কেবল ঐ নামটাকে লইয়া মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া কোনো ফল নাই। প্যাট্রিয়টিজ্‌মের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিষটা বিদেশী, নামটাও বিদেশী থাকিলে ক্ষতি নাই —যদি কোনো বাংলাশব্দই চালাইতে হয়, তবে "স্বাদেশিকতা" কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের উর্দ্ধে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বা-

সেইখানেই ধর্ম্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা, সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল, সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্ম্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয়, তাহাই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌-শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

স্বার্থপরতা কখনই ধর্ম্মের জন্য আপনাকে সংযত করে না, স্বার্থের জন্যই করে। ইংরাজ কখনই এ কথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে ফরাসী-সভ্যতার একটা উপকারিতা আছে, অতএব সে সভ্যতায় আঘাত করিলে সমস্ত মানবের, সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি;—নিজের পেট ভরাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ফরাসীকে সে বটিকার মত গিলিয়া ফেলিতে পারে, দ্বিধা-মাত্র করে না। তাহার দ্বিধার একমাত্র কারণ, আমারও গায়ে জোর আছে, ফরাসীও নেহাৎ ক্ষীণজীবী নহে, অতএব কি জানি, লাভ করিতে গিয়া মূলধনসুদ্ধ হারানো অসম্ভব নহে। এস্থলে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য আশিয়া-আফ্রিকার ডালপালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোনো দোষ দেখি না। অতএব তিব্বতে শান্তিদূতপ্রেরণের ব্যবস্থাকালে কপোল-যুগ লজ্জায় রক্তিমবর্ণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বার্থপরতাকে যদি ধর্ম্মের আসনের প্রান্তে বসাইয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে অবশেষে সে একদিন ধর্ম্মকে ঠেলা মারিয়া ফেলিবেই। স্বদেশীয় স্বার্থপরতা আজ সেইজন্য কেবলি পৃথিবীময় তাল ঠুকিয়া-ঠুকিয়া দেবতাকে-সুদ্ধ ভয় দেখাইয়া স্তম্ভিত করিবার চেষ্টা [করিতে]ছে।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী Sven Hedrinএর নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইংরাজের তিব্বত-আক্রমণপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

The English campaign in Tibet is a fresh proof of the Imperialist brutality which seems to characterise the political tendencies of our times, and in face of whi[ch] the position of the smaller States appears precarious. A small State which does not possess the power to defend itself is doomed to decay, whether it is Christian or not. If our priests taught the people the meaning of the words 'Love thy neighbours as thyself,' 'Thou shalt not steal,' 'Thou shalt do no murder' 'Peace on earth and good-will towards men', instead of losing themselves and their hearers in unfathomable and completely useless dogmas, such an injustice as the present one would be impossible. But probably such really Christian feelings are nonsense in modern policy. And the same Christians send our missionaries to Japan. In the name of truth one ought to protect the Asiatics from such Ch[ristiani]ty."

এ সকল কথার তাৎপর্য্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ, রেল-

গাড়ি ও বড় বড় ইস্কুলবই যে সভ্যতার প্রকৃত উপকরণ ও লক্ষণ নহে, তাহা নিশ্চয় জানিয়া যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের জন্য অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে--তখন জ্ঞান হইতেও পারে যে, মনুষ্যত্বচর্চ্চার জন্য পাশ্চাত্য শস্ত্রধারীদের ছাত্রত্ব স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে। তখন নিজের দেশের আদর্শ ও নিজের শক্তিকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় বলিয়া মনে হইবে না।

কিন্তু অন্নের অভাবে কৃশ হইয়া, তেজের অভাবে ম্লান হইয়া ঝরিয়া মরিয়া পড়িলে তখন তোমার দেশের আদর্শই বা কোথায়, ধর্ম্মই বা কোথায়? আদর্শরক্ষা করিতে গেলেও যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহার অবাধচর্চ্চার স্থল কোথায়? কাজেই সেজন্যে দরখাস্ত করিতেই হয়—শুদ্ধ ইংরাজি-ভাষায় রেজোল্যুশন্ পাস্ না করিলে চলেই না।

একদিকে স্বদেশীয় স্বার্থপরতার সংঘাত আক্রমণ করিলে অপরদিকেও স্বদেশীয় স্বার্থরক্ষার উদ্যম স্বভাবতই জাগিয়া উঠে। এম্‌নি করিয়া ইংরাজিতে যাহাকে নেশন্ অর্থাৎ পোলিটিকাল্-স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায়— বলে, তাহার উদ্ভব হইতে থাকে।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার উদ্ভব না হইয়া থাকিতেই পারে না। সুতরাং এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য্য প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে, তাহার সম্বন্ধে অতি-মাত্রায় মুগ্ধভাব থাকা কিছু নয়। (এ কথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরমলাভ। তাহার উপরেও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইবে,—মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড় বলিয়া জানিতে হইবে।) ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া—মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দ্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব-সুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ স্বার্থপরতার স্বভাবই এই যে, সে ক্রমশই সঙ্কীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে। তাহার প্রমাণ, বোয়ারযুদ্ধে ইংরাজের তরফে রসদের মধ্যে রাশিরাশি ভ্যাজাল্। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। (মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে—ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মই যে অমোঘ, ধর্ম্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে, তাহা নয়।)

বাল্যশিক্ষার প্রভাব বড় কম নয়। ভারতবর্ষের অস্থিমাংস লইয়াও দীনেশবাবুর ন্যায় মনীষী ব্যক্তি "দেশের কথা"র সমালোচনার ছলে এক জায়গায় লিখিয়াছেন :—

"গভর্মেণ্ট যখন এক চক্ষে ভারতবাসীর হিত ও ভাবী উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন, তখন তাহার আর একটা চক্ষু সাগরমেখলা শ্বেতদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী বাণিজ্যলক্ষ্মীর চরণনখরপ্রান্তে আবদ্ধ থাকিবে—ইহা আমরা কোনোক্রমেই অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারিব না।"

দুটি চোখের ঠিক একটি চোখ সাগরের এপারে এবং একটি চোখ ওপারে রাখিলে

ন্যায়দণ্ড কতকটা সীধা থাকিত। কিন্তু দেউস্করমহাশয়ের গ্রন্থখানি কি তাহাই প্রমাণ করিয়াছে? আসল কথা, আমরা আজকাল অনেকেই মনে করি, ন্যাশনালিটির স্পর্শমণির স্পর্শে সমস্ত অন্যায় সোনার চাঁদ হইয়া উঠে!

যাহা হউক, আমাদিগকে নেশান্ বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্যপদার্থটি, যে প্রাণপদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে, আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এ কার্য্যে স্বদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই—যাহা শিক্ষা ও অবস্থার গুণে অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আশা করি, দেউস্করমহাশয়ের বইখানি আমাদিগকে সেই পথে যাত্রার সহায়তা করিবে—আমাদিগকে পুনঃপুন নিস্ফল আন্দোলনের দিকেই উৎসাহিত করিবে না।

পুরুষসিংহ।

[হাস্যরসব্যতিরিক্ত নবরসের কবিতা]

অদ্ভুত।

অক্ষক্রীড়াঘটায় ব্রীড়া কি যে তা বোলো না,
দিনটাভোর করিয়া শোর সতের পোলো না!

বীভৎস।

মেজাজ্ গেল বিগড়ে তাহে মুস্ড়ে গেল প্রাণ;
ভঙ্গ খেলা; সিংহবাবু গৃহেতে ফিরে যান।

রৌদ্র।

প্রবেশি গেহ কহিল—"কেহ দিবে না কি গো ভাত?"
"এসেছ ঘরে?"—গিন্নি তাঁরে কহিল দৈবাৎ;
"খেলিলে পাশা ক্ষুধাপিপাসা থাকে কি কাহারো?"
আর কে থাকে? দাঁড়াল বেঁকে সিংহ বেতরো।

ভয়ানক।

কহিল রাগি'—"দেশ-তেয়াগী হইব এখনি।"
হাসিল শুধু মৃদুল মধু গোপনে গৃহিণী।

বস্ত্রগুলি গুছিয়ে তুলি' বাঁধিয়া পোঁটলা,
বল্লে—"ওরে, দেশ্‌টা ছেড়ে চলিনু একেলা !"

আদি।

এগিয়ে এসে গিন্নী হেসে ধল্লে সেগুলি,
একটি হাত প্রসারি নাথে রাখিল আঙুলি।

বীর।

ক্রোধে অধীর হেল বীর, কথা না মানিল ;
বেজায় জোরে আঁক্‌ড়ে ধোরে বোঁচ্‌কা টানিল।
হ্যাঁচ্‌কা টানে বোঁচ্‌কা নিতে মচ্‌কে গেল হাত :
ছট্‌কে পড়ে' সিংহ যে রে ভূমিতে চিৎপাৎ।

করুণ।

অঙ্গে ব্যথা ! সিংহ কথা কহিছে কাতরে -
"হলেম খুন্‌ হলুদ্‌চুন্‌ আন্‌তে যা ত রে !"
দুচারি-ঘটি জলের ছিটা, পাথার বাতাসে ;
হলুদ-চুন্‌-পটির গুণে তুলিল মাথা সে।

বাৎসল্য।

ঝাড়িয়া দিল গায়ের ধুলো হস্ত বুলায়ে,
রহিল তবু সিংহবাবু ওষ্ঠ ফুলায়ে।

শান্ত।

থালায় কোরে পথ্য তাঁরে দিলেন গৃহিণী।
যতেক খান্‌ আবার চান্‌, ক্ষুধাটা এমনি।
হাঁড়িটি বেশ করিয়া শেষ, গুড়াকু ফুঁকিয়া,
ধূমে ও ঘুমে সকল গোল গেল রে চুকিয়া।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আমি সে জানি।

আমারে চাও
  ামি সে জানি।
.ব মোরে কাঁদাও
  আমি সে জানি।

এ আলোকে এ আঁধারে
কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও
আমি সে জানি।

সারাদিন নানাকাজে
কেন তুমি নানাসাজে
কত সুরে ডাক দাও
আমি সে জানি।

সারা হ'লে দেয়া-নেয়া
দিনান্তের শেষ খেয়া
কোন্-দিক্-পানে বাও
আমি সে জানি।

বংশীধ্বনি।

কি সুর বাজে আমার প্রাণে
আমিই জানি মনই জানে!
কিসের লাগি সদাই জাগি,
কাহার কাছে কি ধন মাগি,
তাকাই কেন পথের পানে,
আমিই জানি মনই জানে!

দ্বারের পাশে প্রভাত আসে
সন্ধ্যা নামে বনের বামে।
সকাল-সাঁঝে বংশী বা'
বিকল করে সকল
বাজায় কে যে কিসের
আমিই জানি মনই জানে!

বঙ্গদর্শন।

গীতার দর্শন।

ভগবদ্গীতার একদিকে যেমন ধর্ম্মতত্ত্ব, অন্যদিকে সেইরূপ দর্শনশাস্ত্র—তত্ত্ববিদ্যা। ধর্ম্মতত্ত্বে নিষ্কাম কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়সংযম, সমদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তিসমন্বিত উপদেশমালায় সাংখ্য, যোগ, বেদান্ততত্ত্বসকল গ্রথিত রহিয়াছে। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব, ত্রৈগুণ্যবিচার; যোগের শম-দম-ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ প্রকরণ, বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ, এ সকলই গীতার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত। এই প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শনত্রয় যেন পরস্পর প্রাধান্যলাভের জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। ভগবান্‌ও তাহাদের দ্বন্দ্ব মিটাইবার জন্য তেমনি যত্নশীল। গীতোক্ত দর্শন সাংখ্যপ্রধান অথবা যোগপ্রধান, এই বিষয়ে অনেকসময় সন্দেহ উপস্থিত হয়; সে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলিয়া রাখিলেন যে, উহারা উভয়েই এক, সাংখ্যও যা, যোগও তা, বালকেরা উহাদিগকে পৃথক্ করিয়া বলে। তিনি চা'ন যে, সাংখ্য ও যোগের, জ্ঞান ও কর্ম্মের বিবাদ মিটি[illegible]য়। জ্ঞানবাদী ও কর্ম্মবাদী, ইহাদের পরস্পর পার্থক্য যত অনর্থের মূল, জ্ঞান কর্ম্ম বিনা নিরর্থক—কর্ম্মও জ্ঞান বিনা নিষ্ফল ও অমঙ্গলকর।

গীতায় বেদান্ততত্ত্বেরও বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। বেদান্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ অনুরাগ; এমন কি, একস্থানে তিনি 'বেদান্তকৃৎ', বেদান্তকর্ত্তা বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদ তাঁহার উপদেশের সারতত্ত্ব। জীবব্রহ্মে অভেদজ্ঞানই তাঁহার মতে সাত্ত্বিক জ্ঞান প্রভেদজ্ঞান রাজসিক জ্ঞান।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যযমীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১৮/২০-২১

কর্ম্মযোগের প্রারম্ভেই যে আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ আছে, আত্মা-পরমাত্মার অভেদভাব না দেখিলে তাহার অর্থ হয় না। সে সমস্ত উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, সুতরাং অবিনাশী। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর হন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর। যদি তাহা হয়, তবে মৃতের জন্য বৃথা

শোক করিতেছ কেন? যুদ্ধে কেনই বা বিমুখ?

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত॥ ২/১৭-১৮

সেই যে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, তাঁহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহ বিনাশ করিতে সক্ষম নহে। নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে, অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২/২০

ইনি জন্মবিহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ, শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ স্পষ্টই বলিতেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭

এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ। ইনি প্রকৃতিবিলীন পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন।

কি আত্মজ্ঞান, কি ব্রহ্মজ্ঞান, গীতার উপদেশসকল বেদান্তভাবে অনুবিদ্ধ; যে সমস্ত বচন পূর্ব্বাপর উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এ কথা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে। 'বিশ্বরূপদর্শন' অধ্যায়ে এই একাত্মভাব অপূর্ব্ব কবিত্বমাধুরীতে প্রস্ফুটিত। বেদান্তের সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে সাংখ্য ও যোগতত্ত্বসকল উপদিষ্ট হইতেছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে যোগশাস্ত্রের অনুশাসিত কর্ম্মযোগ—শেষ ছয় অধ্যায়ের অধিকাংশ সাংখ্যোক্ত উপদেশে পূর্ণ, মধ্যাংশ ও অন্যান্য স্থানে বেদান্তের রচনা-প্রণালী এইরূপ বিমিশ্র। কি পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বের কি কোন বন্ধন নাই? অবশ্য আছে এবং তাহা সূক্ষ্মদর্শী সুধীগণ দেখিতে পান। ফলত, এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়েই গীতার প্রধান গৌরব। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, সকল শাস্ত্রের শিক্ষা—সর্ব্বপ্রকার সাধনার একই লক্ষ্য—যিনি যে পথ দিয়া গমন করুন, সেই একই স্থানে গিয়া তাঁহাকে পৌঁছিতে হইবে।—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ১৩/২৪-২৫

কেহ কেহ ধ্যানযোগে, কেহ সাংখ্যযোগে, কেহ বা কর্ম্মযোগে আত্মাতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন। অন্যেরা তাঁহাকে এইরূপে জানিতে না পারিয়া গুরুর নিকট উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সেই শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিরাও মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পন্থীর লক্ষ্য ও গতি একই। এইহেতু গীতার প্রণয়নকালে যে সমস্ত দর্শনতত্ত্ব প্রচলিত ছিল, তাহার কোনটিকেই তিনি উপেক্ষা করেন নাই—সকলকেই আপনার মতের সঙ্গে মিলাইয়া প্রশ্রয় দিতেছেন। এই সার্ব্বভৌমতা গীতার একটি বিশেষত্ব। "গীতায় সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। অন্য সকল শ্রেণীর দার্শনিক, সকল সম্প্রদায়ের সাধক গীতাকে সমান

আদরের চক্ষে দেখেন। গীতা বিশ্বতোমুখ গ্রন্থ। কি জ্ঞানী, কি কর্ম্মী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলের পক্ষে গীতা তুল্য উপাদেয়।” এই কথাগুলি আমি হীরেন্দ্রবাবুর “গীতায় ঈশ্বরবাদ” প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাঁহার প্রবন্ধগুলি সারবান্, যুক্তিগর্ভ, অতি সুপাঠ্য হইয়াছে—গীতানুরাগিমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য।

সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষরূপ দ্বৈতবাদ, বেদান্তের জীবব্রহ্মে অভেদরূপ অদ্বৈতবাদ—এ উভয়ই গীতাশাস্ত্রে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রকৃতি কোথাও অনাদি মূলতত্ত্ব, কোথাও বা ঐশ্বরী মায়ায় অবগুণ্ঠিতা। কখন স্বপ্রধান, কখনও ঈশ্বরের অধীনে কার্য্য করিতেছে। আপাতত মনে হইতে পারে, এই সকল পরস্পরবিরোধী মতের সামঞ্জস্যসাধন একপ্রকার অসম্ভব। অথচ গীতার মধ্যে এই সমস্ত তত্ত্বের একটি সমন্বয়চেষ্টা পদে পদে প্রত্যক্ষ করা যায়; ইহাদের মধ্যে একটি বন্ধনসূত্র আছে। সেই বন্ধন হচ্চে গীতোপদিষ্ট ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদ। হীরেন্দ্রবাবু উল্লিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন, “দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হয় যে, তাহাদের মধ্যে কি একটা অসম্পূর্ণতা, কি একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে; আর গীতা ঈশ্বরবাদের অবতারণা করিয়া সেই অভাবের পূরণ করিয়াছেন, সেই অসম্পূর্ণতার মোচন করিয়াছেন। এই একটি রাসায়নিক বস্তুর সংযোগে দর্শনশাস্ত্রকে যেন নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন।” যদি তাহার প্রমাণ আবশ্যক হয়, তবে গীতার তুলিকায় সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তদর্শনের চিত্রে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহা দেখিতে হয়, এবং হীরেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। তিনি যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া গীতোক্ত ব্রহ্মবাদে প্রবেশ করা সহজ।

গীতা সাংখ্যমত অনুসরণ করিয়া যে ভাবে প্রকৃতিপুরুষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রথমে আমি তাহা দেখাইব। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে—

“প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার ও সুখদুঃখাদি গুণসকল প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া জানিবে।” ২০ সবিকার প্রকৃতি ও পুরুষ মিলিয়া সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ :—

১। অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি।
|
২। বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্ব।
|
৩। অহঙ্কার।

৪—৮। পঞ্চতন্মাত্র। ৯—১৯। একাদশ ইন্দ্রিয়।
|
২০—২৪। পঞ্চ মহাভূত।

২৫। পুরুষ।

পঞ্চতন্মাত্র কিনা ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চবিষয় = শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

একাদশ ইন্দ্রিয় = পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন (অন্তরিন্দ্রিয়)।

পঞ্চ মহাভূত = ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

এই পর্য্যায় হইতে সৃষ্টির ক্রম উপলব্ধ হইবে। যথা—

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও

একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত।

পুরুষ = আত্মা, অনাদি, ইনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন।

কোন কোন সাংখ্যকার (তত্ত্বসমাস) অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার, এই দুই শ্রেণীতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে বিভক্ত করেন।

অষ্ট প্রকৃতি কিনা মূলপ্রকৃতি এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। এই শেষোক্ত সপ্তক যদিও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু ইহারা ইন্দ্রিয় ও মহাভূতাদির স্থষ্টিকর্ত্তা বলিয়া গৌণভাবে প্রকৃতি। এই অষ্ট প্রকৃতির ষোড়শ বিকার হচ্চে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫।৬ শ্লোকে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥৫

অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি, বুদ্ধি অর্থাৎ মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ শব্দাদি ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়-পঞ্চ, একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চমহাভূত। ইহাদের নাম সবিকার ক্ষেত্র। ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি ক্ষেত্রধর্ম্ম পরের শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের সমষ্টি, চেতনা ও ধৃতি, এই দেহ ও মনোবৃত্তিসমুদায় ক্ষেত্রান্তঃপাতী। ইহারা সর্ব্বসমেত সবিকার ক্ষেত্র।

অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পঞ্চভূতময় জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইল? সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণ এই—

প্রকৃতি গুণময়ী, সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণত্রয় প্রকৃতির অন্তর্নিহিত। প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে—এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলেই সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই বিপ্লবে প্রকৃতির যে প্রথম পরিণাম, তাহাই মহৎতত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কার; অহঙ্কারের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে পঞ্চতন্মাত্র, এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। পঞ্চতন্মাত্রের বিকারে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। এই পঞ্চমহাভূত স্থূলবিষয়রূপে ও জীবদেহরূপে আমাদের উপভোগ্য হয়।

সত্ত্বাদিগুণের সাম্যভঙ্গজনিত অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম পরিণাম যে বুদ্ধি, তাহা কি? বুদ্ধির অর্থ প্রকাশ, আলোক, চিৎপ্রভার প্রথম বিকাশ। যাহা সুপ্তাবস্থা হইতে প্রবুদ্ধ করে, তাহাই বুদ্ধি। বুদ্ধির অপর নাম মহৎতত্ত্ব। এই মহৎতত্ত্বকে অন্যান্য শাস্ত্রেও জ্ঞানস্থানীয় বলা হইয়াছে। মহতের পরিণাম অহঙ্কার। আগে বুদ্ধির উদয়, পরে তদ্বিষয়ে অহঙ্কার অর্থাৎ আমি, আমার, এই বিশিষ্টজ্ঞান জন্মে। বিষয় ও বিষয়ীর পরস্পর প্রতিঘাত না হইলে এই জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হয় না। জ্ঞানের এই যে নিশ্চয়াত্মক বিকাশ, তাহাই অহঙ্কারের কার্য্য। অতএব বলা যাইতে পারে যে, অহঙ্কার হইতে জ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হয়। অহঙ্কার তাহার জ্ঞেয়বিষয় কোথা হইতে পায়? ইন্দ্রিয়সকল হইতে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় কি? আদৌ, পঞ্চতন্মাত্র = শব্দ, স্পর্শ,

রূপ, রস, গন্ধ; ইহারাই আবার পঞ্চমহাভূতের উপাদান। "অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ" অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতসকল হইতে স্থূলভূতের উৎপত্তি। এই নিয়মে, শব্দ হইতে আকাশ, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে তেজ, রস হইতে জল, এবং আকাশ হইতে পৃথিবী যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভূত পর-পর ভূতের কারণ, সেজন্য পর-পর ভূতে একএকটি অধিক গুণ বিদ্যমান আছে। আকাশের এক গুণ শব্দ; বায়ু দ্বিগুণ-বিশিষ্ট, তেজে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ত্রিগুণ, জলে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস এবং পৃথিবীতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ অবস্থিত আছে। এই সূক্ষ্মভূত ও স্থূলভূত ইন্দ্রিয়গণের যাবতীয় বিষয়। মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই গণ্য,— জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, উভয়াত্মক অন্তরিন্দ্রিয়। মনের ধর্ম্ম কি?

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি-র্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি।"

সঙ্কল্প, বিকল্প, কামনা ইত্যাদি মনোধর্ম্ম।

এখন কতকটা জানা গেল, আমরা যে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ করি, সেই জ্ঞান-ক্রিয়া সাংখ্যমতে কিরূপে সম্পন্ন হয়? ইহা আরো একটুকু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। এই জ্ঞানক্রিয়ার প্রণালী দুই বিভিন্নপ্রকার বলা যাইতে পারে। এক —যে, বিষয়জ্ঞান প্রথমে মনোরাজ্যে প্রবেশ করে। মন স্বোপার্জিত বিত্ত অহঙ্কারের নিকট আনিয়া দেয়। অহঙ্কার তাহা বাছিয়া-লইয়া বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করে। বুদ্ধিতে সেই জ্ঞান পরিণতিলাভ করিলে তবে তাহা পুরুষের বোধগম্য হয়। এইরূপে ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক বিষয়গ্রহণ, পরক্ষণে তাহা মনের নিকট অর্পণ; সঙ্কল্পাত্মক মন হইতে অহঙ্কারে, অহঙ্কার হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে পৌঁছিয়া জ্ঞানের উত্তরোত্তর বিকাশ হয়। প্রকৃতির চিত্রপটে জগৎচিত্রের এই যে ক্রমবিকাশ, তাহা আরোহ প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদীতে ইহার এই এক দৃষ্টান্ত আছে (৩৬)—

"গ্রামাধ্যক্ষগণ প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া যেমন বিভাগের কর্ত্তৃ-পুরুষের হস্তে আনিয়া দেয়, ইনি আবার কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করেন, কোষা-ধ্যক্ষ তাহা রাজার কাছে লইয়া যান; সেইরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়গণ কোন বিষয় পাইবা-মাত্র মনের নিকট লইয়া যায়, মন তাহা দেখিয়া-লইয়া অহঙ্কারের হস্তে প্রদান করে, অহঙ্কার তাহা গণিয়া-গাঁথিয়া আত্মসাৎ করিয়া বুদ্ধির নিকট লইয়া উপস্থিত করে। বুদ্ধিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভাবনা বা প্রজ্ঞারূপে পরিণত হয়।"

এই গেল আরোহ প্রণালী। অবরোহী প্রণালীতে বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয়-জ্ঞান অহঙ্কারে সঞ্চারিত হয়—সামান্য হইতে বিশেষে, ব্যাপক হইতে সঙ্কীর্ণে, সর্ব্বগত হইতে বস্তুগত ক্ষেত্রে অবতরণ করে। বুদ্ধি সারসত্যের আলোক ধারণ করে, অহঙ্কার তাহা আপনার গণ্ডীর ভিতর আনিয়া স্বায়ত্ত করে। বস্তুগত (objective) চৈতন্যকে ব্যক্তিগত (subjective) করা অহঙ্কারের কার্য্য। বুদ্ধিতে জ্ঞানের উদ্রেক, অহঙ্কারে জ্ঞানের কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। মন অন্তরিন্দ্রিয়, ইনি দ্বারপালের কার্য্য করেন; এই প্রহরীর

কাছে আসিয়া প্রথমে জ্ঞেয়বস্তুকে আত্ম-পরিচয় দিয়া উপর-উপর ধাপে আরোহণ করিতে হয়, ইঁহার সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানের বিষয় বুদ্ধি কিংবা অহঙ্কারের কাছে পৌঁছিতেই পারে না।

"মহদাখ্যমাদ্যকার্য্যম্", "চরমোঽহঙ্কারঃ"—এই দুই কপিলসূত্রে উক্তরূপ অবরোহী প্রণালী লক্ষিত হইবে।

এইরূপে মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ অন্তর্জগতে জ্ঞানের কার্য্যনির্ব্বাহ হইতেছে, পুরুষ কিন্তু এই সকল কার্য্যের সহিত লিপ্ত থাকেন না। ঘড়ির যন্ত্রের ন্যায় প্রকৃতির কার্য্য চলিতেছে—পুরুষ উদাসীনভাবে সকল দেখিতেছেন; কখনও বা মোহবশতঃ "অহং কর্ত্তা" ভাবিয়া আত্মাভিমানে মগ্ন হইতেছেন।

গীতায় অনেকস্থানে "অব্যক্ত"শব্দ প্রকৃতি অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। "অব্যক্তা-দীনি ভূতানি", "অব্যক্তনিধনানি"—অব্যক্ত হইতে জগতের উৎপত্তি, প্রলয়কালে জগ-তের অব্যক্তে তিরোভাব।

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ৮/১৮

প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে উহা অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়।

গীতায় মহতের পরিবর্ত্তে বুদ্ধিশব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু এই বুদ্ধিশব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত। বুদ্ধির একটি অর্থ নিশ্চয়া-ত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। সাংখ্যদর্শনেও নিশ্চয়বৃত্তিমতী বুদ্ধির কথা আছে। মূল মহত্তত্ত্ব যখন শরীরে পরিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যষ্টিভাব ধারণ করে, তখন তাহা দেহীর অন্তঃকরণে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির রূপে আবির্ভূত হয়। গীতোক্ত এই ব্যব-সায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অর্থ ভগবানে একাগ্রবুদ্ধি = একনিষ্ঠতা।

গীতায় 'পঞ্চভূত ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার', এই অষ্টধা প্রকৃতি ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা পরে দেখান যাইবে।

গীতায় যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহা উপরে বলা হইয়াছে; ত্রৈগুণ্য-বিচারেও সাংখ্যই গীতার আদর্শ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আছে

সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণ প্রকৃতিসম্ভূত জানিবে। এই গুণত্রয় দেহীকে দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

ত্রিগুণলক্ষণ—

সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত প্রকাশক ও অনাময়; এই নিমিত্ত উহা দেহীকে 'সুখসঙ্গে' ও 'জ্ঞানসঙ্গে' বাঁধিয়া রাখে।

রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি উহা হইতে সমুদ্ভূত; উহা দেহীকে কর্ম্মে নিবদ্ধ করিয়া রাখে।

তমোগুণ অজ্ঞান ও মোহজনক; উহা প্রাণীদিগকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাতে অভিভূত করিয়া রাখে।

সত্ত্বগুণ প্রাণীদিগকে সুখে মগ্ন, রজোগুণ কর্ম্মে সংসক্ত, এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরো-হিত করিয়া প্রমাদে আচ্ছন্ন করে। ১৪/৬—৯

গীতা বলেন—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ। ১৮/৪০

নাহি এই পৃথিবীতে হেন কোন জন,
ত্রিদিবেও নাহি কোন দেবতা এমন,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কোথাও না পাইবে দেখিতে,
মুক্ত যেই প্রকৃতিজ ত্রিগুণ হইতে।

গীতা দেখাইতেছেন, এই বিশ্বসংসারে ত্রৈগুণ্যের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত। যজ্ঞ-দান-তপস্যা, আহার, কর্ত্তাকর্ম্মজ্ঞান, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি-ধৃতি-সুখ, এমন কোন গুণ নাই, কোন কর্ম্ম নাই, যাহা ত্রিগুণের সংস্রব-রহিত। গুণভেদে ত্রিধা ভিন্ন হইয়া কোন্ কোন্ বিষয়ের কি কি রূপান্তর ঘটে, তাহা ১৭৷১৮শ অধ্যায়ে তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো হইয়াছে।

সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিতে এই তিন বিরোধী গুণের সততই সংগ্রাম চলিতেছে, "একে অন্যকে পরাভব করিবার জন্য সর্ব্ব-ক্ষণ উদ্যুক্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে কখন সত্ত্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ, বা সুখ, বা লঘুতা উৎপাদন করিতেছে; কখনও রজ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি, বা দুঃখ, বা চাঞ্চল্য উৎপাদন করি-তেছে; আবার কখনও বা তম উৎকট হইয়া নিয়ম (প্রতিবন্ধ,) বা মোহ, বা গুরুত্ব উৎপন্ন করিতেছে।"

গীতাও ইহার অনুমোদন করিতেছেন:—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১৪/১০

হে ভারত! সত্ত্বগুণ রজ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে, তমোগুণ রজ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া রাখে।

যখন সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন জ্ঞানের প্রকাশ। রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভস্পৃহা, অশান্তি জন্মে; তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে অজ্ঞান, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ সঞ্জাত হয়। ১১—১৩। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ, তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান আবির্ভূত হয়। ১৭

প্রকৃতি-পুরুষের গুণাগুণ—

শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি এবং সুখদুঃখভোগবিষয়ে পুরুষই কারণ। ১৩/২০

যিনি প্রকৃতিকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা এবং আপনাকে অকর্ত্তারূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। ১৩/২৯

প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সকল কর্ম্ম কৃত হয়, কিন্তু অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। ৩/২৭

গীতা বলেন যে, শরীর, অহঙ্কাররূপ কর্ত্তা, চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ুর বিবিধ চেষ্টা এবং দৈব অর্থাৎ হস্তাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই পঞ্চকারণ সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ১৮/১৪। পুরুষ অকর্ত্তা। ১৬

পুরুষের লক্ষণ—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ১৩/৩১

হে কৌন্তেয়! এই অব্যয় পরমাত্মা অনাদিত্ব ও নির্গুণত্বপ্রযুক্ত শরীরস্থ হইয়াও কোন কর্ম্ম করেন না ও কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১

পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া প্রকৃতিজ সুখদুঃখ ভোগ করেন। এই

গুণসঙ্গই তাহার সদসদ্যোনিতে জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ।

এই সমস্ত তত্ত্ব সামান্যত কাপিলসাংখ্যের অনুযায়ী। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, অনাদি ও অপরিচ্ছিন্ন। প্রকৃতি জড়, পুরুষ চেতন; প্রকৃতি সবিকার, পুরুষ কূটস্থ নির্ব্বিকার, প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নির্গুণ; প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ ভোক্তা। প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়—সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য; পুরুষ অকর্ত্তা, উদাসীন, সাক্ষিস্বরূপ। প্রকৃতি হইতে সত্ত্বরজস্তমো গুণ উৎপন্ন, পুরুষ তজ্জনিত-সুখদুঃখভোগী। এই গুণানুবন্ধেই পুরুষ দেহে নিবদ্ধ থাকে।

প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। সেইজন্য প্রকৃতির গুণ পুরুষে এবং পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে উপচরিত হয়। সেইজন্য বস্তুত অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে সচেতন বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুত কর্ত্তা না হইলেও পুরুষকে কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়।

প্রকৃতি অচেতন, সুতরাং অন্ধ, পুরুষ অকর্ত্তা, অতএব খঞ্জ + চলৎশক্তিরহিত। প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষ খঞ্জ, পুরুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতি অন্ধ—উভয়ে সংযুক্ত থাকিয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করে। তাহাদের সংযোগের ফলেই সৃষ্টি। প্রকৃতির সৃষ্টি নিজের জন্য নহে—পরের জন্য। পুরুষ দর্শক হইয়া উপস্থিত না থাকিলে প্রকৃতি কোন কার্য্য করে না। সৃষ্টির উদ্দেশ্য—পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধন।

সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বরশাস্ত্র। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গই নাই। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে স্পষ্টত ঈশ্বরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। উহার প্রথম অধ্যায়ের ৯২ সূত্র হচ্চে—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণাভাব। সেইজন্য সেশ্বর পাতঞ্জলদর্শনের বিপরীতপক্ষে কাপিলদর্শনকে নিরীশ্বরসাংখ্য বলা হয়। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ—প্রকৃতি পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না, অন্য কথায়, প্রকৃতি স্বতই জগৎসৃষ্টি করে, কোন স্বতন্ত্র চেতন কর্ত্তার অপেক্ষা রাখে না। জগতের সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের কোন হস্ত নাই।

গীতায় অপর পক্ষে ঈশ্বরবাদ সমুজ্জ্বল। গীতোক্ত প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব ঈশ্বরবাদপ্রভাবে অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত—এই মহা দ্বৈতে সাংখ্যশাস্ত্রের পর্য্যবসান। "এই উভয়ের সমন্বয়ে যে চরম একত্বে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে তাহার আভাস নাই। গীতা কিন্তু সে চরম একত্বের সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন।" গীতার মতে ঈশ্বরই জগতের মূলকারণ- "সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ।" [৭/১০]। এই পঞ্চভূতময় জড়জগৎ ও জীবভূত জগৎ, তাঁহার দুই অংশ—দুই প্রকৃতি—এক অপরা প্রকৃতি, অন্য পরা প্রকৃতি।

ভগবান্ বলিতেছেন—

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ [৭/৪-৫]

"ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্টপ্রকার

প্রকৃতি। ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি; ইহা ভিন্ন আমার উৎকৃষ্টা বা পরা প্রকৃতিও জান। ইনি জীবভূতা এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ভূত চরাচর তাঁহার অপরা প্রকৃতি। ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা—"যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ" এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার পরা প্রকৃতি।

আবার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলিতেছেন -

মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥৩—৪

প্রকৃতি (মহদ্‌ব্রহ্ম) মহদ্‌যোনি, আমি বীজপ্রদ পিতা; আমি এই প্রকৃতিরূপ যোনিতে সমস্ত জগতের যে বীজ নিক্ষেপ করি, তাহা হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হয়।

পুনশ্চ

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ত্ততে॥ ৯/১০

প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতানিবন্ধন এই বিশ্বচরাচর প্রসব করিতেছে, এইহেতু জগৎ পরিচালিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গীতা সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া সাংখ্যমতের পোষকতা করিয়াছেন, কিন্তু এই গুণত্রয় আপনা হইতেই প্রকৃতিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তিনি এ কথা বলেন না। এ বিষয়ে ভগবদুক্তি এই—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি, ন ত্বহং তেষু, তে ময়ি॥ ৭/১২

সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাবসকল আমা হইতেই উৎপন্ন এবং আমারই অধীন, কিন্তু আমি এ সকলে আবদ্ধ নহি।

গুণই সর্ব্বেসর্ব্বা নহে, গুণের উপরেও পরমাত্মা আছেন, তাহা পরের শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৪/১৯

গুণই কর্ত্তা, গুণ ভিন্ন কর্ত্তা নাই, ইহা জানিয়া যিনি গুণের অতীত পরমাত্মাকেও দেখেন, তিনি আমার সারূপ্যলাভ করেন।

এই সকল শ্লোক একত্র করিয়া ভাবার্থ কি পাওয়া যায়? এই যে, প্রকৃতি চরম তত্ত্ব নহে, ঈশ্বরই জগতের মূলকারণ। প্রকৃতি তাঁহার শক্তি ধারণ করিয়া বিশ্বচরাচর সৃজন করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বর সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার অধ্যক্ষতায়, তাঁহার শাসনে প্রকৃতির কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। প্রকৃতিস্থ সত্ত্বরজস্তমোগুণ তাঁহা হইতেই প্রসূত, কিন্তু তিনি এই ত্রিগুণে আবদ্ধ নহেন। যে সাধক এই ত্রিগুণের মধ্য দিয়া ত্রিগুণাতীত পরমাত্মাকে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

প্রকৃতির ন্যায় গীতায় পুরুষতত্ত্বও ঈশ্বরভাবে অনুপ্রাণিত। গীতোক্ত পুরুষবাদ সাংখ্যপুরুষতত্ত্ব হইতে অনেক ভিন্ন। গীতা বলিতেছেন, "এই দেহে বর্ত্তমান পরম পুরুষ সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর। ইনি পরমাত্মা বলিয়াও উক্ত হয়েন।" ১৩/২২

পূর্ব্বোক্ত ৩১শ শ্লোকে "অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ" ইত্যাদি বিশেষণে পুরুষ পরমাত্মারূপে

কথিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদভাবই গীতার সারতত্ত্ব। অন্যত্র অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন "আমি আত্মারূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।" এই পরমাত্মা যদিও জীবাত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে কোথাও নির্দ্দিষ্ট হন নাই, তথাপি "উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর" এই শব্দগুলি কোনটি পরমাত্মায়, কোন শব্দ বা জীবাত্মায় প্রযোজ্য, যেন জীবাত্মা-পরমাত্মা ৬টি পুরুষ দেহমধ্যে একত্রে বাস করিতেছেন।

উপনিষদে এই ভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

মুণ্ডক ৩।১।১ ; শ্বেতাশ্বতর ৪।৬

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—উভয়ে পরস্পরের সখা। ইহাদের একজন ফলভোক্তা, অন্যজন অনাহারী থাকিয়া সাক্ষিরূপে বিদ্যমান (গীতায় যিনি অন্তর্যামী এবং ফলদাতা)।

পুরুষ এক কি অনেক? এই প্রশ্নের উত্তর বেদান্তে একপ্রকার, সাংখ্যে অন্যপ্রকার। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু। জন্মমৃত্যুর কালভেদ, প্রকৃতি ও গুণভেদ, বর্ণাশ্রমভেদ ইত্যাদি কারণে পুরুষের বহুত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। পুরুষ যদি বহু হয়, তবে পুরুষ অর্থে পরিমিত জীবাত্মা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অথচ সাংখ্যেরা ইহাও বলেন যে, পুরুষ সর্ব্বব্যাপী, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্‌বিকারবর্জ্জিত। পুরুষের বহুত্ব এবং তাহার সর্ব্বব্যাপী অনাদি নির্ব্বিকার স্বরূপ যে পরস্পর বিরোধী, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। সে যাহা হউক, গীতা এ বিষয়ে বেদান্তের পথবর্ত্তী হইয়া বহু হইতে একে পৌছিয়াছেন। গীতোপদেশে অদ্বৈততত্ত্বের কিরূপ প্রাধান্য, তাহা জ্ঞানযোগব্যাখ্যানে যথেষ্ট সমালোচিত হইয়াছে, এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। গীতায় প্রকৃতি-পুরুষের অন্য নাম ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রকৃতি ক্ষেত্র, পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ। ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজমান। "যেমন এক সূর্য্য সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ একই পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।" ১৩/৩৩, "যেমন সর্ব্বত্রগামী মহাবায়ু আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে (পরমাত্মাতে) অবস্থিত।" ৯/৬

আমা হ'তে পরতর কোন ঠাঁই নাহি কিছু আর
সবে আমা ওতপ্রোত, গাঁথা যথা সূত্রে মণিহার। ৭/৭

গীতোক্ত পুরুষ সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষ,—অনন্যভক্তি দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায়। ৮/২২

পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরুষ তিনপ্রকার—ক্ষর অর্থাৎ জড়জগৎ; অক্ষর কিনা জীবাত্মা; এবং ক্ষরাক্ষরের অতীত বিশ্বভুবনভর্ত্তা পরমাত্মা যিনি, তিনি পুরুষোত্তম। এইস্থলে সাংখ্যপুরুষের ঊর্দ্ধে সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় পরমপুরুষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বে ঈশ্বরবাদ সমারোপিত করিয়া গীতা তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে কি সৃষ্টি, কি মুক্তি, কিছুতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্কই নাই, সাংখ্যের লক্ষ্য যে কৈবল্যমুক্তি, তাহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়—জ্ঞান। কিসের জ্ঞান? সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত। এই জ্ঞানদ্বারা পুরুষ যখন আপনাকে আপনি সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে, তখন প্রকৃতি নর্ত্তকীর লীলাখেলা থামিয়া যায়, সৃষ্টির বিরাম হয়, তখনই জীব দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্যধামে উপনীত হয়। ইহাই সাংখ্যপ্রদর্শিত মুক্তিপথ। গীতানির্দ্দিষ্ট মুক্তিপথ স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সে পথে বিচরণ করিতে হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া জীবের মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কর্সিকাদ্বীপের একটি গল্প।

[অনুবাদ]

পর্টোভেক্কিয়োসহর হইতে কর্সিকাদ্বীপের ভিতরের দিকে উত্তরপশ্চিম মুখে চলিতে থাকিলে দেখিবে যে, জমি ক্রমেই চড়্‌তি। বড় বড় পাথরের ফাঁকে আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া, মাঝে মাঝে নালা পার হইয়া, ঘণ্টা-তিনেক চলিলে মাকীনামক জঙ্গলের ধারে আসিয়া পড়িবে। এই মাকীজঙ্গল কর্সিকার ছাগপালকদের ও যাহারা কোনরকম বে-আইনী কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের আড্ডা।

কর্সিকার চাষীরা জমিতে সার দেওয়া বাঁচাইবার জন্য জঙ্গলের এক জায়গায় আগুন লাগাইয়া দেয়। আগুন যদি দরকারের চেয়ে বেশীরকম ছড়াইয়া পড়ে, তাহার আর উপায় নাই; কিন্তু সে যেমনই হোক, এই ছাই-পড়া জমিতে বুনানী করিলে চাষীর ফসলের আর মার থাকে না। ক্ষেত উঠিয়া গেলে, আগেকার গাছের যে গোড়াগুলি পুড়িয়া যায় নাই, তাহা হইতে তাজা ডালপালা গজায়; এইগুলি বৎসরকতকের মধ্যে পাঁচছয়হাতপরিমাণ ঠেলিয়া উঠে। এই-প্রকার ঘন গাছড়ার জঙ্গলকে মাকী কহে। ইহাতে পাঁচরকমের গাছ যেমন-তেমন জড়াজড়ি করিয়া বাড়িতে থাকে। কুড়ুলহাতে না গেলে ইহার মধ্যে মানুষের যাতায়াতের সাধ্য নাই। জায়গায় জায়গায় এই মাকী এত ঘন ও ঘেঁষাঘেষি যে, বুনো ছাগলগুলাও ভেদ করিতে পারে না।

যদি মানুষ খুন করিয়া থাক, তবে এই পর্টোভেক্কিয়োর মাকীর আশ্রয় লইয়ো। সেখানে একটি ভাল বন্দুক ও কিছু বারুদগুলি লইয়া নির্ব্বিঘ্নে বসবাস করিতে পারিবে। একটি মোটাগোচের গায়ের কাপড় লইতে ভুলিয়ো না, তাহা পাতাও চলিবে, গায়ে দেওয়াও চলিবে। ছাগপালকেরা তোমাকে দুধ-ছানা-বাদাম জোগাইবে এবং আইন-আদালত বা মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজন হইতে তোমার কোনই ভয় থাকিবে না,—যতক্ষণ না বারুদাদি কিনিবার জন্য আবার শহরে যাইতে বাধ্য হইবে।

আমি যখন ১৮——সালে কর্সিকায় গিয়াছিলাম, তখন মাটিয়ো মাকী হইতে ক্রোশ-খানেক দূরে বাড়ী করিয়াছিল। সে স্থানের মধ্যে মাটিয়ো কিছু অবস্থাপন্ন লোক। সেখানকার বুনোরা তাহার ছাগলের পাল পাহাড়ের উপর এখানে-ওখানে চরাইয়া বেড়াইত, ইহারই আয় হইতে মাটিয়ো রাজার হালে থাকিত, অর্থাৎ তাহাকে আর খাটিয়া খাইতে হইত না।

আমি যে ঘটনার কথা আজ বলিব, তাহার বৎসর-দুই পরে আমার যখন মাটিয়োর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাহার বয়স পঞ্চাশের বেশী দেখায় নাই। কল্পনা কর—মজবুত্ গড়নের বেঁটেখাটো মানুষটি, মিশ্‌মিশে কালো কোঁকড়া চুল, টিকল নাক, বড় বড় জ্বল্‌জ্বলে চোখ, পোড়া-পোড়া রং।

তাহাদের দেশে, প্রায় সকলেই যেখানে বন্দুক ভাল ছুঁড়িতে পারে, সেখানেও মাটিয়োর নিশানা করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য খুব খোষনাম ছিল। ধর না কেন, সে কখনো ছর্‌রা দিয়া বুনো ছাগল মারিত না, তিন রশি তফাৎ হইতে ইচ্ছামত মাথায় কি কাঁধে এক গুলি লাগাইয়া তাহাদিগকে পাড়িয়া ফেলিত। লোকে আমার কাছে তাহার হাতসাফাইয়ের এক গল্প করিল,—যাহা কর্সিকার বাহিরের লোকের হঠাৎ বিশ্বাসই হইবে না। হাতপঞ্চাশেক দূরে এক বাতি বসাইয়া তাহার সাম্‌নে এক পাতলা কাগজ ধরা হইল। এই কাগজের দিকে সে নিশানা ঠিক করিবার পর বাতি নিবান হইল। মিনিটখানেক পরে আওয়াজ করিতে আরম্ভ করিয়া সে চারবারের মধ্যে তিনবার কাগজ ফুটো করিল।

এরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য থাকায় মাটিয়োর বিশেষ খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। লোকে বলিত যে, সে শত্রুহিসাবে যেমন ভয়ঙ্কর, বন্ধুরূপে তেম্‌নি বিশ্বাসী। সে সর্ব্বদাই লোকের কাজকর্ম্ম উদ্ধার করিয়া দিত, গরীবের প্রতি মুক্তহস্ত ছিল, এবং সে জেলার সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখিয়া চলিত। তবে তাহার নামে এ গল্পও ছিল যে, কর্টেজেলায় যেখানে সে বিয়ে করে, সেখানে যে মেয়েকে তার পছন্দ হয়, তার আর-এক উপস্থিত পাত্রকে সে কিছু সংক্ষেপে সরাইয়া ফেলিয়াছিল ; অন্তত সে ব্যক্তি একদিন কামাইতে বসিলে, তাহাকে আচম্‌কা যে গুলিটি লাগে, সেটি লোকে মাটিয়োর নামেই জমা করিয়া রাখিয়াছিল।

এই ব্যাপার চাপা পড়িয়া গেলে, মাটিয়ো বিবাহকার্য্য সমাধা করে। তাহার স্ত্রী গীসেপা প্রথমে তাহাকে একটির পর একটি তিন কন্যা জোগান্ দেওয়াতে সে কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া

উঠিয়াছিল। পরে এক ছেলে হইল, মাটিয়ো তাহার নাম রাখিল ফর্টুনাটো (ভাগ্যবান্)। সে-ই ইহাদের একমাত্র বংশধর এবং পরিবারের আশাভরসা। মেয়েগুলির সৎপাত্রে বিবাহ হইয়াছিল। সময়ে-অসময়ে তাহাদের বাপ নিঃসঙ্কোচে জামাইদের বন্দুক ও ছোরার উপর নির্ভর করিতে পারিত। ছেলেটি সে সময়ে দশবৎসরের মাত্র, কিন্তু তার মধ্যেই উপযুক্ত হইয়া উঠিবার বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছিল।

একদিন শরৎকালে মাটিয়ো স্ত্রীকে লইয়া মাকীর মধ্যে এক আবাদে তাহার ছাগলের পাল তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সকাল সকাল বাড়ী হইতে বাহির হইল। ফর্টুনাটোর ইচ্ছা ছিল সঙ্গে যায়, কিন্তু সে আবাদ অনেকদূর, তা ছাড়া বাড়ী-খবরদারী করার জন্যও একজনের থাকা দরকার, তাই বাপ বারণ করিল। ইহার জন্য তাহাকে পস্তাইতে হইয়াছিল কি না, পরে দেখা যাইবে।

মাটিয়ো ঘণ্টাকতক গিয়াছে। ফর্টুনাটো প্রশান্তভাবে রোদে শুইয়া দূরের নীল পাহাড়গুলি দেখিতেছে, আর আগামী রবিবারে সুবেদার-খুড়ার ওখানে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবে, সে কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে এক বন্দুকের আওয়াজে তাহার চিন্তার স্রোত হঠাৎ বাধা পাইল। সে উঠিয়া, মাঠের যে দিক্ হইতে আওয়াজ আসিল, সে দিকে ফিরিয়া তাকাইল। আওয়াজের পর আওয়াজ কখনো অল্প, কখনো বেশী সময় অন্তর হইতে হইতে ক্রমেই কাছে আসিতে লাগিল। শেষে মাঠ হইতে মাটিয়োর বাড়ীর দিকে আসিবার রাস্তার মাথায় এক লোক দেখা গেল। তাহার লম্বা দাড়ী, পরনে ছেঁড়া কাপড় ও পাহাড়ী টুপী; বন্দুকের উপর লাঠির মত ভর দিয়া কোনরকমে শরীরটাকে টানিয়া আনিতেছে। তাহার উরুতে গুলির চোট্ লাগিয়াছে।

এই লোকটি দস্যু অর্থাৎ আইনের হাত এড়াইবার জন্য পালাইয়া বেড়াইতেছে। সে রাতারাতি সহরে বারুদ আনিতে গিয়া রাস্তায় একদল সিপাহীর হাতে পড়িয়া গিয়াছিল। খুব একপত্তন লড়িয়া, সে কোনগতিকে পাথরের আড়ালে আড়ালে ফিরিয়া দৌড় দিতে পারিয়াছিল। তাহারাও ফাঁকে পাইলেই গুলি চালাইতে চালাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাড়া করিয়াছিল। সে সিপাহীদের অল্পমাত্র আগিয়ে ছিল, এমন অবস্থায় খোঁড়া পা লইয়া ধরা পড়িবার আগে তাহার পক্ষে মাকীতে পৌছন অসম্ভব। সে ফর্টুনাটোর নিকটে আসিয়া কহিল—"তুই কি মাটিয়োর ছেলে?"

"হাঁ।"

"আমি গ্যানেটো। আমাকে লাল পাগড়ীতে তাড়া করেছে। আর চল্‌তে পার্‌ছি নে, আমাকে লুকো।"

"বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে' তোমাকে লুকোলে তিনি কি বল্‌বেন?"

"তিনি বল্‌বেন্—'বেশ করেছিস্।'"

"কে জানে?"

"শীঘ্র লুকো, তারা এল বলে'।"

"বাবার বাড়ী আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর না।"

"আরে মর্! অপেক্ষা কর্‌ব কি? তারা আর পাঁচমিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

আমায় লুকো বলছি, নয় ত তোকে মেরেই ফেল্‌ব।”

ফর্টুনাটো অতি ঠাণ্ডাভাবে উত্তর করিল -“তোমার বন্দুক ত দেখ্‌ছি থালি, আর থলেতেও আর টোটা নেই।”

“আমার ছোরাটা ত আছে।”

“আমার সঙ্গে দৌড়ে পার্‌বে?”

এই বলিয়া বালক এক লাফে দস্যুর আয়ত্তের বাহিরে গেল।

“তুই দেখ্‌ছি বাপের বেটা ন’স্‌। আমাকে শেষে বাড়ীর সাম্‌নে ধরিয়ে দিবি?” এই কথা বালকের মনে লাগিল। সে একটু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল- “তোমাকে লুকোলে কি দেবে?”

দস্যু জেব হাঁটিয়া একটি মুদ্রা বাহির করিল। বোধ হয় ইহা সে বারুদথরিদের জন্য রাথিয়াছিল। রূপা দেখিয়া ফর্টুনাটোর মুখে হাসি দেখা দিল। সে মুদ্রাটি থাব্‌লাইয়া-ধরিয়া গ্যানেটোকে বলিল—“কিছু ভয় নেই।”

তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী খড়ের গাদায় সে এক মস্ত গর্ত্ত করিল। গ্যানেটো গুঁড়ি মারিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া গেলে বালক তাহাকে এমন করিয়া খড়চাপা দিল যে, দমও বন্ধ না হয়, অথচ ভিতরে লোক আছে, তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝা সম্ভব না হয়। সে আর এক প্যাঁচাও ফন্দি ঠাওরাইল। এক বিড়াল সবে বাচ্ছা দিয়াছিল, সেগুলিসুদ্ধ তাহাকে গাদার উপর রাখিল,—যাহাতে দেখায় যেন সম্প্রতি খড় নাড়াচাড়া করা হয় নাই। পরে বাড়ীর ধারের রাস্তায় রক্তের দাগ দেখিয়া সেগুলি বেশ করিয়া ধুলাচাপা দিয়া সে আবার আগেকার মত প্রশান্তভাবে রোদে শুইয়া পড়িল।

মিনিটকতক পরে এক জমাদারের অধীনে ছয়জন থাকীপোষাক লালপগ্‌গধারী সিপাহী মাটিয়োর দুয়ারের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল জমাদার মাটিয়োদের কুটুম্ব হইত, তাহার নাম গম্বা। সে খুব তুখোড় সিপাহী, অনেক দস্যু গেরেফ্‌তার করিয়াছে বলিয়া তাহারা উঁহাকে যমের মত ভয় করিত। ফর্টুনাটো যেথানে শুইয়া ছিল, সে দিকে হাঁটিয়া গিয়া সে কহিল—“কিরে ভায়া। তুই যে মস্ত হয়ে’ উঠেছিস্‌! এথান দিয়ে এইমাত্র কাওকে যেতে দেখেছিস্‌?”

বালক ন্যাকা সাজিয়া উত্তর করিল—“আমি কিন্তু তোমার মত ঢ্যাঙা এথনো হ’তে পারি নি জমাদারদাদা।”

“সময়ে সবই হবে। কিন্তু বল্‌ দেখি, কোন লোক যেতে দেখিস্‌নি কি?”

“লোক যেতে দেখেছি কি না?”

“হাঁ। একটা লোক, মাথায় কালো মথ্‌মলের পাহাড়ী টুপি, গায়ে হল্‌দে-কাজ-করা লাল কোর্ত্তা।”

“মাথায় পাহাড়ী টুপি, গায়ে হল্‌দে-কাজ-করা লাল কোর্ত্তা?”

“হাঁ। চট্‌ করে’ উত্তর দে না, আমার কথাগুলো অমন করে’ আওড়াস্‌ নে।”

“আজ সকালে পাদরীসাহেব আমাদের দুয়োর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে’ গিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, ‘বাবা কেমন আছেন?’ আমি বল্লেম—”

“কিরে বদমাইস্‌! আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে নাকি? ধাঁ করে বলে’ ফেল্‌, গ্যানেটো

কোন্‌দিকে গেল। আমরা তাকেই খুঁজ্‌ছি। আমি বেশ জানি, সে এই রাস্তা ধরে' গেছে।"

"কে জানে?"

"কে জানে কিরে? আমি জানি, তুই তাকে দেখেছিস্‌।

"ঘুমিয়ে থাক্‌লে কি মানুষ দেখা যায়?"

"তুই কখনই ঘুমিয়ে ছিলি নে হতভাগা! বন্দুকের আওয়াজে নিশ্চয়ই তোকে জাগিয়ে দিয়েছিল।"

"তোমার বন্দুকের এতই আওয়াজ নাকি জমাদারদাদা? আমার বাবার বন্দুকটায় ওর চেয়ে ঢের বেশী হয়।"

"মর্‌ পাজী ছোঁড়া! আমি ঠিক বুঝেছি, তুই গ্যানেটোকে দেখেছিস্‌—হয় ত লুকিয়েও থাক্‌তে পারিস্‌। দেখ ত বাবারা, বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখ ত, বেটা আছে কি না। তার এক পা বই চল্‌ছিল না,—সে কাঁচা ছেলে ত নয় যে, ঐরকম চালে মাকী পর্য্যন্ত ঠেলে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। তা ছাড়া রক্তের দাগও এখানে এসে থেমে গেছে।"

ফর্টুনাটো একটু ফচ্‌কে হাসি হাসিয়া বলিল—"বাবা কি বল্‌বেন? তিনি না থাক্‌তে তোমরা বাড়ী চড়াও হয়েছ জান্‌লে কি বল্‌বেন?"

গম্বা-জমাদার বালকের কান ধরিয়া কহিতে লাগিল—"আরে লক্ষ্মীছাড়া! তুই জানিস্‌, আমি মনে কর্‌লে তোর সুর বদ্‌লে দিতে পারি! দশবিশ ঘা কসালে বোধ হয় তোর কথা বেরোবে।"

কিন্তু ফর্টুনাটোর আহ্লাদেপনা ঘুচিল না —সে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল—"আমার বাবা মাটিয়ো!"

"জানিস্‌ পাজী ছোঁড়া, আমি তোকে গারদে পুরতে পারি, তোকে হাতে-পায়ে শিকল দিয়ে অন্ধকূপে ফেলে রাখ্‌তে পারি? গ্যানেটো কোথা আছে যদি না বলিস্‌, তোকে ফাঁসিকাঠে চড়াব।"

এই ফাঁকা লম্বাই-চওড়াই শুনিয়া ছেলে ত হাসিয়া কুটিকুটি। সে আবার বলিল "মাটিয়ো আমার বাবা!"

এক সিপাহী কানে কানে কহিল— "জমাদারজী, মাটিয়োকে ঘাটিয়ে কাজ নেই।"

গম্বা মুস্কিলে পড়িল। সিপাহীদের বাড়ীর ভিতরটা দেখিয়া আসিতে বেশী সময় লাগে নাই—কসিকায় গৃহস্থের বাড়ী বলিতে একটি-মাত্র চৌকাঘর, বসিবার, খাইবার ও শিকার করিবার যাহা-কিছু জিনিষপত্র, সব তাহারই মধ্যে। সিপাহীরা ফিরিলে গম্বা তাহাদের সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ করিতে লাগিল। দুষ্ট ফর্টুনাটোটা তাহার দাদা ও সিপাহীরা গোলে পড়িয়াছে দেখিয়া খড়ের গাদায় হেলান দিয়া বিড়ালের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মজা দেখিতে লাগিল।

এক সিপাহী খড়ের গাদার নিকট গেল, বিড়াল দেখিল; আল্‌গোচে একবার খড়ের গায়ে সঙানের খোচা মারিল; আবার— 'এমন জায়গায় কি মানুষ থাক্‌তে পারে, দেখ্‌তে হয় বলে' দেখা' —এইভাবে মাথা নাড়িয়া ফিরিয়া আসিল। খড়ের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, বালকের মুখেও কিছু চাঞ্চল্য দেখা দিল না।

জমাদার ও তাহার দল কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায় না। কেহ কেহ যেন 'গেলে

হয়’ ভাবে এক আধবার মাঠের দিকে তাকাইতে লাগিল। এমন সময়ে কর্ত্তা, শাসনে কিছু হইবার নহে সাব্যস্ত করিয়া, মিষ্ট কথায় গায়ে হাত বুলাইয়া কাজ উদ্ধারের শেষচেষ্টা দেখা স্থির কবিল। সে বলিল—“ভায়া খুব হুঁসিয়ার ছেলে। এর পর একজন হ’য়ে উঠ্‌বি দেখ্‌ছি। কিন্তু আমার সঙ্গে এমন ব্যবহারটা কি বড় সুবিধের হ’ল? মাটিয়ো-খুড়ো যদি মনে কষ্ট না পেত, আমি তোকে সঙ্গে ধরে’ না নিয়ে যেতাম ত কি বলেছি।”

“ইস্!’

“খুড়ো কিন্তু ফিবে এলে আমি সব বলে’ দেব। তুই মিথ্যেকথা বলেছিস্ শুন্‌লে সে মারের চোটে তোর চামড়া ফাটিয়ে দেবে।”

“তার পর?”

“তুই দেখে নিস্। কিন্তু দেখ্, ভাল ছেলে হ’লে আমি তোকে একটা জিনিষ দেব।”

“জমাদারদাদা, আমিও তোমাকে একটু উপদেশ দেব। তুমি যদি এখানে আর দেরী কর, তা হ’লে গ্যানেটো মার্কীতে পৌঁছে যাবে, তখন তোমার মত দশটা শেয়ানা জুট্‌লেও তাকে আর ধর্‌তে পার্‌বে না।”

জমাদার জেব হইতে রূপার ঘড়ি বাহির করিল, দাম আন্দাজ বিশপঁচিশ টাকা হইবে। লোভে ফর্টুনাটোর চোখ জ্বলিতেছে দেখিয়া, সে চেনের আগা ধরিয়া ঘড়িটি তাহার মুখের সাম্‌নে লট্‌কাইয়া বলিতে লাগিল—“কিরে বদ্‌মাইস্! এরকম ঘড়ি গলায় ঝুলিয়ে বেড়াতে লাগ্‌বে কেমন? সহরের মধ্যে দিয়ে যাবি যেন ময়ূর প্যাকম তুলে’ চলেছে। আর সবাই ‘কটা বেজেছে, কটা বেজেছে’ করে’ চারদিকে ঘির্‌বে, আর তুই বল্‌বি—‘আমার ঘড়িটা দেখে নাও না গা!’”

“আমি বড় হ’লে সুবেদার-খুড়ো আমায় ঘড়ি দেবে।”

“তা ত দেবে, কিন্তু সুবেদারের ছেলের যে এখনই ঘড়ি রয়েছে—সেটা এত ভাল নয় বটে, তবে তার বয়সও তোর চেয়ে কম।”

বালক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

“আচ্ছা ভায়া, আমার এ ঘড়িটা চাস্ কি না, বল্ দেখি?”

হঠাৎ আস্তমাছ সাম্‌নে ধরিয়া দিলে বিড়ালের যেমন হয়, ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ফর্টুনাটোরও সেইরকম চেহারা হইল। বিড়াল সন্দেহ করে, বুঝি-বা তামাসা করা হইতেছে, একবার করিয়া থাবা বাড়ায়, অথচ ছুঁইতে সাহস পায় না; মাঝে মাঝে চোখ ফিরায়,—পাছে অতি লোভে বিপদ্ ঘটে; আবার ঠোঁট চাটে, যেন মনিবকে বলিতেছে—‘এমন নিষ্ঠুর ঠাট্টা কেন?’

গম্বা-জমাদারের চেহারায় ফাঁকির ভাব কিছু না থাকিলেও ফর্টুনাটো হাত না বাড়াইয়া, কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—“আমাকে নিয়ে মজা পেয়েছ নাকি?”

“মাইরি! আমি ঠাট্টা কর্‌ছি নে। গ্যানেটো কোথায়, আমাকে বল্লেই এই ঘড়ি তোরই হবে।”

অবিশ্বাসের ভাবে মুচ্‌কে হেসে ফর্টুনাটো তার বড়-বড় কালো-কালো চোখ দিয়া জমাদারের মুখের দিকে প্যাট্‌প্যাট্ করিয়া চাহিয়া তাহার কথায় কতদূর বিশ্বাস করা চলে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে

লাগিল। জমাদার বলিয়া উঠিল "যা বল্‌ছি, তা কর্‌লে ঘড়ি তোকে যদি না দিই, তবে আমি জমাদারই নই। আমার এই লোকজন সব সাক্ষী রইল, আমার কথা খেলাপ হবার জো নেই।"

এইরূপ বলিতে বলিতে গম্বা ঘড়িটা ক্রমেই বালকের মুখের কাছাকাছি আনিতে লাগিল, শেষে প্রায় তাহার গালে আসিয়া ঠেকিল। মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতে লাগিল, তাহার মনের ভিতরটা কেমন তোলপাড় করিতেছে 'বিশ্বাস ভাঙি, কি ঘড়ি ছাড়ি।' তাহার খোলা বুক সজোরে উঠিতে পড়িতে লাগিল, আর একটু হইলে যেন দম আট্‌কাইয়া আসিবে। ততক্ষণ ঘড়ি সম্মুখে দুলিতেছে, কখনো ঘুরিয়া নাকেও ঠেকিতেছে। অবশেষে একটু একটু করিয়া ডানহাতটা ঘড়ির দিকে উঠিতে লাগিল; আঙুলের ডগা তাহাতে গিয়া ঠেকিল ঘড়ির পুরো বোঝাটা হাতের উপর পড়িল। কিন্তু জমাদার তাহাতেও চেনের আগাটা ছাড়িল না। কাচের ভিতরটার আকাশের মত নীল রং, বাহিরের রূপাটা টাট্‌কা পালিশ করা, রোদে আগুনের মত ঝল্‌কাচ্ছে। লোভ আর কিছুতেই সাম্‌লাইয়া রাখা গেল না।

ফর্টুনাটো বাঁ-হাতটাও তুলিয়া কাঁধের উপর দিয়া বুড়া আঙুলের ইঙ্গিতে পিছনের খড়ের গাদাটা দেখাইয়া দিল। জমাদার তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইল, চেনটা ছাড়িয়া দিল। ফর্টুনাটো ঘড়িটা এখন নিজস্ব সম্পত্তি জানিয়া হরিণের মত এক-লাফে খড়ের কাছ হইতে হাতকতক তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল। সিপাহীরাও তদ্দণ্ডে খড় নাবাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল।

দেখিতে দেখিতে খড় নড়িয়া উঠিল এবং এক রক্তমাখা লোক ছোরাহাতে বাহির হইল। কিন্তু সে উঠিতে গিয়া দেখে, পায়ের জখমটা আড়ষ্ট হওয়ায় তাহার খাড়া হইবার উপায় নাই। সে সেখানেই পড়িল। জমাদার তাহার ঘাড়ের উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া ছোরা ছিনাইয়া লইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার ধড়্‌ফড়ানিসত্ত্বেও সে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা পড়িল।

গ্যানেটো দড়িবাঁধা কাঠের বোঝার মত মাটিতে পড়িয়া নিকটে আগত ফর্টুনাটোর দিকে ফিরিয়া, যত না রাগে, ততোধিক ঘৃণায় বলিল, "——র বাচ্ছা।"

বালক তাহার নিকট যে মুদ্রাটি পাইয়াছিল, তাহাতে আর অধিকার নাই বোধে তাহা গ্যানেটোর দিকে ছুঁড়িয়া দিল। কিন্তু সে কার্য্যের প্রতি দস্যু লক্ষেপমাত্র করিল না। সে জমাদারকে অতি প্রশান্তভাবে বলিল—"গম্বাভাই, আমি ত হাট্‌তে পারব না, আমাকে সহর পর্য্যন্ত ব'য়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।"

বিজয়োৎফুল্ল জমাদার কহিল—"এইমাত্র ত তুমি ছাগলের বাচ্ছার মত লাফাতে লাফাতে এলে। আচ্ছা ভয় নেই, আমি তোমায় ধর্‌তে পেরে এত খুসী আছি যে, পিঠে ক'রে নিয়ে একক্রোশ হাঁট্‌লেও হায়রান্ হব না। যা হোক, ডালপালার উপর তোমার গায়ের কাপড়টা পেতে একটা ডুলির মত ক'রে দিচ্ছি, একটু আগে গিয়ে ঘোড়া পাওয়া যাবে এখন।"

বন্দী কহিল—"সেই ভাল, ডুলির উপর দুটি খড়ও বিছিয়ে দিও, যাতে একটু আরামে যেতে পারি।'

সিপাহীরা কেহ ডালপালা জুটাইয়া ডুলি গাড়িতে, কেহ বা গ্যানেটোর ঘাটায় কাপড় বাঁধিতে ব্যস্ত, এমন সময়ে হঠাৎ সস্ত্রীক মাটিয়োকে মাকার রাস্তার বাঁকের উপর দেখা গেল। স্ত্রীটি মস্ত এক বাদামভরা থলের ভারে কষ্ট স্বীকার করিয়া চলিতেছে স্বামীটি কেবল হাতে এক বন্দুক, পিঠে ঝোলান এক বন্দুক লইয়া খাতিরনদারংভাবে আসিতেছে—কারণ পুরুষমানুষের অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য কোন বোঝা বহিতে নাই।

বাড়ীতে সিপাহী দেখিয়া মাটিয়ো প্রথমেই ভাবিল, বুঝি তাহাকেই ধরিতে আসিয়াছে। তাহার এমন খট্‌কা লাগে কেন? সে কি কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে কিছু বাদাবাদী করিয়াছিল? তাহা নহে—মাটিয়োর ত সরকারের বাধ্য বলিয়া সুখ্যাতিই ছিল। তবে হাজার হৌক কর্সিকাবাসী, তাহার উপর পাহাড়ী। ও জাতের এমন প্রায় কেহই নাই, যাহার পূর্ব্বকথা ভাবিতে বসিলে একটা-না-একটা গলদ মনে না পড়ে হয় বন্দুকের গুলি, নয় ছোরার খোঁচা, নয় ত ঐরকম ছোটখাটো কিছু একটা। অন্যদের অপেক্ষা এ সম্বন্ধে মাটিয়োর মনটা কিছু পরিষ্কারই ছিল, কারণ বছরদশেক হইল, সে কোন মানুষের দিকে বন্দুক তাগ্ করে নাই। তবু সাবধানের মার নাই, সুতরাং সে বাঁচিবার একচোট ভালরকম চেষ্টা করিতে পারিবার মত ব্যবস্থা করিল। স্ত্রীকে কহিল "ওগো। বোঁচ্‌কা রেখে তৈরী হও।"

গীসেপা তৎক্ষণাৎ হুকুমমত কাজ করিল। পাছে কাজের সময় বাধে বলিয়া কাঁধে-ঝোলান বন্দুকটা সে স্ত্রীর হাতে দিল। হাতের টার ঘোড়া তুলিয়া ধীরে ধীরে গাছের সারের ধার দিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল, যাহাতে গোলযোগ দেখিলেই সে এক লাফে বড় একটা গাছের পিছনে নিজের শরীর আড়াল করিয়া বন্দুক ছাড়িতে পারে। স্ত্রী ফালতু বন্দুকটা আর টোটার বাক্স লইয়া পিছনে পিছনে লাগিয়া রহিল। যুদ্ধের সময় সুগৃহিণীর কার্য্য স্বামীর অস্ত্র জোগান।

ওদিকে জমাদার মাটিয়োকে এভাবে পা টিপিয়া টিপিয়া বন্দুক তুলিয়া আসিতে দেখিয়া মহা শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল "কি জানি যদি এই গ্যানেটোর সঙ্গে মাটিয়োর কোন আত্মীয়তা থাকে, কিংবা যদি বন্ধুই হ'য়ে ওকে খালাস করতে চায়, তা হ'লে চিঠি ডাকে দিলে যেমন নির্ঘাত ঠিকানায় পৌছয়, ওর দুই বন্দুকের দুই গুলি দু'জনকে পাবেই পাবে। আর কুটুম্বিতা ভুলে যদি আমারই উপর বন্দুকের মাছিটা ফেলে বসে ?"

এই সমস্যার অবস্থায় সে এক অতি সাহসিক মতলব আঁটিল। সে কুটুম্বোচিত সম্ভাষণ করিয়া একাই মাটিয়োর দিকে অগ্রসর হইয়া ঘটনাটা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে চলিল। যে অল্প পথটুকু তাহাকে এইভাবে যাইতে হইল, সেটা ভয়ঙ্কর লম্বা বোধ হইতে লাগিল। নিকটে গিয়াই হাঁকিল—"কিগো

খুড়োমশায়! তোমার খবরটবর কি? আমি তোমার কুটুম্ব, গম্বা।"

মাটিয়ো উত্তরে কথাটি না কহিয়া থামিয়া গেল, এবং গম্বা যতক্ষণ কথা বলিতেছে, ততক্ষণ বন্দুক আস্তে আস্তে উঠাইয়া, জমাদার পৌঁছিতে পৌঁছিতে নল আকাশের দিকে করিল। জমাদার আবার বলিল—"ভাল ত খুড়ো, অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।"

"কি খবর?"

"এ দিক্ দিয়ে যেতে যেতে ভাব্‌লুম, তোমার বাড়াতে ঢুঁ মেরে খবরটা নিয়ে যাই। আমাদের আজ আচ্ছা লম্বা পাল্লা হয়েছে, কিন্তু তাতে দুঃখ নেই, এক মস্ত শিকার পাওয়া গেছে। গ্যানেটোটা ধরা পড়েছে।"

গীসেপা বলিয়া উঠিল—"বাঁচা গেল! সবে সেদিন ও আমাদের একটা ছাগল চুরি করেছে।"

এই কথায় গম্বার ধড়ে প্রাণ এল।

মাটিয়ো কহিল—"বেটা কি সাধে করেছে—খিদের চোটে বেচারা করে কি?"

জমাদার কিছু দমিয়া গিয়া কহিতে লাগিল—"হতভাগাটা বাঘের মত লড়েছিল। আমার এক সেপাইকে ত মেরেই ফেল্লে শুধু তা নয়, আবার চার্দন্ সরদারের হাত ভেঙে দিলে তবে তাতে বড় লোক্‌সান হয় নি, সে বেটা ফরাসী বৈ ত নয়। তার পর এম্‌নি গা ঢাকা দিলে যে, সয়তানেরও সাধ্যি নেই, খুঁজে বার করে। আমার ফর্টুনাটো-ভায়া অনুগ্রহ না কর্‌লে ওকে কিছুতেই পাকড়াও করা যেত না।"

মাটিয়ো বলিয়া উঠিল—"ফর্টুনাটো?"

প্রতিধ্বনির মত গীসেপা কহিল—"ফর্টুনাটো?"

"হাঁ। গ্যানেটো তোমার ঐ খড়ের গাদাটার মধ্যে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু ভায়া আমার তার বিশ্বে ফাঁস করে' দিলে। আমি সুবেদার-খুড়োকে বোল্‌বো, যাতে ওর বাহাদুরীর জন্যে ভালরকম পুরস্কার পাঠিয়ে দেয়। আর ফর্টুনাটোর সঙ্গে তোমারও নাম আমি জেনেরালসাহেবের কাছে জানাব।"

দাঁত কিড়্‌মিড়্ করিয়া মাটিয়ো বলিল—"মরণ আর কি।"

এতক্ষণে তাহারা সিপাহীদলের নিকটে পৌঁছিল। গ্যানেটো রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ডুলিতে শুইয়াছিল। গম্বার সঙ্গে মাটিয়োকে দেখিয়া একটু বাঁকা-হাসি হাসিল। পরে বাড়ার দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইয়া থুথু ফেলিয়া বলিল—"ঘুষখোরের বাড়ী!"

মরিবার জন্য প্রস্তুত না হইয়া মাটিয়ো-সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে কেহ সাহস পাইত না। ছোরার এক ঘায়ে এক বৈ দুয়ের দরকারই হইত না—এ অপমানের হাতে-হাতে শোধ হইত। কিন্তু মাটিয়ো শিরে করাঘাত ছাড়া আর কোনরকম নড়াচড়া করিল না, তাহার যা' হইবার, যেন হইয়া গেছে।

বাবাকে আসিতে দেখিয়া ফর্টুনাটো বাড়া ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। একটু পরেই সে একপাত্র দুধ হাতে বাহিরে আসিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া তাহা গ্যানেটোকে দিতে গেল। দস্যু তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"দূর হ!"

পরে একজন সিপাহীর দিকে ফিরিয়া কহিল "ভাই হে, একটু জল দাও ত।"

সিপাহী নিজের জলের চোংটা তার হাতে ধরিয়া দিলে, দস্যু যাহার সঙ্গে সবে মাত্র সমানে লড়িয়াছিল, তাহার হাতে অনায়াসে জল খাইল। তাহার পর সে দরবার করিল, যাহাতে তাহার হাতদুইটা পিঠের দিকে না বাঁধিয়া বুকের উপর রাখিয়া বাঁধা হয়। সে বলিল—"আমি আরামে শুতে ভালবাসি।"

তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে দস্যুর ইচ্ছা পূর্ণ করিল। পরে জমাদার নিরুত্তর মাটিয়োর নিকট বিদায় চাহিয়া চলিবার ইঙ্গিত করিল এবং হন্‌হন্‌শব্দে মাঠের দিকে নাবিয়া গেল।

মিনিটদশেক মাটিয়োর বাক্য সরিল না। বালক একবার মার দিকে, একবার বাবার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিল; বাপ রাগে গুম্ হইয়া তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া রহিল। খানিক পরে চাপা, অথচ যাহারা জানে তাহাদের পক্ষে ভয়ানক স্বরে মাটিয়ো বলিল—"আরম্ভ করেছ ভাল!"

"বাবা!"—বলিয়া বালক ছল্‌ছল্ চোখে যেন বাপের পায়ে পড়িবার জন্য এক পা বাড়াইল।

কিন্তু মাটিয়ো গর্জ্জিয়া উঠিল—"আমার কাছ থেকে দূর হ!"

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের নিকট হইতে দুইচার পা তফাতে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

গীসেপা কাছে আসিল। ফর্টুনাটোর পিরাণের ফাঁক হইতে চেনের আগাটা বাহির হইয়াছিল, সেটা তাহার চোখে পড়িল। সে কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"ঘড়িটা তোকে কে দিলে?"

"জমাদারদাদা।"

মাটিয়ো এক হ্যাঁচ্‌কায় ঘড়ি টান দিয়া পাথরের উপর আছড়াইয়া চূরমার করিল। সে বলিল "দেখ মাগি! এ ছেলে কি আমার?"

গীসেপার রোদে-পোড়া গালদুটা ইটের মত টক্‌টকে হইয়া উঠিল।

"তুমি কি যে বল, তার ঠিক নেই,—কার্ সঙ্গে কথা ক'চ্ছ, ভুলে গেছ নাকি?"

"যা হোক্, এ বংশের এই প্রথম ছেলে, যে ভুলেও অবিশ্বাসের কাজ করেছে।"

ফর্টুনাটোর কাঁদুনা-ফোঁপানী দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু মাটিয়োর বাঘের চাহনা তাহার মুখ হইতে সরিল না। অবশেষে সে বাঁট্‌টা একবার মাটিতে ঠুকিয়া বন্দুক আবার ঘাড়ে তুলিয়া লইল এবং ফর্টুনাটোকে সঙ্গে আসিতে হাঁকিয়া মাকীর দিকে ফিরিয়া চলিল। বালক তাহাই করিল।

গীসেপা মাটিয়োর পিছনে ধাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল এবং কালোচোখে স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া যেন তাহার মনের কথাটা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে করিতে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"ওগো, তোমার ছেলে যে গো!"

মাটিয়ো বলিল—"আমায় ছাড়, আমি ওর বাপ।"

গীসেপা ছেলেকে একবার বুকে আঁকড়া-

ইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিয়া যিশুমাতা মারীর মূর্ত্তির সাম্‌নে পড়িয়া কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মাটিয়ো মাকীর রাস্তা ধরিয়া রশিচারপাচ তফাতে এক নালা পাইয়া তাহার মধ্যে নাবিয়া পড়িল। বন্দুকের বাঁট দিয়া ঠুকিয়া দেখিল, মাটি নরম, খোঁড়া সহজ। এ স্থান সে নিজের অভিপ্রায়ের উপযোগী বোধ করিল।

"ফর্টুনাটো। ঐ বড় পাথরের ধারে গিয়া দাঁড়াও।" বালক বাপের কথামত সেখানে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া পড়িল।

"তুমি স্তবস্তোত্র যা জান, তা বল।"

"বাবা! বাবা! আমাকে মেরো না!'

মাটিয়ো পুনরায় ভীষণস্বরে বলিল—"স্তোত্র বল!"

বালক ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে থতিয়ে-মতিয়ে দুইএকটি স্তোত্র আওড়াইল। পিতা প্রত্যেকটির পর উচ্চকণ্ঠে শান্তিপাঠ করিল।

"এ ছাড়া আর কিছু জান?"

"মারীস্তোত্র জানি 'বাবা, আর পিসিমা যে বন্দনাটা শিখিয়েছিলেন।"

"সেটা মস্ত লম্বা, যা হোক্, তা ও বল।"

বালক ক্ষীণকণ্ঠে বন্দনা সাঙ্গ করিল।

"শেষ হইয়াছে?"

"দোহাই বাবা! আমাকে মাপ কর, আমি আর কখনো কর্‌ব না। আমি সুবেদার-খুড়োর হাতে-পায়ে ধরে' গ্যানেটোর সাজা মাপ করিয়ে দেব।"

সে কাঁদাকাটি করিতে থাকিল। মাটিয়ো বন্দুকের ঘোড়া তুলিয়া লইয়াছিল, এক্ষণে নিশানা ঠিক করিয়া কহিল—"ভগবান্ তোমায় ক্ষমা করুন।"

বালক উঠিয়া বাপের পা জড়াইয়া ধরিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু সময় পাইল না। মাটিয়ো বন্দুক ছাড়িল, ফর্টুনাটো কাঠের মত মরিয়া পড়িল।

মড়ার দিকে একটিবারও না চাহিয়া মাটিয়ো ছেলেকে গোর দিবার জন্য কোদাল আনিতে বাড়ী ফিরিল। দুই পা যাইতেই, গাসেপা বন্দুকের আওয়াজে ভয়ে অস্থির হইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহার সঙ্গে দেখা হইল। সে কাঁদিয়া উঠিল—"কি করলে?"

"সুবিচার।"

"সে কোথায়?"

"নালায়। আমি তাকে গোর দিতে চলিলাম। সে উপযুক্ত খৃষ্টানের মত মরেছে, আমি তার ভালরকম সৎকার করাব। বড়-জামাইবাড়ী খবর পাঠিয়ে দাও, সে আমাদের সঙ্গে এসে থাকুক।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বদেশী সমাজ।

"সুজলা সুফলা" বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতকপক্ষীর মত উৰ্দ্ধের দিকে তাকাইয়া আছে—কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরুগুরু মেঘগর্জ্জন সুরু হইয়াছে—গবর্মেণ্ট সাড়া দিয়াছেন—তৃষ্ণানিবারণের যা-হয়-একটা উপায় হয় ত হইবে—অতএব আপাতত আমরা সেজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্ব্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল,—যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত—দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না?

আমাদের যে সকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, সেইগুলাই না হয় বিদেশী পূরণ করুক। অন্নক্লিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য কর্জ্জন্‌সাহেব উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, আচ্ছা, না হয় অ্যাণ্ড্রুযুল্‌ সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্ত্তি করিতে থাকুন্; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জ্বালাময় তরলরসের তৃষ্ণা—যাহা প্রলয়কালের সূর্য্যাস্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে—তাহা পশ্চিমের সামগ্রী এবং পশ্চিমদিগ্দেবী তাহার পরিবেষণের ভার লইলে অসঙ্গত হয় না—কিন্তু জলের তৃষ্ণা ত স্বদেশের খাঁটি সনাতন জিনিষ!—ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট্ আসিবার পূর্ব্বে আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালরূপেই হইয়া আসিয়াছে এজন্য শাসনকর্ত্তাদের রাজদণ্ডকে কোনোদিন ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্য্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মত করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণীখনন চলিতেছে, গুরুমশায় শুভঙ্করী কসাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্ত্তনের আরাবে

পল্লার প্রাঙ্গন মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

দেশে এই যে সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গল-কর্ম্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহতভাবে সমস্ত ধনিদরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইয়াছে, না, রাজপুরুষদিগকে সুদীর্ঘ মন্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে। নিশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, রক্ত-চলাচলের জন্য যেমন টৌন্‌হল্‌মীটিং অনাবশ্যক—সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে—তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচকবাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিষ নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্ত্তা সরকারবাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্ত্তা সরকারবাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকারবাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয়, তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি?

ইংরাজিতে যাহাকে ষ্টেট্ বলে, আমাদের দেশে আধুনিকভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি-আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের ষ্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্ম্মের ভার ষ্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা, পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্ত্তব্য ছিল না, তাহা নহে—

কিন্তু কেবল আংশিকভাবে বস্তুত সাধারণত সে কর্ত্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে—কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই যেমন দিত, তিনিও তেম্‌নি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র বিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন—তাহারা কর্ত্তব্যভারে আক্রান্ত নহে—তাহাদের সমস্ত বড় বড় কর্ত্তব্যভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন — প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্ম্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন,—কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্য্যরূপে, বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থসংযম ও আত্মত্যাগ চর্চ্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্ম্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্ম্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়—এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্‌স্ এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে ষ্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্ম্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরাজ ষ্টেট্‌কে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্ম্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই ষ্টেট্‌কে জাগ্রত রাখিতে, সচেষ্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্ব্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরাজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থানির্ব্বিচারে গবর্মেণ্ট্‌কে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্ম্মভার সাধারণের সর্ব্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভাল, না তাহা বিশেষভাবে সরকারনামক একটা জায়গায় নির্দ্দিষ্ট

হওয়া ভাল। আমার বক্তব্য এই যে, এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিংক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে—বিলাতরাজ্যের ষ্টেট্ সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত—তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না। অত্যন্ত ভাল হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য।

আমাদের দেশে সরকারবাহাদুর সমাজের কেহই নন্, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্ম্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানাজাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায়গ্রহণ করেন নাই, সেইজন্যই আজও আমাদের মাথা একেবারে মাটিতে গিয়া ঠেকিতে পায় নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভূক্ত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরাজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্ত্তনীয়রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি কোনো আপত্তি করি নাই। এ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরাজের আইনে বাঁধিয়া গেছে,—পরিবর্ত্তনমাত্রই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্ম্মস্থান—যে মর্ম্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই-আমাদের অন্তরতম মর্ম্মস্থান আজ অনাবৃত-অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ্, জলকষ্ট বিপদ্ নহে।

পূর্ব্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লি তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও

বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকার-দত্ত রাজামহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল। জন্মভূমির সম্মান তাঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লি হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের গণ্ডগ্রামেও কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্বচর্চ্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্য বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই, কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে। সুস্থ অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক অব্যবহিত উত্তেজনা শরীরের মধ্যেই থাকে—যখন মৃগনাভি, অ্যামোনিয়া, সাপের বিষ দিয়া শরীরকে সক্রিয় করিতে হয়, তখন অবস্থাটা নিতান্ত সংশয়াপন্ন। আজকাল আমাদের সমাজ শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তেজনা ইহাকে কোনো কাজেই প্রবৃত্ত করিতে পারিতেছে না—বৈদ্যমহাশয়ের বড়ি না হইলে একেবারে অচল। এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্টনিবারণের জন্য গবর্মেন্ট্ দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন—স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!

কে বলে, জলকষ্টনিবারণের সামর্থ্য আমাদের নাই? একদা দেশের যে অর্থ দেশের কল্যাণকর্ম্ম সাধন করিয়া চরম সার্থকতা লাভ করিত, আজ সেই অর্থ অজস্রধারায় মিলটনের আড়গড়া, হাইকের গাড়িখানা, ল্যাজারসের আস্‌বাব্‌শালা, হ্যামিল্‌টন্‌কোম্পানির দাক্তর দোকানকে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে। স্বদেশের শুষ্কতালুতে জলবিন্দু দিবার বেলায় টানাটানি না পড়িবে কেন?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, লেডিডফ্‌রিন ফণ্ডে, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ঘোড়দৌড়ে, লাটসাহেবের অভ্যর্থনায় টাকা ঝরিয়া পড়িতেছে কখন? যখন, সেই টাকা-জোগান্‌কারী প্রজার দল দীপ্তমধ্যাহ্নে পানীয়জলের জন্য হাহাকার করিতেছে, যখন ম্যালেরিয়ায় তাহারা উৎসন্ন হইয়া গেল, যখন তাহাদের গরবাছুর চরিবার একছটাক জমি নাই, যখন তাহাদের নিম্নভূমির উপর হইতে বর্ষার পর তিনচারমাস ধরিয়া জলনিকাসের কোনো উপায় থাকে না!

আর যাঁহারা পল্লী হইতে বাহির হইয়া সামান্য অবস্থা হইতে ধনি-অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—তাঁহাদেরও ধনের আড়ম্বর করিবার স্থান সদরে এবং আড়ম্বরের উপায়ও বারো-আনা বিলাতী। ইহাতে যে টাকাগুলাই কেবল বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা নহে, হৃদয়ও দেশে থাকে না। রুচির দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, আচরণের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে যাহাকে অবজ্ঞা করি, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে কেবল আর্থিকশক্তির অভাব ঘটে, তাহা নহে—চিত্তশক্তিও থাকে না। সুতরাং তখন দেশহিতৈষিতার সর্ব্বপ্রধান বুলি এই হইয়া দাঁড়ায় যে, "আমরা নিজে কিছুই করিতে পারিব না, কারণ

"স্বদে ... টিবুট লইয়া অত্যন্ত ব ... । হে সরকার, আমরা 'লঃ ', অ ... মই সমস্ত করিয়া দাও— যদি না কর, ত ... ালি দিব!"

আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়িয়া পড়িয়া থাক্, বিদ্যা ও ধনমান অ ... জন্য বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালিজাতিটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে —তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্ম্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উল্টাপাল্টা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জ্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"

এইজন্য কবিকথিত "স্রোতের সেঁওলি"র মত ভাসিয়াই চলিয়াছি।

এরূপ অবস্থা কোনোমতেই চিরকাল থাকিতে পারে না। এইজন্য আপাতত স্রোতের অত্যন্ত প্রাবল্য দেখিলেও মনকে হতাশ হইতে দিই না। ইহাও ত দেখা গেছে, একসময় ইংরাজিরচনার চর্চ্চা দেশে অত্যন্ত প্রবল ছিল—তখনকার শিক্ষিত যুবকেরা বাংলাভাষাকে একান্তমনে ঘৃণা করিতেন। তখন কি কেহ কল্পনাও করিতে পারিত যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলাভাষায় আধুনিক কাব্যসাহিত্যের প্রথম অবতারণা করিবেন এবং রিচার্ডসনের প্রিয়-ছাত্র বাংলাভাষায় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনা লিখিতে অগৌরব বোধ করিবেন না।

যেমন সাহিত্যে, তেমনি সকল দিকেই স্রোত ফিরিবে—ঘরে আসিতেই হইবে। চারিদিকে তাহার লক্ষণ দেখা দিতেছে।

বাঙালীর সাহিত্যপ্রিয়তা একবার বাহিরে ফিরিয়া আসিবার ফলে আমরা দেখিতেছি, বঙ্গসাহিত্য আজ তাহার পৈতৃক-সীমানা অনেকদূর পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া গেছে। তাহার বিচিত্রশক্তি আজ নানাদিকে নানা আকারে আপনাকে নানাপথে ধাবিত করিয়াছে। তেম্নি যাহাদের হৃদয় একবার বাহিরে ঘুরিয়া অবশেষে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা ঘরকে বড় করিয়া তুলিবে।

বিধাতা এইজন্যই আমাদিগকে এমন করিয়া সকল দিক্ দিয়া ঘর হইতে খেদাইতেছেন—বাহিরটাকে এমন জবরদস্তি করিয়া বারংবার আমাদের রুদ্ধদ্বারের উপর সবলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে ঘর-বাহিরের একটা বৃহৎ সামঞ্জস্য করিবেন। যেখানে পল্লিজীবনযাত্রার আয়োজন ছিল, সেখানে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিচিত্র উপকরণ আহরণ ও সঞ্চয় করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন;—যেখানে

আমরা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, সেখানে বৃহত্তরভাবে আমরা স্বাধীন হইব। এখন আমাদের সমাজ নির্জ্জীবভাবে সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিবে না, সজীব হইয়া সকলের সহিত যোগস্থাপন করিবে,—পল্লির সহিত পল্লি, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়, দেশের সহিত দেশ গাঁথিয়া এক হইয়া যাইবে।

বিচ্ছেদে প্রেমকে প্রবল, মিলনকে ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলে, এ কথা পুরাতন। একবার হারাণোর ভিতর দিয়া পাওয়া প্রকৃষ্টরূপে পাইবার উপায়। আমরা যে মাঝে একবার আপনাকে হারাইয়াছিলাম, সে কেবল আপনাকে প্রবলভাবে, বৃহৎভা‘ব ফিরিয়া পাইবার জন্য। আধুনিক ভারতবর্ষ আপনার পল্লির প্রান্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল এককালে যাহা বৃহৎ ছিল তাহা সঙ্কীর্ণ, যাহা সমগ্র ছিল তাহা খণ্ডিত, যাহা সজীব ছিল তাহা জড়, যাহা জ্ঞানগত ছিল তাহা প্রথাগত, অভ্যাসগত হইয়া আসিয়াছিল। এইবার পশ্চিমের আঘাতে জাগিয়া-উঠিয়া ভারতবর্ষ কি একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ ধার করা জীবন আরম্ভ করিবে?—তাহা নহে। সে আপনাকে উজ্জ্বলভাবে, প্রবলভাবে ফিরিয়া পাইবে—যাহা বদ্ধ ছিল তাহাই মুক্তি পাইবে, যাহা স্তব্ধ ছিল তাহাই চারিদিকে আপন কাজে প্রবৃত্ত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙালির চিত্ত ঘরের মুখ লইয়াছে,—নানা দিক্ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল যে স্বদেশের শাস্ত্র আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে এবং স্বদে ... ’মরা গাড়ি সাহিত্যের দ্বারা অলঙ্কৃত ... তাহা নহে, স্বদেশের ... আম’ ’র কাছে আদর পাইতেছে, ...শের ইতিহাস আমাদের গবেষণাবৃত্তিকে জাগ্রত করিতেছে, রাজদ্বারে ভিক্ষাযাত্রার জন্য যে পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যহই একটু একটু ক... আমাদিগকে গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবারই সহায়তা করিতেছে। দেশে বিজ্ঞানশিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরা স্বদেশী লোকের কাছেই প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছি এবং সম্প্রতি বর্দ্ধমান প্রোভিন্শ্যাল্ কন্ফারেন্সের সভাপতি আমাদের সুদীর্ঘকালের পোলিটিক্যাল্ উদ্যমকে জাতীয় আত্মনির্ভরতাচর্চ্চায় খাটাইবার জন্য শ্রোতাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

এমন অবস্থায় দেশের কাজ প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। এখন কতকগুলি অদ্ভুত অসঙ্গতি আমাদের চোখে ঠেকিবে এবং তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। প্রোভিন্শ্যাল্ কন্ফারেন্স্ই তাহার একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। এ কন্ফারেন্স্ দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরাজিশিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি—আপামরসাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে-অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সা‌ধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি।

আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছলবলকৌশল-সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই ;-কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ কথা আমরা মনেও করি নাই ;—তাই আমাদের হাব-ভাববিলাসের চর্চ্চা সমস্তই পূরারকমে বিলাতিধরণের হইয়াছে। কিন্তু বিলাতের মন ত ভুলাইতে পারিলাম না—বারংবার ত মাথা হেঁট করিয়া ফিরিতে হইল। এখন এ সমস্ত মিথ্যা ছলাকলা ফেলিয়া-দিয়া একবার দেশের মনকে পাইবার জন্য দেশী প্রণালীতে চেষ্টা করিয়া দেখিব না কি ? কারণ, পোলিটিক্যাল্ সাধনার উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের হৃদয়ের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া, দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবল-মাত্র বিদেশীর হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল্ শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হৃদয়লাভকেই যদি চরমলাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্য্য-কলাপে যে সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যা-বশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, সে সমস্তকে দূরে রাখিয়া দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে কর, প্রোভিন্‌শ্যাল্ কন্‌ফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্য্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কি করিতাম ? তাহা হইলে আমরা বিলাতিধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশীধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রাগান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভাল কথক, কীর্ত্তনগায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক্-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে—তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলাভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লিবাসী। এই পল্লি মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎজগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লি আপনার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হয়,—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লির হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর—মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভা-বিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা

একত্র হয়, তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লিগুলি যেদিন হাললাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই, যেখানে নানাস্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাহার পরে এই সমস্ত মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথাযথভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিতসম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন,—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতিসম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশের নানাস্থানে মেলা করিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হন; তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা রচনা করিয়া, সঙ্গে বায়স্কোপ্, ম্যাজিক্লণ্ঠন্, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারদের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন—তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্য্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইঁহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদিব্যাপারে যাহাকিছু আমোদ-আহ্লাদ, সমস্তই কেবল সহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্ম্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না—সেস্থলে "ইতরে জনাঃ" মিষ্টান্নের উপায় জোগাইয়া থাকে, কিন্তু "মিষ্টান্নম্" "ইতরে জনাঃ" কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না—ভোগ করেন "বান্ধবাঃ"। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া

পড়িতেছে এবং যে সাহিত্যে দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণলোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলাসম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লিদ্বারে আর একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল বড় বড় জলাশয় আমাদিগকে জলদান, স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে, তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে—তেম্নি আমাদের দেশে যে সকল মেলা ধর্ম্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে, তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ্য এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে, ধর্ম্মের কাছে অপরাধী হইব।

এ কথা শুনিবামাত্র যেন আমাদের মধ্যে হঠাৎ একদল লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া না ওঠেন—এ কথা না বলিয়া বসেন যে, এই মেলাগুলির প্রতি গবর্মেণ্টের অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে—অতএব আমরা সভা করিয়া কাগজে লিখিয়া প্রবল বেগে গবর্মেণ্টের সাঁকো নাড়াইতে সুরু করিয়া দিই—মেলাগুলার মাথার উপরে দলবল-আইন-কানুন-সমেত পুলিস-কমিশনার ভাঙিয়া পড়ুক—সমস্ত একদমে পরিষ্কার হইয়া যাক্। ধৈর্য্য ধরিতে হইবে,—বিলম্ব হয়, বাধা পাই, সেও স্বীকার, কিন্তু এ সমস্ত আমাদের নিজের কাজ। চিরকাল ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ঘর নিকাইয়া আসিয়াছেন,—ম্যুনিসিপালিটির মজুর নয়। ম্যুনিসিপালিটির সরকারি ঝাঁটায় পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর সম্মার্জ্জনীতে পবিত্র করিয়া তোলে, এ কথা আমরা যেন না ভুলি।

আমাদের দিশী লোকের সঙ্গে দিশী ধারায় মিলিবার যে কি উপলক্ষ্য হইতে পারে, আমি তাহারি একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র—এবং এই উপলক্ষ্যটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া কি করিয়া যে একটা দেশব্যাপী মঙ্গলব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

এইখানে সবিনয়ে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি যে একটা নূতন-পন্থা-উদ্ভাবনকারী দলের মধ্যে একজন, এরূপ স্পর্দ্ধার লেশমাত্র আমার মনে নাই। জাহ্নবী অনেকটা পথ পূর্ব্বমুখে চলিয়া অবশেষে এক-সময়ে দক্ষিণগামিনী হইয়া সমুদ্রলাভ করিয়াছেন, এজন্য দক্ষিণের পথ অহঙ্কার করিবার অধিকারী নহে, বস্তুত তাহা পূর্ব্বপথেরই অনুবৃত্তিমাত্র। দেশ যখন একদা জাগ্রত হইয়া "কন্‌ষ্টিট্যুশনাল্ অ্যাজিটেশনে"র রেখা ধরিয়া রাজেশ্বরের দ্বারের মুখে ছুটিয়াছিল, তখন সমস্ত শিক্ষিতসমাজের বুদ্ধিবেগ তাহার মধ্যে ছিল। আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সেই স্রোতের পথ বাঁক লইবার উপক্রম করিতেছে। আশা করি, এজন্য যেন কোনো

ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ বাহাদুরি লইবার চেষ্টা না করেন। যাঁহারা সাধনাদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, ধীশক্তি দ্বারা ইংরাজশিক্ষিত সমাজের চিত্তকে স্বদেশের কার্য্যে চালিত করিয়াছেন,—স্বদেশের কার্য্যে একাগ্র করিবার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি ভক্তির সহিত নমস্কার করি। তাঁহারা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথে যাত্রা যে ব্যর্থ হইয়াছে, এ আমি কখনই বলিব না। তখন সমস্ত দেশের ঐক্যের মুখ রাজদ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন আমাদের হৃদয় নিজের মধ্যে সেই উপায়ে একটা বিপুল ঐক্যের আভাস উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যাহা বিচ্ছিন্ন ছিল তাহা ঐক্যের অমৃতকণার আস্বাদে যখন আপনার মধ্যে আপনার যথার্থ বল অনুভব করিতে পারিতেছে, তখন সে আপনার সমস্ত শক্তিকে রাজপুরদ্বারে ভিক্ষাকুণ্ডের মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এখন সে চিরন্তন সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে—এখন সে আত্মশক্তি-আত্মচেষ্টার পথে সার্থকতালাভের দিকে অনিবার্য্যবেগে চলিবে—কোনো একটা বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসাদলাভের দিকে নহে। এই যে পথের দিক্‌পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিতেছে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের কৃতকর্ম্ম নহে—যে চিত্তস্রোত প্রথমে একদিকে পথ লইয়াছিল, ইহা তাহারি কাজ—ইহা নূতন স্রোত নহে। যে অঙ্কুর প্রথম মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অজ্ঞাত আলোকের দিকে মাথা তুলিয়াছিল, পরবর্ত্তী শাখাপ্রশাখা যেন নিজেকে "ওরিজিন্যাল্" জ্ঞান করিয়া সেই অঙ্কুরকে সেকেলে বলিয়া উপহাস না করে।

গতবারে এ প্রবন্ধ যখন আমি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন আমার উক্ত কথাটি সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয় নাই। প্রতিবাদে এই কথা উঠিয়াছিল যে, দেশে নানা শক্তি নানালোককে, নানাদলকে আশ্রয় করিয়া কাজ করিবে, ইহাই দেশের স্বাস্থ্যের ও উন্নতির লক্ষণ। অতএব কেবলমাত্র সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না।

প্রবন্ধপাঠের শেষে এমন কথা যখন উঠিল, তখন বুঝিলাম, আমার সমস্ত প্রবন্ধই ব্যর্থ হইয়াছে। আমি এই কথাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বিলাতে যেমনই হৌক্, আমাদের দেশে সমাজ একটা ক্ষুদ্রব্যাপার নহে—যুদ্ধবিগ্রহ, কিয়ৎপরিমাণে পাহারার কাজ ও কিঞ্চিৎপরিমাণে বিচারের কাজ ছাড়া দেশের আর সমস্ত মঙ্গলকার্য্যই আমাদের সমাজ নিজের হাতে রাখিয়াছিল—ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। এইজন্য এই সমাজব্যবস্থার উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব—আমাদের সভ্যতা স্থাপিত, এবং এইজন্য এই সমাজকে আমরা চিরদিন সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ও সক্রিয় রাখিতে একান্ত সচেষ্ট ছিলাম। অতএব কে বলিল, সমাজের কাজ বলিতে কেবল একটিমাত্র কাজ বুঝাইতেছে?

আমি যদি বলি শরীরের সমস্ত কাজ শরীরেরই করা উচিত, তবে কি কেহ এই বলিবেন, আমি তাহার কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে বলিতেছি? শরীরের কাজ বিবিধ, শরীরের কর্ম্মস্থানও বিপুল, সে সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ নাই—কিন্তু শারীরিক ক্রিয়া শরীরের নিজের জিনিষ, এ কথা

চিরদিন ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। আমি যদি পরকে বলি তুমি আমার হইয়া হজম করিয়া দাও—এবং সেরূপ হজম করা যদি পরের দ্বারা সম্ভবপর হয়, তবে তাহাতে মঙ্গল নাই। ব্যবহারের অভাবে নিজের পাকস্থলীটিকে সম্পূর্ণ খোয়াইয়া পরাশ্রিত-শ্রেণীয় জীবের ন্যায় চিরকাল পরের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া দিব্য পরিপুষ্টভাবে চোখ বুজিয়া থাকাকে গৌরবের বিষয় বলা চলে না। ইংরাজের পাকস্থলী তাহার ষ্টেটের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু ষ্টেট্ তাহার সমাজের বহির্ভূক্ত নহে—ইংরাজ সর্ব্বদাই রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া ব্যাপৃত থাকে, কারণ রাজনীতি তাহার স্বকীয় কলেবরের মধ্যেই। আমরা তাহার নকল করিয়া পরের পাকস্থলীতে নিত্যই যদি আন্দোলন উপস্থিত করিতে যাই, তাহাতে কি আমাদের হজমের কোনো সহায়তা করিবে? যাহারা জাবর কাটে, তাহাদের হজম করিবার বিধি একরূপ; যাহারা জাবর কাটে না, তাহাদের হজম করিবার বিধি অন্যরূপ। জাবরকাটা হজম করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া যদি প্রমাণিত হয়, তথাপি তাহা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

যাঁহারা রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের পক্ষে মঙ্গলকর বলেন না, তাঁহাদিগকে অন্যপক্ষে "পেসিমিষ্ট্" অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা যতটা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ স্থূলভদ্রাক্ষাগুচ্ছলুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ "পেসিমিষ্ট্" আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ কথা আমি কোনোমতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হৌক্, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতালাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কি, আমাদিগকে চারিদিক্ হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধস্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থানির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরুপুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামি-প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত

ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ বাহাদুরি লইবার চেষ্টা না করেন। যাঁহারা সাধনাদ্বারা, তপস্যা দ্বারা, ধীশক্তি দ্বারা ইংরাজশিক্ষিত সমাজের চিত্তকে স্বদেশের কার্য্যে চালিত করিয়াছেন,—স্বদেশের কার্য্যে একাগ্র করিবার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি ভক্তির সহিত নমস্কার করি। তাঁহারা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথে যাত্রা যে ব্যর্থ হইয়াছে, এ আমি কখনই বলিব না। তখন সমস্ত দেশের ঐক্যের মুখ রাজদ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন আমাদের হৃদয় নিজের মধ্যে সেই উপায়ে একটা বিপুল ঐক্যের আভাস উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যাহা বিচ্ছিন্ন ছিল তাহা ঐক্যের অমৃতকণার আস্বাদে যখন আপনার মধ্যে আপনার যথার্থ বল অনুভব করিতে পারিতেছে, তখন সে আপনার সমস্ত শক্তিকে রাজপুরদ্বারে ভিক্ষাকুণ্ডের মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এখন সে চিরন্তন সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে—এখন সে আত্মশক্তি-আত্মচেষ্টার পথে সার্থকতালাভের দিকে অনিবার্য্যবেগে চলিবে—কোনো একটা বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসাদলাভের দিকে নহে। এই যে পথের দিক্‌পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিতেছে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের কৃতকর্ম্ম নহে—যে চিত্তস্রোত প্রথমে একদিকে পথ লইয়াছিল, ইহা তাহারি কাজ—ইহা নূতন স্রোত নহে। যে অঙ্কুর প্রথম মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অজ্ঞাত আলোকের দিকে মাথা তুলিয়াছিল, পরবর্ত্তী শাখাপ্রশাখা যেন নিজেকে "ওরিজিন্যাল্" জ্ঞান করিয়া সেই অঙ্কুরকে সেকেলে বলিয়া উপহাস না করে।

গতবারে এ প্রবন্ধ যখন আমি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন আমার উক্ত কথাটি সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয় নাই। প্রতিবাদে এই কথা উঠিয়াছিল যে, দেশে নানা শক্তি নানালোককে, নানাদলকে আশ্রয় করিয়া কাজ করিবে, ইহাই দেশের স্বাস্থ্যের ও উন্নতির লক্ষণ। অতএব কেবলমাত্র সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না।

প্রবন্ধপাঠের শেষে এমন কথা যখন উঠিল, তখন বুঝিলাম, আমার সমস্ত প্রবন্ধই ব্যর্থ হইয়াছে। আমি এই কথাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বিলাতে যেমনই হৌক্, আমাদের দেশে সমাজ একটা ক্ষুদ্রব্যাপার নহে—যুদ্ধবিগ্রহ, কিয়ৎপরিমাণে পাহারার কাজ ও কিঞ্চিৎপরিমাণে বিচারের কাজ ছাড়া দেশের আর সমস্ত মঙ্গলকার্য্যই আমাদের সমাজ নিজের হাতে রাখিয়াছিল—ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। এইজন্য এই সমাজব্যবস্থার উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব—আমাদের সভ্যতা স্থাপিত, এবং এইজন্য এই সমাজকে আমরা চিরদিন সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ও সক্রিয় রাখিতে একান্ত সচেষ্ট ছিলাম। অতএব কে বলিল, সমাজের কাজ বলিতে কেবল একটিমাত্র কাজ বুঝাইতেছে?

আমি যদি বলি শরীরের সমস্ত কাজ শরীরেরই করা উচিত, তবে কি কেহ এই বলিবেন, আমি তাহার কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে বলিতেছি? শরীরের কাজ বিবিধ, শরীরের কর্ম্মস্থানও বিপুল, সে সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ নাই—কিন্তু শারীরিক ক্রিয়া শরীরের নিজের জিনিষ, এ কথা

চিরদিন ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। আমি যদি পরকে বলি তুমি আমার হইয়া হজম করিয়া দাও—এবং সেরূপ হজম করা যদি পরের দ্বারা সম্ভবপর হয়, তবে তাহাতে মঙ্গল নাই। ব্যবহারের অভাবে নিজের পাকস্থলীটিকে সম্পূর্ণ খোয়াইয়া পরাশ্রিত-শ্রেণীয় জীবের ন্যায় চিরকাল পরের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া দিব্য পরিপুষ্ট ভাবে চোখ বুজিয়া থাকাকে গৌরবের বিষয় বলা চলে না। ইংরাজের পাকস্থলী তাহার ষ্টেটের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু ষ্টেট্ তাহার সমাজের বহির্ভূক্ত নহে—ইংরাজ সর্ব্বদাই রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া ব্যাপৃত থাকে, কারণ রাজনীতি তাহার স্বকীয় কলেবরের মধ্যেই। আমরা তাহার নকল করিয়া পরের পাকস্থলীতে নিয়তই যদি আন্দোলন উপস্থিত করিতে যাই, তাহাতে কি আমাদের হজমের কোনো সহায়তা করিবে? যাহারা জাবর কাটে, তাহাদের হজম করিবার বিধি একরূপ; যাহারা জাবর কাটে না, তাহাদের হজম করিবার বিধি অন্যরূপ। জাবরকাটা হজম করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া যদি প্রমাণিত হয়, তথাপি তাহা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

যাঁহারা রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের পক্ষে মঙ্গলকর বলেন না, তাঁহাদিগকে অন্যপক্ষে "পেসিমিষ্ট্" অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা যতটা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভদ্রাক্ষাগুচ্ছ-লুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ "পেসিমিষ্ট্" আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ কথা আমি কোনোমতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হৌক্, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতালাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কি, আমাদিগকে চারিদিক্ হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধস্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থানির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামি-প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত

নৈতিক সম্বন্ধ নহে এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুত্রস্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্য। আমরা যে কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এইজন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্য্য-সাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালমন্দ দুই দিক্‌ই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন কি তদপেক্ষাও বড়, ইহা প্রাচ্য।

জাপানযুদ্ধব্যাপার হইতে আমার এই কথার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হইবে। যুদ্ধব্যাপারটি একটা কলের জিনিষ, সন্দেহ নাই—সৈন্যদিগকে কলের মত হইয়া উঠিতে হয় এবং কলের মতই চলিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানের প্রত্যেক সৈন্য সেই কলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে;—তাহারা অন্ধ জড়বৎ নহে, রক্তোন্মাদগ্রস্ত পশুবৎও নহে; তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত এবং সেই সূত্রে স্বদেশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সেই সম্বন্ধের নিকট তাহারা প্রত্যেকে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে। এইরূপে আমাদের পুরাকালে প্রত্যেক ক্ষত্রসৈন্য আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মের কাছে আপনাকে নিবেদন করিত—রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্চখেলার দাবাবোড়ের মত মরিত না- মানুষের মত হৃদয়ের সম্বন্ধ লইয়া, ধর্ম্মের গৌরব লইয়া মরিত। ইহাতে যুদ্ধব্যাপার অনেক সময়েই বিরাট্‌ আত্মহত্যার মত হইয়া দাঁড়াইত—এবং এইরূপ কাণ্ডকে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন—"ইহা চমৎকার—কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে!" জাপান এই চমৎকারিত্বের সঙ্গে যুদ্ধকে মিশাইয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে ধন্য হইয়াছেন।

যাহা হউক্‌, এইরূপই আমাদের প্রকৃতি। প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ-দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবেই ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং অনাবশ্যক দায়িত্বও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। প্রয়োজনের সম্বন্ধ সঙ্কীর্ণ;—আপিসের মধ্যেই তাহার শেষ। প্রভুভৃত্যের মধ্যে যদি কেবল প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধটুকুই থাকে, তবে কাজ আদায় এবং বেতনদানের মধ্যেই সমস্ত চুকিয়া যায়. কিন্তু তাহার মধ্যে কোনো প্রকার আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই দায়িত্বকে পুত্রকন্যার বিবাহ এবং শ্রাদ্ধশান্তি পর্য্যন্ত টানিয়া-লইয়া যাইতে হয়।

আমার কথার আর-একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখুন্‌। আমি রাজশাহী ও ঢাকার প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। এই কন্‌ফারেন্স্‌-ব্যাপারকে আমরা একটা গুরুতর কাজের বলিয়া মনে করি, সন্দেহ নাই—কিন্তু আশ্চর্য্য এই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কাজের গরজের চেয়ে অতিথিসৎকারের ভাবটাই সুপরিস্ফুট। যেন বরযাত্রীর দল গিয়াছি—আহার-বিহার-আরাম-আমোদের জন্য দাবী ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত যে, তাহা আহ্বানকর্ত্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর। যদি তাঁহারা বলিতেন, তোমরা নিজের দেশের কাজ করিতে আসিয়াছ, আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই— এত চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়,

এত শয়নাসন, এত লেমনেড্-সোডাওয়াটার-গাড়িঘোড়া, এত রসদের দায় আমাদের 'পরে কেন -তবে কথাটা অন্যায় হইত না। কিন্তু কাজের দোহাই দিয়া ফাঁকায় থাকাটা আমাদের জাতের লোকের কর্ম্ম নয়। আমরা শিক্ষার চোটে যত ভয়ঙ্কর কেজো হইয়া উঠি না কেন, তবু আহ্বানকারীকে কাজের উপরে উঠিতে হইবে। কাজকেও আমরা হৃদয়ের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। বস্তুত কন্‌ফারেন্সে কেজো অংশ আমাদের চিত্তকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই,—আতিথ্য যেমন করিয়াছিল। কন্‌ফারেন্স্ তাহার বিলাতি অঙ্গ হইতে এই দেশী হৃদয়টুকুকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই। আহ্বানকারিগণ আহূতবর্গকে অতিথিভাবে, আত্মীয়ভাবে সংবর্দ্ধনা করাকে আপনাদের দায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম, কষ্ট, অর্থব্যয় যে কি পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যে অংশ আতিথ্য, সেই অংশই ভারতবর্ষীয় এবং সেই অংশই দেশের মধ্যে পুরা কাজ করে —যে অংশ কেজো, তিনদিন-মাত্র তাহার কাজ, বাকি বৎসরটা তাহার সাড়াই পাওয়া যায় না। অতিথির প্রতি যে সেবার সম্বন্ধ বিশেষরূপে ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে বৃহৎভাবে অনুশীলনের উপলক্ষ্য ঘটিলে ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ আনন্দের কারণ হয়। যে আতিথ্য গৃহে গৃহে আচরিত হয়, তাহাকে বৃহৎ-পরিতৃপ্তি দিবার জন্য পুরাকালে বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠান হইত—এখন বহুদিন হইতে সে সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা ভোলে নাই বলিয়া যেই দেশের কাজের একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া জনসমাগম হইল, অমনি ভারতলক্ষ্মী তাঁহার বহুদিনের অব্যবহৃত পুরাতন সাধারণ-অতিথিশালার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন, তাঁহার যজ্ঞভাণ্ডারের মাঝখানে তাঁহার চিরদিনের আসনটি গ্রহণ করিলেন। এম্‌নি করিয়া কন্‌গ্রেস্ কন্‌ফারেন্সের মাঝখানে খুব যখন বিলাতী বক্তৃতার ধুম ও চট্‌পটা করতালি—সেখানেও, সেই ঘোরতর সভাস্থলেও আমাদের যিনি মাতা, তিনি স্মিতমুখে তাঁহার একটুখানি ঘরের সামগ্রী, তাঁহার স্বহস্তরচিত একটুখানি মিষ্টান্ন, সকলকে ভাগিয়া, বাটিয়া, খাওয়াইয়া চলিয়া যান, আর যে কি করা হইতেছে, তাহা তিনি ভাল বুঝিতেই পারেন না। মা'র মুখের হাসি আরো একটুখানি ফুটিত,—যদি তিনি দেখিতেন, পুরাতন যজ্ঞের ন্যায় এই সকল আধুনিক যজ্ঞে কেবল বইপড়া লোক নয়, কেবল খাতিরের দাবী লোক নয় আহূত-অনাহূত আপামরসাধারণ সকলেই অবাধে এক হইয়াছে। সে অবস্থায় সংখ্যায় ভোজ্য কম হইত, আড়ম্বরেও কম পড়িত—কিন্তু আনন্দে-মঙ্গলে ও মাতার আশীর্ব্বাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

যাহাই হউক, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানব সম্বন্ধের মাধুর্য্যটুকু ভুলিতে পারে না। সেই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে।

আমরা এই সমস্ত বহুতর অনাবশ্যক দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে-পরে, উচ্চে-নীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই এ দেশে টোল, পাঠশালা, জলাশয়, অতিথিশালা, দেবালয়, অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান, জলদান, আশ্রয়দান, স্বাস্থ্যদান, বিদ্যাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্ত্তব্য ছিন্নসমাজ হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্রসম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

এই উচ্চভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যাহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব? প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এক পয়সা বা তদপেক্ষা অল্প—একমুষ্টি বা অর্দ্ধমুষ্টি তণ্ডুলও স্বদেশবলিস্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? হিন্দুধর্ম্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই—এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্যার আশ্রম, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষসম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না? স্বদেশের সহিত আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ,—সে কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হইবে না? আমরা কি স্বদেশকে, জলদান-বিদ্যাদান প্রভৃতি মঙ্গলকর্ম্মগুলিকে পরের হাতে বিদায়দান করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা, চিন্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব? গবর্মেণ্ট আজ বাংলাদেশের জলকষ্টনিবারণের জন্য পঞ্চাশহাজার টাকা দিতেছেন—মনে করুন, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশলক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশে জলের কষ্ট একেবারেই রহিল না—তাহার ফল কি হইল? তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তালাভ-কল্যাণলাভের সূত্রে, দেশের যে হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকারই পাইবে, সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি—কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেণ্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে? এইজন্যই কি আমরা সভা করি, দরখাস্ত করি, ও এইরূপে দেশকে অন্তরে-বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশহিতৈষিতা? ইহা কদাচই হইতে পারে না!

ইহা কখনই চিরদিন এদেশে প্রশ্রয় পাইবে না —কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম নহে ! আমরা আমাদের অতি দূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই—তাহাদিগকেও নিজের সন্তানদের সহিত সমান স্থান দিয়াছি ; আমাদের বহুকষ্ট অর্জ্জিত অন্নও বহুদূর কুটুম্বদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াকে আমরা একদিনের জন্যও অসামান্য ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করি নাই—আর আমরা বলিব, আমাদের জননী জন্মভূমির ভার আমরা বহন করিতে পারিব না ? বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্ত্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মত না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব ? কদাচ নহে—কদাচ নহে ! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকে এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম্ম । এইবার সময় আসিয়াছে,—যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে । সময় আসিয়াছে,—যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি ,—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না !

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধদ্বারা খুব বড় জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না । একটা ছোট পল্লিকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি—কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়—দেশকে আমরা কখনই পল্লির মত করিয়া দেখিতে পারি না —এইজন্য অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না—কলের সাহায্যে করিতে হয় । এই কল-জিনিষটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানাঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইন কানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না ।

কথাটা অসঙ্গত নহে । কল পাতিতেই হইবে । এবং কলের নিয়ম যে-দেশীই হোক্ না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে । এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না —যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না । ইহাকে ভালই বল আর মন্দই বল, গালিই দাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য । অতএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতালাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিতেই হইবে ।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই । এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন । তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব । তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে ।

পূর্ব্বে যখন রাষ্ট্র সমাজের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তখন রাজারই এই পদ ছিল । এখন রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে । সুতরাং দীর্ঘকাল

হইতে বাধা হইয়া পল্লিসমাজই খণ্ডখণ্ডভাবে আপনার কাজ আপনি সম্পন্ন করিয়াছে স্বদেশী সমাজ তেমন ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের কর্ত্তব্য পালিত হইয়াছে বটে এবং হইয়াছে বলিয়াই আজো আমাদের মনুষ্যত্ব আছে—কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র হওয়াতে আমাদের চরিত্রে সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে। সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণতার মধ্যে চিরদিন বদ্ধ হইয়া থাকা স্বাস্থ্যকর নহে, এইজন্য, যাহা ভাঙিয়াছে, তাহার জন্য আমরা শোক করিব না—যাহা গড়িতে হইবে, তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ করিব। আজকাল জড়ভাবে, যথেচ্ছাক্রমে, দায়ে পড়িয়া, যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে, তাহাই ঘটিতে দেওয়া কখনই আমাদের শ্রেয়স্কর হইতে পারে না।

এক্ষণে, আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনিই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে। আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ কর, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কি করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে! অধিকাংশ লোকই আপনার কর্ত্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দ্দিষ্টপথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজে কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কায় তাহা যদি-বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ—আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না—শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যতশক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া সর্ব্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা—সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা—তাঁহার সম্পূর্ণশাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভাল, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না।

আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষস্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইঁহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবে। সমাজের সমস্ত-অভাব-মোচন, মঙ্গলকর্ম্ম-চালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইঁহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্ম্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশীসমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড় বড় মঠ-মন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছা-পূর্ব্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে জলে-স্বাস্থ্যে-বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশ কেই আমার চোখের সাম্‌নে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্ত্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম একস্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে—কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

কি করিয়া কলের সহিত হৃদয়ের সামঞ্জস্য-বিধান করিতে হয়, কি করিয়া রাজার সহিত স্বদেশের সংযোগসাধন করিতে হয়, জাপান তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। সেই দৃষ্টান্ত মনে রাখিলে আমাদের স্বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্য একইকালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্তৃত্বসমন্বয় করিতে পারিব আমরা স্বদেশকে একটি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশীসমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষস্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষস্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষস্থান হইতে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে, একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গবর্মেণ্ট নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হৌক্, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সেই ভয় প্রকাশ করিয়া আমরা কান্নাকাটি যথেষ্ট করিয়াছি। কিন্তু যদি এই কান্নাকাটি বৃথা হয়, তবে কি সমস্ত চুকিয়া গেল? দেশকে খণ্ডিত করিলে যে সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দেশের

মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভাল—কিন্তু তবু যদি প্রবেশ করিয়া বসে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার, স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্ত্তৃশক্তি কি থাকিবে না? সেই কর্ত্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে সুদৃঢ় সুস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে আঘাত করিয়া বাংলাকে নির্জ্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্চ্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম্ম হইবে। আজকাল বিদেশী রাজপুরুষ সৎকর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ আমাদিগকে উপাধি-বিতরণ করিয়া থাকেন কিন্তু সৎকর্ম্মের সাধুবাদ ও আশীর্ব্বাদ আমরা স্বদেশের কাছ হইতে পাইলেই যথার্থভাবে ধন্য হইতে পারি। স্বদেশের হইয়া পুরস্কৃত করিবার শক্তি আমরা নিজের সমাজের মধ্যে যদি বিশেষভাবে স্থাপিত না করি, তবে চিরদিনের মত আপনাদিগকে এই একটি বিশেষ সার্থকতাদান হইতে বঞ্চিত করিব। আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া-দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তি-স্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্ত্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারে-বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয় ত সাধারণভাবে আমার এ কথা স্বীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন—নির্ব্বাচন করিব কি করিয়া, সবাই নির্ব্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে ত সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্ব্বক বিচারবিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনোকালে কাজে নাবা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত,—দেশের কোনো লোক বা কোনো দল যাঁহার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া-লইয়া লোককে নির্ব্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে—যেমন করিয়া হৌক্, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিদিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা। যদি সমাজপতি-নিয়োগের প্রস্তাব সময়োচিত হয়, যদি রাজা সমাজের অন্তর্গত না হওয়াতে সমাজে অধিনায়কের যথার্থ অভাব ঘটিয়া থাকে, যদি পরজাতির সংঘর্ষে আমরা প্রত্যহ অধিকারচ্যুত হইতেছি বলিয়া সমাজ নিজেকে বাঁধিয়া-তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইচ্ছুক হয়, তবে কোনো একটি যোগ্যলোককে

ইয়া তাঁহার অধীনে একদল লোক যে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে—পূর্ব্বে হইতে হিসাব করিয়া, কল্পনা করিয়া আমরা যাহা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব—সমাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান্ ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে। যে শক্তি আপাতত যোগ্যলোকের অভাবে কাজে লাগিল না, সে শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে সে সমাজ ফুটা-কলসের মত শূন্য হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি সকল সময়ে যোগ্যলোক না হইলেও, সমাজের শক্তি- সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্ব্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্য্যবলে আপনাকে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে। আমরা ক্ষুদ্র দোকানীর মত সমস্ত লাভলোকসানের হিসাব হাতে হাতে দেখিতে চাই—কিন্তু বড় ব্যাপারের হিসাব তেমন করিয়া মেলে না। দেশে একএকটা বড়দিন আসে, সেইদিন বড়লোকের তলবে দেশের সমস্ত শালতামামি নিকাস বড়খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময়ে একবার বৌদ্ধসমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল। আপাতত আমাদের কাজ—দপ্তর তৈরি রাখা, কাজ চালাইতে থাকা; যেদিন মহাপুরুষ হিসাব তলব করিবেন, সেদিন অপ্রস্তুত হইয়া শির নত করিব না—দেখাইতে পারিব, জমার ঘরে একেবারে শূন্য নাই।

সমাজের সকলের চেয়ে যাঁহাকে বড় করিব, এত বড় লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার সকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়, তাহা নহে। কিন্তু রাজ্যই রাজাকে বড় করে। জাপানের মিকাডো জাপানের সমস্ত সুধী, সমস্ত সাধক, সমস্ত শূরবীরদের দ্বারাই বড়। আমাদের সমাজপতিও সমাজের মহত্ত্বেই মহৎ হইতে থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড় লোকই তাঁহাকে বড় করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে—মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি, আমার এই প্রস্তাব যদি-বা অনেকে অনুকূলভাবেও গ্রহণ করেন, তথাপি ইহা অবাধে কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না। এমন কি, প্রস্তাবকারীর অযোগ্যতা ও অন্যান্য বহুবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক দোষ, ত্রুটি ও স্খলন সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট স্পষ্ট কথা এবং অনেক অস্পষ্ট আভাস আজ হইতে প্রচার হইতে থাকা আশ্চর্য্য নহে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। অদ্যকার সভামধ্যে আমি আত্মপ্রচার করিতে আসি নাই, এ কথা বলিলেও পাছে অহঙ্কার প্রকাশ করা হয়, এজন্য আমি কুণ্ঠিত আছি। আমি অদ্য

যাহা বলিতেছি, আমার সমস্ত দেশ আমাকে তাহা বলাইতে উদ্যত করিয়াছে। তাহা আমার কথা নহে—তাহা আমার সৃষ্টি নহে, তাহা আমাকর্তৃক উচ্চারিতমাত্র। আপনারা এ শঙ্কামাত্র করিবেন না, আমি আমার অধিকার ও যোগ্যতার সীমা বিস্মৃত হইয়া স্বদেশীসমাজগঠনকার্য্যে নিজেকে অত্যুগ্রভাবে খাড়া করিয়া তুলিব। আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব—আসুন্, আমরা মনকে প্রস্তুত করি,—ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া অদ্য মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে চিত্তকে উদার করিয়া, কর্ম্মের প্রতি অনুকূল করিয়া, সর্ব্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতিসূক্ষ্ম যুক্তিবাদের তন্তুজালকে সবেগে আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং নিগূঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শতসহস্র রক্ততৃষার্ত্ত শিকড়সমেত হৃদয়ের অন্ধকার-গুহাতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শূন্য আসনে বিনম্রবিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি—শুভক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহকক্ষে মঙ্গলপ্রদীপটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি—শঙ্খ বাজিয়া উঠুক, ধূপের পবিত্রগন্ধ উদ্গত হইতে থাক্‌, দেবতার অনিমেষ কল্যাণদৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেশ আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক বলিয়া একবার অনুভব করুক্‌!

এই অভিষেকের পরে সমাজপতি কাহাকে তাঁহার চারিদিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন, কি ভাবে সমাজের কার্য্যে ক প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা আমার বলিবার ম নহে। নিঃসন্দেহ, যেরূপ ব্যবস্থা আমাদের চিরন্তন সমাজপ্রকৃতির অনুগত, তাহাই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে—স্বদেশের পুরাতন প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি নূতনকে যথাস্থানে যথাযোগ্য আসনদান করিবেন। আমাদের দেশে তিনি লোকবিশেষ ও দলবিশেষের হাত হইতে সর্ব্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও অপবাদ সহ্য করিবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু মহৎ পদ আরামের স্থান নহে—সমস্ত কলরবকোলাহলের মধ্যে আপনার গৌরবে তাঁহাকে দৃঢ়গম্ভীরভাবে অবিচলিত থাকিতে হইবে। কাল যদি তাঁহার অভিষেক হয়, তবে তাহার পরদিন হইতেই আমরা অনেকেই অবোধ বালকের ন্যায় ক্রমাগত প্রশ্ন তুলিতে থাকিব—কি করা হইল, এ কাজগুলা শেষ হইল না কেন, এবার বৈশাখে বারো-আনা আম ঝড়ে পড়িয়া গেল কেন, আমার প্রতিবেশীর ভাগিনেয় 'গুণনিধি' উপাধি পাইল, আর আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কি অপরাধ করিয়াছে? কোনো অনাবশ্যক কৈফিয়তের চেষ্টা না করিয়া এই সমস্ত প্রশ্নবৃষ্টি তাঁহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইবে।

অতএব যাঁহাকে আমরা সমাজের সর্ব্বোচ্চ সম্মানের দ্বারা বরণ করিব, তাঁহাকে একদিনের জন্যও আমরা সুখস্বচ্ছন্দতার আশা দিতে পারিব না। আমাদের যে উদ্ধত নব্যসমাজ কাহাকেও হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সম্মত না হইয়া নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতেছে, সেই সমাজের

সূচিমুখ-কণ্টক-খচিত ঈর্ষাসন্তপ্ত আসনে যাঁহাকে আসীন হইতে হইবে, বিধাতা যেন তাঁহাকে প্রচুরপরিমাণে বল ও সহিষ্ণুতা প্রদান করেন—তিনি যেন নিজের অন্তঃকরণের মধ্যেই শান্তি ও কর্ম্মের মধ্যেই পুরস্কার লাভ করিতে পারেন।

এইস্থলে, বর্ত্তমানে কে আমাদের সমাজপতি হইবার উপযুক্ত, তাঁহাদের একজনেরও নাম যদি না করি, তবে আমার পক্ষে অত্যন্ত ভীরুতা প্রকাশ পাইবে। শুদ্ধ তাহাই নহে, নাম করিলে আমার প্রস্তাবটি আরো, সকলের কাছে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। অতএব এই ক্ষণে—এই স্থানেই তাঁহার নামোল্লেখ করিবার জন্যও আমি প্রস্তুত হইতেছি।

যিনি একদিকে আচার ও নিষ্ঠাদ্বারা হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপরদিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী; একদিকে কঠোর দারিদ্র্য যাঁহার অপরিচিত নহে, অন্যদিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ; যাঁহাকে দেশের লোক যেমন সম্মান করে, বিদেশী রাজপুরুষেরা তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে;—যিনি কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন, অথচ যিনি আত্মমতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই; নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার যাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত; নানা বিরোধী পক্ষের বিরোধসমন্বয় যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; যিনি সুযোগ্যতার সহিত রাজার ও প্রকৃতিসাধারণের সম্মাননীয় কর্ম্মভার সমাধা করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐশ্বর্য্যবান্ অক্ষুব্ধ অবসর লাভ করিয়াছেন; সেই স্বদেশবিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেই ধনসম্পদের মধ্যেও অবিচলিত, তপোনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এইখানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিবেন, কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি। বুঝিতে পারিবেন, নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার, মতামত, আচারবিচার লইয়া আমি লেশমাত্র আপত্তি তুলিতে চাহি না—আমি আমার সমস্ত দেশের অভাব, দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া নম্রভাবে নমস্কারের সহিত সমাজের শূন্য রাজভবনে এই দ্বিজোত্তমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি। আপনারা সকলেও সমস্ত ক্ষুদ্রতক ও কর্ম্মহানিকর দ্বিধা, সমস্ত ব্যক্তিগত, সংস্কারগত পক্ষপাতিত্ব পরিহার করিয়া অদ্য সমস্বরে আমার সমর্থন করুন, অধিনায়ককে স্বেচ্ছাক্রমে বরণ করিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন করুন, এবং অদ্য হইতে ভিক্ষার ঝুলি-কাঁথা সমস্ত ছাই করিয়া পুড়াইয়া দেশের কার্য্যে দেশকে যথার্থভাবে প্রবৃত্ত করুন্!

নিজের শক্তিকে আপনারা অবিশ্বাস করিবেন না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন—সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন—ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূলব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে; তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাসস্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখন এই মুহূর্ত্তেই ধীরে ধীরে

নূতনকালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি—জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি!

বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নূতন নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্য্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্য্যগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্য্যেরা আদিম অষ্ট্রেলিয়ান্ বা আমেরিকগণের মত উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্য্য উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না; তাহারা আপনাদের আচারবিচারের সমস্ত পার্থক্যসত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্য্যসমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর একবার সুদীর্ঘকাল বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাবের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পরদেশীয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংস্রবের চেয়ে এই মিলনের সংস্রব আরো গুরুতর। বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে—মিলনের অসতর্ক অবস্থায় অতি সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই এশিয়াব্যাপী ধর্ম্মপ্লাবনের সময় ভারতবর্ষে নানাজাতির আচারব্যবহার ক্রিয়াকর্ম্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিন্তু এই অতিবৃহৎ-উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থাস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং যাহা-কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ সুবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল। পূর্ব্বাপেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্ব্বত্রই সে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। আজ অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, নানা স্বতোবিরোধ-আত্মখণ্ডনসঙ্কুল এই হিন্দুধর্ম্মের, এই হিন্দুসমাজের ঐক্যটা কোন্‌খানে? সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। সুবৃহৎ পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়াও তেম্‌নি কঠিন—কিন্তু কেন্দ্র তাহার আছেই। ছোট গোলকের গোলত্ব বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু গোল পৃথিবীকে যাহারা খণ্ডখণ্ড করিয়া দেখে, তাহারা ইহাকে চ্যাপ্টা বলিয়াই অনুভব করে। তেম্‌নি হিন্দুসমাজ নানা পরস্পর-অসঙ্গত বৈচিত্র্যকে এক করিয়া লওয়াতে তাহার ঐক্যসূত্র নিগূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এই ঐক্য অঙ্গুলির দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইহা সমস্ত আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে যে আছে, তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পরে এই ভারতবর্ষেই মুসলমানের সংঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তখন হিন্দুসমাজে এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জস্যসাধনের প্রক্রিয়া সর্ব্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানসমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল, যেখানে উভয়

সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী, কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানাস্থানে ধর্ম্ম ও আচার লইয়া যে সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে, শিক্ষিতসম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন ত দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্যসাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।

সম্প্রতি আর-এক প্রবল বিদেশী আর-এক ধর্ম্ম, আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবাতে যে চারি প্রধান ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎসমাজ আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান,- তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মিলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড় রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধপ্রাদুর্ভাবের সময় সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্য্যস্ততা ঘটিয়াছিল, তাহাতে পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভয়ের লক্ষণ রাহয়া গে[illegible] তনত্ব ও পরিবর্ত্তনমাত্রেরই প্রতি সমাজের একটা নিরতিশয় সন্দেহ একেবারে মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ চিরস্থায়ী আতঙ্কের অবস্থায় সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যে সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার দিকেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সহজে চলাফেরার ব্যবস্থা সে আর করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা, আঘাতের আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও প্রত্যেক সমাজকে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতির বন্দোবস্তও রাখিতে হয়। নহিলে তাহাকে পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়—তাহা একপ্রকার জীবন্মৃত্যু।

বৌদ্ধপরবর্ত্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা-কিছু আছে ও ছিল, তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎপদ হারাইতে হইয়াছে এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত সকলদিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল, তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে;—আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্রযাত্রা আমরা সকল দিক্ দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র। আমরা ছিলাম বিশ্বের [illegible] দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যে ভীরু স্ত্রীশক্তি আছে, সেই শক্তিই, কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ স্ত্রৈণপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া

পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা-কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া-উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলঙ্কারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ্ জ্ঞান করিতেছে, তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোওয়া যাইতেছে, তাহা খোওয়াই যাইতেছে।

বস্তুত এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বরত্ব কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদ্‌রূপে ছিল না—তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই—তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার—অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্ম্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যখন হইতে আচারপালনমাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল—যখন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র অর্থাৎ অনার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না,—সমাজকে নব নব তপস্যার ফল, নব নব ঐশ্বর্য্যবিতরণের ভার যে ব্রাহ্মণের ছিল, সেই ব্রাহ্মণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের দ্বারদেশে নামিয়া-আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভারগ্রহণ করিল—তখন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল, তাহাকেও অকর্ম্মণ্য ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কি উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সে বিরাট্‌মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় কেবল ভারস্বরূপে বিরাজ করে। বস্তুত কেবল টিঁকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বারবাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্ব্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্ম্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্ত্তিত্বের চেয়ে বড়।

সে॰ ... ৱব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁটুলি-পাঁটুলা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরাজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্রবেড়া অনেকস্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়্‌মুড়্ করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায়

কাহার সাধ্য! এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিষ আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কি আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কি আশ্চর্য্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরাজ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্বত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল "গেল গেল" বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা, তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরাজ হইতে পারিব না, নকল ইংরাজ হইয়াও আমরা ইংরাজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা, তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশে তাপসেরা তপস্যাদ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হৌক্, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি, তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে,—লজ্জা দূর হইবে,—ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে, তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞা-

যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মত গ্রহণ করিব, তাহা নহে, -ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। আমাদের ভারতের মনীষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও জন্তুতত্ত্বের ক্ষেত্রকে একসীমানার মধ্যে আনিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন—মনস্তত্ত্বকেও যে তিনি কোনো-একদিন ইহাদের এক কোঠায় আনিয়া দাঁড় করাইবেন না, তাহা বলিতে পারি না। এই ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট্‌ একের মধ্যে সকলেরই স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসঙ্কুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

সেই সুমহৎ দিন আসিবার পূর্ব্বে—"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!" যে একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্য নিরন্ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন —মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান করিয়া দিবার জন্ত প্রাণপণ চীৎকার না করিয়া দেশের মধ্যস্থলে সন্তান পরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর! আমরা কি এই জননীর জীর্ণগৃহ সংস্কার করিতে পারিব না? পাছে সাহেবের বাড়ীর বিল্ চুকাইয়া উঠিতে না পারি, পাছে আমাদের সাজসজ্জা-আস্‌বাব্-আড়ম্বরে কম্‌তি পড়ে, এইজন্যই, আমাদের যে মাতা একদিন অন্নপূর্ণা ছিলেন, পরের পাকশালার দ্বারে তাঁহারি অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে? আমাদের দেশ ত একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত,—একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল—আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্ম্মকে অপমানিত করিব? আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া ত কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেষণ করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম, কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল, তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে?—কখনই নহে! নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ডপ্রভাব ধীরভাবে, নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের দুই-

চারিদিকের এই ইস্কুলের মুখস্থবিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের বক্ষঃ-কুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে, সেইখানে, আমাদের গৃহযাত্রা-বাস্তুর অভিমুখে দাঁড়াইয়া "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!" একবার স্বীকার কর, মাতার সেবা স্বহস্তে করিবার জন্য অদ্য আমরা প্রস্তুত হইলাম, একবার স্বীকার কর যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা কর, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া-দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকাল-কুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।

নৌকাডুবি।

৪২

পরদিন হেমনলিনী প্রত্যূষে উঠিয়া যখন প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল, তখন দেখিল, অন্নদাবাবু তাঁহার শোবার ঘরের জানলার কাছে একটা ক্যাম্বিশের কেদারা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ঘরে আস্‌বাব্ অধিক নাই। একটি খাট আছে, এক কোণে একটি আল্‌মারি—একটি দেয়ালে অন্নদাবাবুর পরলোকগতা স্ত্রীর একটি ছায়াপ্রায় বিলীয়মান বাঁধানো ফোটোগ্রাফ্—এবং তাহারি সম্মুখের দেয়ালে সেই তাঁহার পত্নীর স্বহস্তরচিত একখণ্ড পশমের কারুকার্য্য। স্ত্রীর জীবদ্দশায় আল্‌মারিতে যে সমস্ত টুকিটাকি সৌখীন জিনিষ যেমন-ভাবে সজ্জিত ছিল, আজো তাহারা তেম্‌নি রহিয়াছে।

হেমনলিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—"বাবা, আজ এমন চুপ করিয়া বসিয়া আছ যে! বেড়াতে যাও নাই কেন?"

অন্নদাবাবু ধরাপড়া অপরাধীর ন্যায় অপ্রস্তুতভাবে কহিলেন, "আজকাল হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—কার্ত্তিকমাসের হিমটা লাগানো ভাল কি না, তাই ভাবিতেছি!"

কতকাল হইতে অন্নদাবাবু প্রতিদিন সকালবেলায় নিয়মিত বেড়াইয়া আসিতেছেন, হিমে-বৃষ্টিতে কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। তিনি বলিতেন, "সাধনা না করিলে ভাল জিনিষ মেলে না—যাহারা সকালবেলায় খুব একচক্র বেড়াইয়া না আসে, তাহারা চায়ের পেয়ালার ঠিক মর্য্যাদাটি বোঝে না।" লোককে পিল্ খাওয়ানো সম্বন্ধে তাঁহার যেমন আগ্রহ দেখা গেছে—সকালবেলার ভ্রমণের উপদেশ

দেহের সম্বন্ধেও তাহার সংকল্প অশ্রান্ত উৎসাহ ছিল। সেই অন্নদাবাবু আজ কার্ত্তিকমাসের হিমের ওজর করিলে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া উঠে।

হেমন্তকালের প্রভাতের আলোকে এই বিষণ্ণমুখ বৃদ্ধকে তাঁহার নিজের শয়নঘরের বাতায়নে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আজ হঠাৎ অন্নদাবাবুর জীবনের শূন্যতা হেমনলিনীর কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সন্তানেরা স্বভাবতই আপনাদের নবীন জীবনের সুখদুঃখ লইয়াই থাকে, এই বৃদ্ধের কাছে যেদিন সংসার বিমর্ষ-বিকল হইয়া দেখা দেয়, সেদিন হৃদয় অবারিত করিবার জন্য তাহার পার্শ্বে কেহই নাই, কেবল যে কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া গেছে, যে হস্তের স্পর্শ তাহার সমস্ত সান্ত্বনা-সম্পদ্ লইয়া কোন্ লোকান্তরে অন্তর্হিত—সেই কণ্ঠের নির্ব্বাক স্মৃতি, সেই স্পর্শের বিরহানুভূতি পুরাতন গৃহদ্বারের চিরপরিচিত শয্যাসনকে পরিপূর্ণ করিয়া জাগিয়া উঠে, ইহা কে জানিতে পায়।

যে ছেলে তাহার বিছানার প্রান্তে শান্ত-ধৈর্য্যের সঙ্গে আপন রোগের বেদনা সহ্য করিতেছে, তাহাকে দেখিলে মায়ের প্রাণ যেমন করিয়া উঠে, আজ স্তব্ধভাবে আসীন অন্নদাবাবুকে দেখিয়া হেমনলিনীর প্রাণ তেমনি করিয়া উঠিল। তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পাকাচুল বাছিবার ছলে মাথায় কোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করিয়া হেম বলিল—"বাবা, চল না, আমরা দুজনে ছাদে বেড়াইতে যাই!"

দুইজনে ছাদে গেলেন। তখন আকাশের লঘু শিশিরবাষ্প নবপ্রভাতের আবির্ভাবকে আর গোপন করিতে পারিতেছে না, আবরণ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে। হঠাৎ চোখের সম্মুখে মাথার উপরে এই শুভ্রের সহিত স্বর্ণের দীপ্যমান সম্মিলন দেখিয়া অন্নদাবাবু মুহূর্ত্তকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, একবার চোখ বুজিলেন এবং ধীরে ধীরে নমস্কার করিলেন। পরক্ষণে হেমনলিনীর মাথার উপরে হাত রাখিয়া কহিলেন "মা, প্রতিদিন যাহা বহন করিয়া আনিতেছে, তাহা সুন্দরভাবে, শান্তভাবে শিরোধার্য্য করিয়া লইব।'

হেমনলিনী দৃঢ়স্বরে কহিল, "বাবা, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদের সহিত যাহা আদেশ করিবে, তাহা আমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিব। তুমি আমাকে কিছু বল না কেন বাবা? তুমি আমাকে দুর্ব্বল মনে করিয়ো না। আমি স্বভাবত চুপচাপ করিয়া থাকি, ভাল করিয়া কিছু বলিতে পারি না, সেইজন্য ভাবিয়ো না যে, আমি কেবল অসুখী হইয়াই আছি। তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই পালন করিতে পারিলে আমি ভাল থাকি। আমাকে নিজের খেয়ালে ফেলিয়া রাখিয়ো না—আমাকে আদেশ কর!"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"মা, আদেশ করা কি খুব সহজ কাজ মনে করিস্? সংসারে ক'টা লোক তাহা পারে! আমার মত দুর্ব্বলমানুষ কাহাকেও চালনা করিবার জন্য হয় নাই, সে আমি নিশ্চয় জানি।"

দুর্ব্বলতার জন্য অন্নদাকে কতবার কত লোকের কাছে প্রতারিত হইতে হইয়াছে, এবং সেজন্য হেমনলিনীর মার কাছ হইতে

তিনি কত ভর্ৎসনা ও উপদেশ পাইয়াছেন, তাহা গল্প করিতে লাগিলেন। হেমনলিনীর মা যে কিরূপ শান্ত অথচ দৃঢ় ছিলেন, তিনি যে কিরূপ লোক চিনিতেন, সংসারবুদ্ধি যে অন্নদার চেয়ে তাঁহার কত বেশি ছিল, বৃদ্ধ তাহারই নানা দৃষ্টান্ত দিতে লাগিলেন।

এ সব কথা হেমনলিনীর কাছে ইতিপূর্ব্বে কখনো হয় নাই—এরূপ সব কথা যাহার কাছে মন খুলিয়া বলিতে পারেন এমন লোকও অন্নদার কেহ ছিল না। আজ দুঃখের আঘাতে পিতা ও কন্যার মধ্যে একটা যেন ব্যবধান ছিন্ন হইয়া গেছে—বেদনার টানে পরস্পর যেন খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বদিগন্তের সৌধশিখরশ্রেণীর উপরে সূর্য্য রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। হেমনলিনী কহিল, "বাবা, চল, আজ সকাল সকাল চা খাইয়া লইবে। তার পরে তোমার ঘরে বসিয়া তোমার সেকালের গল্প শুনিব এ সব কথা আমার কত ভাল লাগে, বলিতে পারি না।"

হেমনলিনীসম্বন্ধে অন্নদাবাবুর বোধশক্তি আজকাল এমনি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে যে, এই চা খাইতে তাড়া দিবার কারণ বুঝিতে তাঁহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। আর কিছু পরেই অক্ষয় চায়ের টেবিলে আসিয়া উপস্থিত হইবে—তাহারি সঙ্গ এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি চা খাওয়া সারিয়া-লইয়া হেম পিতার কক্ষে নিভৃতে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহা তিনি মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন। ব্যাধভয়ে ভীত হরিণীর মত তাঁহার কন্যা যে সর্ব্বদা ত্রস্ত হইয়া আছে, ইহা তাঁহার মনে অত্যন্ত বাজিল।

নীচে গিয়া দেখিলেন, চাকর এখনো চায়ের জল তৈরি করে নাই। তাহার উপরে হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন—সে বৃথা বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, আজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই চায়ের তলব হইয়াছে। "চাকরের দল বাবু হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের ঘুম ভাঙাইবার জন্য আবার অন্য লোক রাখা দরকার হইয়াছে"—এইরূপ মত তিনি অত্যন্ত নিঃসংশয়ে প্রচার করিলেন।

চাকর তাড়াতাড়ি চায়ের জল আনিয়া উপস্থিত করিল। অন্নদাবাবু অন্যদিন যেরূপ গল্প করিতে করিতে ধীরে-সুস্থে-আরামে চা রস উপভোগ করিতেন, আজ তাহা না করিয়া অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত পেয়ালা নিঃশেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হেমনলিনী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"বাবা, আজ কি তোমার কোথাও বাহির হইবার তাড়া আছে?"

অন্নদাবাবু কহিলেন "কিছু না, কিছু না। ঠাণ্ডার দিনে গরম চা-টা এক চুমুকে খাইয়া লইলে বেশ ঘামিয়া শরীরটা হাল্কা হইয়া যায়।"

কিন্তু অন্নদাবাবুর শরীরে ঘর্ম্ম নির্গত হইবার পূর্ব্বেই যোগেন্দ্র অক্ষয়কে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আজ অক্ষয়ের বেশ-ভূষায় একটু বিশেষ পারিপাট্য ছিল। হাতে রূপা-বাঁধানো ছড়ি—বুকের কাছে ঘড়ির চেন ঝুলিতেছে—বামহাতে একটা ব্রাউন্ কাগজে মোড়া কেতাব। অন্যদিন অক্ষয় টেবিলের যে অংশে বসে, আজ সেখানে না

বসিয়া হেমনলিনীর অনতিদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইল—হাসিমুখে কহিল; "আপনা-দের ঘড়ি আজ দ্রুত চলিতেছে!"

হেমনলিনী অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিল না, তাহার কথার উত্তরমাত্র দিল না। অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেম, চল ত মা উপরে। আমার গরম কাপড়গুলা একবার রৌদ্রে দেওয়া দরকার।"

যোগেন্দ্র কহিল—"বাবা, রৌদ্র ত পালাইতেছে না—এত তাড়াতাড়ি কেন? হেম, অক্ষয়কে একপেয়ালা চা ঢালিয়া দাও। আমারো চায়ের দরকার আছে—কিন্তু অতিথি আগে।"

অক্ষয় হাসিয়া হেমনলিনীকে কহিল—"কর্ত্তব্যের খাতিরে এতবড় আত্মত্যাগ দেখিয়াছেন? দ্বিতীয় সার্ ফিলিপ্ সিড্নি।"

হেমনলিনী অক্ষয়ের কথায় লেশমাত্র অবধান প্রকাশ না করিয়া দুইপেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া একপেয়ালা যোগেন্দ্রকে দিল ও অপর পেয়ালাটি অক্ষয়ের অভিমুখে ঈষৎ-একটু ঠেলিয়া দিয়া অন্নদাবাবুর মুখের দিকে তাকাইল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "রৌদ্র বাড়িয়া উঠিলে কষ্ট হইবে—চল, এইবেলা চল!"

যোগেন্দ্র কহিল—"আজ কাপড় রৌদ্রে দেওয়া থাক্ না! অক্ষয় আসিয়াছে—"

অন্নদা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমাদের কেবলি জবরদস্তি! তোমরা কেবল জেদ্ করিয়া অন্যলোকের মর্ম্মান্তিক বেদনার উপর দিয়া নিজের ইচ্ছাকে জারি করিতে চাও! আমি অনেকদিন নীরবে সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর এরূপ চলিবে না! মা হেম, কাল হইতে উপরে আমার ঘরে তোতে-আমাতে চা খাইব।"

এই বলিয়া হেমকে লইয়া অন্নদা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হেম শান্তস্বরে কহিল, "বাবা আর একটু বোস! আজ তোমার ভাল করিয়া চা খাওয়া হইল না! অক্ষয়বাবু, কাগজে-মোড়া এই রহস্যটি কি, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

অক্ষয় কহিল, "শুধু জিজ্ঞাসা কেন, এ রহস্য উদ্ঘাটন করিতেও পারেন।"—এই বলিয়া মোড়কটি হেমনলিনীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

হেম খুলিয়া দেখিল, একখানি মরক্কো-বাঁধানো টেনিসন্। হঠাৎ চম্‌কিয়া-উঠিয়া তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। ঠিক এই টেনিসন্, এইরূপ বাঁধানো, সে পূর্ব্বে উপ-হার পাইয়াছে—এবং সেই বইখানি আজও তাহার শোবার ঘরের দেরাজের মধ্যে গোপন সমাদরে রক্ষিত আছে।

যোগেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "রহস্য এখনো সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নাই।"—এই বলিয়া বইয়ের প্রথম শূন্যপাতাটি খুলিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিল। সেই পাতায় লেখা আছে—"শ্রীমতী হেমনলিনীর প্রতি অক্ষয়শ্রদ্ধার উপহার।"

তৎক্ষণাৎ বইখানা হেমের হাত হইতে একেবারে ভূতলে পড়িয়া গেল—এবং তৎ-প্রতি সে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া কহিল—"বাবা, চল।"

উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রের চোখদুটা আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল। সে কহিল—"না, আমার

আর এখানে থাকা পোষাইল না। আমি যেখানে হোক্ একটা ইস্কুলমাষ্টারি লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

অক্ষয় কহিল, "ভাই, তুমি মিথ্যা রাগ করিতেছ। আমি ত তখনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তুমি আমাকে বারম্বার আশ্বাস দেওয়াতেই আমি বিচলিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি আমার প্রতি হেমনলিনীর মন কোনোদিন অনুকূল হইবে না। অতএব সে আশা ছাড়িয়া দাও! কিন্তু আসল কথা এই যে, উনি যাহাতে রমেশকে ভুলিতে পারেন, সেটা তোমাদের করা কর্ত্তব্য।"

যোগেন্দ্র কহিল "তুমি ত বলিলে কর্ত্তব্য —উপায়টা কি শুনি।"

অক্ষয় কহিল—"আমি ছাড়া জগতে আর বিবাহযোগ্য যুবাপুরুষ নাই নাকি। আমি দেখিতেছি, তুমি যদি তোমার বোন্ হইতে, তবে আমার আইবড় নাম ঘোচাইবার জন্য পিতৃপুরুষদিগকে হতাশভাবে দিন গণনা করিতে হইত না। যেমন করিয়া হোক্, একটি ভাল পাত্র জোগাড় করা চাই,—যাহার প্রতি তাকাইবামাত্র অবিলম্বে কাপড় রৌদ্রে দিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া না ওঠে।'

যোগেন্দ্র। পাত্র ত ফরমাস দিয়া মেলে না!

অক্ষয়। তুমি একেবারে এত অল্পেই হাল ছাড়িয়া দিয়া বোস কেন? পাত্রের সন্ধান আমি বলিতে পারি, কিন্তু তাড়াহুড়া যদি কর, তবে সমস্ত মাটি হইয়া যাইবে। প্রথমেই বিবাহের কথা পাড়িয়া দুই পক্ষকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিলে চলিবে না। আস্তে আস্তে আলাপপরিচয় জমিতে দাও, তাহার পরে সময় বুঝিয়া দিনস্থির করিয়ো।

যোগেন্দ্র। প্রণালীটি অতি উত্তম, কিন্তু লোকটি কে শুনি।

অক্ষয়। তুমি তাহাকে তেমন ভাল করিয়া জান না, কিন্তু দেখিয়াছ। নলিনাক্ষ-ডাক্তার।

যোগেন্দ্র। নলিনাক্ষ।

অক্ষয়। চম্‌কাও কেন! তাহাকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে গোলমাল চলিতেছে, চলুক্ না। তা বলিয়া অমন পাত্রটিকে হাতছাড়া করিবে?

যোগেন্দ্র। আমি হাত তুলিয়া লইলেই অমনি পাত্র যদি হাতছাড়া হইত, তা হইলে ভাবনা কি ছিল? কিন্তু নলিনাক্ষ বিবাহ করিতে কি রাজি হইবেন?

অক্ষয়। আজই হইবেন, এমন কথা বলিতে পারি না কিন্তু সময়ে কি না হইতে পারে। যোগেন, আমার কথা শোন। কাল নলিনাক্ষের বক্তৃতার দিন আছে— সেই বক্তৃতায় হেমনলিনীকে লইয়া যাও। লোকটার বলিবার ক্ষমতা আছে। স্ত্রীলোকের চিত্ত-আকর্ষণের পক্ষে ঐ ক্ষমতাটা অকিঞ্চিৎকর নয়। হায়, অবোধ অবলারা এ কথা বোঝে না যে, বক্তা স্বামীর চেয়ে শ্রোতা স্বামী ঢের ভাল।

যোগেন্দ্র। কিন্তু নলিনাক্ষের ইতিহাসটা কি, ভাল করিয়া বল দেখি, শোনা যাক্।

অক্ষয়। দেখ যোগেন্, ইতিহাসে যদি কিছু খুঁৎ থাকে, তাহা লইয়া বেশি ব্যস্ত হইয়ো না। অল্প একটুখানি খুঁতে দুর্লভ জিনিষ সুলভ হয়— আমি ত সেটাকে লাভ মনে করি।

অক্ষয় নলিনাক্ষের ইতিহাস যাহা বলিল, তাহা সংক্ষেপে এই : নলিনাক্ষের পিতা রাজবল্লভ ফরিদপুর অঞ্চলের একটি ছোটখাটো জমিদার ছিলেন। তাঁহার বছর ত্রিশ বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কোনোমতেই স্বামীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না এবং আচারবিচারসম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত স্বামীর সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন বলা বাহুল্য, ইহা রাজবল্লভের পক্ষে সুখকর হয় নাই। তাঁহার ছেলে নলিনাক্ষ ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহে ও বক্তৃতাশক্তিদ্বারা উপযুক্তবয়সে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি সরকারী ডাক্তারের কাজে বাংলার নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া চরিত্রের নির্ম্মলতা, চিকিৎসার নৈপুণ্য ও সৎকর্ম্মের উদ্যোগে সর্ব্বত্র খ্যাতি বিস্তার করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। বৃদ্ধবয়সে রাজবল্লভ একটি বিধবাকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কেহই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। রাজবল্লভ বলিতে লাগিলেন, "আমার বর্ত্তমান স্ত্রী আমার যথার্থ সহধর্ম্মিণী নহে— যাহার সঙ্গে ধর্ম্মে, মতে, ব্যবহারে ও হৃদয়ে মিল হইয়াছে, তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করিলে অন্যায় হইবে।" এই বলিয়া রাজবল্লভ সর্ব্বসাধারণের ধিক্কারের মধ্যে সেই বিধবাকে অগত্যা হিন্দুমতানুসারে বিবাহ করিলেন।

ইহার পরে নলিনাক্ষের মা গৃহত্যাগ করিয়া কাশী যাইতে প্রবৃত্ত হইলে নলিনাক্ষ রংপুরের ডাক্তারি ছাড়িয়া-আসিয়া কহিলেন —"মা, আমিও তোমার সঙ্গে কাশী যাইব।"

মা কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, আমার সঙ্গে তোদের ত কিছুই মেলে না, কেন মিছামিছি কষ্ট পাইবি?"

নলিনাক্ষ কহিল, "তোমার সঙ্গে আমার কিছুই অমিল হইবে না।"

নলিনাক্ষ তাঁহার এই স্বামিপরিত্যক্ত অবমানিত মাতাকে সুখী করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইল। তাঁহার সঙ্গে কাশী গেল। মা কহিলেন "বাবা, ঘরে কি বৌ আসিবে না?"

নলিনাক্ষ বিপদে পড়িল, কহিল, "কাজ কি মা, বেশ আছি।"

মা বুঝিলেন, নলিন অনেকটা ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মপরিবারের বাহিরে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। ব্যথিত হইয়া তিনি কহিলেন, "বাছা, আমার জন্যে তুই চিরজীবন সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, এ ত কোনোমতেই হইতে পারে না। তোর যেখানে রুচি, তুই বিবাহ কর্ বাবা, আমি কখনো আপত্তি করিব না।"

নলিন দুইএকদিন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি যেমন চাও, আমি তেম্নি একটি বউ আনিয়া তোমার দাসী করিয়া দিব তোমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে অমিল হইবে, তোমাকে দুঃখ দিবে, এমন মেয়ে আমি কখনই ঘরে আনিব না।"

এই বলিয়া নলিন পাত্রীর সন্ধানে বাংলা-দেশে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার পরে মাঝখানে ইতিহাসে একটুখানি বিচ্ছেদ আছে। কেহ বলে, গোপনে সে এক পল্লিতে গিয়া কোন্ এক অনাথাকে বিবাহ করিয়া

ছিল এবং বিবাহের পরেই তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। কেহ বা তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করে। অক্ষয়ের বিশ্বাস এই যে, বিবাহ করিতে আসিয়া শেষমুহূর্ত্তে সে পিছাইয়াছিল।

যাহাই হউক্, অক্ষয়ের মতে, এখন নিশ্চয়ই নলিনাক্ষ যাহাকেই পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে, তাহার মা তাহাতে আপত্তি না করিয়া খুসিই হইবেন। হেমনলিনীর মত অমন মেয়ে নলিনাক্ষ কোথায় পাইবে! আর যাই হোক্, হেমের যেরূপ মধুর স্বভাব, তাহাতে সে যে তাহার শাশুড়িকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া চলিবে, কোনোমতেই তাঁহাকে কষ্ট দিবে না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নলিনাক্ষ দুদিন ভাল করিয়া হেমকে দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। অতএব, অক্ষয়ের পরামর্শ এই যে, কোনো-মতে দুজনের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হউক্!

৪৩

অক্ষয় চলিয়া যাইবামাত্র যোগেন্দ্র দোতলায় উঠিয়া গেল। দেখিল, উপরের বসিবার ঘরে হেমনলিনীকে কাছে বসাইয়া অন্নদাবাবু গল্প করিতেছেন। যোগেন্দ্রকে দেখিয়া অন্নদা একটু লজ্জিত হইলেন। আজ চায়ের টেবিলে তাঁহার স্বাভাবিক শান্তভাব নষ্ট হইয়া হঠাৎ তাঁহার রোষ প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাতেও তাঁহার মনে মনে ক্ষোভ ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বিশেষ সমাদরের স্বরে কহিলেন, "এস যোগেন্দ্র, বোস।"

যোগেন্দ্র কহিলেন, "বাবা, তোমরা যে কোনোখানে বাহির হওয়া একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছ! দুজনে দিনরাত্রি ঘরে বসিয়া থাকা কি ভাল?"

অন্নদা কহিল "ঐ শোন! আমরা ত চিরকাল এইরকম কোণে বসিয়াই কাটাইয়া দিয়াছি। হেমকে ত কোথাও বাহির করিতে হইলে মাথাখোঁড়াখুঁড়ি করিতে হইত।"

হেম কহিল "কেন বাবা আমার দোষ দাও? তুমি কোথায় আমাকে লইয়া যাইতে চাও, চল না।"

হেমনলিনী আপনার প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়াও সবলে প্রমাণ করিতে চায় যে, সে মনের মধ্যে একটা শোক চাপিয়া ধরিয়া ঘরের মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া নাই! তাহার চারিদিকে যেখানে যাহা-কিছু হইতেছে, সব বিষয়েই যেন তাহার ঔৎসুক্য অত্যন্ত সজীব হইয়া আছে।

যোগেন্দ্র কহিল—"বাবা, কাল একটা মীটিং আছে, সেখানে হেমকে লইয়া চল না!"

অন্নদা জানিতেন, মীটিঙের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হেমনলিনী চিরদিনই একান্ত অনিচ্ছা ও সঙ্কোচ অনুভব করে। তাই তিনি কিছু না বলিয়া একবার হেমের মুখের দিকে চাহিলেন।

হেম হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিল—"মীটিং? সেখানে কে বক্তৃতা দিবে দাদা?"

যোগেন্দ্র। নলিনাক্ষ-ডাক্তার।

অন্নদা। নলিনাক্ষ!

যোগেন্দ্র। ভারি চমৎকার বলিতে পারেন। তা ছাড়া, লোকটার জীবনের ইতিহাস শুনিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। এমন ত্যাগস্বীকার! এমন দৃঢ়তা! এরকম মানুষের মত মানুষ পাওয়া দুর্লভ!

আর ঘণ্টা দুই আগে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি ছাড়া নলিনাক্ষসম্বন্ধে যোগেন্দ্র কিছুই জানিত না।

হেম একটা আগ্রহ দেখাইয়া কহিল, "বেশ ত বাবা, চল না, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইব।"

হেমনলিনীর এইরূপ উৎসাহের ভাবটাকে অন্নদা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন না—তথাপি তিনি মনে মনে একটু খুসি হইলেন। তিনি ভাবিলেন, হেম যদি জোর করিয়াও এইরূপ মেলামেশা যাওয়া-আসা করিতে থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র উহার মন সুস্থ হইবে। মানুষের সহবাসই মানুষের সর্ব্বপ্রকার মনোবৈকল্যের প্রধান ঔষধ। তিনি কহিলেন, "তা বেশ ত যোগেন্দ্র, কাল যথাসময়ে আমাদের মীটিঙে লইয়া যাইয়ো। কিন্তু নলিনাক্ষসম্বন্ধে কি জান, বল ত। অনেক লোকে ত অনেক কথা কয়!"

যে অনেক লোকে অনেক কথা বলিয়া থাকে, প্রথমত যোগেন্দ্র তাহাদিগকে খুব একচোট গালি দিয়া লইল। বলিল, "ধর্ম্ম লইয়া যাহারা ভড়ং করে, তাহারা মনে করে, কথায় কথায় পরের প্রতি অবিচার ও পরনিন্দা করিবার জন্য তাহারা ভগবানের স্বাক্ষরিত দলিল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ধর্ম্মব্যবসায়ীদের মত এতবড় সঙ্কীর্ণচিত্ত বিশ্বনিন্দুক আর জগতে নাই।"—বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

অন্নদা যোগেন্দ্রকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বারবার বলিতে লাগিলেন—"সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক! পরের দোষত্রুটি লইয়া কেবলি আলোচনা করিতে থাকিলে মন ছোট হইয়া যায়, স্বভাব সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে, হৃদয়ের সরসতা থাকে না।"

যোগেন্দ্র কহিল—"বাবা, তুমি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ। কিন্তু ধার্ম্মিকের মত আমার স্বভাব নয়—আমি মন্দ বলিতেও জানি, ভাল বলিতেও জানি—এবং মুখের উপরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া হাতে-হাতেই সব কথা চুকাইয়া ফেলি।"

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"যোগেন্, তুমি কি পাগল হইয়াছ? তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিব কেন? আমি কি তোমাকে চিনি না?"

তখন ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া যোগেন্দ্র নলিনাক্ষের বৃত্তান্ত বিবরিত করিল। কহিল, "মাতাকে সুখী করিবার জন্য নলিনাক্ষ আচারসম্বন্ধে সংযত হইয়া কাশীতে বাস করিতেছে, এইজন্যই, বাবা, তুমি যাহাদিগকে অনেক লোক বল, তাহারা অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি ত এজন্য নলিনাক্ষকে ভালই বলি! হেম, তুমি কি বল!"

হেমনলিনী কহিল—"আমিও ত তাই বলি!"

যোগেন্দ্র কহিল—"হেম যে ভালই বলিবে, তাহা আমি নিশ্চয় জানিতাম। বাবাকে সুখী করিবার জন্য হেম একটা-কিছু ত্যাগস্বীকার করিবার উপলক্ষ্য পাইলে যেন বাঁচে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি!"

অন্নদা স্নেহকোমলহাস্যে হেমের মুখের দিকে চাহিলেন—হেমনলিনী লজ্জায় রক্তিম মুখখানি নত করিল।

ক্রমশঃ।

বঙ্গদর্শন।

তপস্যা।*

বিশ্বামিত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি প্রথমত একজন বলদৃপ্ত, লোভপরায়ণ, পরশ্রীকাতর ক্ষত্রিয় নরপতি। তাঁহার মধ্যে রজোগুণ পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। বসিষ্ঠাশ্রমে তিনি অতিথি, মহর্ষি বসিষ্ঠ পরম-প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তাহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বসিষ্ঠের কামধেনুটি দেখিয়া বিশ্বামিত্রের দুর্জ্জয় লোভ জন্মিল। ঋষি তাঁহাকে সে কামধেনু প্রদান করিলেন না, সেজন্য তাঁহার দারুণ অভিমান ও ক্রোধের উদয় হইল। ক্রোধের পরই বল-প্রয়োগস্পৃহা এবং যুদ্ধ। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার অভিমান দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধ ত ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কেবল যাগযজ্ঞতপস্যা। সেই ব্রাহ্মণের হস্তে বিশ্বামিত্র পরাস্ত হইলেন, ব্রহ্মতেজে তাঁহার ক্ষত্রিয়তেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। ইহা অপেক্ষা অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাই বিশ্বামিত্র শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সে কিজন্য? নিজের হিতাকাঙ্ক্ষায় নহে, সে কেবল পর পীড়নের জন্য, শত্রুদমনের জন্য, বসিষ্ঠকে জব্দ করিবার জন্য। বিশ্বামিত্রের চিত্তে জিঘাংসাপ্রবৃত্তি বড়ই প্রবল, তিনি তখনও রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়। তপস্যার ফলে তিনি শিবের নিকট বরলাভ করিয়া মনে করিলেন—"এবার আর আমাকে পায় কে? আমি এখনই বসিষ্ঠকে সবংশে নিধন করিব।" কিন্তু তাঁহার সকল দর্প চূর্ণ হইল—বসিষ্ঠের ব্রহ্মতেজে তাঁহার ক্ষাত্রতেজ নির্ব্বাপিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি যত-বড় রাজাই হউন, ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহার বাড়াবাড়ি খাটিবে না। ব্রাহ্মণ না হইতে পারিলে ব্রাহ্মণের নিকট জয়ের আশা নাই। তাই তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার জীবননাটকের এক নূতন অঙ্ক উদ্ঘাটিত হইল। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত তম ও রজোগুণ-নির্ম্মুক্ত হইয়া যতই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাপন্ন

* গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সাবিত্রী লাইব্রেরির চতুর্বিংশতিতম সাংবৎসরিক অধিবেশনে লেখককর্তৃক পঠিত।

হইতে কাঁদিল, তিনি ততই এক একটি উচ্চস্তরে উঠিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে তাঁহার পরীক্ষা করিতে আসিয়া দেখেন, তিনি আর সেই ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র নাই, তিনি তপস্যার ফলে হইয়াছেন 'রাজর্ষি' অর্থাৎ অৰ্দ্ধেক রাজা, অৰ্দ্ধেক ঋষি। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তাই আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তপঃপ্রভাবে আরও উচ্চে উঠিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই ত্রিশঙ্কুর ব্যাপার সজ্ঘটিত হইল। ইহাও বিশ্বামিত্রের একটি বিশেষ পরীক্ষা। সেই ত্রিভুবনবিস্ময়কারী ঘটনায় আমরা দেখিতে পাই, বিশ্বামিত্র তপস্যায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহাকে একজন ঋষি বলিয়া গণ্য করিতেছেন। এমন কি, সকলেই তাঁহার তপোভয়ে ভীত। তাঁহার তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কু স্বর্গলোক পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলেন। এমন কি, তপোবলে তিনি আর একটি স্বর্গ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যার দুর্দ্দমনীয় তেজে সুরাসুরগণ কম্পিত হইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। কিন্তু তপস্যায় এতদূর অগ্রসর হইলেও বিশ্বামিত্রের মধ্যে তখনও রজোগুণ রহিয়াছে। তখনও তিনি ক্রোধ, জিগীষা, জিঘাংসার বশীভূত, তখনও তিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এবার অম্বরীষ রাজার পালা। ইহাও বিশ্বামিত্রের পরীক্ষার জন্য। এবার তপঃপ্রভাবে তাঁহার চিত্ত আরও প্রশস্ত প্রশান্ত হইয়াছে। তিনি একটি গরুর লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বসিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবার তিনি শিশু শুনঃশেফের প্রাণরক্ষার্থ নিজের পুত্রদিগকে অম্বরীষ রাজার যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার এতদূর চিত্তোন্নতি দেখিয়া ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন —"বিশ্বামিত্র, তুমি ঋষি হইয়াছ।"

কিন্তু ঋষি হইয়াও তিনি সন্তুষ্ট নহেন, তাই আবার ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। আবার তাঁহার পরীক্ষা হইল। এবারকার পরীক্ষায় তিনি পরাস্ত হইলেন। মেনকার রূপের মোহে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। এইরূপ ক্ষণস্থায়ী চিত্তবিভ্রংশ অনেকেরই ঘটিতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত তপোবল আবার জাগিয়া উঠিল। কামরিপুর পরাভব ঘটিল। তখন অনুতাপের বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহার চিত্ত আবার নির্ম্মলভাব ধারণ করিল। এবার ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে আর-এক-গ্রেড্ উপরে প্রোমোশন্ দিলেন। এবার তিনি 'মহর্ষি' হইলেন। তিনি এখন লোভকে জয় করিয়াছেন, কামকে জয় করিয়াছেন, কিন্তু তবুও তিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেন না। তাই তিনি আবার অধিকতর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আবার পরীক্ষা হইল। ইন্দ্র তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য রম্ভাকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রম্ভা তাঁহাকে রূপের মোহে মজাইতে পারিল না - সে নিজে মজিল। তাহাকে অভিশপ্ত করিয়া বিশ্বামিত্রও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন না। তিনি লোভজয় করিয়াছেন, কামজয় করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ক্রোধজয় করিতে পারেন নাই। তিনি অন্তুক্তও

হইলেন, তিনি আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনেকদিন পরে ইন্দ্র তাঁহার পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া ক্ষুধার সময় তাঁহার মুখের অন্ন কাড়িয়া লইলেন। বিশ্বামিত্র কিন্তু এবার ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি এতদিনে ক্রোধকেও জয় করিয়াছেন। তাঁহার উগ্র তপস্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্বেজিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এখন তিনি তপঃসিদ্ধ। এখন তাঁহার মধ্যে পাপের লেশমাত্রও নাই। এখন তাঁহার চিত্ত রজোগুণবিমুক্ত হইয়াছে, এখন দয়া, ক্ষমা, জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সত্ত্বগুণ তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছে। তাই ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে "ব্রহ্মর্ষি" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। বিশ্বামিত্র কৃতার্থ হইলেন।

এইরূপে বিশ্বামিত্রচরিত্রের বিশ্লেষণদ্বারা আমরা দেখিতেছি, একজন কামক্রোধলোভাদি-রিপুপরায়ণ ক্ষত্রিয়নরপতি কিপ্রকার সাধনবলে সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা আরও পাইতেছি, আর্য্যজাতির শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব কতদূর গৌরবান্বিত, কত-কঠোর-সাধনা-সাপেক্ষ। এবং ব্রাহ্মণগণ তপস্যাদ্বারা এই ভারতভূমিতে যে আর্য্যসভ্যতা প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ কত উচ্চ! যে ব্রাহ্মণের গৌরবান্বিত পদ একদিন রাজর্ষি, ঋষি, মহর্ষি পদ অপেক্ষাও শ্লাঘনীয় ছিল, আজ সেই ব্রাহ্মণবংশের কি শোচনীয় দুর্গতি!

এই বিশ্বামিত্রোপাখ্যানে আমরা আরও একটি তত্ত্বের মীমাংসা পাইতেছি। আমাদের অনেকের বিশ্বাস, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুরুষকার অপেক্ষা দৈববল শ্রেষ্ঠ, আমাদের অদৃষ্টের শাসন অকাট্য। কিন্তু এখানে আমরা তাহার অন্যবিধ মীমাংসা পাইতেছি। ত্রিশঙ্কু—বসিষ্ঠ এবং তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছেন—

"হে মুনিবর! আমি যথাবিধি ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিয়াছি, শতশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সদাচার ও সদ্গুণ দ্বারা গুরুজনের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি, কিন্তু কৈ, কেহই ত আমার প্রতি সদয় হইলেন না। অতএব আমার স্থির বিশ্বাস, পৌরুষ নিরর্থক, দৈবই শ্রেষ্ঠ। এইরূপে দৈবকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়া আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পুরুষকারদ্বারা দৈবকে নিবর্ত্তিত করুন—

'দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্ত্তয়িতুমর্হসি।'"

পুরুষকারের সাক্ষাৎ জ্বলন্তমূর্ত্তি মহাত্মা বিশ্বামিত্র স্বীয় পুরুষকারপ্রভাবে দৈবের নিয়তিবন্ধন ছিন্ন ও দেবগণকে পরাস্ত করিয়া কিপ্রকারে ত্রিশঙ্কুর মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পুরুষকারদ্বারা কিপ্রকারে দৈবকে অতিক্রম করা যায়, বিশ্বামিত্র তাঁহার নিজজীবনের কার্য্যকলাপদ্বারাও তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং দৈববল অনতিক্রমণীয়, পুরুষকার দৈবশক্তির নিকট পরাভূত, এ কথা হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় নহে। আমাদের পূর্ব্বতন আর্য্যপুরুষগণ যেরূপ কঠোর তপস্যাদ্বারা দৈববলকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের

নিজ নিজ অভীষ্টপথে সিদ্ধিলাভ করিতেন, পুরাণেতিহাসে তাহার বহু উদাহরণ বিদ্যমান। তপস্যা যে কেবল ব্রহ্মত্বলাভের উপায়, তাহা নহে; তপস্যা যে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা, ইহা তাঁহারা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা যখন যাহা লাভ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইতেন, তখন তাহা লাভের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া, অন্যের নিকট ভিক্ষা করিতে না গিয়া, পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতেন। তাই আমরা দেখিতে পাই— হিরণ্যকশিপু অমরবরলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, ধ্রুব পিতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠপদ-লাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, ভগীরথ গঙ্গা আনয়নের জন্য তপস্যা করিতেছেন, হৈমবতী উমা পতিলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, অর্জ্জুন পাশুপতাস্ত্রলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, সুরথ রাজা তাঁহার ভ্রষ্টরাজ্যপুনঃপ্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিতেছেন, সমাধিবৈশ্য নির্ব্বাণমোক্ষলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, মহারাজ অশ্বপতি একটি অলোক-সামান্য-সন্ততি লাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন। পুরাণেতিহাসে এরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্ত আছে। বস্তুত বসিষ্ঠধেনু শবলার ন্যায় তপ যে সর্ব্বকামপ্রদ, ইহা পূর্ব্বতন আর্য্যগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। অথবা সেই কামধেনুই শরীরিণী তপস্যা। তাই বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিতেছেন

"শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীর্ত্তিরাত্মবতো যথা।
অস্যাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ॥
আয়ত্তমগ্নিহোত্রঞ্চ বলিহোমস্তথৈব চ।
স্বাহাকারবষট্‌কারৌ বিদ্যাশ্চ বিবিধাস্তথা॥
আয়ত্তমত্র রাজর্ষে সর্ব্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বস্বমেতৎ সত্যেন মম তুষ্টিকরী তথা॥"

অর্থাৎ আত্মবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তির ন্যায় শবলা আমার চিরসহচরী; আমার হব্যকব্য, জীবনযাত্রা, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্‌কার ও বিবিধ বিদ্যা এ সমস্তই ইহার আয়ত্ত।

এই বসিষ্ঠের শরীরিণী তপস্যা কামধেনু যেমন ক্ষুধায় প্রচুরপরিমাণে অন্নপ্রদান করিতে পারে, তেমন শত্রুবিনাশের জন্য অপ্রতিহত শৌর্য্যবীর্য্য ও অগণন সৈন্যসম্পদ্ প্রদান করিতে পারে, আবার দুর্জ্জয়-ইন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রশমনের দ্বারা সাধককে ব্রহ্মত্বে পর্য্যন্ত উন্নয়ন করিতে পারে। তপস্যা কামধেনুর ন্যায় সর্ব্বকামদা—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ ফল প্রদান করিতে সমর্থা। তাই ভগবান্ মনু বলেন—

"তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং সুখম্।
তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোহন্তং বেদদর্শিভিঃ॥
ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥
ঋষয়ঃ সংযতাত্মানঃ ফলমূলানিলাশনাঃ।
তপসৈব প্রপশ্যন্তি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥
ঔষধান্যগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ।
তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনম্॥
যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥

মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ২৩৫—২৩৯

ইহার ভাবার্থ এই—দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে যতপ্রকার সুখ আছে, তপস্যাই সে সকলের আদি, তপস্যাই তাহাদের স্থিতি, তপস্যাই তাহাদের শেষ। ব্রাহ্মণের তপস্যা জ্ঞান ক্ষত্রিয়ের তপস্যা প্রজারক্ষণ (যুদ্ধাদি)

বৈশ্যের তপস্যা কৃষিবাণিজ্যাদি, শূদ্রের তপস্যা সেবা ;—অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিজ নিজ বর্ণধর্ম্ম পালন করিতে হইলে তপস্যার প্রয়োজন। সেইরূপ সংসারত্যাগী ঋষিগণ আত্মসংযম এবং ফলমূলবায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক যে উৎকট তপস্যা করেন, তদ্দ্বারাই তাঁহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নখ-দর্পণের ন্যায় দর্শন করিতে পারেন। ঔষধবল, বিদ্যাবল, নীরোগিতা এবং বিবিধ স্বর্গাদিতে স্থিতি, অর্থাৎ স্বাস্থ্যজন্য সুখ, বিদ্যাজন্য সুখ এবং স্বর্গাদিপ্রাপ্তিজন্য সুখ, এই সর্ব্বপ্রকার সুখের একমাত্র তপস্যাই সাধন। যাহা-কিছু দুস্তর, যাহা-কিছু দুর্লভ, যাহা-কিছু দুর্গম, যাহা-কিছু দুষ্কর, তৎসমস্তই তপোবলে সাধন করা যায়—তপস্যার শক্তিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

বিশ্বামিত্র এই তপোবলকে আশ্রয় করিয়া একটি নূতন স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ মনু বলেন, লোকপিতামহ ব্রহ্মাও তপস্যাকে আশ্রয় করিয়া এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন। যে তপস্যার বলে বিশ্বামিত্রের ন্যায় মানব স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার স্থান অধিকার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, সে তপস্যার বল ত সামান্য নহে। সে তপস্যার বল কোথা হইতে আসে? সে তপস্যা কি? বিশ্বামিত্রের তপস্যা কি?

তপস্যার অর্থ সাধনবলে আত্মশক্তির বিকাশ। আমাদের মানবাত্মায় অতি উচ্চতম শক্তিসকল নিহিত রহিয়াছে। কেন না, মানবাত্মা ত আর কিছু নহে, মানবাত্মাই ঈশ্বরাত্মা—আত্মাই ব্রহ্ম। আমার আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু। যে কামক্রোধাদি রিপুগণের উত্তেজনায় আমি আমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, যে মায়ামোহের আবরণে আমি আমার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছি, যদি একবার সাধনাদ্বারা সেই সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত করিতে পারি, যদি একবার কঠোর আত্মসংযমদ্বারা সেই মায়ামোহের আবরণ অপসারিত করিতে পারি, তবে আমার আত্মার শক্তিসকল পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিবে, তখন মেঘনির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায় আমার আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপে জাগিয়া উঠিবে। তাই বশিষ্ঠের নিকট পরাস্ত হইয়া বিশ্বামিত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন—"ইন্দ্রিয়মনকে সংযত করিয়া আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব, কারণ তপস্যাই ব্রহ্মত্বলাভের কারণ।" বিশ্বামিত্র কি সাধনপ্রণালী অবলম্বনে কামক্রোধলোভমোহাদি রিপুদিগকে দমন করিয়া তাঁহার আত্মায় গূঢ়ভাবে নিহিত বিবেকবৈরাগ্য-জ্ঞান, শম-দম-তিতিক্ষাদি গুণ বিকশিত করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু তপঃসাধনের জন্য সংসারত্যাগপূর্ব্বক বনগমন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ হয় না। ভগবান্ মনু বলেন "ব্রাহ্মণের জ্ঞানোপার্জ্জন তপস্যা, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষণ তপস্যা, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্যাদি তপস্যা, শূদ্রের সেবাবৃত্তি তপস্যা। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি সেই পথে থাকিয়াও তপস্যা করিতে পারেন। তপঃসাধনকে গীতায় তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ; যথা—শারীর তপ, বাঙ্ময় তপ এবং মানস তপ।

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥

১৭শ অধ্যায়, ১৪—১৬।

'দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং সাধুব্যক্তির পূজা, শৌচাচার, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা, ইহাকে শারীর তপ বলে। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিত বাক্য কথন, এবং বেদাধ্যয়ন করাকে বাঙ্ময় তপ বলে। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা (সর্ব্বলোকহিতৈষিতা), মৌন (নিষিদ্ধ বিষয় চিন্তা না করা), আত্মবিনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, ইহাকে মানস তপ বলে।'

এই গীতোক্ত তপঃসাধন গাহস্থ্যাশ্রমের সম্পূর্ণ উপযোগী। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, দেবদ্বিজগুরুভক্তি, শাস্ত্রাভ্যাস, চিত্তশুদ্ধি, আত্মনিগ্রহ—এই সকল সাধনই তপস্যা। এই সকল সাধনদ্বারা আত্মার অতি উচ্চতম শক্তিসকলের স্ফুরণ হইয়া থাকে, এবং ক্রমশ মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয়। তবে যে সকল পূর্ব্বতন মনীষী কেবল মনুষ্যত্বলাভে সন্তুষ্ট না হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন, তাঁহারা সহস্রবাধাবিঘ্নসঙ্কুল সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা যেমন অতি উচ্চ ছিল, তেমনি তাঁহাদের আত্মশক্তির উপর নির্ভরও খুব বেশী ছিল। তাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভের জন্য কোন দেবতার উপাসনা করিতেন না, "তুমি আমাকে ত্রাণ কর" বলিয়া কোন দেবতার কৃপাকটাক্ষলাভের জন্য তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইতেন না। সে যুগের সাধনা ছিল জোরজবরদস্তীমূলক। "তুমি দেবতা, আমাকে অভীষ্টবর প্রদান করিবে না? আচ্ছা দেখিব আমি, তুমি কোথাকার কেমন দেবতা। আমি এই তপস্যায় বসিলাম।" তাঁহারা ঘোরতর কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারিতেন, তাই তাঁহাদের সাধনায় এতদূর জোরজবরদস্তী ছিল। তাঁহাদের এইরূপ দুর্দ্দমনীয় আত্মবল ছিল বলিয়াই তাঁহাদের তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হইতেন, ধরাতল কম্পিত হইত, ব্রহ্মা স্বয়ং বরপ্রদানের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইতেন। এইরূপে তাঁহারা তপোবলে আত্মবিজয়ী হইয়া পরে বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন। এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল—কিন্তু তাহা পাশববলের দ্বারা নহে,—maxim gun কিংবা torpedo boat এর দ্বারা নহে, তাহা তাঁহাদের তপোলব্ধ বিশ্বগ্রাসী হৃদয়ের প্রীতিপ্রবাহদ্বারা। তাঁহারা তপঃসাধনাদ্বারা "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যার ফলে একদিন ভারতবর্ষে যে অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, তাহার মূলমন্ত্র হইতেছে—"সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা।" যে "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা"র দোহাই দিয়া একদিন ফরাসীজাতি নরশোণিতে ধরাতল প্লাবিত করিয়াছিল, আমি সে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা বলিতেছি না। যে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একদিন দৈত্যকুমার প্রহ্লাদ দৈত্যশিশুদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

'সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ। সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।"

হে দৈত্যশিশুগণ, তোমরা সাম্য অবলম্বন কর—সাম্যই বিষ্ণুর প্রকৃত আরাধনা', আমি সেই সাম্যের কথা কহিতেছি। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে রাজনীতি শিক্ষা করিবার জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া প্রত্যাগত হইলে, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'মিত্রেষু বর্ত্তেত কথমরিবর্গেষু ভূপতিঃ ?

রাজা মিত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, আর শত্রুর সঙ্গেই বা কিরূপ ব্যবহার করিবেন ?'

তদুত্তরে দৈত্যকুমার বলিলেন—

"সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ॥
ত্বয্যস্তি ভগবান বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক কুতঃ॥'

'হে পিতঃ, জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দ যখন সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন মিত্র আর শত্রু, এরূপ কথা কেন ? ভগবান্ বিষ্ণু তোমাতে আছেন, আমাতে আছেন, অন্যত্রও আছেন। সুতরাং ইনি মিত্র, উনি শত্রু, এরূপ ভেদ-জ্ঞান থাকিবে কেন ?'

যে সাম্য জগন্ময়ের জগতে শত্রুমিত্রের ভেদ দেখিতে পায় না, তাহাই প্রকৃত সাম্য। ফরাসীজাতি যে সাম্যের সাধন করিয়াছিলেন, তাহা অহঙ্কারমূলক—তাহার মূলমন্ত্র হইতেছে, "তুমি যে মানুষ, আমিও সে-ই মানুষ; তোমার যে অধিকার আছে, আমারও সেই অধিকার থাকা উচিত।" আর এই ঋষিগণের তপস্যালব্ধ সাম্য অহং-ত্বাবিনাশের ফল, "তুমি আমি সকলেই সচ্চিদানন্দময়, তোমা হইতে আমার কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই"—এইরূপ ধারণামূলক। এইপ্রকার সাম্যসাধনা দ্বারাই মৈত্রীর রাজ্য, প্রীতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সর্ব্বত্র সকলেই স্বাধীনতালাভ করে, কেহ কাহাকে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে না। তখন সকলেই সকলকে এক বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে দর্শন করে। এইরূপে সাম্য হইতে মৈত্রীর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, মৈত্রী হইতে স্বাধীনতার বিকাশ হয়। আজ maxim gun ও torpedo boatএর যুগে যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা কবির স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা এবং William Stead, Count Tolstoy প্রমুখ লোকহিতব্রত মহাত্মাদিগের হৃদয়ের শুভ আশা ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু, একদিন ব্রাহ্মণগণের তপোবলে ভারতবর্ষ সেই সাম্য মৈত্রী-স্বাধীনতার বাস্তববিকাশ (realisation) হইয়াছিল। তাঁহাদের সেই বিশ্বব্যাপী প্রীতির অনুশীলনে এদেশে কখনও patriot-ism শ্রেণীর জাতীয়ভাবের বিকাশ হইতে পারে নাই। বিশ্বব্যাপী ভাস্করের করে খদ্যোতিকার উদ্ভব কখনও সম্ভবপর নহে। যিনি বিশ্বের মিত্র—যিনি বিশ্বামিত্র—তাঁহার হৃদয়ে আমার এইটুকু সীমানাসহরঙ্গচিহ্নিত ভারতবর্ষ, আমার এইটুকু সীমানাসহরঙ্গ-চিহ্নিত ইংলণ্ড, আমার এইটুকু সীমানাসহ-রঙ্গচিহ্নিত ফ্রান্স, ইত্যাকার সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। Patriot-

ism সেই সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ ধারণার ফল। Patriotism এর মূলে স্বার্থপরতা ও পরহিংসা। বিশ্বহিতব্রত হিন্দুর হৃদয়ে তাই কখনও Patriotism স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে নাই। এমন কি, সংস্কৃতসাহিত্যে Patriotism-শব্দের একটি প্রতিশব্দও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে সমগ্র বিশ্ব—স্থাবরজঙ্গম-কীটপতঙ্গ-পশুপক্ষি-মনুষ্যাদি সংবলিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড—এক পবিত্র প্রীতির দিব্যজ্যোতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তাই আদর্শব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের বিশ্বব্যাপী হৃদয়ে শব্দব্রহ্মের স্ফুরন্ত তেজ ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার মূলমন্ত্র সাবিত্রীমন্ত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

সেই মহামহিমমণ্ডিত মহাত্মাদিগের বংশধরগণ আমরা—আজ আমাদের সে তপোবল নাই, সে তেজোবীর্য্য নাই, সে জ্ঞানৈশ্বর্য্য নাই—আমরা এখন অধঃপতিত, ধূলিলুণ্ঠিত। যে সাধনবলে তাঁহারা মনুষ্যত্ব হইতে ঋষিত্বে ঋষিত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদের সে সাধনা ভুলিয়া গিয়াছি। দেবত্ব, ঋষিত্ব, ব্রাহ্মণত্ব ত অতি দূরের কথা, আমরা এখন মনুষ্যত্ব হারাইয়া বসিয়াছি। তাই আজ সেই মনীষিগণের সাধনসম্পদের অধিকারী হইয়াও আমরা সামান্য পার্থিব সুখসুবিধার জন্য পরমুখাপেক্ষী, অন্যের কৃপাভিখারী। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বরং ত্রিশঙ্কুর সহিত আমাদিগকে তুলনা করা যাইতে পারে।

ইংরেজজাতি আমাদের রাজা, ইংরেজ বিজেতা, আমরা বিজিত। কিন্তু কোন কোন মহাশয় ইংরেজ সে ভাব ভুলিয়া-গিয়া আমাদের সুশিক্ষার জন্য তাঁহাদের বিশ্ববিশ্রুত শিল্প-সাহিত্য, দর্শনবিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন। আমরা ইংরেজের সাহায্যে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে নানাপ্রকার খেয়াল জাগিয়া উঠিল। ইংরেজজাতি তাঁহাদের মহাগৌরবান্বিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা (Political independence) কতশতাব্দীব্যাপী আন্দোলন, যুদ্ধবিগ্রহ ও শোণিতপাতের ফলে পাইয়াছেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া, ত্রিশঙ্কু যেমন সশরীরে স্বর্গলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, আমরা তদ্রূপ ইংরেজের সমকক্ষ হইয়া British citizenship লাভের জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বসিষ্ঠঋষি এবং তাঁহার পুত্রগণ অর্থাৎ ইংরেজরাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহার অধীনস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ আমাদিগকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমরা তখন কয়েকজন মহামনস্বী উদারচেতা ইংরেজবিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহারা আমাদের সশরীরে স্বর্গগমনের জন্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তাহা হইতেছে- Indian National Congress —জাতীয় মহাসমিতি। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ লইয়া যেমন ঋষিদের মধ্যে একটা দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছিল, এই যজ্ঞ লইয়াও আমাদের রাজর্ষিগণের মধ্যে তেমনি একটা দলাদলি আরম্ভ হইল। সেই দলাদলির ঢেউ আধুনিক স্বর্গধাম বিলাতভূমি পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিল। সেখানেও ইহা লইয়া দেবতাদের মধ্যে একটা দলাদলি উৎপন্ন হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের তাহাতে এপর্য্যন্ত কোনও

লাভ হয় নাই। বিশ্বামিত্রের দল এপর্য্যন্ত পরাজিত হইয়াই আছেন। কলির বিশ্বামিত্রের ততদূর তপোবল নাই যে, ত্রিশঙ্কুগণের জন্য একটি নূতন স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিবেন। তবে তাঁহাদের ক্ষমতা যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। ত্রেতার বিশ্বামিত্র তপোবলে যেমন কতকগুলি নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া ত্রিশঙ্কুকে সেই-কৃত্রিম-নক্ষত্ররাজি-পরিবৃত হইয়া মনে মনে স্বর্গসুখ কল্পনা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কলির বিশ্বামিত্রদের প্রভাবেও আমাদের ত্রিশঙ্কুগণের মনস্তুষ্টির জন্য কয়েকটি নক্ষত্রভূষণ প্রদত্ত হইয়াছে--যথা--C. S. I., C. I. E., Hon'ble, Rai Bahadur &c. &c.। আমাদের ত্রিশঙ্কুগণ এই সকল কৃত্রিম নক্ষত্রালোকে তাঁহাদের নিজ নিজ মনের অন্ধকার কতকটা দূর করিতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই—কিন্তু যাহাদের স্বর্গগমনের জন্য, যে জনসাধারণের হিতকামনায়, এই মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বে "যে তিমিরে" ছিল, এখনও "সেই তিমিরে" ডুবিয়া রহিয়াছে। বরং সম্প্রতি এই মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে জনসাধারণের অজ্ঞানতিমির আরও ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জাতীয়-মহাসমিতি-সমধিষ্ঠিত আবেদনকারিগণের সক্রোধ প্রার্থনায় ইংরেজরাজ কিছুমাত্র কর্ণপাত করিতেছেন না দেখিয়া, ইহার মধ্যে আর-এক নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। সে কি? না, কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে লাঠিখেলার ব্যবস্থা। অর্থাৎ জাতীয় মহাসমিতির বাগ্মিগণের বক্তৃতার তেজে আমাদের নির্জ্জীবপ্রাণে জাতীয়তার তড়িচ্ছটাস্ফুরণ হইবার যেটুকু বাকী থাকিবে, তাহা নিশ্চয়ই লাঠির ঠুকাঠুকীশব্দে পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিবে। আর সেই লাঠিধারী বীরবৃন্দের শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমবার্ত্তা ডেলিগেট্‌দিগের মুখে দেশবিদেশে প্রচারিত হইলে অতি অল্পকালমধ্যেই ভারতব্যাপী একটি অভিনব জাতীয়তা সৃষ্ট হইবে। যাহা হউক, ভিক্ষার্থিগণের সঙ্গে লাঠিয়াল দেখিয়া গৃহস্বামী ভয়ে ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে পাছে ভিক্ষালাভের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে, এই আশঙ্কাতেই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক, সেই লাঠিখেলার প্রস্তাবটি মহাসমিতিতে গৃহীত হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইয়া থাকিলেও, শরীরস্থ বলদ্বারা হৃদয়স্থ সাহসের অভাবপূরণ হইতে পারে, এই আশ্বাসে ও বিশ্বাসে, এখনও স্থানে স্থানে সেই বীরত্বস্ফুরণকারী মহামন্ত্রের সাধনা পূরাদমে চলিয়াছে;--বোধ হয় এই আশায় যে, এমন একদিন আসিবে, যেদিন ইংরেজ সেই লাঠির ভয়ে bag and baggage এবং গোলাগুলি লইয়া রণতরিআরোহণে ভারতবর্ষ হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে! সে যাহা হউক, আপাতত এই লাঠিধারী বীরগণ হইতে ইংরেজ অপেক্ষা দেশীয় নিরীহ ভদ্রলোকদিগেরই ভয়ের কারণ বেশী। এই সকল বীরগণের সুপ্তশৌর্য্য উত্তেজিত হইলে যখন তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তখন রেলের গাড়িতে কিংবা গড়ের মাঠে তাঁহাদের উপযুক্ত দুর্বিনীত ইংরেজশীকার না মিলিলে, তাঁহাদের তৈলাক্ত লাঠি ও বজ্রকঠোর ঘুসি যে অতি

সামান্য কারণে অনেকানেক দেশীয় নিরীহ ভালমানুষের প্লীহাবিদারণ কিংবা মস্তক চূর্ণ করিতে অগ্রসর হইবে না, তাহার একরার-নামা কোথায় ?

বর্ত্তমান সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে মহাসমিতির পৃষ্ঠপোষক কিংবা লাঠিখেলার পক্ষপাতী যাঁহারা আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। দেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলীর মাতৃভূমির হিতকামনায় এই সকল আন্তরিক উদ্যমকে আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করি বলিয়াই এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কোন্ শিক্ষিত ভারতসন্তানের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নয় যে, ভারতবাসিগণের আবার জাতীয় অভ্যুদয় হউক, আবার ভারত প্রবুদ্ধ হউক ? কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের এই জাতীয়জীবনের মুমূর্ষু দশায় তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহাকে বাঁচাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যে বিকারগ্রস্ত রোগীর নাড়ী দমিয়া যাইতেছে —pulse sink করিতেছে,—তাহাকে জীবিত রাখিবার জন্য যদি তাড়িতযন্ত্র (battery) লাগান হয়, তবে যে অঙ্গে সেই তড়িৎপ্রবাহ সংযোজিত হইবে, কেবল সেই অঙ্গই ক্ষণকালের জন্য নড়িয়া উঠিবে, তাহাতে রোগী জীবনী শক্তি লাভ করিয়া আবার দাঁড়াইয়া উঠিবে না। মৃত ভেকের পায়ে তড়িৎপ্রবাহ স্ফুরিত হওয়াতে, সেই পা'টা কেবল ক্ষণকালের জন্য নাচিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সে ভেক ত আর বাঁচে নাই। আমাদের জাতীয়জীবনের পুনর্গঠন করিতে হইলে, প্রথমে দেখিতে হইবে, তাহার pulse কোন্‌খানে; পরে সেই pulse ধরিয়া, রোগীর ধাতুর অনুকূলে, উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে—সেই pulse যাহাতে rise করে—আবার যাহাতে ধাত আসে সেজন্য আবশ্যক হইলে উত্তেজক ঔষধ (stimulant) দিতে হইবে।

এই বিশাল ভারতবর্ষে আমরা হিন্দু-মুসলমান-শিখ্-পারসী প্রভৃতি নানাজাতি বাস করিতেছি—আমরা সকলেই একদেশবাসী এবং একপ্রকারের শাসনাধীনে থাকিয়া পরস্পরের সুখদুঃখভাগী। ইহাই আমাদের মধ্যে একটি জাতীয়তাবন্ধনের প্রকৃষ্ট সূত্র, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় এই সূত্রে জাতীয়তাবন্ধনের কোন সম্ভাবনা দেখি না। ইংরেজশাসনের দোষপ্রদর্শন করিবার জন্য ভিন্নজাতীয় এবং ভিন্নদেশীয় লোকমণ্ডলী সমবেত হইলেই যে তাহাদের মধ্য হইতে একটা জাতীয়তা জমাট বাঁধিয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা বৃথা। আমরা কেবল শাসনকর্ত্তৃগণের দোষপর্য্যালোচনাদ্বারাই আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের পর্য্যবসান হইল মনে করি,—জাতীয়তাসৃষ্টির জন্য আমাদের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা অর্জ্জন ও অনুশীলন করিবার চেষ্টা করি কই ? যাহাদের মধ্যে ভাইয়ে-ভাইয়ে একতা নাই, স্বগ্রামবাসিগণের মধ্যে একতা নাই, সজাতীয় লোকের মধ্যে একতা নাই—যাহাদের মধ্যে গ্রাম্যস্কুল লইয়া দলাদলি, সহরের মিউনিসিপালিটি লইয়া দলাদলি, ডাক্তারখানা লইয়া দলাদলি, সাহিত্য

সমিতি লইয়া দলাদলি—যাহারা সুশিক্ষিত হইয়াও বারোয়ারির আমোদপ্রমোদের জন্য সহস্র সহস্র টাকা উড়াইয়া দিতেছে, অথচ সাধারণহিতকল্পে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কিংবা ডাক্তারখানার চাঁদা স্বাক্ষর করিয়া দিতে অনিচ্ছুক—এইপ্রকার লোকমণ্ডলীর মধ্যে শুদ্ধ এক বিশাল দেশবাসী ও এক ইংরেজ সম্রাটের শাসনাধীনে থাকিয়া একপ্রকারসুখভাগী এবং একপ্রকারদুঃখভোগী বলিয়া কি কখনও একতাবন্ধন হইতে পারে, না জাতীয়তার গঠন হইতে পারে? বস্তুত আমাদের হিন্দুজাতির মধ্যে কখনও স্বদেশপ্রীতিমূলক, জাতীয়বন্ধন ঘটে নাই। "আমরা একজাতি"—"আমাদের এক দেশ" বলিয়া সর্ব্বজনীন জাতীয়ভাব কখনও হিন্দুজাতির মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং এইরূপ জাতীয়তাসৃষ্টির পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে যাহাতে ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব গঠিত হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি এবং জাতীয় উৎকর্ষ অবশ্যম্ভাবী। সাধুতা (honesty), ঐকান্তিকতা (sincerity), কর্ত্তব্যনিষ্ঠা (devotion to duty), সৎসাহস (moral courage), একতা (unity), স্বার্থত্যাগ (self-sacrifice) ইত্যাদি মনুষ্যোচিত গুণগ্রাম আমাদের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাশক্তি জমাট বাঁধিবে। কিন্তু এই সকল গুণ লাভ করিতে হইলে সাধনা চাই, তপস্যা চাই। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যে কঠোর সাধনাবলে তাঁহার আত্মার অন্তস্তলে লুক্কায়িত উচ্চতম শক্তিসকলের বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ কঠোর সাধনা, কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমাদের বর্ত্তমান যুগের আদর্শ, তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়, দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা এবং কঠোর আত্মসংযমই আমাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায়। তাঁহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া আজ আমাদিগকে আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পরমোদার বিশ্বপ্রীতির আদর্শে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সম্প্রদায়গত, জাতিগত, ধর্ম্মগত ভেদ ভুলিয়া গিয়া এই হিন্দুস্থানের হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জাতি মিলিয়া এক অভিনব বিশাল মহাজাতি গঠন করিতে হইবে। এইরূপে তপস্যাদ্বারা আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং জাতীয়তাশক্তির স্ফুরণ হইলে—লোকপিতামহ ব্রহ্মা যেমন একদিন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ্যপদবীতে বরণ করিবার জন্য স্বয়ং অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, গুণগ্রাহী ইংরেজজাতিও তদ্রূপ আমাদিগকে সসম্ভ্রমে উচ্চতম রাজনৈতিক স্বাধীনতার মাল্যচন্দন পরাইবার জন্য অগ্রসর হইবেন—তখন আর আমাদিগকে বিলাত পর্য্যন্ত গিয়া ভিক্ষুকের ন্যায় ইংরেজের দ্বারে দ্বারে ভারতের দুঃখকাহিনী কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে হইবে না।

বঙ্গের মুখশ্রী যাঁহা হইতে উজ্জ্বল হইয়াছে সেই মহাকবি দীপকরাগে গাহিয়াছেন—

"ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,

আপনি আসিয়া ভক্তরণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
"এখন সেদিন না হবে বে আর
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না—হবে না—খোল তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন॥"

তরবার খুলিলেই যদি ভারত উদ্ধার হইত, তবে এতদিন যাত্রাগানের ভীমার্জ্জুন কিংবা থিয়েটারের প্রতাপাদিত্যগণের দ্বারা কবে ভারতবাসী স্বাধীন হইত। যদি বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে কিংবা কবিত্বের উদ্দীপনায় ভারত-উদ্ধার হইত, তবে দেশে এত বাগ্মী ও বক্তা থাকিতে আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন? আমরা কতকাল ধরিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বীরগণের ঐতিহাসিক কাহিনী আলোচনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের মনে বীরত্ব জাগিয়া উঠে না কেন? ভারত-উদ্ধার এখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিয়া আমার বিবেচনায় আমাদিগকে একবার আত্ম-উদ্ধারে মনোনিবেশ করিতে হইবে। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, পূর্ব্বতন আর্য্যগণের তপস্তার ফলে এখনও আমাদের মধ্যে সেই আত্ম-উদ্ধারের বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সেই আত্ম-উদ্ধারের বীজ কোথায়? হিন্দু-জাতির ধর্ম্মপ্রবণ চিত্তে। ধর্ম্মের উৎকর্ষদ্বারাই একদিন আমাদের ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব, সামাজিক একতা এবং জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সংঘটিত হইয়াছিল, আবার সেই ধর্ম্মের অপকর্ষদ্বারাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার অধঃ-পতন ঘটিয়াছে। ধর্ম্মই হিন্দুর জীবনবায়ু, ধর্ম্মই হিন্দুর জাতীয়জীবনের pulse। তাই এই নিদারুণ অধঃপাতের দিনেও এক ধর্ম্মের নামে সমগ্র হিন্দুজাতির হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে একমাত্র ধর্ম্মের নামে প্রত্যেক হিন্দুর ধমনীতে ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া থাকে, একমাত্র ধর্ম্মচুম্বকের আকর্ষণবলে সমাজের বহুধাবিচ্ছিন্ন চির-মরিচা-পড়া লৌহকণাগুলি ছুটিয়া আসিয়া পুঞ্জীকৃত হয়। এই ধর্ম্মের আকর্ষণে সেদিন বিহার-অঞ্চলে হিন্দুজন-সাধারণ গোহত্যানিবারণের জন্য মুসলমানের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এই জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের বলে এখনও সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী একমাস-দুইমাসের পথ হাঁটিয়া অনা-হারে অনিদ্রায় দুর্গম তীর্থসকল দর্শনের জন্য ছুটিয়া যায় এবং পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত ও কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় অম্লানচিত্তে প্রাণবিসর্জ্জন দেয়। এক ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন্ বস্তুর জন্য হিন্দুজাতি এ-ভাবে জীবন দিতে প্রস্তুত? হিন্দুজাতি কোন্ মহাপুরুষকে সমাজের নেতা বলিয়া স্বীকার করিবে? তাঁহাকে নহে,—যিনি মর্ম্ম-স্পর্শিনী জ্বালাময়ী ভাষায় স্বদেশহিতৈষণা-সমুদ্দীপক বক্তৃতা করিতে পারেন। তাঁহাকে নহে,—যিনি অগাধজ্ঞান, প্রখরবুদ্ধি ও সর্ব্বদর্শিভূয়োদর্শনবলে কূট রাজনৈতিক সমস্যাসকলের মীমাংসা করিতে পারেন। তাঁহাকে নহে,—যিনি শাণিত-কৃপাণ-করে অগণন-শত্রুদল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে জীবনবিসর্জ্জন দিতে পারেন। আজ যদি যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতাপ্রবর্ত্তক মহাবীর ওয়াশিংটন্ কিংবা ইটালীর দেশহিতৈষী বীরশ্রেষ্ঠ ম্যাট্‌সিনি, কিংবা ঊনবিংশ শতাব্দী

গৌরবরবি মহাত্মা গ্লাড্‌ষ্টোন্‌ আসিয়া আমাদের দেশে উপস্থিত হন, তবে হিন্দুজাতি তাঁহাদিগকে চিনিবে না। হিন্দুজাতির নেতা ছিলেন তপস্বিরাজ শ্রীরামচন্দ্র, ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বত্যাগী বিশ্বপ্রেমিক শুদ্ধোদন, পরমযোগী জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য। এরূপ কোন তপঃপরায়ণ মহাপুরুষ ভিন্ন কেহ কখনও হিন্দুজাতির নেতা হইতে পারেন নাই, এবং বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায় যদি কখনও আবার হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান ঘটে, তবে সে এইরূপ কোন তপস্বী মহাপুরুষের শুভাবির্ভাবেই ঘটিবে। আজ হিন্দুজাতি একজন প্রকৃত নেতার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া হাহাকার করিতেছে। সে শুভদিন কবে আসিবে,—যেদিন সেই মহাপুরুষের শুভাবির্ভাবে বহুযুগব্যাপী জীর্ণসংস্কারাভাবে হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে যে আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অগ্নিময় করসংস্পর্শে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে? কবে এই বিশাল ধর্ম্মবিটপীর গাত্রে কালাত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন-সাম্প্রদায়িক-মতভেদ-বশত যে সকল স্বল্প-আলোকিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটর নির্ম্মিত হইয়াছে, সেগুলি তাঁহার অঙ্গবিচ্ছুরিত-দিব্যজ্যোতিঃ-সঞ্চারে পূর্ণমধ্যাহ্নদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হইবে, এবং এই জীর্ণশীর্ণ ধর্ম্মতরু নবজীবন লাভ করিয়া জাতীয়তার সঞ্জীবস্নিগ্ধ পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইবে?

কিন্তু এইরূপ কোন ধর্ম্মবীরকে আবাহন ও আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইলে, আমাদেরও সাধনা চাই, তপস্যা চাই। বহু তপস্যার ফলে মর্ত্ত্যধামে তাঁহাদের শুভাগমন হয়। আমাদের এই দুর্গতির দিনে আমরা যেমন ওয়াশিংটন্‌, ম্যাট্‌সিনি, গ্লাড্‌ষ্টোন্‌কে চিনিব না, সেইরূপ রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করকেও চিনিব না। বহু সাধনাদ্বারা আমাদিগকে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী স্তরে উন্নীত করিতে পারিলে, তবে আমরা তাঁহাদের মহিমা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিব। কঠোর তপস্যাদ্বারা ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে পারিলে, আমরা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিব। মেঘমালার সঞ্চরণশীল বিদ্যুৎশিখা কেবল তখনই সনিনাদে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, যখন ভূপৃষ্ঠস্থ তড়িৎশক্তি সমানতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করে। সুতরাং মনুষ্যত্বলাভ করিতে হইলে,—জাতীয়জীবন গঠন করিতে হইলে,—হিন্দুজাতির নেতাকে অভিনন্দন করিতে হইলে, আমাদের হৃদয়নিহিত ধর্ম্মবীজকে তপস্যাদ্বারা, সংযমদ্বারা, আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে হইবে। কঠোর তপস্যা ভিন্ন এ জাতির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নাই।

তপস্যাদ্বারা পূর্ব্বকালে কার্য্যসিদ্ধি হইত, এখন কি হয় না? ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি, আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনেও যেখানে যেখানে তপঃপ্রভাব কিছুমাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই এক একটি জাতীয় অভ্যুত্থানের উদ্ভব হইয়াছে। যেমন কোন স্থানে বিন্দুমাত্র মিষ্টরস পাইলে পিপীলিকাশ্রেণী তাহার অন্বেষণে ধাবিত হইয়া সেই মিষ্টরসের আস্বাদে মজিয়া যায়, এমন কি, সেই মিষ্টরসে পুঞ্জীকৃত হইয়া

ডুবিয়া তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করে, সেইরূপ তপস্যা হিন্দুজাতির এতই প্রিয়, ধর্ম্ম হিন্দু-জাতির জীবনের অন্নরসের সহিত এতদূর গূঢ় ও গাঢ়রূপে সম্বদ্ধ যে, এই বর্ত্তমান সময়েও যিনি যিনি নিজের জীবনে কিছুমাত্র তপোমাহাত্ম্য বিকশিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দুসমাজের একএকটি নেতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া একএকটি সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে বর্ত্তমান সময়ে মহাবীর শিবাজীর বৈরাগ্য-দ্যোতক-গৈরিকপতাকা-তলে মহারাষ্ট্রীয় জাতির এক মহাজাতীয় অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। এইরূপে সন্ন্যাসব্রত শিখগুরুর অধিনায়কতায় ভাবতগৌরব শিখজাতির এক বিরাট্ অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। এইরূপে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসসাধন-বলে বঙ্গদেশে এক তুমুল প্রেমতরঙ্গপ্রবাহ ছুটিয়াছিল। এইরূপে তপস্বিপ্রবর শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের তপঃসাধনার দৃষ্টান্তে বর্ত্তমান সময়েও আর্য্যধর্ম্মের এক বিশাল অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। শুদ্ধ তপস্যাদ্বারা মানবজীবন কতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহা এই শেষোক্ত মহাপুরুষের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। Mr. William Digby তাঁহার "Prosperous British India" নামক গ্রন্থে বলেন—

"During the last Century the finest fruit of British intellectual culture was probably to be found in Robert Browning and John Ruskin. Yet they were mere gropers in the dark compared with the uncultured and illiterate Ram Krishna of Bengal, who knowing naught of what we term learning, spake as no other man of his age spoke and revealed God to weary mortals" — (Chap II—p. 99).

সেই ত্রেতাযুগে আমরা দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র এক তপস্যাকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মর্ষিপদবীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই ঘোর কলিযুগেও আমরা দেখিতেছি, সেই তপস্যার বলে একটি অশিক্ষিত বিষয়বুদ্ধিহীন শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য সামান্য পূজারী ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাগৌরবান্বিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বলতম প্রদীপ Robert Browning ও John Ruskinকেও দিব্যজ্ঞানের আলোকে নিষ্প্রভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ের বাঙালীসমাজেও তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙালী-জাতি বুদ্ধিবলে, বিদ্যাবলে এতদূর উন্নত কিসে? এই জাতীয় অধঃপাতের দিনেও আর কোন্ প্রদেশ স্বল্পকালমধ্যে রামমোহন রায়, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমগ্র ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী এতগুলি রত্ন (আমি কোন জীবিত মহাত্মার নামোল্লেখ করিতেছি না) প্রসব করিতে সক্ষম হইয়াছে? ইহার কারণ—এই সকল মহাত্মা-দিগের পিতৃপিতামহগণের তপস্যা। বর্ত্তমান

সময়ে অনেক উদ্দামগতি সমাজসংস্কারক মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনকে তাঁহাদের সংস্কারপথের বিষদিগ্ধ কণ্টক বলিয়া জ্ঞান করেন। বাজিকরগণ যেমন তাহাদের ভোজবাজি দেখাইবার পূর্ব্বে আত্মারাম সরকারকে একবার গালি না দিলে তাহাদের ভেল্কিবিদ্যা সিদ্ধ হইল না মনে করে, আমাদের সমাজসংস্কারকগণও রঘুনন্দনকে একবার গালি না দিলে তাঁহাদের সংস্কারচেষ্টা বিফল হইল মনে করেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাঙালীসমাজ এই মহাত্মার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। উক্ত মহাত্মা মন্বাদিস্মৃতিসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক তাঁহার অষ্টাবিংশতিতত্ত্বসঙ্কলনদ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মচর্য্যার পথ সুগম করিয়া-দিয়া হিন্দুসমাজের যে মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীসন্ধ্যাবর্জ্জিত হইয়া এখনও পর্য্যন্ত যে দরোয়ান ও পাচকশ্রেণীতে পরিণত হন নাই,—এখনও যে উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে ক্রমাগত সহস্র সহস্র graduate ও under-graduate বাহির হইতেছেন,—তাহার একমাত্র কারণ রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র। বিগত সহস্রাধিক বর্ষের পরাধীনতার প্রচণ্ড নিষ্পেষণে বাঙালীজাতির মানসিক বৃত্তিনিচয় যে একেবারে ভগ্ন ও দলিত হইয়া যায় নাই, তাহার কারণ রঘুনন্দনের সংগৃহীত বিশুদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান-নিয়ম-সংযমের পালনদ্বারা উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মনে পুণ্য ও পবিত্রতার বল সঞ্চিত হইয়া তাহাকে elastic (স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট) করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল কঠোর তপোনিয়ম এতদিন এ জাতিকে জীবিত রাখিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার স্রোতে এখন সেই সকল সামাজিকস্বাস্থ্যপ্রদ আচার-অনুষ্ঠান ভাসিয়া যাইতেছে। এখন বাঙালীসমাজে আহার-বিহারে, আচার-অনুষ্ঠানে সংযম-সহিষ্ণুতা-শীলতার অভাব ক্রমেই সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে সমাজে এক উদ্দাম-উন্মুক্ত স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাই এখন বাঙালীর মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষের সংখ্যা দিনদিনই বিরল হইতেছে। বাঙালীসমাজ এখন ক্রমেই নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

খুড়া-মহাশয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শরতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। বড় ঘরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া গগন চক্রবর্ত্তী তামাক খাইতেছেন। ঘরের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি পীড়িত, এখনি ডাক্তার আসবার কথা আছে।

ইঁহারা দুই ভাই, নবীন ও গগন। গ্রামটি নৈহাটির নিকট চন্দ্রদেবপুর। ইঁহারা এখানকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কিন্তু শুনা যায় নাকি, বৃদ্ধ নবীনের হাতে নগদ দশহাজার টাকা আছে। কেহ বলে ইহ' বাজে গুজব, কেহ বলে ইহা সত্য কথা। কিন্তু কেহই সে টাকা স্বচক্ষে দেখে নাই। সে টাকা যে লোহার সিন্ধুকটিতে আছে অথবা নাই, সেই সিন্ধুকটি-মাত্র সকলে দেখিয়াছে। সেটি বৃদ্ধের শয়ন-কক্ষে অবস্থিত। বৃদ্ধ সর্ব্বদা সেই ঘরে থাকিয়া সিন্ধুকটি আগ্‌লাইয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্র নবকুমার পশ্চিমে চাকরি করে, সে অনেকবার পিতাকে স্বীয় কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ কখনও যান নাই। সকলে বলে, তিনি সিন্ধুকটি ফেলিয়া যাইতে পারেন না।

গগন চক্রবর্ত্তী বসিয়া-বসিয়া নীরবে তামাক খাইতে লাগিলেন। ক্রমে ডাক্তার-বাবুর লণ্ঠনের আলো উঠানে পড়িল। ডাক্তারবাবু আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন -"চক্রবর্ত্তিমশাই, খবর-কি ?"

চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি নামাইয়া বলিলেন—"ডাক্তারবাবু ? এস। খবর ভাল। এখনও বেহুঁস রয়েছেন,—বড্ড জ্বরটা রয়েছে কিনা। কিন্তু নাড়ী বেশ চল্‌ছে এখনও। উঠে এস —একবার দেখ না।"

ডাক্তারবাবু উঠিয়া আসিলেন। চক্র-বর্ত্তী হুঁকাটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া দুয়ার খুলিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। পিল্‌সুজের উপর একটি মাটীর প্রদীপ ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল। একখানি লম্বা ও চওড়া তক্তাপোষের উপর মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধরোগী নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার পুত্রবধূ সাবিত্রী পায়ে হাত বুলাইতেছে।

ইঁহাদের প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাবিত্রী ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। গগন চক্রবর্ত্তী প্রদীপটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। ডাক্তার বৃদ্ধের নাড়িপরীক্ষা করিলেন,—থার্ম্মিটার্ দিয়া উষ্ণতা লইলেন। পরী-ক্ষান্তে বলিলেন--"এখনও খুব জ্বর। সে ফিবার্-মিক্‌শ্চার্‌টা খাওয়ান হচ্চে ?"

সাবিত্রী তাহার ঘোম্‌টাবৃত মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, হইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন--"আজ সারারাত্রি ওটা দেওয়া হোক্। ভোরের দিকে রিমিশন্ হবার সম্ভাবনা।"

বলিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিলেন। গগনচন্দ্রও তাঁহার সহিত দরজা অবধি যাইলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবুকে খবর দিয়েছেন?"

"নাঃ, দিই নি। কিছু ভাবনা নেই, দাদা ভাল হ'য়ে উঠ্‌বেন। ওরকম ত হয়ই ওঁর মাঝে মাঝে। নবুকে খবর দিলেই এখনই খরচপত্র করে' বাড়ী আসবে তাই খবর দিই নি।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন "গতিক বড় ভাল বোধ হচ্চে না কিন্তু। আজ পাঁচ পাঁচ দিন জ্বরটা ছাড়্‌ল না,—ভারি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন। জ্বর ছাড়্‌বার সময় সাম্‌লাতে পার্‌লে হয়।"

গগন বলিলেন—"আরে না না। আমি এতকাল দেখ্‌ছি। কিছু ভয় নেই।"

"দেখা যাক্। অনেক বয়সটা হয়েছে কিনা, তাই ভয় হয়।" বলিয়া ডাক্তারবাবু মৃদুমন্দপদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারবাবুর কথাই সত্য হইল,—ভোর-বেলায় প্রাণবায়ু বৃদ্ধের দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুইএক মিনিটের জন্য মাত্র তাঁহার চেতনা হইয়াছিল। তখন তিনি শুধু বলিয়াছিলেন—"নবু—নবু এসেছে?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিলে, পাড়ার লোক দুইটি-একটি করিয়া আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই বলিল—"তা বেশ গেছেন, খুব গেছেন। বয়স হয়েছিল, তোমাদের সব রেখে গেছেন,—এ ত ওঁর সৌভাগ্য। তবে নবু কাছে থাক্‌লেই ভাল হ'ত।"

সৎকারের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। সেখানে সত্যচরণ নামে একটি যুবক দাঁড়াইয়া ছিল,—সে নবকুমারের একজন বিশেষ বন্ধু। তাহার হাতটি ধরিয়া গগনচন্দ্র বলিলেন "তুমি বাবা গিয়ে নবুকে একখানি টেলিগ্রাপ্ করে' দাও। আমার আর হাত-পা আস্‌ছে না।"

সত্যচরণ বলিল "আচ্ছা, আমি আপিস যাবার সময় ষ্টেশন্ থেকে টেলিগ্রাপ্ করে' দেব এখন।" সত্যচরণ কলিকাতায় চাকরি করে—রোজ নয়টার ট্রেণে আপিস্ যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সে দিনটি শোকের মধ্যে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে সকলে দুগ্ধাদি পান করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিল। গগনচন্দ্র বিপত্নীক। তিনি একা একঘরে শয়ন করিয়া-ছিলেন। অনেক রাত্রি হইল,—গৃহের কুত্রাপি আর কোন সাড়াশব্দ নাই—কেবল গগনচন্দ্র তাঁহার শয্যায় এপাশ-ওপাশ করিতেছেন। শোকটা ইঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাগিয়াছে বুঝি? ইহা শোক, না আতঙ্ক?- দুইটি নিকটসম্পর্কীয় বৃদ্ধের মধ্যে একটি মরিলে, অপরটির সহজেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়;—তাঁহার মনে হয়, এই-বার আমার পালা ত আসিল।

যাহা হউক, ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। গগনচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অন্ধকারে, অতি সন্তর্পণে, নিজেরা ঘরের খিলটি খুলিয়া, নগ্নপদে বাহিরে আসিয়া

দণ্ডায়মান হইলেন। জমাট অন্ধকার,—তাহার উপর আকাশে মেঘ করিয়াছে। মাঠের প্রান্তে শৃগাল একটা ডাকিয়া উঠিল। গগনচন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বড় ঘরের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন। যে ঘরে গতরাত্রে বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে,—সে ঘরটি আজ তালা-বন্ধ। গগনচন্দ্র নিঃশব্দে তালাটা খুলিয়া সেই অন্ধকারঘরে প্রবেশ করিলেন। ভয়ে তাহার বুকটা দুরুদুরু করিয়া উঠিল। হায় ভ্রাতৃস্নেহ!—এতরাত্রে নিদ্রাহীনচক্ষে ভ্রাতা বুঝি ভ্রাতার মৃত্যুশয্যাটি একবার দেখিবার জন্য ও অশ্রুপাত করিবার জন্য আসিয়াছেন!

গগনচন্দ্র পূর্ব্ববৎ সাবধানতার সহিত ঘরের দুয়ারটি প্রথমে বন্ধ করিয়া দিয়া একটি দিয়াশালাই জ্বালিলেন। প্রদীপটি জ্বালিয়া, পূর্ব্বকথিত লোহার সিন্ধুকটির নিকট অগ্রসর হইলেন। সিন্ধুকটির উপর হইতে একটি ভাঙা কাঠের হাতবাক্স, একখানি ছিন্ন মহাভারত ও কয়েকটি খালি ঔষধের শিশি নামাইয়া, সিন্ধুকটি খুলিয়া ফেলিলেন। কয়েকটি কাপড়ের পুঁটুলি তাহা হইতে নামাইবার পর, নীচের দিক্ হইতে পুরাতন-লালচেলা-বাঁধা একটি ছোট পুঁটুলি বাহির হইল। সেইটি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে তাড়াবন্দি অনেক নোট্ রহিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র, সেই ক্ষীণালোকে, সেই মৃত্যুকক্ষে গগনচন্দ্রের মসীকৃষ্ণ মুখমণ্ডলে শুভ্র দন্তপংক্তির ছটা ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ত্বরিতহস্তে পুঁটুলিগুলি যথাস্থানে পুনঃসন্নিবিষ্ট করিয়া, গগনচন্দ্র সিন্ধুকটি বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাভারত ও ভাঙা বাক্স ও ঔষধের শিশিগুলি তাহার উপর পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া-রাখিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া, দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া, নিজ শয্যাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুয়ারটি বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া, গগনচন্দ্র শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। বালিশের নিম্নে তাঁহার চশ্মার খোলটি ছিল। চশ্মাটি চক্ষে লাগাইয়া, নোটের তাড়াগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।—কেবল দশটাকার নোট্,—একখানিও নম্বরওয়ারি নোট্ তাহাতে ছিল না। একটি তাড়া খুলিয়া নোট্গুলি সাবধানে গণনা করিয়া দেখিলেন,—একশতখানি আছে,—হাজার টাকা। প্রত্যেক তাড়াটি খুলিয়া একে একে গণনা করিলেন, প্রত্যেকটিতেই হাজার টাকা করিয়া। এরূপ দশটি তাড়া ছিল—দশহাজার টাকা।

একবার গণিয়া তৃপ্তি হইল না,—গগনচন্দ্র নোট্গুলি বারংবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে ভোর হইয়া পড়িল। তখন তিনি পুঁটুলিটি নিজের সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া, ঘরের বাহিরে আসিলেন।

দুইএকটা কাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে—অল্প অল্প আলো হইয়াছে। গাড়ুটি হাতে করিয়া, বাটীর বাহির হইয়া, আম্রবাগানের ভিতর দিয়া গগনচন্দ্র পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তখনও কোথাও জনমনুষ্যের দেখা নাই। প্রথমেই গগনচন্দ্র, দাদার লোহার সিন্ধুকের চাবিটি, জোরে ছুড়িয়া পুষ্করিণীর মধ্যস্থানে নিক্ষেপ করি-

লেন। তাহার পর হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া গাড়ুতে জল ভরিয়া, ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইদিন বেলা নয়টার সময় প্রবাস হইতে সন্তঃপিতৃহীন নবকুমার বাটী আসিয়া পৌছিল। সে ইতিমধ্যেই নিজের সাধারণ বেশ পরিত্যাগ করিয়া কাচা পরিয়াছে, পদ নগ্ন করিয়া আসিয়াছে।

নবকুমারের বাড়ী পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল। তাহা শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সকলে বলিল—"নবু, কেঁদ না বাবা, চুপ কর। বাপ-মা কি আর লোকের চিরদিন থাকে? এই তোমার খুড়োমশায় রয়েছেন, হনিই এখন তোমার বাপ হলেন। চুপ কর বাবা।"

প্রতিবেশীরা গৃহ ত্যাগ করিবার সময় পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—"আহা,—গগনচক্রবর্ত্তী বুড়োর চেহারাটা কি হ'য়ে গেছে দেখেছ একদিনে! চোখটোখ সব একবারে বসে' গেছে।"

একজন বলিল "আহা, ভাইয়ের শোকটা বড় লেগেছে বামুনের।"—চক্ষু-বসার আসল কারণ যে সারারাত্রি জাগরণ ও মনের অঙ্গনে শয়তানের তাণ্ডবনৃত্য, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না।

যথাসময়ে নবকুমার খুড়ামহাশয়ের সহিত বসিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিল। ভোজনান্তে গগনচন্দ্র মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন, নবকুমার তাঁহার কাছে বসিয়া ছিল। খুড়ামহাশয় বলিলেন—"শ্রাদ্ধশান্তির ত আয়োজন এইবেলা থেকে কর্‌তে হবে! টাকাকড়ি কিছু এনেছ?"

নবকুমার বলিল—"টাকাকড়ি আমি কোথায় পাব? বাবার সিন্ধুক থেকে কিছু বেরুতে পারে বোধ হয়।"

"তা দেখ যদি কিছু থাকে।"

"চাবিটা?"

"চাবি? চাবি কোথায়, তা ত বল্‌তে পারি নে।—হয় ত বউমাকে দিয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

নবকুমার গিয়া সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল। সাবিত্রী বলিল "আমাকে ত দিয়ে যান নি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কোমরের ঘুন্‌সীতে ছিল দেখেছি। খুড়োমশায় হয় ত খুলে নিয়ে থাক্‌বেন।"

"না,—উনি ত বল্লেন—চাবি কোথায়, কিছুই জানেন না।"

নবকুমার ফিরিয়া-আসিয়া খুড়ামহাশয়কে এই কথা বলিল। তিনি বলিলেন—"তার কোমরে ছিল! তা ত লক্ষ্য করি নি। তবে হয় ত তার সঙ্গে চিতায় উঠেছে।"

নবকুমার একটু বিরক্তির সঙ্গে বলিল—"ওটা আপনি লক্ষ্য কর্‌লেন না?"

খুড়ামহাশয় হুঁকা নামাইয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিলেন—"আরে বাবা—সে সময় কি আমার চাবি-সিন্ধুক-টাকাকড়ি ভাব্‌বার মত মনের অবস্থা ছিল? সে সব তোমরা বোঝ না।"

নবকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। খুড়ামহাশয় ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে নবকুমার বলিল—"তবে এখন উপায়?"

"উপায় আর কি? কামার ডাকিয়ে সিন্ধুক খোলাতে হবে।"

কামার ডাকাইয়া সিন্ধুক খোলান হইল। তাহা হই ত কেবল গুটিত্রিশেক নগদ টাকা আর নবকুমারের পরলোকগত জননীর খানকয়েক সোনা ও রূপার পুরাতন অলঙ্কার বাহির হইল।

ইহা দেখিয়া নবকুমার ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারও বরাবর মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাহার পিতার সিন্ধুকে নগদ দশহাজার টাকা আছে। তাহার মনে বিশ্বাস হইল, খুড়ামহাশয়ই সে টাকা সরাইয়াছেন। অথচ তাহার সাক্ষসাবুদ কিছুই নাই।

খোলা সিন্ধুকের সম্মুখে নবকুমার বসিয়া ভাবিতেছিল, এমনসময় খুড়ামহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু পেলে?"

সিন্ধুক হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, নবকুমার তাহা দেখাইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল "দশহাজার টাকা ছিল যে, কোথা গেল?"

গগনচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কত টাকা?"

"দশহাজার।"

খুড়ামহাশয়ের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন—"দশহাজার টাকা! পাগল! কোথা পাবেন তিনি?"

নবকুমার বলিল—"কেন, সকলেই ত বলত, এই সিন্ধুকে তাঁর দশহাজার টাকা আছে।"

"সকলে ত সব জানে। কেন, দাদা ত সর্ব্বদাই বল্‌তেন, তাঁর এক পয়সাও নেই। তুমি পশ্চিম থেকে যা টাকাকড়ি পাঠাতে, মাঝে মাঝে তাও খরচপত্র কর্‌তেন, আর দু-পাঁচ টাকা জমিয়েছিলেন। হ্যাঃ—দশ-হাজার টাকা। দশহাজার টাকা কি সাধারণ কথা রে বাবা।"

নবকুমার আর কি করিবে। নীরবে মনের সন্দেহ ও রাগ হজম করিয়া, যথাসময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। অল্পদিন পরেই তাহার ছুটি ফুরাইল,—ভগ্নহৃদয় লইয়া কর্ম্ম-স্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে! এতদিন তাহার পিতার সেবাশুশ্রূষার জন্য স্ত্রীকে বাটীতে রাখিয়াছিল। এবার সাবিত্রীকে সে পশ্চিমে লইয়া নিজের কাছে রাখিবে। স্ত্রীকে বলিয়া গেল, পূজার ছুটি হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে একটা বাড়ী ঠিক করিয়া, পূজার সময় আসিয়া, তাহাকে লইয়া যাইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নবকুমার কলিকাতায় আসিল। পুরাতন গহনাগুলি বিক্রয় করিবে, কিছু কাপড়-চোপড়ও কিনিবার প্রয়োজন আছে। সারা-দিন বউবাজার ও বড়বাজারে ঘুরিয়া আড়াই-শত টাকায় গহনাগুলি বিক্রয় করিল। বড়-বাজারে একটা কাপড়ের দোকানে বসিয়া কিছু কাপড় খরিদ করিল। তাহার পকেট্-বুকে নোট্ ছিল, টাকা দিবার জন্য পকেট্-বুক্ বাহির করিতে যাইয়া দেখে,—পকেট্-বুক্ নাই—জুয়াচোরে কখন্ চুরি করিয়াছে, জানিতে পারে নাই।

বিপদের উপর বিপদ্! সেই পকেট্-বুকে তাহার রিটার্‌ন্ টিকিটখানি পর্য্যন্ত ছিল,

—আড়াইশত টাকার নোট্ ছিল,—খানকতক পুরাতন চিঠিপত্র ছিল সব গিয়াছে।

দোকানের কাপড় দোকানে রাখিয়া, নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল। আজ পঞ্জাব-মেলে সে কর্ম্মস্থানে ফিরিবে ভাবিয়াছিল, এমন টাকা নাই যে, নূতন টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া যায়।

ভাবিল, পরদিন সত্যচরণ আসিলে, আপিসে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু টাকা ধার লইয়া যাইবে। দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া কোনরকমে নবকুমার বাসায় রাত্রিযাপন করিল।

প্রভাতে, তখনও নবকুমার শয্যাত্যাগ করে নাই, -বাসার একটি মোটা বাবু একখানি সংবাদ পত্র হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন—"নবকুমারবাবু, দেখুন, ঈশ্বর যা করেন, তা ভালর জন্যেই করেন। কাল যে আপনার পকেট্‌বুক্ চুরি হয়েছিল, সেটা একটা খুব মঙ্গল বল্‌তে হবে।"

নবকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কেন ব্যাপারটা কি?"

স্থূলকলেবর যুবকটি সংবাদপত্র হইতে পাঠ করিলেন—"গতরাত্রে পঞ্জাব-মেল্ আশান্‌শোলের নিকট পৌঁছিলে একটি মাল গাড়ির সঙ্গে ভীষণ কলিশন্ হইয়া যায়। দুইতিনখানি যাত্রিগাড়ি চূর্ণ হইয়াছে। ড্রাইভার্ অত্যন্ত আহত হইয়া হাঁসপাতালে আছে। যাত্রিগণের মধ্যে ছয়জন মৃত ও বাইশজন সাংঘাতিকরকম আহত। মৃতের তালিকা—"

মৃতের তালিকার মধ্যে "নবকুমার চক্রবর্ত্তী"র নামও পাওয়া গেল।

স্থূলবাবুটি বলিলেন "কিরকম? আপনিও মরেছেন নাকি?"

নবকুমার বলিল—"বোধ হয় আমার নামের অন্য কেউ?"

যুবকটি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি নবকুমারবাবুর ভূত নন ত? কি জানি মশাই, বিশ্বাস নেই।" বলিয়া বাবুটি চলিয়া গেলেন।

এ কথা শুনিয়া নবকুমারের মস্তিষ্কে দুই-একটা কথার উদয় হইল। সে সকাল-সকাল আহার সারিয়া, সত্যচরণের নিকট টাকা ধার করিয়া, আশান্‌শোলে চলিয়া গেল।

সেখানে গিয়া পুলিস্ আফিসে সন্ধান লইল। জিজ্ঞাসা করিল—"একজন নবকুমার চক্রবর্ত্তী বলে' যে মরেছে—আপনারা তাঁর নাম জান্‌লেন কি করে'?"

দারোগা বলিল—"তার পকেট্ থেকে এই পকেট্‌বুক্‌টি বেরিয়েছে।"

নবকুমার দেখিল, তাহারই পকেট্‌বুক্—তাহাতে তাহার নোট্, চিঠি, রিটারন্‌টিকিট, সবই রহিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই;—সেই জুয়াচোরই তবে মারা পড়িয়াছে। পাপের এরূপ হাতে হাতে প্রতিফল আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে?"

"আমি নবকুমারবাবুর একজন বন্ধু।"

"লাশের কি হবে? অ্যাক্‌সিডেণ্টের পর আমরা খবরের কাগজে টেলিগ্রাফ করেছি। লাশের আত্মীয়রা এসে কেউ জালাবার বন্দোবস্ত করে ত করবে, নইলে আমরা পুঁতে ফেল্‌ব।"

নবকুমার একবার ভাবিল,—পুঁতিয়াই ফেলুক। তাহার মস্তকে এই সময়ে একটা মৎলব পাকা হইয়া আসিতেছিল। ভাবিল, যদি সংবাদ পাইয়া খুড়ামহাশয় আসেন, ত লাশ দেখিয়াই জানিতে পারিবেন, আমি নাহি।

দারোগার নিকট লাশ জ্বালাইবার অনুমতি চাহিল। দারোগা বলিল—"আর এ টাকাকড়ি? লাশের ওয়ারিশান্ কে?"

"লাশের এক স্ত্রী আছে, খুড়া আছে। স্ত্রী ওয়ারিশ। খুড়াকে খবর দিলে আসিয়া টাকা লইয়া যাইবে।"

দারোগা খুড়ার ঠিকানাদি নোট্ করিয়া লইল। লাশ জ্বালাইয়া নবকুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। স্থূলবাবুটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মশাই? খবর কি?"

নবকুমার গম্ভীরভাবে বলিল—"গিয়ে দেখ্‌লাম,—আমি নই,—আর একজনই মরেছে বটে!"

বাবুটি বলিলেন—"তবু ভাল।"

পরদিন সত্যচরণের আপিসে গিয়া নবকুমার তাহার সঙ্গে দেখা করিল। শুনিল, যদিও পল্লিগ্রামে দৈনিক কাগজ যায় না, তথাপি লোকমুখে বাটীর লোক তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছে। সত্যচরণের সঙ্গে অনেকক্ষণ গোপন-পরামর্শ করিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকাল,—গগনচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। পাড়ার দুইচারিজন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গতকল্য নবকুমারের শ্রাদ্ধ হইয়া গেছে। বৃদ্ধের শ্রাদ্ধ যেমন ঘটা করিয়া হয়, যুবকের শ্রাদ্ধ সেরূপ হয় না। গগনচন্দ্র আশানূশোল হইতে নবকুমারের যে আড়াইশত টাকার নোট্ আনিয়াছিলেন,—তাহারই মধ্যে হইতে কেবল পঞ্চাশটি টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। বাকী দুইশত টাকা নবকুমারের বিধবাকে দিয়াছেন।

সাবিত্রী যখন সধবা ছিল, তখন সর্ব্বত্র তাহার যে একটা সুনাম ছিল,—তাহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। যেদিন স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসে, সেইদিনমাত্র সে অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিয়াছিল। রাত্রে সত্যচরণের স্ত্রী আসিয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। পরদিন হইতে সে মুখখানি বিমর্ষ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সদ্যোবিধবার যেরূপ হওয়া উচিত তাহার কিছুই দেখা যায় না। প্রায় রোজই দ্বিপ্রহরে সত্যচরণের স্ত্রীর কাছে যায়। এ অবস্থায় এরূপ করিয়া পাড়া-বেড়ানো কি তাহার উচিত? এরূপ অস্বাভাবিক বালবিধবা ত হিন্দুগৃহে প্রায় দেখা যায় না।

সমবেত বৃদ্ধগণের মধ্যে হুঁকাটি নিয়মিতরূপে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। এ সভাটি অদ্য প্রায় নীরব, কেবল মাঝে কেহ কেহ বলিয়া উঠিতেছেন—"সংসার অনিত্য, সকলই মায়া!"—কেহ বা বলিতেছেন,—"আহা নবকুমার বড় ভাল ছেলে ছিল;—আজকালকার দিনে ওরকম প্রায় দেখা যায় না।"

একটু পরে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। মুহূর্ত্ত পরে, বাড়ীর চাকর চিনিবাস, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গলদঘর্ম্ম হইয়া, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া, বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ

করিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শুধু দুইবার বলিল—"কত্তা কত্তা।" তাহার মুখে আর কোন বাক্যনিঃসরণ হইল না,—লোকটা সেইখানে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া, প্রচলিত উপায়ে তাহার মুখে জল দিয়া, তাহাকে পাখা করিয়া, ক্রমে তাহার চেতনা-সম্পাদন করিলেন। ক্রমে লোকটা সুস্থ হইতে লাগিল। সকলে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন –"কিরে চিনিবাস, অমন করলি কেন?"

চিনিবাস তখন ভয়ে শিহরিয়া বলিল - "রাম রাম রাম। ভূত কত্তা।"

উঁহার মধ্যে যে বৃদ্ধটি বাল্যকালে কিঞ্চিৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—"দের বেটা চাষা—ভূত কি? ভূত আছে নাকি?"

চিনিবাস চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল "ভূত নাই। ঐ পুকরধারে বাঁশতলায় দেখগা ঠাকুর।"

অনেক প্রশ্নাদির পর ক্রমে ক্রমে চিনিবাস বলিল, কিছু পূর্ব্বে যখন সে পুকুরে বাসন মাজিয়া ফিরিতেছিল, তখন সেই পুকুরের ঈশানকোণে বাঁশঝাড়ের তলায় অন্ধকারে দেখিল আপাদমস্তক শাদা-কাপড়ে ঢাকা একটা-কি বেড়াইতেছে। নিকটবৰ্ত্তী হইবা-মাত্র পদার্থটা কাছে আসিল,—ঠিক ৺নব-কুমারের মত চেহারা,—আর বলিল "ওঁরে চিঁনে,—এঁকবার খুঁড়োমশাঁয়কেঁ ডেঁকে দিঁতে পাঁরিস্?"—তাহা শুনিবামাত্র চিনিবাস সমস্ত বাসন ও পাথরবাটী সেখানে ফেলিয়া পালাইয়া আসিয়াছে।

ইহা শুনিয়াই খুড়ামহাশয় রামনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"ঠিক দেখেছিস?"

"ঠিক না ত কি বেঠিক দেখেছি কত্তা। ওরে বাবারে, আর আমি সন্ধেবেলা বাসন মাজতে যাব না।"

পূর্ব্বোক্ত নাস্তিকপ্রকৃতির বৃদ্ধটি বলিলেন—"চক্রবর্ত্তিমশায়, ঐ কথা আপনি বিশ্বাস করছেন? বেটা অসাবধানে বাসন-গুলো ভেঙে ফেলেছে—তাই এসে ঐ একটা গুজব করছে।"—কিন্তু বক্তার হৃদয়ের ভিতরটা গোপনে দুরদুর্ করিতে লাগিল।

সে সন্ধ্যা ত কাটিল। তাহার পর, তিন-চারিদিন ধরিয়া, পাড়ার ভদ্রলোকেরা আসিয়া গগনচক্রবর্ত্তীর নিকট সংবাদ দিলেন, কেহ দীঘির ধারে, কেহ ভাঙা শিবমন্দিরের নিকট, কেহ অন্য কোথাও, "নবকুমারকে" দেখিয়া-ছেন। পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক বৃদ্ধটিকে আর সন্ধ্যার পর বাহির হইতে দেখা যায় না।—অন্যান্য বৃদ্ধেরা গগনচক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন "শাস্ত্র ত মিথ্যে হবার নয়। অপঘাতমৃত্যুটো হ'ল কিনা,—ও-রকম ত হবারই কথা। বছরটা পুরুক, গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ডি দিইয়ে দাও, উদ্ধার হ'য়ে যাবেন।"

একদিন সন্ধ্যার পর খুড়ামাহাশয় পুষ্করিণীর তীর হইতে মুখ ধুইয়া, জলভরা গাড়ুটি হাতে করিয়া, আমবাগানের ভিতর দিয়া ফিরিতেছিলেন। সহসা এক শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখটি ছাড়া সমস্ত গাত্র বস্ত্রে আবৃত ছিল। আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র

সে বলিল—"খুঁড়োমশায়,- সেঁ দঁশহাঁজার টাঁকা—"

আর শুনিবার পূর্ব্বে, খুড়ামহাশয় সেই-খানে গাড়ু আছাড়িয়া ফেলিয়া "রাম রাম" শব্দ করিতে করিতে উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পালাইলেন।

পরদিন অমাবস্যা;—সন্ধ্যার পর খুড়া-মহাশয় আর বাটীর বাহির হইলেন না। রাত্রি নয়টার সময় আহার করিয়া শয়ন করিলেন। যখন তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন,—রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময়, গাত্রে কাহার অতি শীতল হস্তস্পর্শে খুড়ামহাশয়ের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। খুড়ামহাশয় চমকিয়া ঘুমের ঘোরে বলিলেন—"কে ও?"

অন্ধকারের মধ্য হইতে শব্দ হইল—"আমি নঁবকুঁমার।"

শুনিবামাত্র খুড়ামহাশয়ের ঘুমের ঘোর চট্ করিয়া ভাঙিয়া গেল।

ভূত বলিল—"সেঁ দঁশহাঁজার টাঁকা আমার বঁউকে যঁতদিন না দিঁচ্চ—তঁতদিন রোঁজ আঁস্‌ব তাঁগাদা কঁরতে—রোঁজ আঁস্‌ব—রোঁজ আঁস্‌ব—রোঁজ আঁস্‌ব।"

বলিয়া নবকুমার চুপ করিল ভূতটি যে কে, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই অবশ্য বুঝিয়াছেন। খুড়ামহাশয়ের নিশ্বাস তখন ঘনঘন বহিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দাঁত ঠক্‌ঠক্ করিয়া মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। নবকুমার তখন খোলা জানালার কাছে গিয়া, তাহার একটি গরাদে কৌশলে সরাইয়া, নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। বাহিরে কিয়দ্দূরে সত্যচরণ অপেক্ষা করিতেছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যচরণ আপিস হইতে ফিরিয়া-আসিয়া নবকুমারকে সংবাদ দিল,—খুড়ামহাশয় তাহারই ট্রেণে কলিকাতায় গিয়াছিলেন,—সাবিত্রীর নামে দশহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়া আনিয়াছেন। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "এ টাকা কোথা থেকে এল?"

গগনচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"টাকাটা ছিল আমার দাদার। সকলে যে বল্‌ত, তাঁর দশ-হাজার টাকা আছে তা দেখ্‌ছি মিথ্যে নয়। কিন্তু তাঁর লোহার সিন্ধুক থেকে বেরোয় নি। কাল্‌কে রাত্রে হঠাৎ তাঁর একটা পুরোণো টিনের বাক্স খুলে দেখি, একটুক্‌রো লাল চেলীতে মোড়া দশহাজার টাকার নোট্। দেখে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হ'ল আর কি। আহা, আজ যদি নবু বেঁচে থাক্‌ত।—পিতৃধন। যা হোক, বিধবাটার উপায় হ'ল।"

ইহার পর নবকুমার কলিকাতায় গিয়া খুড়ামহাশয়কে এক চিঠি লিখিল। লিখিল, সে শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছে যে, তাহার মৃত্যুর একটা গুজব উঠিয়াছে এবং শ্রাদ্ধশান্তিও হইয়া গেছে কিন্তু বাস্তবিক সে বাঁচিয়া আছে এবং একটু কার্য্য উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে গিয়াছিল। অমুক তারিখে সে বাড়ী আসিবে এবং একদিন থাকিয়া স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিম যাত্রা করিবে।

নবকুমার বাটী আসিয়া শুনিল, খুড়া-মহাশয় কি-একটা জরুরি কার্য্য উপলক্ষ্যে গ্রামান্তরে গিয়াছেন। স্ত্রীকে লইয়া সে পশ্চিম চলিয়া গেল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

জীবক।*

[বুদ্ধের চিকিৎসক]

পালি বিনয়পিটকের প্রথম ও অষ্টম খন্ধকে এবং তিব্বতীয় ক্যাড্গুর গ্রন্থের দুল্ব অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে জীবকের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে। মগধসাম্রাজ্যের রাজগৃহনগরে জীবকের জন্ম হয়। কোন কারণে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবক, অষ্টাদশ বিদ্যা ও চতুঃষষ্টি কলা, ইহার কোন একটি শিখিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, এরূপ কল্পনা করিলেন। তদনুসারে তিনি তক্ষশিলায় † যাইয়া তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদের অধ্যাপকের নিকট স্বীয় প্রার্থনা জানাইলেন। এই অধ্যাপকের নাম আত্রেয়। অধ্যাপক জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমাকে কত করিয়া বেতন দিতে পারিবে?" জীবক বলিলেন—"মহাশয়, কাহাকেও না বলিয়া আমি গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি; সুতরাং আমি আপনাকে উপযুক্ত বেতন দিতে পারিব না, শিক্ষা সমাপন করিয়া আমি চিরজীবন আপনার দাস হইয়া থাকিব।"

---

* জীবকের বৃত্তান্তে কোন ঔপাখ্যানিক বৈচিত্র্য নাই। আড়াইহাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে চিকিৎসাবিদ্যার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার কতক আভাস ইহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

† জীবকের জন্মভূমি রাজগৃহ (Patna), কিন্তু তাঁহাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে তক্ষশিলায় (Punjab) যাইতে হইয়াছিল। ইহা দ্বারা অনুমান হয়, তখন তক্ষশিলা বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল। বস্তুত বৌদ্ধগ্রন্থে তক্ষশিলা সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাণিনি ও চাণক্য এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। তক্ষশিলা গান্ধারদেশের রাজধানী। ইহা ভারত ও পারস্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। পারসীক সম্রাট্ দরায়ুস প্রভৃতির অভ্যুদয়ের সময়ে তক্ষশিলা পারস্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রীকবীর আলেক্‌জান্দর তক্ষশিলা অধিকার করেন। গ্রীকগণের অধঃপতনের সময়ে ইহা শকরাজগণের হস্তগত হয়। তক্ষশিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশীয় সংস্কৃতচতুষ্পাঠীর শিক্ষাপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তক্ষশিলা বিদ্যালয়ে অষ্টাদশবিদ্যার আলোচনা হইত। প্রত্যেক বিদ্যা শিখাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিতেন। অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগের নিকট হইতে উপযুক্ত মাসিক বেতন অথবা একযোগে বহু অর্থ গ্রহণ করিতেন। মনু বলিয়াছেন—

গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা।
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থী নোপপদ্যতে॥

আমাদের দেশে গুরুশুশ্রূষাদ্বারা বিদ্যালাভ হইত। কিন্তু তক্ষশিলায় "পুষ্কল ধন" (বহু অর্থ) না দিয়া কেহই কিছু শিখিতে পারিতেন না। তক্ষশিলায় সেমিটিক্ সভ্যতার প্রভাব ছিল।

আত্রেয় * জীবকের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। জীবক ক্রমান্বয়ে সাতবৎসর অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র সমাপন করিলেন। তখন অধ্যাপক তাঁহার অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—"এই বিদ্যালয়ের চতুর্দিকে ১৬মাইলের মধ্যে যে সকল লতা ও বৃক্ষ আছে, উহাদের মধ্যে চিকিৎসায় যেগুলির প্রয়োজন হয় না, সেইগুলি অনুসন্ধান করিয়া আন।" চারিদিন পরে জীবক অধ্যাপকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিলেন—"মহাশয়, ঔষধে প্রয়োজন হয় না, এমন লতা পাইলাম না।" অধ্যাপক প্রীত হইয়া জীবককে গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। জীবক মগধে প্রত্যাবর্ত্তনকালে একদিন সাকেত- (অযোধ্যা)-রাজ্যে অবস্থিতি করেন। তথায় কোন রমণীর ঘোর শিরঃপীড়া হইয়াছিল। জীবক চিকিৎসাদ্বারা তাঁহার রোগবিমুক্তি করেন। তিনি একটু মাখন উত্তপ্ত করিয়া একটি ঔষধ উহার সহিত মিশাইয়া দেন এবং মিশ্রিত দ্রব্য উক্ত রমণীকে নস্য করিতে বলেন। রমণী ঐ দ্রব্যটি নাসিকাদ্বারা মস্তিষ্কে ও কণ্ঠে আকর্ষণ করিলেন। এইরূপ গ্রহণ করিবার পর তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরঃপীড়ার শান্তি হইল।

রাজগৃহে আসিয়া জীবক রাজা বিম্বিসারকে ভগন্দররোগ হইতে বিমুক্ত করেন। একটি ঔষধের মালিষে এই রোগের উপশম হয়। বিম্বিসার সন্তুষ্ট হইয়া জীবককে অপরিমিত অর্থ † প্রদান করেন।

* আমরা দেখিলাম, জীবক যে সময়ে তক্ষশিলায় গমন করেন, তখন আত্রেয় তত্রত্য বিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। হিন্দুচিকিৎসাগ্রন্থে অত্রিপুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাঙ্গহৃদয়ে লিখিত আছে—

ব্রহ্মা স্মৃত্বায়ুষো বেদং প্রজাপতিমজিগ্রহৎ।
সোঽশ্বিনৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোঽত্রিপুত্রাদিকান্ মুনীন্॥

ব্রহ্মা চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক। তদনন্তর দক্ষপ্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র ও অত্রিপুত্র প্রভৃতি এই শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার করেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে যে অত্রিপুত্রের উল্লেখ আছে, তিনি বৌদ্ধগ্রন্থের আত্রেয় ভিন্ন আর কেহই নহেন। তিব্বতীয় গ্রন্থে (দুল্-ব, তপঃ) আত্রেয়ের নাম গ্যুন্-সেস্-ক্যি বু। ইহার আবয়বিক অর্থ "অত্রির পুত্র" বা "অত্রিপুত্র"। অতএব অত্রিপুত্র, আত্রেয় ও গ্যুন্-সেস্-ক্যি বু একই ব্যক্তির নাম। এক্ষণে আত্রেয়ের আবির্ভাবকালনির্ণয়-সম্বন্ধে আমাদের কোনপ্রকার কষ্ট পাইতে হইবে না। ইহা প্রায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যায়, তিনি খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কারণ, আত্রেয় জীবকের অধ্যাপক। জীবক বুদ্ধের চিকিৎসক। বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দের লোক।

আত্রেয়ের সময়ে তক্ষশিলায় চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয়। ভারতের প্রাচীনতম চিকিৎসাগ্রন্থ-নিচয় তক্ষশিলা ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থে যে সকল লতা ও ওষধির উল্লেখ আছে, উহা কাম্বোজ প্রভৃতি হিমবৎপ্রদেশে জন্মে। দাক্ষিণাত্য বা মধ্যভারতের কোন লতাপত্রের উল্লেখ প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থে নাই।

† প্রাচীনকালে কোন কোন দেশে চিকিৎসাবিদ্যা অত্যন্ত সমাদৃত হইত। মীশরে অস্ত্রচিকিৎসার অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। চিকিৎসক ডিমোকিডিস্ ইজিনার কোন ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিয়া এক বৎসরে ৬০০০, ছয়-হাজার টাকা ফি পাইয়াছিলেন। স্যামোসের পোলিক্রেটিস্ উক্ত চিকিৎসককে এক বৎসরে ১২০০০, [illegible]

রাজগৃহে এই সময়ে একজন ধনী বাস করিতেন। তাঁহার মস্তকে অসহ্য বেদনা হইয়াছিল। তাঁহার বোধ হইত, কেহ যেন মস্তকে ছুরিকা বিদ্ধ করিতেছে। জীবক একখানি তীক্ষ্ণ অস্ত্র * দ্বারা তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে দুইটি কীট বাহির করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। রোগীকে সাতমাস পৃষ্ঠ, সাতমাস দক্ষিণপার্শ্ব ও সাতমাস বামপার্শ্বের উপর ভর দিয়া শুইয়া † থাকিতে হইয়াছিল।

তদনন্তর জীবক বারাণসী, উজ্জয়িনী ও কৌশাম্বীতে গমন করিয়া, বহু লোকের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর তাৎকালিক রাজা চন্দ্রপ্রদ্যোত পাণ্ডুরোগে (jaundice) কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, জীবক মগধরাজ বিম্বিসারের গৃহচিকিৎসক। তদনুসারে তিনি বিম্বিসারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ‡ জীবককে উজ্জয়িনীতে আনয়ন করেন। জীবক একটি ঔষধ তৈলদ্বারা § মিশ্রিত করিয়া চন্দ্রপ্রদ্যোতকে খাইতে বলেন। উহাতেই তাঁহার রোগমুক্তি হয়।

ইহার পরেই জীবক বুদ্ধদেবের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে জীবক ধন্য। যেহেতু তিনি জগদ্ব্যাধিপমোচক বুদ্ধের ব্যাধিবিমোচন করিয়াছিলেন। এক সময়ে বুদ্ধদেবের দেহ অসুস্থ হয়। আনন্দ জীবকের নিকট যাইয়া এই সংবাদ বিজ্ঞাপন করেন। জীবক রাজগৃহের বিহারে আসিয়া বুদ্ধের চিকিৎসা করেন। তিনি তিনটি পদ্মপুষ্পের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঔষধ প্রক্ষেপ করিয়া ঐ তিনটি পুষ্প তিন সময়ে বুদ্ধকে আঘ্রাণ করিতে বলেন। পুষ্প তিনবার আঘ্রাণ ¶ করিয়াই বুদ্ধের দশবার বিরেচন হয়। ইহাতেই তাঁহার দেহ সবল হয় ও তিনি রোগমুক্ত হন।

টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সম্রাট দরায়ুসকে রোগমুক্ত করিয়া ডিমোকিডিস অসংখ্য সুবর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলেন। (হেরোডোটাস, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) আমাদের দেশে শাস্ত্রকারেরা নিয়ম করিয়াছেন, চিকিৎসা করিয়া অর্থগ্রহণ করিবে না। জীবক তক্ষশিলায় চিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়া প্রাচীন পারসিক ও মীশরীয় জাতির প্রথা অনুসারে রোগীর নিকট হইতে টাকা লইতেন।

* নানাসূত্রে জানা যায়, অস্ত্রচিকিৎসা সর্ব্বপ্রথম মীশরে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। পম্পাইনগরে কোন গৃহে কতকগুলি অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। উহা অবিকল বর্ত্তমানকালে ব্যবহৃত ডাক্তারী অস্ত্রের অনুরূপ।

† পৃষ্ঠে, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শোয়াইয়া রাখা প্রাচীন চিকিৎসার একটি রীতি। য়ীহুদিজাতির মধ্যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। পরমেশ্বর ইযেকিলকে আদেশ করিয়াছিলেন, বামপার্শ্বে ভর দিয়া ৩৯০ দিন ও দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া ৪০ দিন শুইয়া থাক। (Ezekiel IV 5)

‡ রাজার বাড়ীর কোন চিকিৎসককে আনিতে হইলে রাজার নিকট আবেদন করিতে হইত। ওলড টেষ্টেমেণ্টে দেখা যায়, নেয়াম নিজের চিকিৎসার জন্য ভিষগ্বর এলিসাকে কিছু না বলিয়া, এলিষার প্রভু ইজ্রেলের রাজার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। (2 Kings V. 5)

§ তৈল পাণ্ডুরোগের মহৌষধ।

¶ প্রাচীন ভিষগ্‌গণের মতে নাসিকাদ্বারা গন্ধগ্রহণ করা একপ্রকার রোগপ্রতিকারের উপায়। গন্ধগ্রহণে সকল রোগেরই উপশম হইতে পারে। ডিমোক্রিটস, মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া ভাবিয়াছিলেন—"আর ৪ দিন বাঁচিলেই আমি ক্রীড়ামহোৎসবটি দেখিয়া মরিতে পারি।" কিন্তু তখন তাঁহার কিছু আহার করিবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি গরম রুটি নাকে শুঁকিয়া ৪ দিন জীবিত ছিলেন।

তথাগতের বুদ্ধত্বলাভের বিংশতিবর্ষ পরে জীবক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি বুদ্ধকে প্রত্যহ তিনবার দেখিতে পাইবেন, এই আশয়ে রাজগৃহনগরে নিজের উদ্যান-ভূমিতে একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন। ঐ বিহার তিনি বুদ্ধকে প্রদান করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের মৃত্যুর পর জীবক অজাতশত্রুর গৃহচিকিৎসক হন। তিনি বালচিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "জীবক কোমারভচ্ছ" বলিত। জীবকের কথা অনুসারে একদিন অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনিবার জন্য উৎসুক হন। তিনি জীবকের বিহারে গমন করিয়া বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

মগধে একসময়ে কুষ্ঠ, শোষ, ধবল, যক্ষ্মা ও অপস্মার, এই পঞ্চবিধ রোগের উপদ্রব হইয়াছিল। ঐ সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ জীবকের নিকটে গিয়া বলিয়াছিল—"মহাশয়, আমাদিগকে রোগমুক্ত করুন।" জীবক উত্তর দেন "মহাশয়গণ, আমাকে অনেক কার্য্য করিতে হয়। আমি রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক। রাজার অন্তঃপুরে আমি চিকিৎসা করি। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘেরও চিকিৎসক আমি। আমার সময় নাই, আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।" রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ জীবককে পুনরায় বলিল -"মহাশয়, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি আছে, আপনাকে দিতেছি; আমরা চিরকাল আপনার দাস হইয়া থাকিব; আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, আপনি আমাদিগকে রোগমুক্ত করুন।" জীবক পুনরায় উত্তর করিলেন—"মহাশয়গণ, আমার অনেক কার্য্য আছে, আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।" তখন রোগাক্রান্ত লোকেরা মনে করিল—"বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সুখে বাস, সুখে ভোজন, সুখে শয়ন করেন। আমরাও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষু-শ্রেণীমধ্যে প্রবেশ করি। তাহা হইলে ভিক্ষুগণ আমাদের শুশ্রূষা এবং জীবক আমাদের চিকিৎসা করিবেন।" এইরূপ স্থির করিয়া ঐ সকল লোক ভিক্ষুসংঘের নিকটে গিয়া প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিল। ভিক্ষুগণ উহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। জীবকও চিকিৎসাদ্বারা উহাদের রোগবিমুক্তি করিলেন। কিন্তু উহারা রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ভিক্ষুধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইল। জীবক উহাদের অবস্থান্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"আপনারা ধর্ম্মজীবন ত্যাগ করিলেন কেন?" উহারা উত্তর করিল—"আমরা এক্ষণে রোগমুক্ত হইয়াছি, আর আমাদের ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই।" জীবক এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং তথাগতের সমীপে গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তথাগত ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, আপনারা কুষ্ঠ, শোষ, ধবল, যক্ষ্মা ও অপস্মার, এই সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন, কিন্তু কখনও উহাদিগকে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা প্রদান করিবেন না, অর্থাৎ ভিক্ষুসম্প্রদায়ে প্রবেশ করাইবেন না।"

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সার সত্যের আলোচনা।

পুরাণ-কাহিনী।

বিগত প্রবন্ধে এই একটি কথা রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছিল যে, কাণ্টের দক্ষযজ্ঞে বাস্তবিক-সত্তারূপিণী সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই। এ কথা সত্য—কিন্তু তথাপি বাস্তবিক সত্তা সেই যজ্ঞের সভামণ্ডপে অনাহূতা উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাঁহার স্বামীকে ছাড়িয়া একাকিনী। বাস্তবিক-সত্তা'র স্বামী কে? না, কাণ্ট্ যাহাকে বলেন—thing-in itself স্বয়ংবস্তু। বাস্তবিক-সত্তা স্বয়ংবস্তুকে ছাড়িয়া সংবিতের যোগাত্মক একতা-বেশে যজ্ঞভবনে প্রবেশ করিলেন। এই যে বস্তুবিবর্জিতা বাস্তবিক-সত্তা, ইনি আপনাতে আপনি নাই। সভার মাঝখানে বাস্তবিক-সত্তা'র প্রাণসংশয় উপস্থিত,—কাজেই কাণ্ট্ সংশয়বাদী। মৌলিক পদার্থসকলের মাঝখান হইতে কাণ্ট্ স্বয়ংবস্তুকে সরাইয়া দিয়াছেন—তাহা তিনি দি'ন্—কিন্তু আপনার মন হইতে একতিলও সরাইয়া দিতে পারেন নাই। কাণ্ট্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, স্বয়ংবস্তুকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না এইজন্য, যেহেতু তাহা করিলে এইরূপ একটা শিরোনাস্তি-শিরঃপীড়া-রকমের অসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, অস্তি নাই অথচ ভাতি আছে—বস্তু নাই অথচ প্রকাশ আছে। তার সাক্ষী—This proves no doubt that all speculative knowledge is limited to objects of experience but it should be carefully borne in mind that this leaves it perfectly open to us to *think* the same objects as things by themselves, though we cannot *know* them For otherwise we should arrive at the absurd conclusion that there is phenomenal appearance without something that appears.

ইহার বাংলা।

"এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আমাদের চিন্তাসম্ভূত সমস্ত জ্ঞানই পরীক্ষাধীন বস্তুসকলের গণ্ডি'র মধ্যে আবদ্ধ; এটা কিন্তু সাবধানে মনে রাখা চাই যে, সে-সব বস্তু'র বাস্তবিক-সত্তা জ্ঞানে জানিতে পারা আমাদের সাধ্যায়ত্ত না হইলেও তাহা মনে ভাবিতে পারিবার পক্ষে কোনো বাধা নাই। কেন না, পরীক্ষাধীন বস্তুসকলের উপলব্ধিকালে যদি তাহাদের বাস্তবিক সত্তা মনেও ভাবা না যায়, তবে তাহাতে ফলে দাঁড়ায় এইরূপ একটা অসঙ্গত কথা যে, অস্তি নাই অথচ ভাতি আছে—বস্তু নাই অথচ প্রকাশ আছে।" কাণ্ট্ এই যে একটি কথা বলিতেছেন যে, বাস্তবিক-সত্তা জ্ঞানের অগম্য হইলেও তাহাকে মনে না ভাবিলেই নয়—এ কথাটার মধ্যে প্রধান একটি দোষ প্রচ্ছন্ন

রহিয়াছে এই যে, যেন জ্ঞানের অগম্য পদার্থকেও মনে ভাবিতে পারা সম্ভবে। মনে-ভাবা বাস্তবিক-সত্তাকে কাণ্ট্ ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিতেছেন; অথচ, জ্ঞানে-জানা বাস্তবিক-সত্তা'র প্রতি তিনি পরাঙ্মুখ। জ্ঞানে-জানা বাস্তবিক-সত্তা হ'চ্ছেন সেই বাস্তবিক-সত্তা, যিনি স্বয়ংবস্তুর সহিত (thing-in-itselfএর সহিত) একাসনে উপবিষ্টা। রূপকটিকে ভাল করিয়া গুছাইয়া বলি—তাহা হইলেই কাণ্টের সংশয়বাদের প্রকৃত বৃত্তান্তটি আপামর সাধারণের বোধগম্য হইতে পারিবে। কাণ্ট্ ছিলেন সর্ব্বপ্রকারে স্বকার্য্যে দক্ষ। মনে-ভাবা বাস্তবিক-সত্তা তাঁহার চিন্তার উদ্ভাবনা—এক প্রকার মানসকন্যা। বাস্তবিক-সত্তারূপিণী সেই যে মানসকন্যা সতী, তাহার পতি হ'চ্চেন স্বয়ংবস্তু। তাঁহার পিতার নিকটে (কাণ্টের নিকটে) তিনি মনে-ভাবা; পতির নিকটে (স্বয়ংবস্তুর নিকটে) জ্ঞানে-জানা। সেই বাস্তবিক-সত্তারূপিণী সতী সংবিতের একতা-বেশে পদার্থসভার মাঝখানে (category-দিগের মাঝখানে) অনাহূতা আসিয়া উপস্থিত; পুষ্পকে দূরে ফেলিয়া রাখিয়া সৌরভ যেন চলিয়া আসিল আপনি একাকী। কাণ্ট্ বলেন, সংবিতের একতা বস্তু-শূন্যা হইলেও—যোগাত্মিকা; তাহার ত্রিনেত্র রহিয়াছে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে উন্মীলিত। পক্ষান্তরে, স্বয়ংবস্তু (thing-in-itself) নিতান্তই দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য ভোলা। ঢুলঢুলুচক্ষে আছেন তিনি ভালো জনশূন্য শ্মশানে বা অগম্য কৈলাসশিখরে—সেইখানেই থাকুন্। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সভার মাঝখানে বসানো হইতে পারে না। কাণ্টের পুরাণ-কাহিনী এ-যেমন একটি—এই-তেম্নি আর-একটি :—কালী (অর্থাৎ কালের মুহূর্ত্তপরম্পরা) নৃত্য করিতেছেন (কিনা ভাঙিতেছেন-গড়িতেছেন) যোগিনী সমভিব্যাহারে [কিনা যোজনা-শক্তিকে (Synthesisকে) সঙ্গে করিয়া]। কালীর স্বামী যিনি (অর্থাৎ কালের ভিত্তিমূল যিনি) শঙ্কর মহাকাল (Eternity), তিনি মৃতবৎ পড়িয়া আছেন সটান। কালীর বিচিত্রলীলা'র সহিত মহাকালের যেন কোনো সম্পর্কই নাই অথচ দোঁহে দোঁহার অদ্ধাঙ্গ। কাণ্টের পুরাণে, যোজনাশক্তি-সমভিব্যাহারিণী সংবিতের সহিত স্বয়ংবস্তু'র (thing-in-itselfএর) কোনো সম্পর্কই নাই—অথচ উভয়ে পরস্পরের এপিট-ওপিট।

পূর্ণাঙ্গ সত্য।

এই সকল ভেদবুদ্ধি সংশয়বাদের গোড়া'র কথা। প্রকৃত সত্য যাহা, তাহা আমরা বহুপূর্ব্বে বলিয়া চুকিয়াছি; পাঠককে তাহা আরেকবার স্মরণ করাইয়া দিই :

সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ (বা জ্ঞান), এ তিনটি মৌলিক পদার্থ এরূপ হরিহরব্রহ্মা যে, তিনের কোনোটি অপর-দুইটির সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকালও একাকী থাকিতে পারে না। যেমন কাগজের এপিট-ওপিট এবং স্থূলতা। এপিট যেমন ওপিটের সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না, ভাতি তেমনি অস্তি'র সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না। স্থূলতা যেমন এপিট-ওপিটের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ

করিয়া একাকী থাকিতে পারে না, শক্তি তেমনি অস্তি-ভাতির সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না। শুধুই কেবল সত্তা নহে, শুধুই কেবল শক্তি নহে, শুধুই কেবল প্রকাশ নহে; পরন্তু অনুলোম ক্রমে সত্তা হইতে শক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পর্য্যন্ত এবং প্রতিলোম-ক্রমে প্রকাশ হইতে শক্তির মধ্য দিয়া সত্তা পর্য্যন্ত—সবটা লইয়া এক অদ্বিতীয় অখণ্ডসত্য নিত্য-বর্ত্তমান। সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, এই তিনটি মৌলিক-পদার্থের একাত্মভাবের কথা এ যাহা বলিতেছি, এ কথার যাথার্থ্য একদিকে আমরা বিস্পষ্টভাবে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই, আর-এক দিকে সংক্ষিপ্তভাবে হাতের কাছে দেখিতে পাই। বিস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে, সংক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাই ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে। এখনকার কালের নূতন নূতন বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয় ব্রহ্মাণ্ডের অনেকানেক নিগূঢ় তত্ত্ব অনেকে জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু একটি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পাণ্ডতগণের এখনো চক্ষু ফোটে নাই যদিচ পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদের এই দীন-হীন-মলিন হতশ্রীক দেশের ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সেই বিষয়টির রীতিমত পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ইহারি মধ্যে কতকগুলি অভাবিতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছেন। সে বিষয়টি সংক্ষেপে এই:—যাহা বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে—তাহাই ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে; যাহা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে—তাহাই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড, দোঁহে দোঁহার পর নহে—পরন্তু একেরই এপিট-ওপিট! খুব সংক্ষেপে বলিলাম;—শুনিবা-মাত্রই অনেকে অনেকপ্রকার ভুল বুঝিতে পারেন। অতএব তিনটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখানো আবশ্যক—

(১) ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের অনুলোমক্রম এবং প্রাতিলোমক্রম কিরূপ; (২) বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের অনুলোমক্রম এবং প্রাতিলোমক্রম কিরূপ; (৩) উভয়ের মধ্যে একাত্মভাব কিরূপ এই তিনটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখানো আবশ্যক। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড আর-কিছু না—জীবাত্মা। জীবাত্মা এক বটে, কিন্তু তিন লইয়া এক—(১) আত্মসত্তা, (২) আত্মশক্তি এবং (৩) আত্মজ্ঞান, এই তিন লইয়া এক। পাশ্চাত্য দর্শনের আদিগুরু বলিয়াছেন—"আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি আছি।" দেকার্ত্তের এই মূলবচনটির তাৎপর্য্য শুধু এই যে, যেমন দূর হইতে তরঙ্গক্রীড়া দেখিলে সমুদ্রের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়, তেমনি চিন্তা'র প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলে আত্মার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। তা বই, উহার অর্থ কেহ যদি এরূপ বোঝেন যে, চিন্তার উপরেই আত্মার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। তরঙ্গক্রীড়ার উপরেও সমুদ্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে না—চিন্তার উপরেও আত্মার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। কোনো মনুষ্যই চিন্তা করিয়া পৃথিবীতে আসেন

নাই, চিন্তা করিয়া বাঁচিয়া থাকেন না, চিন্তা করিয়া পৃথিবী হইতে অবসৃত হ'ন না। "আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি আছি"—এ কথাটির অর্থ শুদ্ধকেবল এই যে, চিন্তাতে আত্মশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় এবং আত্মশক্তির স্ফূর্ত্তিতে আত্মসত্তা অভিব্যক্ত হয়। আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রকাশ, এই তিনের কোনোটি অপর দুইটিকে ছাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য দর্শনকারেরা সাক্ষাৎ উপলব্ধিকে খাটো করিয়া চিন্তাকে বেশীমাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন—ইহা তাঁহাদের কথাবার্ত্তার ভাবে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কাণ্ট্ কিন্তু বুঝিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতিরেকে চিন্তা ফাঁকা। কিন্তু হইলে কি হয়—তিনিও ইউরোপীয় ভেদদৃষ্টির কঠিন বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনিও ভাবিতেছি'র মুলুকেই আটক পড়িয়া-রহিয়া সংশয়ে বিভ্রান্ত হইয়াছেন—জানিতেছি'র মুলুকে পৌঁছিতে পারেন নাই। দেকর্ত্তা যে জায়গায় বলিয়াছেন যে, "আমি ভাবিতেছি, অতএব আমি আছি", আমাদের দেশের এক-জন গ্রন্থকার সেই জায়গায় বলিয়াছেন—"আমি জানিতেছি, অতএব আমি আছি।"

"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতি ধীবলাৎ।"

চিন্তা, জিজ্ঞাসা, সংশয়, জ্ঞানসাধনের প্রথম সোপান, তাহাতে আর ভুল নাই—কিন্তু তাহাই কিছু আর জ্ঞানের সারসর্ব্বস্ব নহে। সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে মনে হয় যে, সমুদ্র তরঙ্গেরই ক্রীড়াক্ষেত্র; কিন্তু সমুদ্রে ডুব দিলে সে ভুল অচিরে ঘুচিয়া যায়; তখন মনে হয় যে, সমুদ্র প্রশান্তির আলয়। "আমি আছি"—এই প্রশান্ত জ্ঞানটি আত্মার গভীরে নিরন্তর জাগিতেছে—তাহাই আত্মার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ; তদ্ব্যতীত, আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য ভাবিতেছি'কে সাক্ষী মান্য করা নিতান্তই বাড়া'র ভাগ। এ এক-প্রকার—সোনার গাত্রে সোনালি রঙ মাখানো—প্রস্ফুটিত গোলাপফুলের গাত্রে গোলাপজল মাখানো। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আত্মাকে ধ্রুবরূপে জ্ঞানে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে চিন্তার তরঙ্গক্রীড়া থামানো আবশ্যক—চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা আবশ্যক। আর, আমাদের দেশের যোগশাস্ত্রের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল তাহারই প্রণালীপদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'চ্চে সাধনরূপী জ্ঞানের (অর্থাৎ চিন্তা'র) মূলে যেখানে সিদ্ধরূপী জ্ঞান (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান) রহিয়াছে, সেইখানে মনকে লইয়া যাওয়া।

ইউরোপীয় দর্শনকারেরা "অসীম অসীম" করিয়া ক্রমাগতই গণ্ডগোল করেন। শেষে কলরবে ক্ষান্ত দিয়া বলেন যে, অসীমকে চিন্তা দিয়া নাগাল পাওয়া যায় না। তাঁহাদের জানা উচিত যে, যে-অসীমকে তাঁহারা চিন্তাদ্বারা বন্ধন করিয়া ঘরে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন—তাহা তাঁহাদের চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই ঘরে রহিয়াছে ষোল-আনা মজুদ্।

তোমার আত্মার অস্তিত্ব তো আর তোমার চিন্তার ফল নহে তাহা তোমার চিন্তার মূল। যাহার দৌলতে তুমি চিন্তা করিতে পারিতেছ—তাহাকে তুমি চিন্তাদ্বারা ফলাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছ;—এ তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না তো আর কি!

এ বিষয়ে আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা যাহা বলেন, তাহা অতীব প্রণিধান। তাঁহাদের কথা এই যে—

"মান" প্রবোধয়ন্তং বোধ যে মানেন বুভুৎসতে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাধিয়ঃ।

প্রমাণকে জাগাইয়া তুলিতেছে যে সাক্ষাৎ-জ্ঞান, সেই সাক্ষাৎ-জ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণদ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করেন—সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা প্রজ্বলিত ইন্ধনকাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ যে অগ্নি ইন্ধনকে দগ্ধ করিতেছে, সেই অগ্নিকে তাঁহারা ইন্ধন দিয়া দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন।

আমাদের বক্তব্য কথা সংক্ষেপে এই :—আত্মার সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান গোড়াতেই একীভূত রহিয়াছে। গোড়াতে আত্মা যেরূপ প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাই তিনি আপনি, আর, আপনার সত্তা এবং প্রকাশের মাঝখানে ইচ্ছা এবং শক্তি যাহা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, তাহাও তিনি আপনি। আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান, সমস্ত লইয়া এক আত্মা। আত্মসত্তা চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান—আত্মজ্ঞান চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশমান—আত্মশক্তি চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই স্ফূর্ত্তিমান্। যাহা চিন্তার মূলে আছে, তাহাই যদি চিন্তার ফলে দাঁড়ায়, তবেই চিন্তা সার্থক চিন্তা হয়। পক্ষান্তরে, এরূপ যদি হয় যে, চিন্তার মূলে আছে একরূপ ফলে দাঁড়াইতেছে আর-একরূপ- তবে তাহা চিন্তার একপ্রকার কৃত্রিম কারীকরি তাহা যথার্থভাবের চিন্তা নহে।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশের ক্রম দুইরূপ—(১) অনুলোম এবং (২) প্রতিলোম। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে অনুলোমক্রম এইরূপ :

প্রথমে আত্মসত্তা, তাহার পরে চিচ্ছক্তির স্ফূর্ত্তি বা চিন্তা তাহার পরে আত্মার প্রকাশ বা আত্মজ্ঞান।

প্রতিলোম ক্রমে এইরূপ :

প্রথমে আত্মপ্রকাশের উপলব্ধি—তাহার পরে চিচ্ছক্তির উপলব্ধি, তাহার পরে আত্মসত্তার উপলব্ধি।

অনুলোম-পদ্ধতি'র পর পর সিঁড়ি'র ধাপ হচ্চে—কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম প্রতিলোম-পদ্ধতির পর-পর সিঁড়ির ধাপ হ'চ্চে—জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা। আত্মা শুদ্ধকেবল একটা ফাঁকা একত্ব নহে পরন্তু জ্ঞান জ্ঞাতা-জ্ঞেয় কর্ত্তা-কর্ম্ম ক্রিয়া, সমস্তেরই সমাধিস্থান বা কেন্দ্রস্থান অথবা যাহা একই কথা আত্মা—সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, তিনই একাধারে।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু, সমস্তই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছে, এটা যখন স্থির ; এটা যখন স্থির যে, আমরা চিন্তা খাটাইয়া আপনার সত্তাকেও আনয়ন করি নাই, আপনার শক্তিকেও আনয়ন করি নাই, আপনার প্রকাশকেও আনয়ন করি নাই, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রকাশ, তিনেরই মূলাধার বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব যেমন জীবাত্মা বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের (অর্থাৎ সর্ব্বজগতের) সারসর্ব্বস্ব তেমনি পরমাত্মা। অতএব এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, জীবাত্মার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, তিনেরই মূলাধার পরমাত্মা।

এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, আমি যখন আমার সম্মুখে একটা বৃক্ষ দেখিতেছি, তখন আমি যেমন এ কথা বলিতে পারি না যে, আমার চিন্তার বলে আমি তাহা দেখিতেছি—তেমনি, আমি যখন আমার আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি, তখন এ কথা বলিতে পারি না যে, আমি আমার চিন্তার বলে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছি। সাক্ষাৎ-জ্ঞানে আমরা আত্মাকেই উপলব্ধি করি, আর বহির্বস্তুকেই উপলব্ধি করি—সাক্ষাৎ-জ্ঞানে আমরা যে বস্তুকেই যখনই উপলব্ধি করি, তাহা ঐশ্বরিক শক্তির বলেই উপলব্ধি করি, নিজের বলে নহে। পুনশ্চ, ঐশ্বরিক শক্তির বলে যাহা কিছু আমরা সাক্ষাৎ-জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহা জাগ্রত-জীবন্ত-ভাবে উপলব্ধি করি, পক্ষান্তরে, চিন্তাদ্বারা যাহা-কিছু উপলব্ধি করি, তাহা সেই মূলগ্রন্থের এক-প্রকার যৎসামান্য অনুবাদ; তাহাও আবার অনেক সময়ে প্রকৃত অনুবাদ নহে—পরন্তু অপভ্রংশ। আত্মাকে যিনি যখন সাক্ষাৎ-জ্ঞানে জাগ্রত-জীবন্ত-ভাবে উপলব্ধি করেন, তিনি তখন পরমাত্মার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশের যোগে জীবাত্মার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ উপলব্ধি করেন। এরূপ সাক্ষাৎ-উপলব্ধি শুধুকেবল চিন্তাদ্বারা সম্ভাবনীয় নহে। চিন্তাকে নিরোধ করিয়া মনকে প্রশান্ত করিলে—কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রসাদেই তাহা সম্ভাবনীয়। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বালোচনা করিতে গেলেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে—যেহেতু উভয়ে পরস্পরের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওতপ্রোত। এবারে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—বারান্তরে বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ।*

ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের রাজ্যাভিমুখে।

এখন সন্ধ্যা। এই সময়ে সূর্য্যাস্তের পরেই সুস্নিগ্ধ প্রশান্তি ও মধুর শৈত্য কোথা হইতে যেন সহসা আবির্ভূত হয়। কিয়ৎকালের জন্য এই ক্ষুদ্র অনাদৃত পলঙ্কটা-গ্রামে আমি বিশ্রাম করিতেছি। এইখানেই আজ রাত্রি-যাপন করিতে হইবে।

এই দিবাবসানসময়ে, এই তরুতলে, এই নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমি আজ সর্ব্বপ্রথমে বাস্তবিকই দূরদেশে আসিয়াছি বলিয়া অনুভব করিতেছি।

আমি ফ্রান্স্ হইতে ডাক-জাহাজে করিয়া, হরিৎ-শ্যামল আর্দ্রভূমি সিংহলদ্বীপে

* পিয়ের-লোটি-কৃত।

প্রথম উপনীত হই। সেইখানে সপ্তাহবা থাকিয়া, পরে উপকূলগামী একটা জঘন্য জাহাজে উঠিয়া, গতরাত্রে ম্যানার-উপসাগর পার হইয়াছি। সেইখানকার সমুদ্র যেন অষ্টপ্রহর টগবগ্ করিয়া ফুটিতেছে। তাহার পর, সমস্তদিন শকটে আরোহণ করিয়া, খুব শীঘ্র এই গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ত্রিবঙ্কুরাধিপতি আমার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি লোক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আমার জন্য, সুনিবিড় তরুপল্লবের ছায়াতলে একটি ছোট শাদা বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন—সেইখানে আমাকে লইয়া গেলেন।

আগামী কল্য গরুর গাড়ি করিয়া ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের অধিকারভুক্ত একটি প্রদেশে উপনীত হইব। সেইখান হইতে আমার যাত্রা আরম্ভ হইবে। লোকে এই প্রদেশটিকে "খয়রাৎ-মহল"ও বলিয়া থাকে। আমার এই প্রদেশটিকে সুখশান্তির আশ্রম বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানশতাব্দীসুলভ বিলাস-বিভবের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই; পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন, লোকবিরল, তাল নারিকেল প্রভৃতি তরুমণ্ডপের ছায়াতলে অবস্থিত।

রাত্রি হইয়া আসিতেছে, গ্রীষ্মকালের অতি সুন্দর রাত্রি, কিন্তু চন্দ্রহীন। সেই লোকটি ব্রাহ্মণমন্দিরের দীপালোক দেখাইবার জন্য আমাকে শকটে করিয়া লইয়া গেল। এই মন্দিরটি "তৃণবল্লী"-নামক পার্শ্ববর্ত্তী নগরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শকটের বাহনেরা সহজ দুল্‌কি-চালে চলিতেছে। আমরা বহুস্তম্ভময় তরুপুঞ্জের মধ্য দিয়া চলিয়াছি, আমাদের মস্তকোপরি শ্যামল পল্লবজাল প্রসারিত; সেই সকল বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা হইতে শিকড় বিস্তৃত হইয়া আবার তাহাদের সহিত যেন মিলিবার চেষ্টা করিতেছে। তরঙ্গিত শিকড়জাল সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। পাদপের উপরে পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে আকাশের অসংখ্য তারা এবং নিম্নতলে—এমন কি, ভূমির উপরেও—অসংখ্য জোনাকি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে, প্রতি সন্ধ্যায়, আতসবাজির স্ফুলিঙ্গবৎ এই কীটগুলি জ্বলিতে থাকে। তারা ও জোনাকির স্ফুলিঙ্গজ্যোতি এরূপ পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে যে, উহার মধ্যে কোন্‌টি জ্যোতিষ্ক ও কোন্‌টি জ্যোতি-রিঙ্গণ তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর।

সিংহলের অবসাদজনক আর্দ্রবায়ু ত্যাগ করিয়া, এইখানে আবার স্বাস্থ্যকর শুষ্ক-বায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ফ্রান্‌সের গ্রীষ্মকালীন সুন্দর রাত্রির মত, এখানে আবার সেইরূপ সুখদ অনিল, নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি এবং জুন্‌মাসে ফ্রান্‌সের পল্লীগ্রামে যেরূপ শুনা যায়, এখানেও সেইরূপ ঝিল্লীসঙ্গীত চারিদিক্ হইতে শুনিতেছি। কিন্তু এই সকল পথে যে পথিকলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে, তাহারা আমাদের চক্ষে অদ্ভুত;—এই সকল তাম্রমূর্ত্তি পথিকেরা নিঃশব্দে খালি-পায়ে চলিয়াছে। তাহাদের স্কন্ধের উপর মল্‌মলের উত্তরীয়। মধ্যে-মধ্যে, দূর হইতে যখন ঢাক্-ঢোলের শব্দ অথবা শানাইযন্ত্রসমুত্থিত

আর্ত্তনাদের আলাপ শুনিতে পাই, তখনি ঠিক বুঝিতে পারি, এটি পৃথিবীর কোন্ বিভাগ; তখনি ইহাকে ভারতবর্ষ বলিয়া, ব্রাহ্মণের দেশ বলিয়া চিনিতে পারি; আর তখনি বুঝিতে পারি, আমাদের দেশ হইতে এই স্থানটি কতটা দূর।

তরুতিমিরের মধ্যে, ছোট ছোট শাদা বারাণ্ডাওয়ালা বাড়ী পথের দুইধারে দেখা দিতে সুরু করিয়াছে; যেখানে আমাদের যাইবার কথা, সেই "তৃণবল্লী"-নগরে ইহারই মধ্যে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। পথের দুইধারে তালজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী;—ভঙ্গুর বৃন্তের উপর ভর করিয়া আকাশে যেন কালো-কালো পাখা বিস্তার করিয়া আছে। এই তরুপথটি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে একটি ছায়াচিত্র অঙ্কিত দেখিলাম। এই ছায়াচিত্রটি একটু বিশেষ-ধরণের, অতীব নয়নাকর্ষক। ইহা একটি প্রকাণ্ড মন্দির। ভারতবর্ষে যে কখনো আসে নাই, সে-ও ইহাকে মন্দির বলিয়া চিনিতে পারে কেন না, চিত্র-প্রতিমূর্ত্তি-আদি দেখিয়া, পূর্ব্ব হইতেই উহাদের আকারসম্বন্ধে সকলেরই কিছু-না-কিছু অস্পষ্ট ধারণা থাকে। কিন্তু ঈদৃশ প্রকাণ্ড মন্দির সহসা নৈশগগনে সমুত্থিত দেখিব, ইহা কখন কল্পনা বা প্রত্যাশা করি নাই। ইহা যেন রাশীকৃত দেবমূর্ত্তির একটা প্রকাণ্ড স্তূপ; ইহার চূড়াদেশও বিকটাকার মূর্ত্তিতে আকার্ণ। অসংখ্যতারকাদীপ্ত আকাশপটের উপর এই ছায়াচিত্রের কৃষ্ণবর্ণ-রেখাপাত হইয়াছে।

একটু পরেই আমাদের গাড়ি একটি প্রস্তরময় খিলানমণ্ডপের মধ্য দিয়া, সেকেলে-ধরণের গুরুভার সমচতুষ্কোণ স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দিরের এই অগ্রবর্ত্তী প্রদেশটি অতিক্রম করিয়া, আবার যখন আমাদের মস্তকোপরি তারকা-মণিখচিত গগনাম্বর প্রসারিত হইল, তখন দেখিলাম, একটা বিপুল ঘেরের সম্মুখে আসিয়া পাড়িয়াছি। তাহার সীমা লঙ্ঘন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সেই প্রকাণ্ড মন্দিরস্তূপটি একেবারে আমাদের সম্মুখে—খুব নিকটে। সেই বিসদৃশপরিমাণযুক্ত মহাভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড মন্দিরচূড়ার নিম্ন দিয়া একটি পথ গিয়াছে—তাহার মধ্যে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু সেই প্রবেশপথের মুখটি এত বড় যে, সেখান হইতে অভ্যন্তরস্থ দেবমণ্ডপের সুদূর পশ্চাদ্ভাগ পর্যান্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সেই পবিত্র অন্ধকারের মধ্যে, মন্দিরমণ্ডপের দুই ধারে অসংখ্য রহস্যময় দীপাবলী সারি-সারি সজ্জিত। সেইখান হইতে দেখিতে নিষেধ নাই; কিন্তু তাহাও বেশিক্ষণের জন্য কিংবা খুব নিকটে গিয়া দেখা নিষিদ্ধ।

এই সুদূরপ্রসারিত প্রবেশপথের প্রত্যেক দিকে, মণ্ডলাকারে-বিন্যস্ত স্তম্ভশ্রেণীর নিম্নে, ছোট-ছোট মশালের আলোকে, দেবতাদের ব্যবহারের জন্য ফুলের দোকান, মালার দোকান, মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে। এই মশালের আলোকে, দোকানদারদিগকে এবং মন্দিরের প্রস্তরময় তলদেশটি বেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সেই প্রস্তরে বিকটাকার বিবিধ মূর্ত্তি, অদ্ভুতাকার জীবজন্তুর মূর্ত্তি খোদিত, কিন্তু সেই মূর্ত্তিগুলি ক্ষয়গ্রস্ত ও বিলুপ্তমুখশ্রী। ঐ সকল দোকানদারেরাও দেবমূর্ত্তিবৎ অচল।

উহাদের শ্যামল নগ্নগাত্র ঐ সকল লাল পাথরের উপর ঠেস দিয়া রহিয়াছে; নেত্রগুলি জ্বল্‌-জ্বল্‌ করিতেছে; এবং উহাদের রমণীসুলভ সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ স্কন্ধের উপর লতাইয়া পড়িয়াছে। উপরে থামগুলির মাথায়, খিলান-মণ্ডলের সমীপবর্ত্তী স্থানে, অন্ধকার একাধিপত্য করিতেছে।

মণ্ডপের সুদূর পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত আমি অলক্ষিতভাবে এখান হইতে সমস্ত দেখিতেছি। অফুরন্ত সারি-সারি স্তম্ভ অস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। ক্ষীণপ্রভ দীপাবলী ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। সুদূর প্রান্তে শুভ্রবসন মনুষ্যমূর্ত্তিসকল বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করিতেছে। এবং ঐ স্থানটি স্তুতিপাঠে ও গানকীর্ত্তনে মুহুর্মুহু অনুরণিত হইতেছে।

যে নিষিদ্ধ দ্বার দিয়া আমি লুকাইয়া দেখিতেছি, তাহার গঠন অতি অপূর্ব্ব, একেবারেই বাস্তবিদ্যার অপরিজ্ঞাত। দ্বারের প্রকোষ্ঠটি খুব বড়। কিন্তু এতাদৃশ প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী চূড়ার তুলনায়, মন্দিরের দ্বারটি বড়ই নীচু, এমন কি, গুপ্তপথ বলিয়াও মনে হইতে পারে; মনে হয়, উহা যেন সুরঙ্গপথের দ্বার—রহস্যরাজ্যের প্রবেশপথ!

জীবনের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণদিগের একটি মন্দির দেখিয়া আমার মনে হইল, আমি এমন একটা-কিছু দেখিলাম, যাহা পৌত্তলিকতার বিষাদ অন্ধকারে আচ্ছন্ন;—ভীষণ বৈরভাবাপন্ন লোকের দ্বারা পূর্ণ। আমি এইরূপ দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই; আর ইহাও ভাবি নাই, মন্দিরে আমার প্রবেশনিষেধ হইবে। আমি কতকটা আশা করিয়াছিলাম, ভারতবর্ষে গিয়া, মহা-পূর্ব্বপুরুষগণ-অবলম্বিত ধর্ম্মের অন্তস্তলে কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইব। কিন্তু এখন আমার সেই চিরপোষিত আশা অতীব শূন্যগর্ভ ও নিতান্ত "ছেলেমানুষি" বলিয়া মনে হইতেছে।

আহা! খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে কেমন একটি মন ভুলানিয়া মধুময় শান্তির ভাব বিরাজিত—সেই ধর্ম্মের দ্বার সকলেরই নিকট অবারিত এবং যাহা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদিগেরও হিত-সাধনে সতত নিযুক্ত।..

এখন আমাকে সকলে এইরূপ আশ্বাস দিতেছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে, দেবালয়ের মধ্যে এতটা দারুণ কঠোরতা লক্ষিত হইবে না, এমন কি সেখানকার দেবালয়ে হয় তো আমি প্রবেশ করিতেও অনুমতি পাইব। যাহা হউক এইবার এখান হইতে সরিয়া পড়া ভাল—বেশিক্ষণ থাকাটা সুবুদ্ধির কাজ নহে কিন্তু যদি ইচ্ছা করি, গাড়িতে থাকিয়া আস্তে-আস্তে এই বৃহৎ মন্দিরের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিতে পারি—তাহাতে কোন বাধা নাই।

মন্দিরের ঘেরটা সমচতুষ্কোণ,—এত বৃহৎ যে, ইহার মধ্যে একটা নগরের সমাবেশ হইতে পারে। ইহার চতুঃসীমার মধ্যস্থল হইতে একটি প্রকাণ্ড স্তূপ সমুত্থিত—উহার নিম্নদেশে একটি দ্বার ফুটানো আছে। এই সকল মূক প্রাচীর, যাহার ধার দিয়া আমরা নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে চলিয়াছি,—উহা দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় কঠোরভাবে খাড়া হইয়া আছে। যে বিজন পথটি আমরা অনুসরণ করিতেছি, উহা সেই পবিত্র গণ্ডিরই সামিল,—যাহার মধ্যে নীচজাতীয় লোকের

প্রবেশ নিষিদ্ধ। এইখানে আর-একপ্রকার প্রকাণ্ড স্তূপের পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম উহা দৈবক্রমে ত্রিস্তান আটকাইয়া পড়িয়াছে। উহাও দেখিতে দেবমন্দিরের ন্যায়,—কতকগুলি বিরাট্ চাকার উপর স্থাপিত; পর্ব্ব-উৎসবের দিনে দেবতাদিগকে হাওয়া-খাওয়াইবার জন্য সহস্র সহস্র লোক এই রথগুলিকে টানিয়া লইয়া যায়, রথের চাকা বসিয়া গিয়াছে, তাই আজ বাধ্য দেবতারা মর্ত্ত্যদিগেরই ন্যায় এইখানেই নিদ্রা যাইবেন।

আমাদের দুই ধারে সারি সারি তাল-জাতীয় উচ্চবৃক্ষ—উহাদের কালো কালো পাখা ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, যে সময়ে আমরা এই তরুবীথির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলাম, সেই সময়ে ভক্তির প্রচণ্ড উন্মত্ত উল্লাস চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল,—সেই সময় ধর্ম্মের কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ চলিতেছিল। এই প্রশান্ত সুন্দর রাত্রিতে, গহ্বর-গভীর ঢাকের শব্দ, তূর্য্যের পৈশাচিক নিনাদ আমাদের পশ্চাতে শুনা যাইতেছে, সে এরূপ বিকট শব্দ যে, শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

এখনো আমরা পল্লীগ্রামে। মশক-পতঙ্গাদি তাড়াইবার জন্য তাম্রমূর্ত্তি ভৃত্যগণ সমস্ত রাত বড়-বড় হাতপাখায় আমাকে বাতাস করিয়াছে।

এক্ষণে এই বহুপুরাতন সৌধধবল শুভ্র বাড়ীর মধ্যে অরুণ-কিরণ প্রবেশ করিয়াছে। হাস্যময়ী ঊষার প্রভায় গৃহটি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যের দীপ্যমান মহিমার মধ্যে আমি জাগ্রত হইলাম।

শিশিরসিক্ত বারণ্ডাটি এখনো বেশ ঠাণ্ডা। এটি সুন্দর বসিবার স্থান। বারণ্ডাটি সৌধপলেপে তুষারশুভ্র। উহার মোটা-মোটা থাটো থাটো অসমান (অনিচ্ছাকৃত) থামগুলি চামেলি-লতায় ঘেরা।

চতুর্দ্দিকে মাঠ-ময়দান, গ্রাম্য নিস্তব্ধতা, বিমল প্রাভাতিক শান্তি। যদিও অত্রস্থ প্রকৃতিসুন্দরী একটু তাপদগ্ধা, শরতের প্রভাবে শুষ্কতানিবন্ধন একটু অবসাদক্লিষ্টা, তথাপি এখানকার আলোকরশ্মি দক্ষিণ-ফ্রান্সের সুন্দরতম প্রভাতকিরণের ন্যায় দিব্য প্রশান্ত। এখানে বড়-বড় তালজাতীয় বৃক্ষ নাই, অথবা সিংহলের ন্যায় উদ্দাম উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্য নাই। অস্মদ্দেশীয় অরণ্যের ন্যায় এখানকার বৃক্ষগুলি অনতি-উচ্চ ও বিরলপল্লব। ছিন্নতৃণ মাঠ ময়দান, ফলের বাগান, ছাঁটা ঘাসের উপর অঙ্কিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পায়ে চলা পথ, দূরে বৃক্ষশাখার মধ্য হইতে পরিদৃশ্যমান চূন্কামকরা ছোট-ছোট প্রাচীর, সুধাধবল ছোট-ছোট বাড়ী—এই সকল আমি অবলোকন করিতেছি, এবং আমার শৈশবের সুপরিচিত দৃশ্যগুলি আবার আমার চতুর্দ্দিকে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি।

যে চড়াইপাখী আমাদের গৃহছাদে নীড় নির্ম্মাণ করে, সেই নিতান্ত গ্রাম্য পাখীগুলা এখানেও আছে দেখিতেছি। কেবল এইমাত্র প্রভেদ ভারতের জীবজন্তু-মাত্রেরই মানুষের উপর যেরূপ অগাধ বিশ্বাস, ইহাদেরও তদ্রূপ;—মানুষ নিকটে গেলে উহারা পলায় না।

আমি দেখিতে পাইতেছি, স্বদেশসাদৃশ্য-জনিত বিস্ময় যেন আমার স্তব্ধ স্থানে স্থানে

এদেশে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই পূর্ণ শীতের সময়ে, আমাদের গ্রীষ্মশেষের শোভাসৌন্দর্য্য এখানে সম্ভোগ করিতেছি।..

আমি যে ভারতবর্ষে আছি, এই জ্ঞানটি আমার অন্তরের অন্তস্তলে জাগরূক থাকিলেও, যখনি আমি এখানকার কোন অনাদৃত জনবিরল স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই, তখনি একপ্রকার মধুর বিস্ময়সহকারে, জন্মভূমি-সম্বন্ধীয় বিবিধ বিভ্রমের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিই।

এই সকল ছোট-ছোট শাদা প্রাচীর, চামেলি-লতা, হল্‌দে-রং-ধরা ঘাস, শরৎঋতু-সুলভ বিচিত্র রং—এই সবে স্বদেশকে স্মরণ হইয়া, মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন সেই Aunis,—সেই La Saintonge-র মাঠ-ময়দান, আঙুর পাকিবার সময়ে, সেই কনকোজ্জ্বল-ঋতুকালীন Pleron-দ্বীপের সেই শান্তিময় বাড়ীগুলি, আমার মনে পড়ে।

কিন্তু আবার, মধ্যে মধ্যে অনেক ছোটো-খাটো জিনিষ পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া আমার এই স্বপ্নের ব্যাঘাত করে। ঐ দেখ, ছয়বৎসরবয়স্কা একটি ছোট বালিকা, আমাকে একটা সংবাদ দিবার জন্য, নিজগ্রাম হইতে প্রেরিত হইয়া এইখানে আসিয়াছে। ইহার কালো রহস্যময় চোখদুটি দীর্ঘায়ত; ইহার নাক্ ফুঁড়িয়া চুনি-বসানো একটি সোনার মাকৃড়ি আছে; চুনিগুলি দেখিতে শোণিতবিন্দুর ন্যায়।

দূরে, আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন শান্তিময় প্রাকৃতিক দৃশ্যটিকে উদ্বেজিত করিয়া কি-একটা অদ্ভুত জিনিষ গাছের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে;—ব্রাহ্মণিক দেবালয়ের একটি কোণ,—দেবতা ও রাক্ষসাদির মন্দিরস্থ একটি কোণ। মন্দিরটি বিষ্ণুদেবের—গাছপালায় ঢাকা পড়িয়াছে।

তরুগণের ছায়াসত্ত্বেও, মধ্যাহ্নের সূর্য্য আমাদের এই শাদা বাড়াটির উপর বাস্তবিকই একটু অতিরিক্ত-পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ বর্ষণ করিতেছে।

ছোট-ছোট ফলবাগানের উপর, অবসাদ-ম্রিয়মাণ তৃণভূমির উপর আলো পড়িয়াছে—খুব উজ্জ্বল আলো পড়িয়াছে। আমাদের সেপ্টেম্বরমাসের দীপ্ততম মধ্যাহ্নও এখানে হার মানে।

চারিদিকই নিস্তব্ধ। মেঠো-ঘাসের পথে আর কোন পথিক নাই। বড়-বড় হাতপাখাগুলা এখন ঘুমাইতেছে; যে সকল ভারতীয় ভৃত্য ঐ সকল পাখা ব্যজন করিয়া থাকে, তাহারাও ঘুমাইতেছে। সব চুপ্‌চাপ্। কোথাও টুঁশব্দ নাই। কেবল কতকগুলা দাঁড়কাক—যাহাদের দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ—তাহারাই আমার কাম্‌রায় প্রবেশ করিয়া আমার চারিদিকে কা-কা-শব্দ করিতেছে। এই সকল নিস্পন্দ পদার্থের মধ্যে, উহাদেরি নাচুনি-চালের পদশব্দ এবং উড়িবার পক্ষসঞ্চালনশব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না।...

হঠাৎ মনে পড়িল—খৃষ্টজন্মোৎসবের দিন আসন্ন; অমনি এখানকার এই চিরনির্ম্মল আকাশ—চিরগ্রীষ্মঋতু আমার কল্পনার উপর যেন ঘনঘোর বিষাদ ঢালিয়া দিল।

এইবার একে-একে আমার যাত্রার গাড়ি-দুটি আসিয়া পৌঁছিল। এখান হইতে ত্রিবঙ্কুরে যাইতে প্রায় দুইদিন লাগিবে।

সেইখানে যাইবার জন্য আমার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। এই দেশীয় শকটগুলি সুদীর্ঘ "কফিনে"র (শবাধার ন্যায় পিছন দিক্ দিয়া উহাতে ঢুকিতে হয়; এবং পর্য্যটন-কালে বাধ্য হইয়া উহার মধ্যে শুইয়া থাকিতে হয়। উহাদের বৃষবাহনেরা দুল্‌কি-চালে নাচিতে নাচিতে চলে। আমার গাড়ির বৃষযুগল শাদা; উহাদের শিং নীলরঙে রঞ্জিত। উহাদের গাড়ির বৃষদুটি কপিশ রঙের, এবং উহাদের শিং তারা দিয়া বাঁধানো।

এখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই। ইত্যবসরে, আমাদের চারিটি নিরীহ শান্ত অলস বৃষ তৃণভূমির উপর সটান শুইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট। *

"স্বদেশী সমাজ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জ্জন্ রঙ্গমঞ্চে পাঠ করি, † তৎসম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত-কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য এ প্রশ্নগুলি তিনি আমার কাছে পাঠান নাই, হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই যে যে স্থানে লেশমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থানে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আন্তরিক-কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

কিন্তু প্রশ্নোত্তরের মত লিখিতে গেলে লেখা নিতান্তই আদালতের সওয়াল-জবাবের মত হইয়া দাঁড়ায়। সেরূপ থাপ্‌ছাড়া লেখায় সকল কথা সুস্পষ্ট হয় না, এইজন্য সংক্ষিপ্ত-প্রবন্ধ-আকারে আমার কথাটা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করি।

কর্ণ যখন তাঁহার সহজ কবচটি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখনি তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়াছিল অর্জ্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই, তখনি তিনি সামান্য দস্যুর হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, শক্তি সকলের এক জায়গায় নাই—কোনো দেশ নিজের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিজের বল রক্ষা করে, কোনো দেশ নিজের সর্ব্বাঙ্গে শক্তিকবচ ধারণ করিয়া জয়ী হয়।

য়ুরোপের যেখানে বল, আমাদের সেখানে বল নহে। য়ুরোপ আত্মরক্ষার জন্য যেখানে

* ইহা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে বাহির হইয়া গেছে। কিন্তু "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের সহিত এই প্রবন্ধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেজন্য অনেকের আগ্রহে ও অনুরোধে এবং ইহার স্থায়িত্বসঙ্কল্পে উক্ত "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইল।—(সহঃ সঃ)

† গত ৭ই শ্রাবণ শুক্রবার মিনার্ভারঙ্গমঞ্চে চৈতন্যলাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে প্রবন্ধটি প্রথম পঠিত হইয়াছিল; তাহার পর পরিবর্দ্ধিত আকারে ১৬ই শ্রাবণ রবিবার কর্জ্জন্‌রঙ্গমঞ্চে ভাদ্রের বঙ্গদর্শন হইতে পুনঃপঠিত হয়।

উদ্যম প্রয়োগ করে, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সেখানে উদ্যমপ্রয়োগ বৃথা। য়ুরোপের শক্তির ভাণ্ডার ষ্টেট্ অর্থাৎ সরকার। সেই ষ্টেট্ দেশের সমস্ত হিতকর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে;—ষ্টেট্ই ভিক্ষাদান করে, ষ্টেট্ই বিদ্যাদান করে, ধর্ম্মরক্ষার ভারও ষ্টেটের উপর। অতএব এই ষ্টেটের শাসনকে সর্ব্বপ্রকারে সবল, কর্ম্মিষ্ঠ ও সচেতন করিয়া রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচানোই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়।

আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্ম্মরূপে আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্যই এতকাল ধর্ম্মকে, সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্ম্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।

এতকাল নানা দুর্ব্বিপাকেও এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এখন ইহা আমরা অচেতনভাবে, মূঢ়ভাবে পরের হাতে প্রতিদিন তুলিয়া দিতেছি। ইংরাজ আমাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল, রাজত্ব পাইয়াছে—সমাজটাকে নিতান্ত উপরিপাওনার মত লইতেছে—"ফাউ" বলিয়া ইহা আমরা তাহার হাতে বিনামূল্যে তুলিয়া দিতেছি।

তাহার একটা প্রমাণ দেখ। ইংরাজের আইন আমাদের সমাজরক্ষার ভার লইয়াছে। হয় ত যথার্থভাবে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাই বুঝিয়া খুসি থাকিলে চলিবে না। পূর্ব্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। সেই রফা অনুসারে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। তাহার ফল হইত এই, সামাজিক কোনো প্রথার ব্যত্যয় যাহারা করিত, তাহারা স্বতন্ত্রসম্প্রদায়রূপে সমাজের বিশেষ একটা স্থানে আশ্রয় লইত। এ কথা কেহই বলিবেন না, হিন্দুসমাজে আচারবিচারের কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেই পার্থক্য সামাজিক ব্যবস্থার গুণে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করে না।

আজ আর তাহা হইবার জো নাই। কোনো অংশে কোনো দল পৃথক্ হইতে গেলেই হিন্দুসমাজ হইতে তাহাকে ছিন্ন হইতে হয়। পূর্ব্বে এরূপ ছিন্ন হওয়া একটা বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইত। কারণ, তখন সমাজ এরূপ সবল ছিল যে, সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া টিঁকিয়া থাকা সহজ ছিল না। সুতরাং যে দল কোনো পার্থক্য অবলম্বন করিত, সে উদ্ধতভাবে বাহির হইয়া যাইত না। সমাজও নিজের শক্তিসম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল বলিয়াই অবশেষে ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া পৃথক্‌পন্থাবলম্বীকে যথাযোগ্যভাবে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইত।

এখন যে দল একটু পৃথক্ হয়, তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কারণ, ইংরাজের আইন কোন্‌টা হিন্দু, কোন্‌টা অহিন্দু, তাহা স্থির করিবার ভার লইয়াছে—রফা করিবার ভার ইংরাজের হাতে নাই; সমাজের হাতেও নাই। তাহার কারণ, পৃথক্ হওয়ার দরুণ কাহারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—ইংরাজরচিত স্বতন্ত্র

আইনের আশ্রয়ে কাহারো কিছুতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব এখন হিন্দুসমাজ কেবলমাত্র ত্যাগ করিতেই পারে। শুদ্ধমাত্র ত্যাগ করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রাণরক্ষার উপায় নহে।

আক্কেলদাঁত যখন ঠেলিয়া উঠিতে থাকে, তখন বেদনায় অস্থির করে। কিন্তু যখন সে উঠিয়া পড়ে, তখন শরীর তাহাকে সুস্থভাবে রক্ষা করে। যদি দাঁত উঠিবার কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া দাঁতগুলাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই শরীর সাব্যস্ত করে, তবে বুঝিব, তাহার অবস্থা ভাল নহে, বুঝিব, তাহার শক্তি-হীনতা ঘটিয়াছে।

সেইরূপ সমাজের মধ্যে কোনোপ্রকার নূতন অভ্যুদয়কে স্বকীয় করিয়া লইবার শক্তি একেবারেই না থাকা, তাহাকে বর্জ্জন করিতে নিরুপায়ভাবে বাধ্য হওয়া সমাজের সজীবতার লক্ষণ নহে। এবং, এই বর্জ্জন করিবার জন্য ইংরাজের আইনের সহায়তা লওয়া সামাজিক আত্মহত্যার উপায়।

যেখানেই সমাজ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া খণ্ডটিকে আপনার বাহিরে ফেলিতেছে, সেখানে যে কেবল নিজেকে ছোট করিতেছে, তাহা নহে—ঘরের পাশেই চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই বিরোধী পক্ষ যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, হিন্দুসমাজ ততই সপ্তরথীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িবে। কেবলি খোওয়াইতে থাকিব, এই যদি আমাদের অবস্থা হয়, তবে নিশ্চয় দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের এ দশা ছিল না। আমরা খোওয়াই নাই, আমরা ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া সমস্ত রক্ষা করিয়াছি ইহাই আমাদের বিশেষত্ব, ইহাই আমাদের বল।

শুধু এই নয়, কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া, আমরা ইংরাজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি, তাহাও কাহারো অগোচর নাই। যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিস্‌ম্যান্ ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবাররক্ষার চেষ্টা কেন? সেদিন বনবাসই শ্রেয়।

মুসলমানসমাজ আমাদের এক পাড়াতেই আছে এবং খৃষ্টানসমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বন্যার মত ধাক্কা দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সময়ে এ সমস্যাটা ছিল না। যদি থাকিত, তবে তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত এই সকল পর-সমাজের অধিকার নির্ণয় করিতেন—এমন ভাবে করিতেন, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত বিরোধ ঘটিত না। এখন কথায় কথায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে, এই দ্বন্দ্ব—অশান্তি, অব্যবস্থা ও দুর্ব্বলতার কারণ।

যেখানে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব বাধিতেছে না, সেখানে ভিতরে ভিতরে অলক্ষিতভাবে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয়রোগও সাধারণ রোগ নহে। এইরূপে সমাজ পরের সঙ্গে আপনার সীমানানির্ণয়সম্বন্ধে কোনো কর্ত্তৃত্ব-প্রকাশ করিতেছে না; নিজের ক্ষয়নিবারণের প্রতিও তাহার কর্ত্তৃত্ব জাগ্রত নাই। যাহা আপনি হইতেছে, তাহাই হইতেছে;—যখন ব্যাপারটা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পরিস্ফুট হইতেছে, তখন মাঝে মাঝে হাল ছাড়িয়া

বিলাপ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিলাপে কেহ বন্যাকে ঠেকাইতে পারে নাই এবং রোগের চিকিৎসাও বিলাপ নহে।

বিদেশী শিক্ষা, বিদেশী সভ্যতা আমাদের মনকে, আমাদের বুদ্ধিকে যদি অভিভূত করিয়া না ফেলিত, তবে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা এত সহজে লুপ্ত হইতে বসিত না।

গুরুতর রোগে যখন রোগীর মস্তিষ্ক বিকল হয়, তখনি ডাক্তার ভয় পায়। তাহার কারণ, শরীরের মধ্যে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা, তাহা মস্তিষ্কই করিয়া থাকে—সে যখন অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন বৈদ্যের ঔষধ তাহার সর্ব্বপ্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রবল ও বিচিত্রশক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে। সেই মনই সমাজের মস্তিষ্ক, বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কি করিয়া?

এইরূপে বিদেশীশিক্ষার কাছে সমাজের শিক্ষিতলোক হৃদয়মনকে অভিভূত হইতে দিয়াছে বলিয়া কেহ বা তাহাকে গালি দেয়, কেহ বা প্রহসনে পরিহাস করে। কিন্তু শান্তভাবে কেন বিচার করে না যে,—কেন এমনটা ঘটিতেছে?

ডাক্তাররা বলেন, শরীর যখন সবল ও সক্রিয় থাকে, তখন রোগের আক্রমণ ঠেকাইতে পারে। নিদ্রিত অবস্থায় সর্দ্দিকাশি-ম্যালেরিয়া চাপিয়া ধরিবার অবসর পায়।

বিলাতিসভ্যতার প্রভাবকে রোগের সঙ্গে তুলনা করিলাম বলিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। স্বস্থানে সকল জিনিষই ভাল, অস্থানে পতিত ভাল জিনিষও জঞ্জাল। চোখের কাজল গালে লেপিলে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠে। আমার উপমার ইহাই কৈফিয়ৎ।

যাহা হউক, আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়ে সতেজ সক্রিয় থাকিত, তাহা হইলে বিলাত আমাদের সে চিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিতে পারিত না।

দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজ যখন তাহার কলবল, তাহার বিজ্ঞানদর্শন লইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া পড়িল, তখন আমাদের চিত্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। যে তপস্যার প্রভাবে ভারতবর্ষ জগতের গুরুপদে আসীন হইয়াছিল, সেই তপস্যা তখন ক্ষান্ত ছিল। আমরা তখন কেবল মাঝে মাঝে পুঁথি রৌদ্রে দিতেছিলাম এবং গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম। আমরা কিছুই করিতেছিলাম না। আমাদের গৌরবের দিন বহুদূর পশ্চাতে দিগন্তরেখায় ছায়ার মত দেখা যাইতেছিল। সম্মুখের পুষ্করিণীর পাড়িও সেই পর্ব্বতমালার চেয়ে বৃহৎরূপে, সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়!

যাহাই হউক, আমাদের মন যখন নিশ্চেষ্ট-নিষ্ক্রিয়, সেই সময়ে একটা সচেষ্ট-শক্তি, শুষ্ক জ্যৈষ্ঠের সম্মুখে আষাঢ়ের মেঘাগমের ন্যায় তাহার বজ্রবিদ্যুৎ, বায়ুবেগ ও বারিবর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ দিগ্‌দিগন্ত বেষ্টন করিয়া দেখা দিল। ইহাতে অভিভূত করিবে না কেন?

আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা। আমরা যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি বসিয়া-বসিয়া ফুঁকিতেছি, ইহাই আমাদের

গৌরব নহে; আমরা সেই ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছি, ইহাই যখন সমাজের সর্ব্বত্র আমরা উপলব্ধি করিব, তখনি নিজের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইয়া আমাদের মোহ ছুটিতে থাকিবে।

আমাদের এই নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট অবস্থা কেন ঘটিয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার কারণ দেখাইয়াছি। তাহার কারণ ভীরুতা। আমাদের যাহা কিছু ছিল, তাহারই মধ্যে কুঞ্চিত হইয়া থাকিবার চেষ্টাই বিদেশী-সভ্যতার আঘাতে আমাদের অভিভূত হইবার কারণ।

কিন্তু প্রথমে যাহা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহাই আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। প্রথম সুপ্তিভঙ্গে যে প্রখর আলোক চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়, তাহাই ক্রমশ আমাদের দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে। এখন আমরা সজাগভাবে, সজ্ঞানভাবে নিজের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে বৃহৎভাবে, প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখিতেছি।

এখন এই আদর্শকে কি করিয়া বাঁচানো যাইবে, সেই ব্যাকুলতা নানাপন্থানুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে। যেমন আছি, ঠিক তেম্নি বসিয়া থাকিলেই যদি সমস্ত রক্ষা পাইত, তবে প্রতিদিন পদে পদে আমাদের এমন দুর্গতি ঘটিত না।

আমি যে ভাষার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবার মৎলব মনে মনে আঁটিয়াছি, বঙ্গবাসীর কোনো কোনো লেখক এরূপ আশঙ্কা অনুভব করিয়াছেন। আমার বুদ্ধিশক্তির প্রতি তাঁহার যতদূর গভীর অনাস্থা, আশা করি, অন্য দশজনের ততদূর না থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষীণহস্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে? প্রবন্ধ লিখিয়া আমি ভারতবর্ষ একাকার করিব। যদি এমন মৎলবই আমার থাকিবে, তবে আমার কথার প্রতিবাদেরই বা চেষ্টা কেন? কোনো বালক যদি নৃত্য করে, তবে তাহার মনে মনে ভূমিকম্পসৃষ্টির মৎলব আছে শঙ্কা করিয়া কেহ কি গৃহস্থদিগকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে?

ব্যবস্থাবুদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ষ বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করে, এ কথার অর্থ ইহা হইতেই পারে না, ভারতবর্ষ ষ্টীম্‌রোলার্ বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম, সমতল করিয়া দেয়। বিলাত পরকে বিনাশ করাই, পরকে দূর করাই আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানে, ভারতবর্ষ পরকে আপন করাই আত্ম-সার্থকতা বলিয়া জানে। এই বিচিত্রকে এক করা, পরকে আপন করা যে একাকার করা নহে, পরন্তু পরস্পরের অধিকার সুস্পষ্ট-রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, এ কথা কি আমাদের দেশেও চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে? আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন করিতে, পরকে আপন করিতে না পারি—আমরাও যদি পদশব্দটি শুনিলেই, অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই অমনি হাঁহাঁঃশব্দে লাঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া যাই, তবে বুঝিব, পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্মী আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন এবং এই লক্ষ্মীছাড়া অরক্ষিত ভিটাকে আজ নিদ্রিত

কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাঁচাইতে হইবে—ইহার রক্ষাদেবতা,—যিনি সহাস্যমুখে সকলকে ডাকিয়া-আনিয়া সকলকে প্রসাদের ভাগ দিয়া অতি নিঃশব্দে, অতি নিরুপদ্রবে ইহাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন,—তিনি কখন্ ফাঁকি দিয়া অদৃশ্য হইবেন, তাহারই অবসর খুঁজিতেছেন।

গোস্বামিমহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—আমি যেখানে নূতন নূতন যাত্রা-কথকতা প্রভৃতি রচনার প্রস্তাব করিয়াছি, সেস্থলে "নূতন" কথাটার তাৎপর্য্য কি? পুরাতনই যথেষ্ট নহে কেন?

রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত ছয়কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নূতন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত কঠিনভাবে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিতগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।

আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নূতন করিয়া আরো একটি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা, সাধু, পিতা, গুরু, ভাই, ভৃত্যের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাঁহাদের জন্য কতদূর ত্যাগ করা যায়, তাহা শিখিব; সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহাও নূতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে, ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু আছে?

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, সমুদ্রযাত্রার আমি সমর্থন করি কি না; যদি করি, তবে হিন্দুধর্ম্মানুগত আচারপালনের বিধি রাখিতে হইবে কি না?

এ সম্বন্ধে কথা এই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম্ম বলি না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ সমস্ত কথাকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া আমি অনাবশ্যক জ্ঞান করি। কারণ, আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আমার মতেই সমাজগঠন করিতে হইবে। আমি বলিতেছি, আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্বগ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোনো উপায়ে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত মীমাংসা কখন্ কিরূপ হইবে, আমি তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না। অতএব প্রসঙ্গক্রমে আমি দুচারিটা কথা যাহা বলিয়াছি, অতিশয় সূক্ষ্মভাবে তাহার বিচার করিতে বসা মিথ্যা। আমি যদি সুপ্ত জহরীকে ডাকিয়া বলি—"ভাই, তোমার হীরামুক্তার দোকান সাম্‌লাও", তখন কি সে এই কথা লইয়া আলোচনা করিবে যে, কঙ্কণরচনার গঠনসম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে, অতএব আমার কথা কর্ণপাতের যোগ্য নহে? তোমার কঙ্কণ তুমি যেমন খুসি গড়িয়ো, তাহা লইয়া তোমাতে-আমাতে হয় ত চিরদিন বাদপ্রতিবাদ চলিবে, কিন্তু আপাতত চোখ জল দিয়া ধৌত কর, তোমার

হীরামুক্তার পসরা সাম্‌লাও—দস্যুর সাড়া পাওয়া গেছে এবং তুমি যখন অসাড়-অচেতন হইয়া দ্বার জুড়িয়া পড়িয়া আছ, তখন তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাটি একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিতেছে না।

শিবাজি-উৎসব।

১

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে'—
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি'—
"একধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি!"

২

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ,
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ!
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল-নির্ম্মল
শ্যামল উত্তরী'
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি'।

৩

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগযুগান্তের বিদ্যুদ্বহ্নিতে
মহামন্ত্রশিখা!

মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্কপত্র যথা,—
সেদিনো শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিল বারতা!

৪

তার পরে শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লিরাজশালা,—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা!
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হ'ল তার সীমা।

৫

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দ-চরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন!
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি'
নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্ব্বরী,
রাজদণ্ডরূপে!

৬

সেদিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি!
কোথা তব নাম!
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হ'ল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম!
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে,—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে!

৭

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ !
ওগো মিথ্যাময়ি,
তোমার লিখন-'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী ?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে,
নিশ্চয় সে জানি।

৮

হে রাজতপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশলক্ষ্মার পূজাঘরে,
সে সত্যসাধন
কে জানিত হ'য়ে গেছে চির যুগযুগান্তর-তরে
ভাবতের ধন !

৯

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল, হে রাজবৈরাগি,
গিরিদরীতলে,
—বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি'
পরিপূর্ণ বলে—
সেইমতে বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
'যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে
কোথা ছিল ঢাকা !'

১০

সেইমত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব্বভারতে—
কি অপূর্ব্ব হেরি !
বঙ্গের অঙ্গনদ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ'তে
তব জয়ভেরি ?

তিনশত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি'
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কি রশ্মি প্রসারি'
উদিল আবার ?

১

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির
আঘাতে না টলে।
যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি' বেশ
ভারতের দ্বারে।

১২

আজো তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কি দৃশ্য মহান্‌
হেরিছে কে জানে।
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'য়ে
আসিয়াছ আজ,
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে,
সেই তব কাজ।

১৩

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ অশ্বদল
অস্ত্র খরতর, —
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
হর হর হর।
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হ'তে এল নামি',
করিল আহ্বান,
মুহূর্ত্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামি,
বাঙালীর প্রাণ!

১৪

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দকাল ধরি'—
জানে নি স্বপনে
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে।
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্দ্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন-বাণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,
নূতন প্রভাত।

১৫

মারাঠার প্রান্ত হ'তে একদিন তুমি, ধর্ম্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে,
রাজা বলে' জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে!
তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে!

১৬

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমরমূরতি,
সমুন্নত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনোকালে!
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি, হে রাজন্,
তুমি মহারাজ!
তব রাজকর ল'য়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ!

১৭

সেদিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' লব!
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব!